বিশ্বভারতী
পত্রিকা
সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫১

সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে

ভারতে মকরধ্বজ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে ইহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বর্তমান কালে সকল শ্রেণীর চিকিৎসক নানা রোগে ইহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মকরধ্বজ অদ্রাব্য বস্তু, সহজ অবস্থায় পাকস্থলীর রসে জীর্ণ হয় না। এই কারণে সেবনের পূর্বে বহুক্ষণ মাড়িতে হয়। কিন্তু খল-মুড়ির পেষণ কখনও চূড়ান্ত হয় না, চর্মচক্ষুতে যাহা সূক্ষ্ম বোধ হয় অণুবীক্ষণে তাহার স্থূলতা ধরা পড়ে। এই কারণেই মকরধ্বজে সকল ক্ষেত্রে উপকার দর্শে না।

যদি ফললাভে নিশ্চিত হইতে হয় তবে

সেবন করা কর্তব্য

ইহা বিশুদ্ধ ষড়্‌গুণ স্বর্ণাঢ্য মকরধ্বজ, যন্ত্রের প্রচণ্ড পেষণে তনুকৃত এবং কণাসমূহের অশেষ বিভাজনের ফলে সক্রিয়।

প্রতি শিশিতে ১৪ ট্যাবলেট (৭ পূর্ণ মাত্রা) থাকে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

বিশ্বভারতী পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৫১—আষাঢ় ১৩৫২

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রচনা-সূচী

চিত্রসূচী

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫১

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

প্রতি সংখ্যা এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। বিশ্বভারতী পত্রিকা এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়স্বরূপ হইবে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হইবে।

সম্পাদনা-সমিতি

সম্পাদক : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সদস্যবর্গ :

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য — শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন — শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। বার্ষিক মূল্য রেজেস্ট্রী ডাকে ৫।০। বিশ্বভারতীর সদস্যগণ পক্ষে ৪।০। চিঠিপত্র, প্রবন্ধাদি ও টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণীয় :

কর্মাধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা
বিশ্বভারতী কার্যালয়
৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

টেলিফোন : বড়বাজার ৩৯৯৫

৩৭ পৃষ্ঠার চিত্র 'নিরীক্ষা'র এবং ৫৪ পৃষ্ঠার চিত্র 'দেশ'এর সৌজন্যে প্রকাশিত।

শবরীর প্রতীক্ষা শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫১

গীতিগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

আমরা দূর আকাশের নেশায় মাতাল
ঘরভোলা সব যত—
বকুলবনের গন্ধে আকুল
মৌমাছিদের মতো।
সূর্য ওঠার আগে
মন আমাদের জাগে,—
বাতাস থেকে ভোর-বেলাকার
সুর ধরি সব কত॥

কে দেয় যে হাতছানি
নীল পাহাড়ের মেঘে মেঘে,
আভাস বুঝি জানি।
পথ যে চলে বেঁকে বেঁকে
অলখ-পানে ডেকে ডেকে
ধরা যারে যায় না তারই
ব্যাকুল খোঁজেই রত॥

২

বাহির হলেম আমি আপন ভিতর হতে,
নীল আকাশে পাড়ি দেব খ্যাপা হাওয়ার স্রোতে।
আমের মুকুল ফুটে ফুটে
যখন পড়ে ঝ'রে ঝ'রে,
মাটির আঁচল ভ'রে ভ'রে
ঝরাই আমার মনের কথা
ভরা ফাগুন-চোতে ॥

কোথা তুই প্রাণের দোসর বেড়াস ঘুরি ঘুরি
বনবীথির আলোছায়ায় করিস লুকোচুরি।
আমার একলা বাঁশি পাগলামি তার
পাঠায় দিগন্তরে
তোমার গানের তরে,—
কবে বসন্তেরে জাগিয়ে দেব
আমাতে আর তোতে ॥

৩

সুরের জালে কে জড়ালে আমার মন,
আমি ছাড়াতে পারিনে সে বন্ধন।
আমায় অজানা গহনে টানিয়া নিয়ে যে যায়,
বরন-বরন স্বপনছায়ায়
করিল মগন ॥

জানি না কোথায় চরণ ফেলি,
মরীচিকায় নয়ন মেলি,—
কী ভুলে ভুলালো দূরের বাঁশি।
মন উদাসী
আপনারে হারালো ধ্বনিতে আবৃত চেতন ॥

৪

এই তো ভরা হল ফুলে ফুলে ফুলের ডালা।
ভরা হল— কে নিবি কে নিবি গো,
গাঁথিবি বরণমালা।
চম্পা চামেলি সেঁউতি বেলি
দেখে যা সাজি আজি রেখেছি মেলি—
নবমালতীগন্ধ-ঢালা॥

বনের মাধুরী হরণ করো তরুণ আপন দেহে।
নববধূ, মিলনশুভলগন-রাত্রে
লও গো বাসরগেহে—
উপবনের সৌরভভাষা,
রসতৃষিত মধুপের আশা।
রাত্রিজাগর রজনীগন্ধা
করবী রূপসীর অলকানন্দা
গোলাপে গোলাপে মিলিয়া মিলিয়া
রচিবে মিলনের পালা॥

গীতার ভূমিকা

শ্রীরাজশেখর বসু

গীতার উদ্দেশ্য

সমস্ত বিদ্যা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— তত্ত্ববিষয়ক (theoretical) ও ব্যবহারবিষয়ক (practical)। কোনও বিদ্যার তত্ত্বাংশ না জানলে তার সুপ্রয়োগ হ'তে পারে না। শরীরতত্ত্ব, উদ্‌ভিদ্‌তত্ত্ব, রসায়ন, ভৈষজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা তত্ত্ব শিখে চিকিৎসক তাঁর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। যেসকল বিষয় নিয়ে কোনও কাজ করতে হয় তাদের প্রকৃতি ও পরস্পর সম্বন্ধ না জানলে সিদ্ধিলাভ হয় না।

সকল ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য দুঃখের নিবৃত্তি কিংবা মোক্ষ। উপরিলিখিত শ্রেণীবিভাগ-অনুসারে দর্শনবিদ্যার এক অঙ্গ তত্ত্বজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মা কি, জগৎ কি, তাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি, ইত্যাদির নির্ণয়। অপর অঙ্গ তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োগ, অর্থাৎ ঐ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দুঃখের নিবৃত্তি বা মোক্ষলাভ। সকল দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বাঙ্গ একপ্রকার নয়, ব্যবহারাঙ্গও একপ্রকার নয়। আমার নির্বাচিত দর্শনতত্ত্ব যদি বলে যে ঈশ্বর ও শয়তান দুইই আছেন এবং দুজনেই প্রবল তবে আমাকে যে ভাবে চলতে হবে, একেশ্বরবিশ্বাসী বা নিরীশ্বর হ'লে ঠিক সে ভাবে চলতে হবে না। আবার, একই তত্ত্ব মেনে নিলেও চলবার পথ বিভিন্ন হ'তে পারে।

বেদান্ত ও সাংখ্য সূত্রগ্রন্থ প্রধানত তত্ত্বমূলক। কি ক'রে এই সকল তত্ত্ব জীবনে প্রয়োগ করতে হয় তার বিস্তারিত বিধান নেই, যিনি মোক্ষকাম তাঁকে নিজ বুদ্ধির দ্বারা বা অপর শাস্ত্রের সাহায্যে সূত্রনির্ণীত তত্ত্বসকল কাজে লাগাতে হয়। পাতঞ্জলসূত্রে তত্ত্ব ও প্রয়োগবিধি দুইই আছে; ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ ইত্যাদির সম্বন্ধনির্ণয় আছে, এবং কি ক'রে প্রাণায়ামাদির সাহায্যে যোগৈশ্বর্য ও মুক্তি লাভ করা যায় তারও প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে।

গীতাতে দার্শনিক তত্ত্ব বিস্তর আছে, তথাপি এতে মুখ্যত ব্যাবহারিক বিদ্যাই কথিত হয়েছে। গীতাকার তাঁর সময়ে প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের তত্ত্বসমূহ ভিত্তিরূপে নিয়েছেন এবং বহু স্থানে ঐসকল তত্ত্ব নিজ ভাষায় বিস্তারিত করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ঐসকল তত্ত্ব অনুসারে জীবনযাত্রার পদ্ধতি নির্ধারণ। গীতা কেবল নীতিশাস্ত্র বা ethics নয়। নীতিশাস্ত্র বলে— এই কাজ ভাল, এই কাজ মন্দ, বড় জোর বলে — এইজন্য ভাল, এইজন্য মন্দ। কিন্তু গীতাকার অধিকন্তু বলেন— এইরূপে জীবনযাত্রা নিরূপিত কর, তবেই যা শ্রেয় তাতে মন বসবে, যা হেয় তাতে বিরাগ জন্মাবে।

গীতায় যে শিক্ষা আছে তার উদ্দেশ্য কি? সকলেই বলবেন— সকল মোক্ষশাস্ত্রের যে উদ্দেশ্য গীতারও তাই, অর্থাৎ মোক্ষ। মোক্ষের তারতম্য আছে কিনা জানি না, কিন্তু অর্জুনকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য তাঁর সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ যেসকল আদর্শ ধরেছেন তার সকলগুলিকেই সম্পূর্ণ মুক্তি বা ব্রহ্মনির্বাণের অবস্থা বলা যায় না। মোক্ষ নিশ্চয়ই চরম লক্ষ্য। কিন্তু তাতে পৌঁছবার জন্য যে সোপান বর্ণিত হয়েছে তার কোনও পঙ্‌ক্তিতে উঠতে পারলেও মানুষ কৃতার্থ হ'তে পারে— এও গীতার বক্তব্য। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে

মহতো ভয়াৎ' (২।৪৪), এই ধর্মের অতি অল্পও মহাভয় থেকে ত্রাণ করে। সাধারণ লোকের গীতা-অধ্যয়নের এই সার্থকতা।

সাংখ্য

কোনও একটি বিষয় সম্বন্ধে বিশদ ধারণা করতে হ'লে নানা দিক্ দিয়ে তার বিশ্লেষ ও আলোচনা করা যেতে পারে। গণিতের অনেক তত্ত্ব জ্যামিতি ও বীজগণিত উভয়েরই সাহায্যে বুঝতে পারা যায়। আত্মজ্ঞান আলোচনার উদ্দেশ্যে বিবিধ দর্শনশাস্ত্র এখন প্রচলিত আছে, গীতারচনার যুগেও ছিল। সাংখ্যদর্শন তারই একটি। ইউক্লিডের যুগে জ্যামিতি যেরূপ ছিল বর্তমান যুগে ঠিক সেরূপ নেই, তথাপি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় জ্যামিতির পদ্ধতি একজাতীয়। সেইরূপ, গীতার যুগে সাংখ্যদর্শন বললে যা বোঝাত তা অধুনা প্রচলিত সাংখ্যদর্শন থেকে কিছু ভিন্ন, যদিও পদ্ধতি একই প্রকার। ১০।২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন — তিনি 'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ'। কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তয়িতা ব'লে খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ কপিলের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। গীতোক্ত সাংখ্যে ব্রহ্মই কেন্দ্রস্বরূপ, কিন্তু প্রচলিত সাংখ্য ব্রহ্মবর্জিত। গীতোক্ত ও প্রচলিত সাংখ্যের এইটিই প্রধান প্রভেদ।

যোগ

অমরকোষে 'যোগ'-এর অর্থ— সংহনন (সংহতি), উপায় (উপার্জন), ধ্যান, সংগতি (মিলন), যুক্তি (প্রয়োগ)। চলিত কথায় 'যোগ' বললে হঠযোগাদি বোঝায়। গীতায় 'যোগ' শব্দ এই সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয় নি। দুই-এক স্থলে এর অর্থ উপায় বা উপার্জন, যথা 'যোগক্ষেম'। কিন্তু অন্য সর্বত্র 'যোগ' শব্দ এক বিশেষ অথচ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

গীতায় যোগের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে— 'সমত্বই যোগ' (২।৪৮); 'কর্মে কৌশলই যোগ' (২।৫০); 'যা সন্ন্যাস তাই যোগ, যার সংকল্প (ফলাশা) সন্ন্যস্ত হয় নি সে কখনও যোগী নয়' (৬।২)।

ধ্যান ও প্রয়োগ এই দুই আভিধানিক অর্থও গীতোক্ত 'যোগ' শব্দে উহ্য আছে। ধ্যান বা একাগ্র-চিন্তার দ্বারাই সমত্ব অর্থাৎ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান লাভ হয়। ধ্যানদ্বারা কর্মের তত্ত্ব সম্যক্ বুঝতে পারলেই লোকে ফল সম্বন্ধে উদাসীন হ'তে পারে। আবার, প্রয়োগেই কৌশল আবশ্যক।

কোনও ক্রিয়া (process) না থাকলে যোগ অসম্ভব। চিন্তাও মানসিক ক্রিয়া। আভিধানিক ও গীতোক্ত অর্থ অনুসারে কোনও ক্রিয়াকে 'যোগ' বলতে হ'লে তার এই কটি লক্ষণ থাকা আবশ্যক—

(১) এই ক্রিয়ায় কোনও বিষয়ে অপর কোনও বিষয় প্রযুক্ত হচ্ছে (যুক্তি বা প্রয়োগ)। (২) এই ক্রিয়া একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠিত (ধ্যান)। (৩) এই ক্রিয়া উদ্দেশ্যসাধনের উপযুক্ত দক্ষতাসহকারে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত (কৌশল)। (৪) এর অনুষ্ঠাতা সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন, অর্থাৎ তাঁর নিজের কোনও ফলাশা বা স্বার্থ নেই (সমত্ব, সন্ন্যস্ত সংকল্প)।

অতএব, গীতার মতে একাগ্রচিত্তে কাজ করলেই যোগ হয় না, সুকৌশলে কাজ করলেও হয় না, সমত্ব ও ফলাশাবর্জন চাই। আমি যখন ফলাফল সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থেকে একাগ্রচিত্তে বুদ্ধিপ্রয়োগ করি তখন আমি 'বুদ্ধিযোগ' অবলম্বন করি। যখন ঐপ্রকারে সাংখ্যসন্ন্যাসিগণের মত অনুসারে নিজের আচরণ

নিয়ন্ত্রিত করি তখন 'সাংখ্যযোগ' অবলম্বন করি। যখন মাথা না ঘামিয়ে কেবল শ্রদ্ধাপ্রয়োগ ক'রে কোনও আপ্তবাক্য উপলব্ধি ক'রে তদনুসারে কর্ম করি তখন 'ভক্তিযোগ' অবলম্বন করি।

কর্ম, কর্মযোগ

গীতায় বহু স্থলে সাধারণ অর্থেই 'কর্ম' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। শ্বাস, আহার, নিদ্রা, অর্থোপার্জন, যাগযজ্ঞ, সুকর্ম, কুকর্ম— সকলই 'কর্ম'। অনেক কর্ম আছে যা ইচ্ছা করলেও ছাড়া যায় না, ছাড়লে মৃত্যু, যথা —শ্বাস, আহার, নিদ্রা। কিন্তু এমন কর্ম অনেক আছে যা করা না-করা অথবা করার পদ্ধতিনির্বাচন মানুষের ইচ্ছাধীন। গীতার উপদেশ— এই সকল কর্ম নির্বিচারে ক'রো না, বুদ্ধিযোগদ্বারা যাচাই ক'রে নাও। যা 'বিকর্ম' (কুকর্ম) তা অবশ্য বাদ দেবে, কিন্তু অবশিষ্ট বিহিত কর্ম যা আছে, যা সমাজরক্ষার অনুকূল অতএব ধর্মসংগত, তাও বিশেষ প্রণালীতে যোগস্থ হয়ে সম্পন্ন করবে। যদি এইরূপে সাবধান না হও তবে 'কর্মবন্ধনে' পড়বে, কর্ম তোমার বশ না হয়ে তুমিই কর্মের বশ হবে, কামনা সফল হ'লে আরও কামনা আসবে, বিফল হ'লে ক্রোধ আসবে, সম্মোহ আসবে, নীতিজ্ঞান লুপ্ত হবে, বুদ্ধিনাশ হবে, তোমার উন্নতির সম্ভাবনা নষ্ট হবে। সাধারণ লোক এত সতর্ক হ'তে চায় না, যদৃচ্ছা কর্ম ক'রে যায়। গীতা তাদের জন্য নয়। কিন্তু যিনি উন্নততর অবস্থায় পৌঁছতে চান, তাঁর জন্য গীতা মার্গ নির্দেশ করেছে— 'কর্মযোগ'।

কোন্ কোন্ কর্ম বিধেয় গীতায় তার বিস্তৃত তালিকা নেই, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে নানা স্থানে আছে— একপ্রকার কর্মের চেয়ে অন্যপ্রকার কর্ম শ্রেষ্ঠ, সাত্ত্বিক প্রকৃতির কর্ম কি, জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধাত্মা কি ভাবে কর্ম করেন, ইত্যাদি। তালিকার প্রয়োজন হয় নি, কারণ গীতার যুগে যে সকল কর্ম বিহিত গণ্য হ'ত তখনকার ধর্মশাস্ত্রেই তা বিস্তারিত ছিল— 'শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ' (১৬।২৪), কার্য-অকার্য ব্যবস্থার জন্য শাস্ত্র তোমার প্রমাণ। কিন্তু বিহিত কর্ম হ'লেই চলবে না, গীতায় তার সম্পাদনপদ্ধতি নিরূপিত হয়েছে— 'অসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচার' (৩।১৯), অনাসক্ত হয়ে সতত করণীয় কর্ম কর। এই আসক্তিহীন কর্মের কথা গীতায় নানা স্থানে নানা প্রকারে উক্ত হয়েছে। এই নিষ্কাম কর্মই গীতার মূল বক্তব্য।

নিষ্কাম কর্মের অর্থ লক্ষ্যহীন কর্ম নয়। মানুষ সজ্ঞানে কোনও কর্ম বিনা উদ্দেশ্যে করতে পারে না। নিষ্কামের অর্থ— ব্যক্তিগত স্বার্থ-বিহীন। সর্বভূতের বা বহুজনের মঙ্গল ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়। নিজেকে সুস্থ রাখাও নিষ্কাম কর্ম, কারণ, প্রত্যেকের স্বাস্থ্য নিয়েই বহুজনের স্বাস্থ্য। সর্বভূতের সকলে সমান উপকৃত হবে এমন কর্ম করা প্রায় অসম্ভব। আমি যদি যথাসাধ্য সমাজরক্ষার অনুকূল কর্ম করি এবং তার ফলে স্বয়ং উপকৃত হই, তাও নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম করার পদ্ধতিই 'কর্মযোগ'।

> যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
> সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ (২।৪৮)
> বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
> তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ (২।৫০)

অতএব, গীতার মতে কর্মযোগের লক্ষণ— (১) করণীয় কর্মে বুদ্ধি প্রযুক্ত হবে। (২) যোগস্থ অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত হয়ে করতে হবে। (৩) কৌশলে অর্থাৎ বিশিষ্ট উপায়ে দক্ষতার সহিত করতে হবে। (৪) সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ ক'রে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হয়ে সুকৃতদুষ্কৃতের হিসাব না ক'রে নিষ্কামভাবে করতে হবে।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ

গীতায় দুইপ্রকার 'নিষ্ঠা' উক্ত হয়েছে— সাংখ্যগণের জ্ঞানযোগ ও যোগিগণের কর্মযোগ (৩৷৩)। 'নিষ্ঠা'র অর্থ আস্থা, অনুষ্ঠান বা সাধনাপদ্ধতি— যাঁদের লক্ষ্য উচ্চে তাঁদের উপযোগী জীবনযাত্রাপ্রণালী। 'সাংখ্য'-এর অর্থ সাংখ্যদর্শনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি নয়। যেসকল সন্ন্যাসী সাংখ্য তত্ত্ব শিখে সংসার থেকে দূরে যথাসম্ভব কর্মবর্জন ক'রে চলতেন তাঁরাই 'সাংখ্য'। এঁদের 'নিষ্ঠা' বা সাধনার মার্গকে গীতায় 'জ্ঞানযোগ' বলা হয়েছে।

'যোগী'র অর্থ— কর্মযোগপরায়ণ— 'কর্মযোগেন যোগিনাম্' (৩৷৩)। এঁরাও সাংখ্যদর্শনকে ভিত্তিস্বরূপ নিতেন, কিন্তু অন্যবিধ মার্গ অনুসরণ করতেন।

গীতোক্ত কর্মযোগ সাধনায় যেমন ইন্দ্রিয়সংযম বুদ্ধিপ্রয়োগ ইত্যাদি বিহিত হয়েছে, সাংখ্য-সন্ন্যাসীদের অবলম্বিত জ্ঞানযোগেও তা প্রয়োজনীয়। প্রভেদ এই— জ্ঞানযোগী আসক্তির আশঙ্কায় কর্ম পরিহার করেন, জনসাধারণের সহিত সংশ্রব রাখেন না, একমাত্র নিজের বা নিজ দলের উন্নতি করতে চান। তাঁর অনুষ্ঠান মানসিক ব্যাপার মাত্র, কেবল তপস্যা। পক্ষান্তরে কর্মযোগী বহুকার্যে ব্যাপৃত। তিনি আসক্তি ত্যাগ করেছেন কিন্তু কর্ম ত্যাগ করেন নি। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার আছে। তিনি সাধারণ লোকের সম্মুখে সহজসাধ্য হিতকর আদর্শ নিজের আচরণদ্বারা স্থাপন করেন। তিনি 'লোকসংগ্রহচিকীর্ষু' (৩৷২৫), অর্থাৎ লোকরক্ষণ বা লোকহিত করতে চান। তিনি কেবল নিজেরই উন্নতি করেন না, 'জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি যুক্তঃ সমাচরন্' (৩৷২৬), যোগপরায়ণ হয়ে সর্বকর্ম সমাচরণ ক'রে লোকসেবা করেন। তাঁর অনুষ্ঠান কেবল মানসিক ব্যাপার নয়, তিনি 'ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য অসক্তঃ কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগম্ আরভতে' (৩৷৭), মন দ্বারা ইন্দ্রিয়ের প্রভাব সংযত ক'রে অনাসক্ত হয়ে কর্মেন্দ্রিয়দ্বারা অর্থাৎ হাতেকলমে কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন। জ্ঞানযোগী অসামাজিক সন্ন্যাসী, কর্মযোগী সামাজিক গৃহী, তথাপি নির্লিপ্ত।

গীতার মতে জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসীর চেয়ে কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ— 'কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে' (৫৷২)। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগের স্পষ্ট নিন্দা করেন নি। বলেছেন— বালকের মত লোকেরাই সাংখ্য (জ্ঞানযোগ বা সন্ন্যাস) এবং যোগ (কর্মযোগ) পৃথক্ বলে, একটিতে আস্থা থাকলে উভয়েরই ফল পাওয়া যায় (৫৷৪)। কিন্তু এও বলেছেন— 'সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ, যোগযুক্ত মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি' (৫৷৬), কর্মযোগ বিনা সন্ন্যাস পাওয়া কষ্টকর, কর্মযোগযুক্ত সাধক অচিরে ব্রহ্ম লাভ করেন। অর্থাৎ কর্মত্যাগ ক'রে কেবল সন্ন্যাসদ্বারা সিদ্ধিলাভ কঠিন, কিন্তু নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করলে সহজে সিদ্ধিলাভ হয়, এবং যিনি কর্মযোগী তিনি জ্ঞানযোগীও বটেন।

গীতায় বহুস্থলে 'যোগ' ও 'যোগী' শব্দ কর্মযোগ ও কর্মযোগী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ঐসকল স্থলে ঐ অর্থই যে অভিপ্রেত তার প্রমাণ গীতার শ্লোকের ভিতরই পাওয়া যায়। ২৷৫০ শ্লোকে আছে— 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্', যোগ কর্মেরই কৌশল। ৩৷৩ শ্লোকে— 'কর্মযোগেন যোগিনাম্', অর্থাৎ কর্মযোগই যোগিগণের মার্গ। ৫৷১ শ্লোকে অর্জুন বলেছেন— 'সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি', অর্থাৎ একবার কর্মের সন্ন্যাস উপদেশ দিয়ে আবার তারই যোগ (কর্মযোগ) উপদেশ দিচ্ছ।

গীতার সর্বত্রই 'যোগ' অর্থে কর্মযোগ এমন বলা চলে না। মনে রাখা আবশ্যক যে গীতাকার ২৷৪৮-৫০ শ্লোকে যোগের যেসকল লক্ষণ দিয়েছেন তদনুসারে 'যোগ', 'বুদ্ধিযোগ' ও 'কর্মযোগ' এদের

সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, এবং যোগ বললে বুদ্ধিযোগ কর্মযোগ দুইই সূচিত হয়। 'যোগ' শব্দের অর্থ মোটামুটি ধরা যেতে পারে— নির্বিকারভাবে একাগ্রচিত্তে দক্ষতাসহকারে নিষ্কাম কর্মে (অর্থাৎ লোকহিতে) আত্মনিয়োগ এবং সেই সঙ্গে আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা।

হঠযোগ

গীতাকার ইন্দ্রিয়সংযম আসক্তিত্যাগ প্রভৃতি অবশ্যকরণীয় বলেছেন, কিন্তু তিনি জবরদস্তির বিরোধী। 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি' (৩।৩৩), মানুষ প্রকৃতির বশেই চলে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কি করবে ? সংযম ও সবলে নিরোধ এক নয়। গীতাকার বহুবিধ যজ্ঞের বর্ণনাপ্রসঙ্গে (৪।২৪-৩০) পূরক রেচক কুম্ভক ইত্যাদির উল্লেখ ক'রে শেষে বলেছেন— দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ বাহ্য অনুষ্ঠান ও বিষয়বর্জন অপেক্ষা জ্ঞানদ্বারা চিত্তশুদ্ধিই অধিক ফলপ্রদ। ১৭।৫-৬ শ্লোকে আছে— যারা দম্ভ ক'রে ঘোর তপস্যায় শরীর ও আত্মাকে কৃশ করে তারা অসুরপ্রকৃতি। গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে কিছুকাল উৎকট তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু অবশেষে তা নিষ্ফল জেনে নিবৃত্ত হন।

চলিত কথায় 'যোগ' বললে যা বোঝায় গীতায় তজ্জাতীয় কিছু কিছু প্রক্রিয়া বিহিত আছে, যথা ৬।১১-১৪ শ্লোকে— যোগী অনতি-উচ্চ অনতি-নীচ কুশাসনে অজিন ও চেল বিছিয়ে স্থিরভাবে ব'সে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে যোগাভ্যাস করবেন। এই যোগ 'আত্মবিশুদ্ধয়ে', মনের বিশুদ্ধির জন্য ; এর উদ্দেশ্য 'নির্বাণপরমা মৎসংস্থা শান্তি', নির্বাণ-অভিমুখী ব্রহ্ম-আশ্রিত শান্তি, অণিমালঘিমাদি অদ্ভুত ঐশ্বর্যলাভ নয়।

যজ্ঞ

৩।১০-১৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন— ব্রহ্মা মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গেই যজ্ঞ সৃষ্টি ক'রে এই বিধান দিলেন যে মনুষ্যগণ যজ্ঞ ক'রে দেবগণকে তুষ্ট করবে এবং দেবগণও মনুষ্যের ইষ্টসাধন করবেন। এইরূপ পরস্পর আদানপ্রদানদ্বারা মনুষ্যগণ শ্রেয়োলাভ করবে। যে লোক যজ্ঞ না ক'রে অর্থাৎ দেবতাকে ফাঁকি দিয়ে নিজে ভোগ করে সে চোর। তার পর অক্ষর, ব্রহ্মা, কর্ম, যজ্ঞ, পর্জন্য, অন্ন, প্রাণী— এক হ'তে অপরের উৎপত্তি নির্দেশ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন— এই প্রবর্তিত চক্রের (আদানপ্রদানের) অনুবর্তী যে না হয় সেই পাপাত্মার জীবনই বৃথা। এর পর আবার ৪।২৩-৩৩ শ্লোকে বলছেন— অনাসক্ত মুক্ত জ্ঞানীর যজ্ঞাচরিত সমস্ত কর্ম বিলীন হয় ; তাঁর সমস্ত যজ্ঞই ব্রহ্মময় (অথবা ব্রহ্মই তাঁর যজ্ঞ) ; অনেকে অনেকপ্রকার যজ্ঞ করেন— দৈবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ইন্দ্রিয়-বিষয়-প্রাণ ইত্যাদির আহুতি, দ্রব্যযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ, কুম্ভক-প্রাণায়ামাদি ; এঁরা সকলেই যজ্ঞাবশিষ্ট ভোগ ক'রে ব্রহ্মলাভ করেন ; যে অযজ্ঞ অর্থাৎ কোনও যজ্ঞ করে না তার ইহকাল পরকাল নেই। এইপ্রকার অনেক যজ্ঞই ব্রহ্মার মুখে বিস্তারিত হয়েছে, এবং সে সমস্তই কর্মজ ; তা জেনে মুক্ত হও। শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে বলছেন— দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।

এইসকল শ্লোক থেকে পাওয়া যাচ্ছে—

(১) পুরাকাল হ'তে যজ্ঞচক্র অর্থাৎ দেবতা মানবের মধ্যে আদানপ্রদানের একটা ব্যবস্থা চ'লে আসছিল। যজ্ঞ না করা অপরাধ গণ্য হ'ত। শ্রীকৃষ্ণ নিজের মত বলেছেন— 'এই চক্রের অনুসরণ যে না করে সে অঘায়ু ইন্দ্রিয়ারাম, তার জীবনই বৃথা'।

(২) কিন্তু পরে আবার বলেছেন— 'অনাসক্ত জ্ঞানীর যজ্ঞাচরিত কর্ম বিলীন হয়; ব্রহ্মকে নিয়েই তাঁর যজ্ঞ'। এর তাৎপর্য্য— অনাসক্ত জ্ঞানীর ফলাশা নেই, অতএব তাঁর যজ্ঞের আড়ম্বর নিরর্থক। যজ্ঞচক্র সম্বন্ধে তাঁর যা কর্তব্য আছে তা তিনি ব্রহ্মযজ্ঞ ক'রে 'ব্রহ্মকর্মসমাধি' দ্বারাই, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ ক'রেই সম্পন্ন করবেন।

(৩) গীতায় বহুবিধ অনুষ্ঠান যজ্ঞ ব'লে গণ্য হয়েছে। বেদের অর্থবোধের চেষ্টাও যজ্ঞ (স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞ)। কতকগুলি অনুষ্ঠান রূপক হিসাবেই যজ্ঞ, যথা সংযম-অগ্নিতে ইন্দ্রিয়-আহুতি। কুম্ভকাদি প্রক্রিয়াও যজ্ঞ। এগুলিকেও রূপক বলা যেতে পারে— অপানে প্রাণ-আহুতি।

(৪) ঐ সকল যজ্ঞকারী সকলেই যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন ক'রে ব্রহ্মলাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ (বা গীতাকার) হয়তো নিজের মত না ব'লে ব্রহ্মার মুখের কথামাত্র অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তিনি তার পরেই বলেছেন— 'অযজ্ঞের ইহকাল পরকাল নেই'। অতএব তাঁর মতে সকলেরই কোনও না কোনও যজ্ঞ করা অবশ্যকর্তব্য। ১৮।৫ শ্লোকেও যজ্ঞের আবশ্যকতা উক্ত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ আবার বলেছেন—'ব্রহ্মার মুখে এই যে নানাপ্রকার যজ্ঞ উক্ত হয়েছে সে-সমস্তই কর্মজ; তা জেনে মুক্ত হও'। এর এক অর্থ হ'তে পারে— তোমাকে যেরূপ হ'ক যজ্ঞ করতেই হবে; যজ্ঞের ফল আত্মাকে স্পর্শ করে না, যজ্ঞকর্মেই নিবদ্ধ থাকে; অতএব কেবল কর্তব্যবোধে যজ্ঞ করলে তোমার মুক্তির ব্যাঘাত হবে না। অথবা এই কথা শ্রীকৃষ্ণের বক্রোক্তিও হ'তে পারে।— ব্রহ্মা যেসব যজ্ঞের কথা বলেছেন সে সমস্তই কর্মজ ('ক্রিয়াবিশেষবহুলাং' ২।৪৩), জ্ঞানজ নয়; অর্থাৎ শুধুই কর্ম, বুদ্ধিচালিত নয়। ওসকল যজ্ঞ সাধারণের জন্য। তাদের যজ্ঞ চাই, কিন্তু তারা অজ্ঞ, কেবল ফরমাশ খাটতে পারে, অতএব তাদের জন্য কর্মজ যজ্ঞের ব্যবস্থা, যাতে বহু আড়ম্বর, বহু ক্রিয়া। ওরূপ যজ্ঞ না করলে তোমার কোনও ক্ষতি নেই, তবে 'লোকসংগ্রহ'এর জন্য করতে পার। তোমার উপযুক্ত যজ্ঞ অন্যবিধ।

(৬) পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন— 'দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ', অর্থাৎ আড়ম্বরবহুল যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানচর্চাই শ্রেষ্ঠ।

(৭) 'যজ্ঞ' শব্দ যেরূপ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তাতে অনেক কর্মকেই যজ্ঞ বলা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কামভাবে সতত কর্ম করতে বলেছেন। অর্জুন সেই উপদেশ অনুসারে চললে অনেক যজ্ঞই তাঁর করা হবে। গীতার শেষে (১৮।৭০) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—'যিনি আমাদের এই ধর্ম্যসংবাদ (অর্থাৎ গীতা) অধ্যয়ন করেন তাঁর দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞে পূজিত হই।'

যজ্ঞ ও নিষ্কাম কর্ম

পুরাকালে 'যজ্ঞ' বললে যে প্রক্রিয়া বোঝাত তার কতকগুলি নির্দিষ্ট অঙ্গ ছিল, যথা— (১) যজমান বা যজ্ঞকর্তা, (২) যে দেবতার তুষ্টির জন্য যজ্ঞ হ'ত, (৩) যে দ্রব্য দেবতাকে নিবেদিত হ'ত, (৪) যে অভীষ্টলাভের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ত, অর্থাৎ যজ্ঞের সংকল্প। যজ্ঞের উদ্দেশ্য— দেবতার প্রাপ্য দেবতাকে দিয়ে অভীষ্ট আদায়। এই অভীষ্ট ব্যক্তিগত হ'তে পারে, যথা পুণ্যসঞ্চয়, ধনপুত্রলাভ; অথবা সামাজিক হ'তে পারে, যথা সুবৃষ্টি, মারীভয়নিবারণ। যিনি উদ্যোগী হয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করতেন তিনিই যজমান। যা দেবতাকে দেওয়া হ'ত তা প্রধানত হবি বা ঘৃত, কিন্তু পশু, শস্য, পুরোডাশ ইত্যাদিও দেওয়া চলত এবং এসমস্তই 'হবি' ব'লে গণ্য হত। অগ্নিই প্রধান দেবতা, তাঁকে সহজে পাওয়া যায় এবং তিনি মূর্তিমান্ হয়ে

হবি গ্রহণ করেন। অপর দেবতারা স্বয়ং দেখা দিতেন না, এজন্য অগ্নিকে তাঁদের প্রতিভূ বা প্রতীক মনে ক'রে আহুতি দেওয়া হ'ত। নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ ক'রে অগ্নি যা ফেলে রাখতেন তা অতি পবিত্র 'যজ্ঞশিষ্ট' (যজ্ঞাবশিষ্ট) অমৃততুল্য বস্তু। যজমান তা সবান্ধবে খেয়ে ধন্য হতেন।

কালক্রমে এই যজ্ঞে রূপক এল। অনেক অনুষ্ঠান, যাতে কোনও অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, যজ্ঞ ব'লে গণ্য হ'তে লাগল। যা অর্পণ বা ত্যাগ করা যায় তাই হবি। যাতে বা যে উদ্দেশ্যে অর্পণ করা যায় তাই অগ্নি। দেবগণ জনসাধারণের মঙ্গলবিধান করেন, অতএব তাঁরা জনহিতের বা সমাজের প্রতীক। দেবতাকে বা অগ্নিতে অর্পণ করার অর্থ— জনহিতকল্পে কোনও দ্রব্য নিয়োগ করা, যথা পূর্তযজ্ঞে জলাশয়াদি। হবির অর্থ ব্যাপক হয়ে দাঁড়াল, যা কিছু নিয়োগ করা যেতে পারে— বিত্ত, সামর্থ্য, এমন কি নিজের বল বুদ্ধি জ্ঞান ইন্দ্রিয় পর্যন্ত। অবশেষে 'সংকল্প' অর্থাৎ যে অভীষ্টের কামনায় যজ্ঞ হচ্ছে তা পর্যন্ত হবির অন্তর্গত হ'ল, নিষ্কাম যজমান যজ্ঞফল পর্যন্ত উৎসর্গ করতে লাগলেন। যজ্ঞশিষ্টভোজনের অর্থ হ'ল— উৎসৃষ্ট বস্তুতে যজ্ঞকর্তার আর স্বত্ব রইল না, তা দেবতার অর্থাৎ জনসাধারণের সম্পত্তি হ'ল, তবে যজ্ঞকর্তা জনসাধারণেরই একজন হিসাবে তা ভোগ ক'রে কৃতার্থ হ'তে পারেন। দেবতা জনহিতের প্রতীক এই ধারণা হয়তো সর্বত্র ছিল না, কিন্তু সংকল্প-বিনিয়োগের ফলই হ'ল ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ এবং পরার্থে দান। এই জন্যই 'যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্' (৪।৩০)।

অবশ্য সকলেই সংকল্প উৎসর্গ ক'রে যজ্ঞ করত না। তথাপি অধিকাংশ যজ্ঞই সমাজহিতকর, সেজন্য কোনও যজ্ঞ না করার চেয়ে কাম্যযজ্ঞও বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হ'ত। ব্যাপক দৃষ্টিতে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানমাত্রই যজ্ঞ। কিন্তু যে কর্মে আহুতিদানরূপ আড়ম্বর থাকত তাই যজ্ঞ নামে বিশেষিত হ'ত। এখনও অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে আরম্ভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ (৪।৩৩), এবং পরে আবার বলেছেন— যজ্ঞসকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ (১০।২৫)। জপের অর্থ মন্ত্র আওড়ানো নয়। জপ ও ধ্যান সমার্থক, একাগ্রচিন্তার দ্বারা জ্ঞানলাভের চেষ্টা।

ধর্ম ও স্বধর্ম

যা সমাজকে ধারণ করে, অর্থাৎ যে আচার ব্যবহার সমাজরক্ষার অনুকূল তাই ধর্ম। ধর্ম religion নয়, কেবল moralityও নয়। আহার, বিহার, শিক্ষা, বৃত্তি, উপার্জন, স্বজনপালন, শত্রুদমন, সদাচার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি সমস্তই ধর্মের অন্তর্গত। কেবল সমাজের হানিকর কর্ম অধর্ম। কোনও এক কালে ভারতবর্ষে গুণকর্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ হ'ত, কিন্তু পরে বর্ণ বৃত্তি ও ধর্ম জাতিগত হয়ে যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হত, যথা দ্রোণকৃপাদির ক্ষত্রিয়বৃত্তি, কিন্তু সমাজের অধিকাংশ লোকই বর্ণগত ধর্ম পালন করত। গীতার 'স্বধর্ম' শব্দের স্পষ্ট অর্থ— স্বীয় বর্ণের নির্দিষ্ট ধর্ম। গীতাযুগের সামাজিক অবস্থা কল্পনা করলে এই অর্থ সংকীর্ণ বোধ হবে না। তখনকার শিক্ষার ধারা বর্ণ- বা বংশ-গত ছিল, যে লোক যে বর্ণে জন্মাত সেই বর্ণের নির্দিষ্ট আচরণই তার পক্ষে সুসাধ্য এবং স্বভাবের অনুকূল হ'ত। 'পরধর্ম' অর্থাৎ অপর বর্ণের নির্দিষ্ট ধর্ম তার অপরিচিত এবং সমাজকর্তৃক ভর্ৎসিত, সেজন্য 'ভয়াবহ'। স্বধর্ম তার বর্ণসম্মতও বটে এবং শিক্ষাস্বভাবেরও অনুকূল। কিন্তু বর্তমান কালে বর্ণগত ধর্ম লোপ পেয়েছে, সেজন্য স্বধর্মের প্রাচীন অর্থ ধরলে গীতার বক্তব্য নিরর্থক হয়। এখনকার সমাজে বর্ণগত কর্মভেদ নেই, গুণকর্ম

অনুসারেও বর্ণভেদ নেই। ধর্ম পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু নূতন ধর্মশাস্ত্র লিখিত হয় নি। এখন নিজের শিক্ষা, প্রতিবেশ এবং স্বভাব বা রুচির অনুকূল ধর্মই স্বধর্ম। স্বধর্ম শব্দের এই ব্যাপক অর্থ ধরলেই গীতাবাক্যের তাৎপর্য পরিস্ফুট হবে।

গীতার দার্শনিক মত

প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে দুই প্রকার সত্তা স্বীকৃত হয়— পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ বা আত্মা অসংখ্য ; প্রকৃতি একই, যদিও তার প্রকাশ বহুরূপে। পুরুষ নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি গুণান্বিত ও সদা ক্রিয়ারত। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হ'লে প্রথমে 'মহৎ' উৎপন্ন হয়। 'মহৎ' কি সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন বুদ্ধি, কেউ বলেন মন, কেউ বলেন চিন্তা, কেউ বলেন চেতনা। মহৎ থেকে ক্রমে ক্রমে অপর সমস্ত উৎপন্ন হয়েছে। পুরুষ বা আত্মা যখন মহতের অংশ আপনাতে আরোপিত ক'রে গুণান্বিত এক স্বতন্ত্র সত্তা কল্পিত করে তখন 'অহংকার' (আমিত্ব-বোধ) উৎপন্ন হয়। তার পর ক্রমে ক্রমে তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয়, স্থূলভূত প্রভৃতি অন্যান্য 'তত্ত্ব' উৎপন্ন হয়। এ-সমস্তই প্রকৃতির বিকার এবং বস্তুত সত্তাবিহীন। মূল প্রকৃতি 'অব্যক্ত', কিন্তু পুরুষের সঙ্গে সংযোগের ফলে উক্ত বিবিধ তত্ত্ব উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতির ব্যক্ত রূপ পুরুষ দেখতে পায়। পুরুষ তখন আপনাতে নানা গুণের আরোপ করে এবং তার ফলে সুখদুঃখাদির অধীন হয়। সাধনার দ্বারা পুরুষ তার স্বতন্ত্র নির্গুণ অবস্থা বা 'কৈবল্য' ফিরে পেতে পারে, তখন সুখদুঃখের নিবৃত্তি হয়।

গীতাকার এই সাংখ্যতত্ত্ব মোটামুটি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি একে বেদান্তের অনুগামী ক'রে বলেন— পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই মূল ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা। ব্রহ্মের এক অনির্বচনীয় শক্তি আছে—'মায়া'। তার ফলে জীব ও জগৎ স্বতন্ত্র সত্তারূপে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ আমি আছি এবং আমা হ'তে পৃথক্ জগৎ আছে এই ধারণা হয়। ব্রহ্মের এই দ্বিধা প্রকাশই প্রকৃতি। সপ্তম অধ্যায়ে প্রকৃতির দুই ভেদ বর্ণিত হয়েছে— 'অপরা' ও 'পরা'। জীবাত্মা থেকে পৃথক্ যে জগৎ প্রতীয়মান হয় (objects) তাই অপরা প্রকৃতি। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় আত্মা না থাকলেও 'মায়াবশে' বহু স্বতন্ত্র জীবাত্মা বা পুরুষের প্রতীতি হয়। এই পুরুষবর্গ (subjects) 'জীবভূতা পরাপ্রকৃতি'র অন্তর্গত— 'যয়েদং ধার্যতে জগৎ' (৭।৫), যার দ্বারা এই জগতের ধারণা (conception) উৎপন্ন হয়। সাংখ্য মতে বহু পুরুষ বা বহু জীবাত্মার অস্তিত্ব সত্য কিন্তু গীতার মতে তাদের অস্তিত্ব প্রাতিভাসিক বা ব্যাবহারিক সত্য মাত্র।

অষ্টম, ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে গীতাকার মনুষ্যের সত্তার বিশ্লেষ করেছেন। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইত্যাদির নাম 'অধ্যাত্ম', এদের সমষ্টিই মানুষের 'স্বভাব' (character, individuality)। 'ক্ষরের ভাব' অর্থাৎ নিত্যবিকারী স্থূল শরীর 'অধিভূত'। দেহে যে পুরুষ বা জীবাত্মা অধিষ্ঠান করেন তিনি 'অধিদৈবত'। এই পুরুষের ব্যক্তিত্ববোধ আছে, কিন্তু বস্তুত সকল পুরুষ এক, এবং তিনিই সকল দেহরূপ যজ্ঞের 'অধিযজ্ঞ' বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই অধিযজ্ঞরূপ পুরুষ, যিনি 'সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি' (৮।২০), সর্ব জীব নষ্ট হ'লেও নষ্ট হন না, 'যস্য অন্তঃস্থানি ভূতানি' (৮।২২), জীবগণ যাঁর অন্তঃস্থ— ইনিই 'পুরুষঃ পরঃ', 'অব্যক্ত অক্ষর', 'পরম অক্ষর', 'পরমাত্মা'।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারে এই তত্ত্ব আরও বিস্তারিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়মনাদিযুক্ত বিকারশীল দেহই 'ক্ষেত্র', এবং পরমাত্মা 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। স্থাবর জঙ্গম সমস্তই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফল (১৩।২৬), অর্থাৎ আত্মা দেহধারী হ'লেই সমস্ত জগতের প্রতীতি উৎপন্ন হয়, নতুবা জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নেই।

সাধকের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতের সহিত তাঁর সম্বন্ধের বোধও পরিবর্তিত হয়। ১৫।১৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ দুইপ্রকার পুরুষের কথা বলেছেন— 'ক্ষর' ও 'অক্ষর'। 'ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে'। সাধারণ বদ্ধ জীব যারা বিকারশীল ইন্দ্রিয়মনাদিযুক্ত দেহকেই 'আমি' মনে করে তারা ক্ষর। আর যিনি কূটস্থ অর্থাৎ স্বীয় আত্মাকে নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, প্রকৃতি হ'তে স্বতন্ত্র ব'লে বুঝেছেন তিনি অক্ষর। কিন্তু যিনি কূটস্থ অক্ষর তাঁরও প্রতীতি থাকতে পারে যে তাঁ থেকে পৃথক্ আর এক সত্তা আছে—প্রকৃতি। গীতাকার এক 'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ' (১৫।১৭-১৮) উল্লেখ করেছেন, যিনি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত 'পুরুষোত্তম' বা পরমাত্মা, এবং শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকট।

শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ও গীতায় ভক্তিবাদ

মহাভারতে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান আছে যা প্রাচীন বিশ্বাসেরই উপযোগী। মহাভারতের লেখক বহু হ'তে পারেন, কিন্তু যিনি গীতা রচনা করেছেন তিনি মহাভারতের সাধারণ ধারাই অনুসরণ করেছেন। অতএব মহাভারতে বর্ণিত অদ্ভুতকর্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত গীতার শ্রীকৃষ্ণের সংগতি থাকা স্বাভাবিক। গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের মুখে তত্ত্বকথা শোনাবেন ব'লেই যে শ্রীকৃষ্ণের চার হাত (১১।৪৬) এবং অন্যান্য পৌরাণিক অলংকার ছেঁটে ফেলবেন এমন আশা করা যায় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বার বার বলছেন— আমিই ব্রহ্মা, আমিই ইন্দ্র, বাসুদেবঃ সর্বং, আমাকেই উপাসনা কর, যে আমাকে দ্বেষ করে তাকে আমি নরকে নিক্ষেপ করি, ইত্যাদি। এসকল উক্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কিন্তু সরল ব্যাখ্যা এই মনে হয় যে গীতাকার তাঁর দুরূহ প্রসঙ্গের অবকাশে মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য পৌরাণিক রীতিতেই কীর্তন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ কিনা, তিনি বাস্তবিক কিরূপ ছিলেন, তার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। গীতাকার তাঁকে ধর্মসংস্থাপক নরদেহধারী পুরুষোত্তমরূপে চিত্রিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ জ্ঞানমূলক, কিন্তু জ্ঞানলাভের ক্ষমতা সকলের নেই। সমস্ত বুঝে উপদেশ পালন করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু যদি বোঝবার ক্ষমতা না থাকে তবে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উপদেশ মেনে চললেও ফল হয়। চিকিৎসকের ব্যবস্থিত ঔষধের গুণাগুণ বুঝে নিয়ে তার পর ঔষধ সেবন করা সকল রোগীর সাধ্য নয়। চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস শ্রদ্ধা বা ভক্তির বশেই সাধারণ রোগী ঔষধ সেবন করে। ব্যবস্থার কারণ যে বুঝতে চায় তারও শ্রদ্ধা ও 'অনসূয়া' আবশ্যক, নতুবা বোঝবার সামর্থ্যই আসবে না। এই জন্যই গীতায় বার বার ভক্তিশ্রদ্ধার অবতারণা হয়েছে। যিনি জ্ঞান চান শ্রদ্ধা তাঁর সহায়, এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পাবে। যাঁর জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা নেই তিনি শ্রদ্ধার দ্বারাই নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারবেন। ভক্তি বা শ্রদ্ধার অবলম্বন চাই, গীতাকার ধর্মব্যাখ্যাতা পুরুষোত্তমরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সেই অবলম্বন বলেছেন।

গীতোক্ত ধর্ম

গীতাকে যোগশাস্ত্র বলা হয়। এই যোগের অর্থ— আত্মোন্নতির জন্য সর্বতোভাবে সাধনা, spiritual, moral and physical culture। বঙ্কিমচন্দ্র একেই 'অনুশীলনধর্ম' নাম দিয়েছেন। যিনি এই সাধনা করেন তাঁর সামাজিক বৃত্তি যাই হ'ক, গীতাকার তাঁকে যোগী বলেন। এই যোগসাধনার উপায়— ইন্দ্রিয়-সংযম, আসক্তিত্যাগ, নিষ্কামকর্মাচরণ বা কর্মযোগ, তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন বা জ্ঞানযোগ, এবং পুরুষোত্তমরূপে

কল্পিত গীতাধর্মের ব্যাখ্যাতা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে অবিচলিত ভক্তি বা ভক্তিযোগ। গীতাকার নির্বিচারে সর্বপ্রকার ভোগ বর্জন করতে বলেন না, সমাজত্যাগী কৃচ্ছ্রসাধক তপস্বী হ'তেও বলেন না। তাঁর আদর্শ রাজর্ষি জনক। যিনি উপযুক্ত অধিকারী তিনি সমাজে থেকে নিজ স্বভাব-অনুযায়ী সমাজধর্ম পালন ক'রেও এই সাধনা করতে পারেন। মানুষ কর্ম না ক'রে থাকতে পারে না, সেজন্য গীতাকার কর্মপ্রবৃত্তিকে রুদ্ধ না ক'রে সমস্ত চেষ্টাকেই সাধনার অঙ্গ করতে বলেছেন। এরই নাম কর্মযোগ, যা গীতোক্ত সাধনার প্রধান উপায়। সাধারণ মানুষ কেবল আপনার বা স্বজনের হিতার্থ কর্ম করে। কর্মযোগী সর্বভূতের সহিত একাত্মা হয়ে নিষ্কামভাবে সর্বভূতের হিতার্থ কর্ম ক'রে স্বভাবদত্ত নিজ কর্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন। এই কর্মযোগচর্চার ফলে তাঁর সাধনার অন্যান্য অঙ্গও (জ্ঞান, ভক্তি) উৎকর্ষলাভ করে। গীতাকারের মতে কর্মবর্জন ক'রে কেবল জ্ঞানদ্বারা সিদ্ধিলাভ কঠিন। ভক্তিকেও তিনি উচ্চ স্থান দিয়েছেন। কিন্তু জ্ঞানই সাধনার উচ্চতম সোপান, 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে' (৪।৩৩), সমস্ত কর্ম জ্ঞানেতেই পরিপূর্ণতা লাভ করে, এবং ভক্তির পরেও বুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হয়, 'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্. দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাং উপযান্তি তে' (১০।১০), সতত যোগযুক্ত প্রীতিপূর্বক ভজমান তাঁদের আমি এপ্রকার বুদ্ধিযোগ দিই যাতে তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হন।

কিন্তু গীতা সর্বসাধারণের জন্য রচিত হয় নি। 'ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন, ন চাশুশ্রূষবে ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি' (১৮।৬৭), এই গীতোক্ত ধর্ম তোমার কদাচ তপস্যাহীনকে বক্তব্য নয়, অভক্তকে নয়, অশ্রবণেচ্ছুকে নয়, যে আমাকে অসূয়া করে তাকেও নয়। কাম্যকর্মে আসক্ত বিষয়সেবী অজ্ঞলোকের বুদ্ধিভেদ করতে গীতাকার নিষেধ করেছেন, 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্' (৩।২৬), ফললোভে কর্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাবে না। সম্প্রতি Dr Gilbert Murray তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন—'...practically every human society has a mass of traditional customs and beliefs, mostly unreasonable, to which it is deeply attached, and on which its self-respect and its rules of conduct largely depend. When this frame of life is violently and contemptuously destroyed the effect on the community is ruinous.' (The Rationalist Annual, 1944)। গীতার উপদেশ— জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ আচরণদ্বারা সামাজিক আদর্শ রক্ষা করবেন, যাতে জনসাধারণ একটা সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সুগম মার্গ অনুসরণ করতে পারে। বিষয়াসক্ত অজ্ঞলোকের বুদ্ধিভেদ ঘটালে কুতার্কিক সমাজদ্রোহীর উদ্ভব হবে এই আশঙ্কা গীতাকারের ছিল। বর্তমান কালে গীতা সম্বন্ধে এই সতর্কতা অবলম্বন করা অসম্ভব, কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে আপামর সাধারণকে গীতা মুখস্থ করিয়ে কোনও লাভ নেই।

তৎকালপ্রচলিত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর গীতাকারের শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু নিম্ন অধিকারীর পক্ষে এসকল কর্ম তিনি হিতকর ব'লেই মনে করেন। শ্রেষ্ঠ সাধকের পক্ষেও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বর্জনীয় বলা হয় নি, কারণ, তাতে ইতরসাধারণের আদর্শবিপর্যয়ের সম্ভাবনা।

গীতায় শান্ত সহিষ্ণু মৃদু অহিংস হবার বহু উপদেশ আছে, কিন্তু ক্লীবের তুল্য পীড়ন সইতেও নিষেধ আছে। দুষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই গীতার উপলক্ষ্য। 'তস্মাৎ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব'— এই বাক্য বহু স্থলে গীতাধর্মবিবৃতির সহিত জড়িত আছে। বিশ্বরূপবর্ণনায় ব্রহ্মের ভয়াবহ সংহারমূর্তিই প্রকটিত হয়েছে। গীতাধর্ম শৌর্যবীর্যাদি পুরুষোচিত গুণের এবং সমাজরক্ষার্থ নিষ্ঠুরতারও পরিপন্থী নয়।

গীতায় বহু প্রসঙ্গ আছে যা অনেক আধুনিক পাঠকের ধারণার-বিরোধী। জন্মান্তরবাদ, দেহ থেকে উৎক্রান্ত সূক্ষ্মশরীর (১৫।৮), দেবযান পিতৃযান (৯।২৫) প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব, এমন কি তাঁর ঐতিহাসিকত্ব অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হ'তে পারে। গীতার অনেক অংশ দুর্বোধ, ভাষ্যটীকাকারগণের ব্যাখ্যাও বহু স্থলে বিভিন্ন। কিন্তু সমস্ত অস্পষ্ট ও বিসংবাদী বিষয় বাদ দিলেও যা থাকে তা অতুলনীয়। বহুপূর্বে বহু প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে রচিত হ'লেও গীতায় সর্বকালের উপযোগী শ্রেষ্ঠ সাধনাপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

জামবাগানের তলায় চড়ে ধোবাদের গাধা
ছেলেটা তার পিঠে চড়ে
ছড়ি হাতে জমায় ঘোড়দৌড়

কংক্রিট-জমানো
ব্লকের ছাপ
শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

মাসী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মস্ত বড় দোতলা বাড়ি। বাইরের মহলটা আলাদা। ভিতরে দুইটি মহল, রান্নাবাড়িটা ধরিলে তিনটা। বাড়ির এক কোণ থেকে ডাক দিলে অন্য কোণে সব সময় আওয়াজ পহুঁছায় না।

এত বড় বাড়িটাকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে দুইটি শিশুতে।

কেমন ধারা একটু শোনায় বটে; প্রশ্ন ওঠে, তবে আর সবাই গেল কোথায়।

আর সবাই সংসারটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে ব্যস্ত— আজকের সংসার আবার ভবিষ্যতের সংসারও। ঠাকুরমা, দিদিমা, মাসী পিসীতে অনেকগুলি বৃদ্ধা,—তাঁহারা পুষ্পে-নৈবেদ্যে ঠাকুরদের তুষ্ট করেন,— 'তোমরাও খাও-দাও ঠাকুর, এদেরও খাওয়াদাওয়ার দিকে একটু নজর রেখো'।

যাঁরা গিন্নীর দলের তাঁহাদের তো উদয়াস্ত দম লইবার সময় থাকে না; রান্নার দিকে নজর রাখো, বাজারের দিকে নজর রাখো, আফিস-ইস্কুলের ব্যবস্থায় যেন এতটুকু না গাফিলতি হয়, আরও সব নানানখানা; এঁদের পরে যাঁরা তাঁদের এতদুভয়ের ফাই-ফরমাস খাটিতে খাটিতে দম বন্ধ হইয়া আসে— পূজার চন্দন ঘষা থেকে পান সাজা, স্কুলগামী ছোট দলের ধোওয়ান-মোছান জামাকাপড়-পরান পর্যন্ত।—অর্থাৎ সংসারের বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত।

কর্তারা সংসার বাঁচাইয়া রাখার একেবারে গোড়ার ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত— অর্থাৎ রোজগারের ব্যাপার। সকাল থেকে মক্কেল, রোগী— একটু ডাইনে-বাঁয়ে চাহিবার ফুরসত থাকে না। বৈকালে হয়তো একটু ক্লাব, সেখানেও উদ্দেশ্য ঐ একই—অর্থাৎ সংসারটিকে জিয়াইয়া রাখা। তাহার জন্য নিজের নিজের প্রাণশক্তিকে অটুট রাখিতে হইবে তো ?— তাই ক্লাব, অথবা অন্যভাবে একটু চিত্তবিনোদন।

কিন্তু সংসার বাঁচাইয়া রাখা আর বাড়ি বাঁচাইয়া রাখা এক কথা নয়। বিধাতাপুরুষ যে মন্ত্রে বাড়ি বাঁচাইয়া রাখেন সে-মন্ত্রের সংগীত একটু অন্য ধরনের। তাহার জন্য বাছিয়া লন শিশুর কণ্ঠ। এ-বাড়িতে আছে মিটু আর তুলতুল, বয়স আড়াই থেকে তিনের মধ্যে; তুলতুলটি মেয়ে, সেই ছোট।

সত্যই তুলতুল; এত নরম যে চলা-ফেরার মধ্যে কেন এলাইয়া পড়ে না সেইটাই আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। যেখানেই হাত দাও—কাঁধে, হাতে, পিঠে, গালদু'টিতে, আঙুলগুলি যেন খানিকটা মাখনের তালে বসিয়া যায়। চোখ দুটি স্বপ্নালু, মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া এক-মাথা কালো কুচকুচে চুল—রেশমের মতো হালকা আর মসৃণ। পাতলা ঠোঁট দুটি যখন নড়ে মনে হয় ঐটুকুতেই যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িবে। স্বভাবটিও বড্ড নরম কিন্তু মিটুর সংসর্গে নরম থাকা দিন-দিনই নাকি কঠিন হইয়া উঠিতেছে।

মিটুটি অতিরিক্ত দুষ্টু, চঞ্চল আর ধূর্ত। কথাগুলায় জিবের একটুও জড়তা নাই; মনে হয় পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে কথা কহিতেছে। কথার বাঁধুনির বিষয় যদি ধরা হয় তো যে-কোন বয়সের লোকের মুখেই বেশ মানায়। কিছু বলিলে বুড়োদের মতো ভ্রূ দু'টি কুঞ্চিত করিয়া চোখে চোখ রাখিয়া শোনে, একটু ভাবে, তাহার পর উত্তর দেয়।

বারান্দার ওদিককার ঘরে প্রবল উৎসাহে মাতামাতি করিতেছে ; একটু কড়া গলায়ই ডাকিলাম, "মিটু, একবার এদিকে আসতে হবে।"

এখানে বলিয়া রাখা ভালো যে অপরিচিত না হইলেও অনেকটা নূতন আমি মিটুর পক্ষে। উহাদের লইয়া যাইবার জন্য উহাদের মামার বাড়ি আসিয়াছি। মিটু দাপাদাপি স্থগিত রাখিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া আবার থামিয়া গেল। মা আর ভাইদের কাছে শুনিয়াছে আমি নাকি একটু কড়া প্রকৃতির মানুষ ; ডান হাতের চারিটি আঙুল দাঁতে চাপিয়া আমার পানে চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন মেজ কাকা, একটা কথা বলবে ?"

অর্থাৎ সামান্য কোন একটা কথাই তো ?—মারধোর করিবার উদ্দেশ্য নয় ? তাহা হইলে সে দূর হইতে আপন পথ দেখে। দাদুরা আছে, দিদিমারা আছে, মামার বাড়িতে নিরাপদ স্থানের অভাব নাই।

ছেলেটি ইংরাজীতে যাহাকে বলে প্রডিজি তাই, অবশ্য দুষ্টামির দিক দিয়া ; ওর সাহচর্যে তুলতুল যদি কাঠিন্য লাভ করে তো তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

দুটির সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইল সকালে জলখাবারের সময়। কুটুমবাড়ির আয়োজন—ডিশে প্লেটে সাজানো ফল, মিষ্টান্ন, টোস্ট, কেক্, ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম। মিটুর দিদিমা সামনে একটি কৌচে বসিয়া গল্প করিতেছেন। একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় এই যে কিছু ফেলিয়া না রাখিয়া গল্পের ফাঁকে ফাঁকে একটি একটি করিয়া সমস্তগুলির সদ্ব্যবহার করি। বেশ একটু অস্বস্তিজনক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। গল্পের মধ্যেই অনুরোধ উপরোধও আসিয়া পড়িতে লাগিল ; একটি রাখিতে হইল, একটি কাটাইলাম, তৃতীয়টি লইয়া টানাটানি চলিতেছে এমন সময় ওঁর একটা জরুরী তলব আসিল। সমস্তগুলি শেষ করিবার একটা পাইকারি হুকুম রাখিয়া উনি উঠিয়া গেলেন।

একে লড়াইয়ের বাজার, কিছু পাওয়া যায় না, সামান্য যা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ফেলিয়া রাখিলে তিনি শুনিবেন না। বলিয়া গেলেন কাহাকেও পাঠাইয়া দিতেছেন।

বলিলাম, "তাহলে এমন কাউকে পাঠিয়ে দেবেন মা, যিনি এই এতগুলো জিনিসকে কিছু পাওয়া গেল না ব'লে না ধরেন।"

"না বাবা, বাজে কথা শোনা হবে না" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

উনি যাইবার একটু পরে পিছনে শিশুকণ্ঠে অল্প একটু গলা খাঁখারি দেওয়ার শব্দ হইল ; ফিরিয়া দেখি পিছনের দোরের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া মিটু। একবার দেখাটা হইয়া যাইতে চক্ষুলজ্জাটা ভাঙিয়া গেল বোধ হয়, আসিয়া শোফার পিছনটিতে দাঁড়াইল।

আর এক কাপ চা ঢালিতে ঢালিতে প্রশ্ন করিলাম, "কি মনে করে ?"

খাবারগুলির দিকে চাহিয়া ছিল, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, বলিল "এমনি"।

বড়দের মতো এই কথাটি খুব রপ্ত করিয়া রাখিয়াছে মিটু। সর্বদাই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য লইয়া থাকে বলিয়া ঐ কথাটি দিয়া অনাসক্তির ভাবটা ফুটাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে ; ওর সঙ্গে একটু বেপরোয়া ভাব মিশাইবার অভিপ্রায় হইলে বলে, "এমনি—ইচ্ছে।"

একটি কেক ভাঙিয়া মুখে দিলাম, নিজের মনেই বলিলাম, "বাঃ, চমৎকার কেকটি দিয়েছে তো, কী মিষ্টি !"

মিটু একবার আড়চোখে কেকটির পানে চাহিল, আর একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। প্রথম গ্রাসটি

নটীর পূজা : শান্তিনিকেতনে চীনভবনস্থ ভিত্তিচিত্রের একাংশ

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

বনভোজন : এচিং

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

শেষ করিয়া আবার তুলিয়াছি কেকটা, মিটু প্রশ্ন করিল, "মেজ কাকা, বাড়িতে কে কে আছে ? আছেন বলতে হয়, না ?"

বলিলাম, "হ্যাঁ। তোমার দাদু আছেন, জেঠামশাইরা আছেন, জেঠাইমারা, কাকারা, খুড়ীমারা, দাদারা, দিদিরা।"

মিটু বলিল, "জানো মেজকাকা ? তুলতুল বড্ড হ্যাংলা, আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।"

বাড়ীতে পাঁচ-ছয়টি হ্যাংলা-পরিবৃত হইয়া আহার করা অভ্যাস, মিটুর দিদিমা বর্তমানে সেই অভাবটাই এতক্ষণ সব চেয়ে বেশি অনুভব করিতেছিলাম। যাই হোক একটিকে পাওয়া গেছে আপাতত ; তাহারই লোভটুকু ভালো করিয়া উপভোগ করিবার ইচ্ছা দমন করিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আহা, ও ছেলেমানুষ কিনা ; ছেলেমানুষ একটু হ্যাংলা হয়। তুমি তো বড় হয়ে গেছ মিটু, না ?"

কোন উত্তর পাইলাম না, মিটু শুধু চারিটি আঙুল মুখে পুরিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল।

একখানি চায়ের রেকাবিতে একটু কেক, দুইখানা বিস্কুট, কিছু কমলা লেবুর কোয়া, একটি সন্দেশ, একটা রসগোল্লা আলাদা করিয়া রাখিলাম। মিটু স্থির, লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। বলিলাম, "যাও, ডেকে নিয়ে এস তুলতুলকে এবার। আহা, ছেলেমানুষ, একটু হ্যাংলা হবে না ? ও তো আর মিটুর মতন বড় হয় নি, হবে না হ্যাংলা একটু ? যাও, ডেকে নিয়ে এস।"

মিটু ভ্রূ দুইটা চাপিয়াই পরম অভিনিবেশের সহিত আমার কথাগুলা শুনিতেছিল। বেশ দেখিতেছি, ওর মনের গভীরে একটি আলাদা চিন্তার ধারা বহিয়া চলিয়াছে। যাইবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না,—সোফাটার পিঠ ধরিয়া বার দুয়েক একটু দোল খাইল, বার দুয়েক তুলতুলের রেকাবিটার পানে চাহিল, তাহার পর বলিল, "আমিও তো বড় হইনি।"

আমি কপালে ভ্রূ তুলিয়া বলিলাম, "সে কি কথা—তুমি বড় হওনি ! মস্ত বড় হয়েছ যে, তুলতুলের চেয়ে বড়, খোকার দাদা ! খোকা যেই ভাত খেতে শিখবে, 'দাদা দাদা' বলে কোলে উঠবে তোমার।"

বেচারা একটু প্রবঞ্চিত হইল, বড় হওয়ার গুমরে আরও বার দুয়েক দোল খাইয়া বলিল, "খোকা ঝিনুকে দুধ খায়, ন্যাংটো ; আমি তো প্যান্ট পরি, খোকা তো খোকা ; আমি তো মিটু বাবু।"

বলিলাম, "তা বইকি। আর খোকা তো হ্যাংলা, মাটি খায়। যাও ডেকে আনো তুলতুলকে।"

মিটু পিছনের দুয়ারের দিকে চাহিল, ঘুরিয়া দেখি তাহার দিদিমার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে তুলতুল কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাকিলাম, "এই যে, এস তুলতুল, কখন থেকে তোমার জন্যে খাবার নিয়ে বসে আছি।"

তুলতুল একবার পিছন দিকে চাহিল, ঘুরিয়া খাবারের পানে চাহিল, তাহার পর ঠোঁট ফুলাইয়া ট, ড, ড়—এই রকম গোছের কতকগুলা অক্ষর সংযোগে এক অদ্ভুত উচ্চারণে কি একটা বলিল। মিটুর যেমন পরিষ্কার এর গুলা তেমনি অস্পষ্ট, একেবারেই জিবের আড় ভাঙে নাই। লোকে যে টপ করিয়া ধরিতে পারে না এটা নিশ্চয় মিটুর জানা, বুঝাইয়া দিল, "বলছে, ও হ্যাংলামি করবে না।"

তুলতুলের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "না, তুমি এস, হ্যাংলামি হবে না, তোমার জন্যে তো খাবার রয়েছে। আলাদা থাকলে হ্যাংলামি হয় না ; এস তো।"

তুলতুল একবার পিছনে দেখিয়া লইয়া প্রবেশ করিল, তবে আমার কাছে না আসিয়া পাশটিতে গিয়া দাঁড়াইল। দুয়ারের দিকে আরও একবার চাহিয়া লইয়া খাবারের উপর ঢুলঢুলে লুব্ধ চোখ দুইটি রাখিয়া স্বকীয় উচ্চারণে আবার কি বলিল ; এবার একটু বেশি।

মিটু বুঝাইয়া দিল, খাবারের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, "বলছে, শুধু বড় জেটুর কাছে হ্যাংলামি করব। বড় জেটু বকেন না।"

হ্যাংলামি কথাটা তাহা হইলে তত আপত্তিজনক নয় তুলতুলের কাছে, যদিও মিটু অর্থটা অনেকখানি বোঝে। জিনিসটা যে দোষের সেদিকে না গিয়া বলিলাম, "আমিও বকব না, বড় জেটুর চেয়ে আমি বেশি ভালোবাসি হ্যাংলাদের। বড্ড ভালোবাসি, এই দেখ না আলাদা করে খাবার রেখে দিয়েছি। কেউ যদি বকে তোমায় তার সঙ্গে খুব ঝগড়া করব, মিটু যদি তাড়িয়ে দিতে যায়, ওকে মারব।"

তুলতুল একবার আড়চোখে মিটুর পানে চাহিয়া লইয়া পায়রার মতো গলা নাচাইয়া কি বলিল, মিটু একটু টানিয়া উত্তর দিল, "হোস নি, আমি তো বলিও না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপারটা কি ?"

মিটু বলিল, "বলচে, মিটুর মাসী হব না। আমি তো ডাকিও না মাসী বলে।"

বলিলাম, "আচ্ছা, মাসী-বোনপোর বোঝাপড়া পরে হবে। তুমি এস তো খেতে।"

নিজেই উঠিলাম, সঙ্গে করিয়া আনিয়া রেকাবির সামনে বসাইয়া বলিলাম, "খাও। তুলতুল বড্ড লক্ষ্মী। ও তো কারুর কাছে হ্যাংলামি করে না, শুধু বড় জেটুর কাছে আর আমার কাছে করে। ওবেলা আবার খাবার খাব, তুলতুল এসে খাবে। কমলা লেবুটা কী চমৎকার মিষ্টি, না তুলতুল ?"

তুলতুল মাথাটা দোলাইয়া কি বলিল ; আমি টীকার জন্য মিটুর পানে চাহিতে মিটু ঠোঁট-দুইটা জড়ো করিয়া বলিল, "আর বলব না, যাও।"

আহার্যের প্রশংসায় আরও একটু রং চড়াইলাম, সাক্ষী পাইয়া সুবিধাও হইয়াছে। মিটু পিছন থেকে সামনে আসিয়া শোফাটায় হাতপা ছড়াইয়া বসিল। একবার শুইয়া পড়িল, একবার শোফার উপর ডিগবাজি খাইবার চেষ্টা করিয়া নির্লিপ্তভাবটা জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর হঠাৎ একবার সোজা হইয়া বসিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, "মেজ কাকা, তুমি হ্যাংলা মেয়েদের ভালোবাস ?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, খুব।"

"ছেলেদের ?"—ভ্রূ নামাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া আছে।

ভাইপোর ওকালতি বুদ্ধিতে পেটে হাসি সুড়-সুড় করিয়া উঠিতেছে। গম্ভীরভাবে অল্প একটু মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "হুঁ, বাসি। তবে বড় ছেলেদের নয়।"

মিটু আবার পরাভবের ভাবটা শোফায় মাখাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বেশ বুঝিতেছি, আর পারিতেছে না বেচারা। নিষ্ঠুর খেলায় আমারও মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে, ভাবিতেছি ডাকিয়া লইব, এমন সময় মিটু ডিগবাজি দেওয়ার জন্য মাথাটা গুঁজিয়া উলটা চোখে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "মেজকাকা, কানে কানে একটা কথা শুনবে ?"

উলটা দৃষ্টিতে লজ্জাটা বোধ হয় একটু আড়ালে পড়িয়া যাইতেছে।

বলিলাম, "শুনব, কথাটা কি ?"

"কাউকে বলবে না ?—কারুকে—কারুকে নয়—তুলতুলকেও না ?"

তুলতুল বিস্কুট চিবাইতেছিল, বোধ হয় শুনিবার অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য মুখটা ভার করিয়া বলিল, "আমি টো টোর মাটী ওই।"

"ইস্, মাসী!" বলিয়া মিটু সোজা হইয়া বসিল, তাহার পর আমার মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই উঠিয়া আসিয়া আমার কানে মুখ দিয়া বলিল, "আমি তো কচি ছেলে মেজকাকা, বড় নয় তো।"

'হ্যাংলা' কথাটা উহ্য রাখিল। ঐ টুকু মেজকাকা কি বুঝিয়া লইতে পারিবে না? এতটা বড় হইয়াছে কি করিতে? অর্থাৎ, মিটু হার মানিতেছে, তবে যতটা সম্ভব মর্যাদা বজায় রাখিয়া।

২

দ্বিতীয় পর্যায়ে একটু গোল বাধিল।

মিটুকে একটা রেকাবিতে করিয়া খাবারগুলা সাজাইয়া ডাকিতেই তুলতুল হাত গুটাইয়া মুখটি তোলো-হাঁড়ি করিয়া বসিল।

একটু ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি হোল?—তোমার আমার কি হোল, তুলতুল?"

সামান্য একটু মাথা নাড়ার সঙ্গে উত্তর হইল, "আমি ঠাবুই না, ডেকোটো!"

ওর আবার 'দেখোতো' কথাটা প্রয়োজনের গুরুত্বে ব্যবহার করা অভ্যাস।

প্রশ্ন করিলাম, "কেন খাবে না? বেশ তো দুজনে হ'লে··· "

আবদারে কণ্ঠে উত্তর হইল, "আমি টো মাটী ওই।"

বলিলাম, "তা হও বই কি, তাই তো বলছি—দিব্যি মাসী-বোনপোতে··· "

তুলতুল অভিমানের স্বরে গর-গর করিয়া খানিকটা কি বলিয়া গেল, একবর্ণও বুঝিতে পারিলাম না।

অনেক তপস্যায় পাওয়া খাবার, অনেক পিছাইয়াও আছে, আবার বিপদ ঘনাইয়া আসিতেও দেরি না হইতে পারে, মিটু খুব তাড়াতাড়ি হাতমুখ চালাইতে শুরু করিয়া দিয়াছিল, ঘুরিয়া একবার তুলতুলের পানে চাহিয়া নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলিল, "ই—স্!" তাহার পর আমার প্লেটের রাজভোগ দুইটার পানে একবার চাহিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "দিদিমনি আবার আসবেন, মেজকাকা?"

ভবিষ্যতের দিকেও নজর আছে। বলিলাম, "না; তুলতুল কি বললে রে মিটু?"

মিটু দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি কখনও মাসী বলব না; বলবই না।"

তুলতুল মুখটা আরও অন্ধকার করিয়া বলিল, "আমি ঠাবুই না। ডেকোটো।"

মিটু ঠোঁটটা একটু উলটাইয়া বলিল, "বয়ে গেল।"

একবার তুলতুলের রেকাবির পানে চাহিয়া লইয়া বলিল, "আমি খাব'খন, এ্যাঁ মেজকাকা?"

বলিলাম, "তা খাস্, মা-মাসীর পাতের পেসাদ খেতে হয়।"

মিটু ভ্রূ দুইটা খুব চাপিয়া সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের পানে চাহিয়া লইল একটু, তাহার পরে নিঃশব্দে নিজের রেকাবিতে মনঃসংযোগ করিল। কথার মধ্যে কিছু মারপ্যাঁচের গন্ধ পাইলে ও এইরকম করে, পরে ঐ যে নিঃশব্দে আহার বা দোলা বা ডিববাজি খাওয়া, ঐ সময়টা ভাবিয়া লয়, একটা কাটান্ ঠিক করিয়া ফেলে। একবার মুখ তুলিয়া বলিল, "মাসীরা তো কাপড় পরে মেজকাকা, তা জান না বুঝি?"

আবার ইংগিতে বোকা বানায়। বলিলাম, "এখন ছোট তাই ইজের আর পেনি প'রে আছে। বড় হলে পরবে কাপড়।"

আবার একটু নিঃশব্দে আহার; তাহার পর একটা/কমলা লেবুর কোয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "বড় হলে বলব মাসী।"

রাগিয়া বলিলাম, "বড় বেয়াড়া তো তুই! আচ্ছা, ও মাসী না বলে আমি গিন্নী বলে ডাকব তোমায় তুলতুল, তুমি খাও।"

তুলতুল গলাটা দুলাইয়া বলিল, "আমি টো ডিন্নী নয়, আমি টো মাটী ওই।"

আচ্ছা এক ফ্যাসাদে পড়া গেল তো! এমনি তো দুটি প্রজাপতির মতো বেশ উড়িয়া ফিরিয়া সমস্ত বাড়িটা এক করিয়া বেড়াইতেছে দুজনে, একরত্তি আলাদা নয়। আমার এখানে আসিয়াই এ কি এক আদাড়ে জিদ ধরিয়া বসিল! বলিলাম, "মাটীরা ডিন্নীও হয়, সে বরং আরও ভালো, খুব আদর করব, ক-ত্তো জিনিস দোব।"

নড়চড় নাই, মানময়ী গৃহিণীর মতোই মুখ ভার করিয়া, অল্প একটু ঘুরাইয়া বসিয়া আছে। বলিলাম, "শুনচ, তুলতুল? খাও। অনেক খাবার দোব, অনেক!"

আদায়ের স্বরেই ঘাড় বাঁকাইয়া একটু আড়ে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "টাপোড্ডেবে?"

বুঝিতে না পারিয়া মিটুর পানে চাহিতে মিটু প্রশ্নটারই দ্বিরুক্তি করিল, "কাপড় দেবে?"

এতক্ষণ কোনরকমে চাপিয়া ছিলাম, একেবারে ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিলাম। এ আবার মিটুর চেয়েও সেয়ানা। এক সঙ্গেই গৃহিণীত্ব আর মাসীত্বের ব্যবস্থা করিয়া লইতে যায় যে! গৃহিণী-রূপে কাপড় আদায়, তাহার পর সেটা পরিয়া মাসী হইয়া বসা।

বলিলাম, "যা সম্বন্ধ দাঁড়ালো, কাপড় তো দেওয়ারই কথা তুলতুল। কিন্তু বাজারে তো পাওয়া যাবে না, আর একটু বড় হও। নাও, এবার খাও দিকিন।"

মুখটা শুধু আর একটু ঘুরিয়া গেল।

বোধ হয় আমার হঠাৎ হাসিয়া ওঠাতেই মিটুর দিদিমা দুয়ারের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাগের ভান করিয়া বলিলেন, "ওমা, একি কাণ্ড! একটু সরেছি আর দুটোতে এসে ভাগ বসাতে আরম্ভ করেছে? একে কিচ্ছু পাওয়া যায় না!"

মিটু হাত গুটাইয়া লইল, হঠাৎ এরকম হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া যাওয়ায় বুদ্ধি খুলিতেছে না। এদিকে একে অভিমান ছিলই তাহার উপর এই গঞ্জনার সূচনা, তুলতুলের ঠোঁট দুইটি একটু কাঁপিয়া উঠিল। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনাকে একটু সরে যেতে হবে, মা। যা সমস্যা নিয়ে পড়েছি তাতে যদি দুটো খাবারের ওপর দিয়েই রেহাই পাই তো বুঝব··· "

আগাইয়া আসিলেন, একটু হাসিয়াই বলিলেন, "ব্যাপারখানা কি? পাত থেকে খাবার তুলে দিতে হবে, আবার সমস্যাও? এসে জুটল কোন্ দিক দিয়ে? নাও, খেয়ে নাও, দখল যখন করেই বসেছ··· "

বলিলাম, "ওকে মিটু মাসী না বললে খাবে না!"

"সেই মাসী-বোনপোর ব্যাপার? ও সমস্যা আজ পর্যন্ত কেউ মেটাতে পারলে না তো তুমি একদিনের জন্যে এসে কোথা থেকে পারবে, বাপু? কম শয়তান তোমাদের ঐ বাঁটকুলটি? এতটুকু দেখতে

হলে কি হয় ? কাপড় না পরলে কোনমতে মাসী বলবে না ; সমস্ত বাড়ি এক দিকে, ও এক দিকে। এখন, অতটুকু মেয়ের কাপড় কোথায় পায় বল দিকিন লোকে ?"

মিটুর পানে চাহিয়া বলিলেন, "বল্ না মাসী একবারটি নাহয় ; মেজকাকা বলছেন। না বলে, তুমি ওকে নিয়ে যেয়ো না, এইখানে ফেলে রেখে যেয়ো, জব্দ হবে।"

বলিলাম, "হ্যাঁ, তাই যাব, ওর বদলে বরং তুলতুলকে নিয়ে যাব। তুমি খাও তুলতুল, লক্ষীটি ! সেখানে মাসী বলবার কত লোক আছে—গোপাল, মণ্টু, ছবি, গৌরী, মৈয়া, কোঁদন—আরও কত্তো সব—তুমি উত্তুর দিয়ে উঠতেই পারবে না ! নাও, খেয়ে নাও, থাকবে মিটে এখানে একলা পড়ে।"

রসগোল্লাটি তুলিয়া মুখের কাছে ধরিলাম। তুলতুল মুখটা ঘুরাইয়া বিড় বিড় করিয়া কি একটু বলিল। মিটুর দিদিমা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "শোন !—শুনলে তো ?"

বলিলাম, "ধরতে পারলাম না তো।"

"বলছে মিটুও সেখানে যাবে, মাসী বলবে। ওকে যদি একশোটা ছেলেমেয়ে চারিদিক থেকে মাসী বলে ডাকতে থাকে, তবু মিটু না ডাকলে সেসব কিছু নয় ওর কাছে। কাকে রেখে কাকে দুষবে বল ? ও-ও কি কম দজ্জাল মেয়ে ? মিটুকে ঘাড় ধরে মাসী বলাবে তবে ওর সোয়াস্তি !"

আর একটু চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল ; কন্যার আজই যাত্রার দিন, তাঁহার দম লইবার অবসর নাই। আমার এমন কিছু তাড়া নাই, ওদের সমস্যা লইয়াই আরও কাটাইলাম খানিকটা ; এবং অবশেষে আধাআধি একটা সমাধানও হইল ; বলিলাম, "বেশ, আজ বাজার থেকে তোমার কাপড় এনে দোব তুলতুল, তুমি খাও। আজই এনে দোব কেমন ঝক্‌মকে শাড়ি। এইবার বল্ মাসী, মিটু।"

মিটু সন্দেশে একটা কামড় দিয়া একটু গলা দোলাইয়া ওর বুড়ুটে ভাষায় বলিল, "কাপড় পরুক না, তাড়াতাড়ি কিসের ?"

আধাআধি সমাধান এইজন্য বলিতেছি যে তুলতুল শেষ পর্যন্ত খাবারগুলি খাইল। অবশ্য, শুধু ঝক্‌মকে শাড়ির লোভ দেখাইয়াই ফল হইল না, তাহার সঙ্গে একটু ঝাল-মসলা মিশাইতে হইল : মিটু ভয়ঙ্কর বদমাইস—মিটুকে সেখানে লইয়া গিয়া বেত মারিয়া মাসী বলাইতে হইবে—সেখানে তো দাদুও নাই, দিদিমাও নাই যে বাঁচাইবে—মিটু সবটা খাইয়া ফেলিল, তুলতুল তাড়াতাড়ি না খাইয়া ফেলিলে ওর ভাগটাও কাড়িয়া খাইবে—এখানে কিছু বলা যাইবে না কিনা, দাদু দিদিমা দুজনেই রহিয়াছেন যে—

৩

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে একটি অতি সূক্ষ্ম প্রবঞ্চনা থাকে, শিশুদের লইয়া জীবনের যে-অংশটি তাহাতে। এত সূক্ষ্ম যে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না, ওদের ভুলাইয়া-ভালাইয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া, ভাঙিয়া, আমাদের যাত্রার পথ মসৃণ করিয়া লই। বোধ হয় ভাবি, এত ছোট সমাচারগুলো ভগবানের কাছে পৌঁছায় না। পৌঁছায়ই, কেননা এক-এক সময় এক-একটি এমন ধাক্কা আসিয়া বুকে লাগে যে সে আর ভোলা যায় না।

শিশু যে ভগবানের একেবারে বুকের কাছটিতে থাকে, এ কথা আমরা ভুলিয়া বসিয়া থাকি।

তুলতুলের শাড়ির কথা এমন কিছু বড় কথা নয় যে মনে করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। আহার

শেষ করিয়া ছুটিতে মাসী-বোনপোর আড়াআড়ি ভুলিয়া, নাচিয়া-কুঁদিয়া আবার সমস্ত বাড়িটা পূর্ণ করিয়া তুলিল—কোথাও ভাঙা, কোথাও গড়া (ওদের নিজের প্রথায়), কোথাও বকুনি, কোথাও আদর ; যদি একটু নীরবতা তো কণ্ঠকাকলি পরমুহূর্তেই দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে বিরাট দেউড়ির দেয়ালে দেয়ালে আঘাত হানিয়া ওঠে।

আমি একটু ঘোরাঘুরি করিলাম, খানিকটা গল্পে মাতিলাম, দরকারী আলোচনাও ছিল—আজই বৈকালে যাইতে হইবে, এতগুলি লোককে লইয়া গাড়িতে যাওয়া, যা অবস্থা আজকাল !

ওরই মধ্যে তুলতুল আসিয়া একবার হাঁটুটা জড়াইয়া গলা তুলিয়া আবদারের সুরে বলিল, "আমাট্টাপোর আনটে অবে, আমি মাটী অবো।"

বলিলাম, "নিশ্চয়, আনব বইকি।"

আবার ঠোঁট কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমি ডিন্নী ওই।"

আমাদের নূতন-পাতা সম্বন্ধটা লইয়া বোধ হয় বাড়িতে একটা আলোচনা হইয়াছে, মিটুর মারফত খবরটা প্রচারিত হইয়াছে ; তুলতুল টের পাইয়াছে গিন্নীর দর অনেক—শাড়ী পায়, গয়না পায়, আরও কত কি পায় ; মনে করাইয়া দিল।

ঠিক করিয়াছিলাম বাজারে গিয়া গজ দুয়েক রঙিন রেশম বা মলমল-জাতীয় কাপড় কিনিয়া জরির পাড় বসাইয়া শাড়ি সমস্যা মিটাইব। উঠিতেও যাইতেছিলাম—বলিয়াছি ছেলেমানুষকে, ওটুকু সারিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া বসি। গল্পটা একটু দিক-পরিবর্তন করিয়া নূতনভাবে জমিয়া উঠিল। গল্পের মজলিসে লোক বাড়িল, শাখা-প্রশাখায় গল্প নূতন নূতন পথে ছুটিল, একটি মেয়ের শিশুসুলভ আবদার দুইটি চঞ্চল ঠোঁটের স্মৃতি মাঝে মাঝে জাগাইতে জাগাইতে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হইয়া কখন মিলাইয়া গেল।

মনে পড়িল যখন মধ্যাহ্ন-আহারের ডাক পড়িল। অবশ্য, বড় প্রয়োজনের কাছে ও সামান্য কথাটা আমলই পাইল না ; আগে এটা তো সারিয়া লই, তাহার পর নাহয় বাজারে চাকর-বাকর কাহাকেও পাঠাইয়া আনাইয়া লওয়া যাইবে।

ভাত খাওয়ার সময়ে কাছে আসিয়া দাঁড়ানোটা হ্যাংলামির পর্যায়ে পড়ে না ; তুলতুল বেশ সপ্রতিভ এবং খোলাখুলি ভাবেই সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি একটু পুরাতনও তো হইয়াছি ; হ্যাংলামির ধার মরিয়া যায় ওতে। একবার মিটুও আসিল ; খানিকক্ষণ থাকিয়া কি যেন একটা খুব জরুরী কাজে বন্ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। টকার-ডকারের বাঁধ খুলিয়া দিয়া অনর্গল গল্প করিয়া চলিয়াছে তুলতুল ; মাঝে মাঝে শুনিতেছি, আবার মাঝে মাঝে নিজেদের গল্পে ডুবিয়া যাইতেছি—মিটুর দিদিমা রহিয়াছেন, দাদুরা আহার করিতেছেন। শেষ পাতে দই মিষ্টির সময় তুলতুলকে পাশে আসিয়া বসিতে বলিলাম। তুলতুল একবার জেঠাইমার পানে চাহিল ; তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "বোস, ঐ উদ্দেশ্যেই তো এসে দাঁড়ানো গুটি-গুটি করে।"

তুলতুল দুই পা অগ্রসর হইয়া বসিতে গিয়া আবার দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার পর ঘুরিয়া উপরের সিঁড়ির দিকে ছুটিল। প্রশ্ন করিলাম, "কি হ'ল তুলতুল ?"

সকলেই তাহার এই হঠাৎ ভাবপরিবর্তনে একটু বিস্মিত হইয়া চাহিয়া আছেন। তুলতুল ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া একটু গিন্নীপনার ভাবে তর্কের সুরে বলিল, "ডাঁড়াও, মিটু ঠাবে না ? ডেকোটো !"

তাহার বলিবার ধরনে সকলকেই একটু হাসিয়া উঠিতে হইল ; মিটুর দিদিমা কতকটা তাহারই

ভঙ্গী নকল করিয়া বলিলেন, "ডেকোটো! বোনপো শুকোচ্ছে, আমার মুখে কখনও অন্ন জল উঠতে পারে? কিরকম বেয়াক্কেলে কথা আবার!"

মিটু আসিয়া অবশ্য 'মাসী' বলিল না, তবে এবার আর উল্লেখযোগ্য কোন হ্যাঙ্গাম হইল না। মিটুর দাদু একবার প্রশ্ন করিলেন, "মিটু, তাহলে বলছ মাসী?"

মিটু উত্তর করিল, "কাপড় পরুক না, তাড়াতাড়ি কিসের?"

তুলতুল বলিল, "টাপোপ্পোবো; ডেকোটো।"

এইতেই আপাতত কাজ চলিয়া গেল।

সমস্ত রাত গাড়ীতে অকথ্য কষ্ট গিয়াছে, তাহার উপর মিটু তুলতুল সত্ত্বেও কুটুমবাড়িরই আহার। একটু শয্যা আশ্রয় করিতে হইল; ওরা দুজন সঙ্গে রহিল। বলিলাম, "একটু গড়িয়ে নিই, মিটু; তারপর আমি উপরে গিয়ে বাক্স খুলে পয়সা দিচ্ছি, তুই পঞ্চুকে ডেকে দিবি, তুলতুলের কাপড় এনে দেবে।"

তুলতুল মুখটা ভার করিয়া গড় গড় করিয়া কি খানিকটা বলিয়া গেল; দু'চারটা কথা ধরিতে পারিতেছি, অতগুলা আয়ত্ত হয় না। মিটু বলিল, "বলছে, পঞ্চু আনলে আমি পরব না, পঞ্চু কালো, বিচ্ছিরি।"

হাসিয়া তুলতুলকে বলিলাম, "তা বেশ, আমি হাতে করে আনলেই যদি তোমার কাপড় রাঙা টুকটুকে থাকে, আমিই যাবো। সে তো ভাগ্যির কথা। একটু গড়িয়ে নিই, কি বল?"

কাপড়ের আলোচনা চলিল: রাঙা টুকটুকে শাড়ি আসবে তুলতুলের—ফিনফিনে জমি, মাঝে মাঝে চুমকি বসান, এতখানি চওড়া জরির পাড়, এই আঁচলা— এইরকম ক'রে প'রে, পিঠে এইরকম করে আঁচলা দুলিয়ে যেই দাঁড়াবে তুলতুল অমনি মিটু এসে বলবে, "ও তুলতুল মাসী! ও তুলতুল মাসী! ও তুলতুল মাসী!"

আনন্দে একবার ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই তুলতুল সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ভার করিয়া কি বলিল। মিটু বুঝাইয়া দিল, "বলছে, শুধু মাসী বলব।"

মর্য্যাদাজ্ঞান দেখিয়া একটু বিস্মিতই হইতে হইল; অর্থাৎ সঙ্গে নাম জুড়িয়া দিলে তো ওরই মধ্যে একটু ছোট করা হইল; তুলতুল ও-খাদটুকু চায় না। বলিলাম, "হ্যাঁ, নাম ধরে আবার নাকি মাসী বলে? মিটুর যেমন কাণ্ড? তাহলে তো নাম ধরে দাদু বলবে, নাম ধরে দিদিমা বলবে, আমারও নাম ধরে মেজকাকা বলবে।— মিটু ছুটে এসে বলবে: ও মাসী! ও মাসী! তুমি যে কাপড় পরেছ গো! ও মাসী! ও মাসী! ও মাসী!"

কী সাধ লইয়া যে ওরা জন্মায় কে জানে, কথাগুলা তুলতুলকে যেন সুড়সুড়ি দিয়া উঠিল। হঠাৎ আমার দক্ষিণ হস্তটা টানিয়া লইয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল এবং চোখমুখ কুঞ্চিত করিয়া একেবারে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি থামিলে বলিল, "আবাল বল না, আবাল বল! টি বোব্বে মিটু?"

৪

শাড়ি আনা হয় নাই। খুবই ক্লান্ত ছিলাম, কখন গল্পের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছি টের পাই নাই। উঠিলাম একেবারে যাওয়ার আয়োজনের ব্যস্ততার মধ্যে। পাশে তুলতুল শুইয়া আছে একটি পুষ্পস্তবকের

মতো। ওর মুখের উপর যখন নজর পড়িল, ঠোঁটের এক কোণে একটি হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে ; বোধ হয় রঙিন শাড়ি আর "মাসী" ডাকের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

মিটুর দাদু বলিলেন, "আমিই তোমাকে উঠোতে বারণ করে দিয়েছিলাম, কাল ঐ অবস্থা গেছে, আজ রাত্তিরেও ঘুম হবে না। নাও, মুখ হাত ধুয়ে একটু চা-টা খেয়ে নাও, স্টীমারের আর মোটে আধ-ঘণ্টাটাক আছে।"

নিজেকে প্রস্তত করিয়া লইবার মিনিট দশেক যা সময় পাওয়া গেল তাহাতে ডাইনে-বাঁয়ে চাহিবার ফুরসত পাওয়া গেল না, শিশু-ভোলানো হালকা আলাপের মধ্যে একটি রাঙা শাড়িরও প্রলোভন ছিল এ কথা আর কি করিয়া মনে থাকিবে ? ক্ষতিই বা কি যদি না রহিল মনে ? বড় বাড়িতে কন্যাবিদায়ের ব্যাপার—ওদিকেও বেশ একটা তাড়াহুড়া পড়িয়া গেছে, কে কাহার খোঁজ রাখে ? উপর থেকে নামিয়া আসিয়া যখন বিদায় লওয়ার পালা, ছোটদের স্তরে নামিতে তুলতুলের কথা মনে পড়িল। তুলতুল ছিল না।

কেহ সন্ধান দিতে পারিল না। মনে ধক্ করিয়া একটা বড় আঘাত লাগিল ; কিন্তু সে ক্ষণিক ; তখনই অদূরে স্টীমার-ঘাটে স্টীমারের ভোঁ বাজিয়া উঠিল, ওপার হইতে উপস্থিতির সূচনা। যাত্রার তাড়ায় মোটরে গিয়া উঠিতে হইল।

গেটের দিকে মুখ করিয়া মোটর দাঁড়াইয়া আছে। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও বিদায়ের শেষ লগ্নটুকু মেয়েরা একটু লয়ই টানিয়া বাড়াইয়া ; মিটুর মায়ের ওঠা তখনও হয় নাই। হঠাৎ আমার দৃষ্টি সামনে এক জায়গায় নিবদ্ধ হইয়া গেল।

সুমুখেই যে দোতলার ঘরটি তাহার সামনে রেলিঙে-ঘেরা ছোট্ট একটি বারান্দা বা ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়াইয়া একা তুলতুল। একটি বোধ হয় বারো হাতের শাড়ির বেষ্টনীতে ক্ষুদ্র শরীরটির বুক পর্যন্ত একেবারে অবলুপ্ত, তাহারই আঁচলের একটা কোণ মাথার উপর তোলা। ছোট্ট বুকের যত আশা, যত উৎকণ্ঠা তুলতুলের সেই স্বপ্নময় চোখ দুইটিকে যেন অস্বাভাবিক রকম তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। মিটু আমার পাশে বসিয়া মুখটা ঘুরাইয়া বিদায়দৃশ্য দেখিতেছে ; তুলতুলের দৃষ্টি তাহারই উপর ন্যস্ত, কখন একবার ফিরিবে সেই প্রতীক্ষায়।

বোধ হয় হঠাৎ চোখ পড়ার জন্যই মনটা আমার প্রথমে হাসিতেই উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মিটুর মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলাম, "ঐ দেখ্, এক-কাপড় মাসী তোর! ডাক্ একবার মাসী বলে!"

সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটুকুর মর্মান্তিকতা আমার বুকে যেন একটা মোচড় দিয়া উঠিল। ততক্ষণে আমার কথার সূত্র ধরিয়া সবার দৃষ্টি ব্যাল্‌কনির উপর গিয়া পড়ায় বিদায়ের অশ্রুর মধ্যেও একটু হাসি ছলছল করিয়া উঠিয়াছে। তুলতুলের মুখটা যেন কি রকম হইয়া গেল, কচি ঠোঁট দুইটি নাড়িয়া কি একটা বলিতে গিয়া জড়াইয়া ফেলিয়াই দুইহাতে মুখটা ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

একবার ইচ্ছা হইল ডাকিয়া লই। তখনই কিন্তু স্টীমারের বাঁশি আর একবার বাজিয়া উঠিল ; মিটুর মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন, মোটর ছাড়িয়া দিল। ব্যাল্‌কনির নীচে দিয়া যাইবার সময় চোখ তুলিয়া দেখিলাম, অপর্যাপ্ত বস্ত্রের নিষ্ঠুর পরিহাসের মধ্যে তুলতুলের শরীরটুকু যেন ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও লৌকিক ছন্দ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাংলা ছন্দের আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই; কিন্তু··· সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলাদেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রহিয়াছে। কেবল ছাপার কালির তিলক পরিয়া সে ভদ্রসাহিত্যসভায় মোড়লি করিয়া বেড়াইতে পারে না। কিন্তু তাহার কণ্ঠে গান থামে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশি বাজিতেছেই। সেইসব মেঠো গানের ঝরনার তলায় বাংলা ভাষার হসন্ত শব্দগুলা নুড়ির মতো পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুনঠুন শব্দ করিতেছে। আমাদের ভদ্রসাহিত্য-পল্লীর গম্ভীর দিঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নাই; সেখানে হসন্তের ঝংকার বন্ধ। আমার শেষবয়সের কাব্যরচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি" (সবুজপত্র, ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ)। এই সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স তিপান্ন। তখন শেষবয়সের কাব্য বলতে তিনি বোধ করি ১৯০০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে রচিত ক্ষণিকা, শিশু, উৎসর্গ, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য প্রভৃতি গ্রন্থের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। এই কাব্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথের হাতে চলতি বাংলার ছন্দ ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

চলতি বাংলার এই যে বিশিষ্ট রূপ ও সুরের কথা বলা হল, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কবে আকৃষ্ট হল এবং কবে থেকে এটিকে তিনি ছন্দের কাজে লাগাতে শুরু করেন, সেইটেই এই প্রবন্ধের বিচার্য বিষয়। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, 'ক্ষণিকা'র বহুপূর্বে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রায় সূচনাতেই চলতি বাংলার ছন্দোবৈশিষ্ট্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১২৮৭ সালের আশ্বিনসংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত ম্যাকবেথ নাটকের ডাকিনী অংশের বাংলা অনুবাদে রবীন্দ্রনাথকর্তৃক চলতি বাংলা ছন্দ ব্যবহারের প্রথম নিদর্শন পাই। ডাকিনীর উক্তিতে ছন্দোগত কিছু বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির অভিপ্রায়েই যে তিনি বাংলা লৌকিক ছন্দের আশ্রয় নিয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে।[১] কিন্তু তারও বহুপূর্বে শিক্ষারম্ভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চলতি বাংলার ছন্দ অর্থাৎ ছড়ার ছন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' তাঁর জীবনের এই 'আদিকবির প্রথম কবিতা'র ছন্দ-ঝংকারের[২] পরেই যে রচনাটি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল সেটি হচ্ছে খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্জের মুখে শোনা একটি 'ছড়া'। এই ছড়াটি তাঁর মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত···তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত উচ্চারিত অনর্গল-শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা"।[৩] এটিকে বলা যায় তাঁর জীবনে আদিকবির দ্বিতীয় কবিতা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "শিশু-কালের সাহিত্যরসসম্ভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে; আর মনে পড়ে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-

---

১ ১৩৫০ সালের বৈশাখসংখ্যা বিশ্বভারতীপত্রিকায় আমার 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা' নামক প্রবন্ধ এবং অচিরপ্রকাশিতব্য 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২ 'কবিতা'—১৩৫১ আষাঢ়, পৃ ২৭০-৭২।

টুপুর নদেয় এল বান'। ঐ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত"।[১] লক্ষ্য করার বিষয় রবীন্দ্রনাথের বাল্য-স্মৃতিতে যে তিনটি 'কবিতা' উজ্জ্বল হয়ে জাগরূক ছিল তার মধ্যে দুটিই ছড়া অর্থাৎ চলতি বাংলা ছন্দের রচনা। রবীন্দ্রনাথের শৈশবস্মৃতিতে জাগরূক আরও একটা চলতি ছন্দের রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। সেটি ছড়া নয়, ঈশ্বর গুপ্তের 'বোধেন্দুবিকাশ' নাটকের একটি গান। গানটি হচ্ছে এই :

ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না,
বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে ;
এ বড়ো হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে ![২]

এই চলতি ছন্দের যে দোলা ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ বাল্যকালেই রবীন্দ্রনাথের মনে মুদ্রিত হয়েছিল তার প্রথম প্রকাশ দেখতে পাই পূর্বোক্ত ম্যাকবেথ নাটকের ডাকিনী অংশের অনুবাদে। অতঃপর বাল্মীকি-প্রতিভা (১২৮৭ ফাল্গুন) ও কালমৃগয়া (১২৮৯ অগ্রহায়ণ) নাটকে এবং প্রভাতসংগীত (১২৯০ বৈশাখ) কাব্যের উৎসর্গপত্রে এই ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, তখন পর্যন্ত বাংলার ভদ্রসাহিত্যে এ ছন্দের খুব বেশি প্রয়োগ হয়নি। কিন্তু ভদ্রসাহিত্যের যোগ্য বাহন বলে গণ্য না হলেও এছন্দ দীর্ঘকাল যাবৎ সুপরিচিত ছিল। ষোড়শ শতকে লোচনদাসের ধামালি গানে এর যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। তার পরের শতকে গোবিন্দদাসের পদাবলীতে এক জায়গায় এছন্দের নিদর্শন আছে। অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদের কাছেও এছন্দ অজ্ঞাত ছিল না। অন্নদামঙ্গল কাব্যে ওছন্দের একটিমাত্র রচনা দেখা যায়। কিন্তু রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত এছন্দের বহুল ও সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। বস্তুত রামপ্রসাদী সুরের মতোই রামপ্রসাদী ছন্দও বহুকাল বাঙালির চিত্তকে মুগ্ধ করেছে। চলতি ছন্দ ব্যবহারের দিক্ থেকে বলা যায়, অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসাদের যে স্থান উনবিংশ শতকে ঈশ্বর গুপ্তের সেই স্থান। ঈশ্বর গুপ্তের হাতে এছন্দ যে সৌষ্ঠব লাভ করেছে বাংলা ছন্দের ইতিহাসে তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। মধুসূদনের 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে (১৮৫৯) লৌকিক ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ লৌকিক রীতির গদ্যরচনার জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। লৌকিক রীতির পদ্যরচনাতেও যে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল একথা সুবিদিত নয়, কিন্তু তার প্রমাণ আছে তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'তেই। এই বইএর প্রথম ভাগ (১৮৬২) থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

আজব সহর কলকেতা।…
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা,
যত বকবিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির ফাঁদপাতা।…
গিলটি কাজে পালিশকরা,
রাঙ্গা টাকা তামাভরা
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাষে তফাত থাকাই সার কথা॥

১ জীবনস্মৃতি, শিক্ষারম্ভ।
২ 'কবিতা'—১৩৫১ আষাঢ়, পৃ ২৭০

ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য দীনবন্ধু মিত্রের রচনাতেও এছন্দের সাক্ষাৎ পাই। যথা—

এলো চুলে বেনে বউ আলতা দিয়ে পায়
নোলক নাকে কলসি কাঁখে জল আনতে যায়।

দীনবন্ধু মিত্রের 'প্রভাত' নামক সুপরিচিত কবিতাটিও এই লৌকিক ছন্দে রচিত।—

রাত পোহাল ফরসা হল ফুটল কত ফুল।
কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা জুটল অলিকুল॥ —বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ আষাঢ়

হেমচন্দ্রের কয়েকটি কবিতাও এই লৌকিক ছন্দে[১] রচিত হয়েছে। এখানে দুএকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

ভয় করো না, একলা আমি দেখতে নাহি চাই।
রাজার ছেলের আবডালেতে উঁকি মারব ভাই॥
স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লো তোরে॥
—বাজিমাৎ : অমৃতবাজার পত্রিকা, ১২৮২ মাঘ

হায় কি হল দেশের দশা রিপন রাজার ভুরে?
সাদা কালো সমান হবে? সবার মুণ্ড ঘুরে॥···
সফেদ-কালা মিশ খাবে না, সমান হওয়া পরে।
নাচের পুতুল হয় কি মানুষ তুললে উঁচু করে?
—হায় কি হল : বঙ্গদর্শন, ১২৯০ কার্তিক

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, সকলেই হালকা ধরনের লৌকিক বিষয়বস্তুর বর্ণনাতেই এই লঘু লৌকিক ছন্দের ব্যবহার করেছেন। গুরুগম্ভীর বিষয়ের রচনাতেও যে এই ছন্দকে বাহনরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে একথা কেউ কল্পনাও করেননি। ঠিক এই সময়ে 'সিন্ধুদূত'[২] নামক একটি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনাপ্রসঙ্গে ১২৯০ সালের শ্রাবণসংখ্যা ভারতীর একটি প্রবন্ধে ওই লৌকিক ছন্দের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে আশ্চর্যরকম স্বাধীন মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে। তাতে বলা হয়েছে "ভাষার উচ্চারণ-অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়।" অতঃপর যুক্তিসহকারে দেখানো হয়েছে, রামপ্রসাদ সেনের গানগুলিতে যে-ছন্দ দেখা যায় সেইটেই হচ্ছে বাংলার স্বাভাবিক ছন্দ। সর্বশেষে এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, "যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।" প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম নেই। কিন্তু লেখক যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ আছে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে যেসব গৌণ প্রমাণ দেওয়া যায় সেসব ছেড়ে দিয়ে আমরা এস্থলে কয়েকটি মাত্র মুখ্য প্রমাণই উপস্থাপন করব।

---

১ হেমচন্দ্র লৌকিক ছন্দ রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। 'বাজিমাৎ' ও 'বাঙালির মেয়ে' রচনা-দুটিতে ছন্দের প্রচুর ত্রুটি দেখা যায়। 'হায় কি হল?' সম্পূর্ণ নির্দোষ না হলেও অপেক্ষাকৃত সবলতার ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

২ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এঁরই প্রথম কাব্য 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭)। এই 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'র সমালোচনাই রবীন্দ্রনাথের প্রথমপ্রকাশিত গদ্যরচনা (জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, ১২৮৩ কার্তিক)। দ্রষ্টব্য জীবনস্মৃতি, রচনাপ্রকাশ।

বাংলার 'স্বাভাবিক ছন্দ' কাকে বলা যায়, এই আলোচনার প্রসঙ্গে লেখক বলেন, "আমাদের ভাষায় পদে পদে হসন্ত শব্দ দেখা যায়, কিন্তু আমরা ছন্দ পাঠ করিবার সময় তাহাদের হসন্ত উচ্চারণ লোপ করিয়া দিই।" স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে লেখকের মতে—

(১) 'হসন্তশব্দ'-প্রধান চলতি বাংলাতেই আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ বজায় থাকে।

(২) যে-ছন্দে এই হসন্তবহুল উচ্চারণ অব্যাহত থাকে সেইটেই বাংলার 'স্বাভাবিক ছন্দ'।

(৩) রামপ্রসাদ সেনের চলতি বাংলার ছন্দই স্বাভাবিক ছন্দ বলে স্বীকার্য।

(৪) যে ভাষা ও ছন্দে ওই হসন্তের মর্যাদা রক্ষিত হয় না তা বাংলার পক্ষে স্বাভাবিক নয়, অর্থাৎ কৃত্রিম।

এখন নিম্নোদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের উক্তিসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলেই আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সার্থকতা বোঝা যাবে।—

(১) "সাধুভাষার কাব্যসভায় যুক্তবর্ণের মৃদঙ্গটা আমরা ফুটা করিয়া দিয়াছি এবং হসন্তর বাঁশির ফাঁকগুলি সীসা দিয়া ভরতি করিয়াছি। ভাষার অন্তরের 'স্বাভাবিক' সুরটাকে রুদ্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইতে সুর যোজনা করিতে হইয়াছে" (সবুজপত্র, ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ)।

এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধের প্রথমেই উদ্ধৃত অংশটুকুর 'হসন্তশব্দ' ও 'হসন্তর ঝংকার' কথাদুটিও স্মরণীয়।

(২) "প্রাকৃত-বাংলার প্রকৃতি সমতল নয়।...বস্তুত পদে পদেই তার শব্দ বন্ধুর হয়ে ওঠে। তার কারণ প্রাকৃত-বাংলায় হসন্তের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। এই হসন্তের দ্বারা ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে সংঘাত জন্মাতে থাকে, সেই সংঘাতে ধ্বনি গুরু হয়ে ওঠে। প্রাকৃত-বাংলার এই গুরুধ্বনির প্রতি যদি সদ্‌ব্যবহার করা যায় তাহলে ছন্দের সম্পদ্ বেড়ে যায়।...এই প্রাকৃত-বাংলা মেয়েদের ছড়ায় বাউলের গানে 'রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাবে' প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সাধুসভায় তার সমাদর হয়নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বলতে পারেনি এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হল না" (সবুজপত্র, ১৩২৪ চৈত্র)।

(৩) "বাংলাভাষারও নিজের একটা বিশেষ ধ্বনিস্বরূপ আছে। তার ধ্বনির এই চেহারা হসন্তবর্ণের যোগে।...বাংলাদেশের সাহিত্য-আরামবাগ থেকে বাংলাভাষার 'স্বকীয়' ধ্বনিরূপটি পণ্ডিত পাহারাওয়ালার ধাক্কা খেয়ে অনেককাল বাইরে বাইরে ফিরেছিল।...বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন করে, সেই ভাষায় বাংলা 'স্বাভাবিক' ধ্বনিরূপকে স্বীকার করেনি। আর-একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে, এই ভাষা বাংলা 'হসন্ত শব্দের' ধ্বনিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে" (উদয়ন, ১৩৪১ বৈশাখ)।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মত এই যে, 'রামপ্রসাদের পদে' যে ছন্দ পাওয়া যায় সেইটেই বাংলার স্বাভাবিক ছন্দ। আমরা দেখেছি 'সিন্ধুদূত'-সমালোচকেরও এই মত। সুতরাং উভয় ব্যক্তিকে অভিন্ন বলে সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন নয়। অন্যান্য উক্তিগুলিও এই সিদ্ধান্তের অনুকূল। আরও দুএকটি প্রমাণ দেখাচ্ছি।

সিন্ধুদূতের সমালোচক চলতি ভাষার ছন্দ-বিচারে রামপ্রসাদকেই আদর্শ বলে মেনে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও এই বিষয়ে রামপ্রসাদকে অন্যতম আদর্শ বলে গণ্য করেন। বস্তুত মেয়েলি ছড়া এবং বাউলের গান বাদ দিলে দেখা যাবে তিনি শুধু রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরগুপ্তের রচনা থেকেই চলতি ছন্দের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন ; ঈশ্বরগুপ্তের দৃষ্টান্ত তুলেছেন মাত্র একটি, কিন্তু চলতি ছন্দের প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের কথা বলেছেন

বা তাঁর দৃষ্টান্ত তুলেছেন কয়েক বার। 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথের "বাল্যবয়সের সাহিত্য-দীক্ষাদাতা" কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী[১]র উৎসাহে অল্পবয়সেই যাঁদের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদ অন্যতম। অক্ষয় বাবু সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায়[২] বলেছেন, "শ্যামাবিষয়ক গান করিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত।" এই শ্যামাবিষয়ক গান খুব সম্ভবত রামপ্রসাদেরই গান (এই প্রসঙ্গে 'এমন দিন কি হবে তারা' গানটি বিশেষভাবে স্মরণীয়)। এই বাল্যপরিচয়ের প্রভাব যে পরবর্তী কালেও রবীন্দ্রনাথের মন থেকে মুছে যায়নি, চলতি বাংলা ছন্দের আলোচনাপ্রসঙ্গে পুনঃপুনঃ রামপ্রসাদের নামোল্লেখের মধ্যেই তার প্রমাণ পাই। ১২৯৯ সালের শ্রাবণসংখ্যা 'সাধনা'তে (পৃ ২১৪) 'বাঙ্গলা শব্দ ও ছন্দ' নামক তাঁর একটি প্রবন্ধে 'রামপ্রসাদী গান'এর উল্লেখ দেখা যায়। এই প্রবন্ধের গোড়াতেই যে উক্তিটি উৎকলন করেছি তাতে যে 'ভক্ত কবিদের' কথা আছে তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদ যে অন্যতম বা মুখ্যতম তাতে সন্দেহ নেই। একটু আগে রবীন্দ্রনাথের যে উক্তিগুলি উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যেও 'রামপ্রসাদের পদে'র উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালেও তিনি রামপ্রসাদের গানের অংশ উদ্ধৃত করে চলতি বাংলার ছন্দ বিশ্লেষণ করেছেন।[৩] সিন্ধুদূতের সমালোচকও বাংলার স্বাভাবিক ছন্দ বিশ্লেষণ উপলক্ষে রামপ্রসাদের গানই উদ্ধৃত করেছেন।

সিন্ধুদূতের সমালোচক এবং রবীন্দ্রনাথ যে অভিন্ন ব্যক্তি, এই সিদ্ধান্তের পক্ষে আরেক যুক্তি হচ্ছে উভয়ের ছন্দোবিশ্লেষণরীতির আশ্চর্যরকম ঐক্য। সিন্ধুদূতের সমালোচনা থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।—

"রামপ্রসাদের নিম্নলিখিত ছন্দটি পাঠ করিয়া দেখ—

মন্ বেচারীর কি দোষ আছে,
তারে　যেমন্ নাচাও তেম্‌নি নাচে।

দ্বিতীয় ছত্রের 'তারে' নামক অতিরিক্ত শব্দটি ছাড়িয়া দিলে দুই ছত্রে এগারোটি করিয়া অক্ষর থাকে। কিন্তু উহাই আধুনিক ছন্দে পরিণত করিতে হইলে নিম্নলিখিত রূপ হয়—

মনের কি দোষ আছে,
যেমন নাচাও নাচে।

ইহাতে দুই ছত্রে আটটি অক্ষর হয়; তাল ঠিক সমান রহিয়াছে অথচ অক্ষর কম পড়িতেছে। তাহার কারণ শেষোক্ত ছন্দে আমরা হসন্ত শব্দকে আমল দিই না। বাস্তবিক ধরিতে গেলে রামপ্রসাদের ছন্দেও আটটির অধিক অক্ষর নাই—

১ অক্ষয়চন্দ্রের (১৮৫০-৯৮) 'উদাসিনী' (বঙ্গদর্শন, ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ), 'মাধবমালতী' (জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২ পৌষ) এবং 'ভারতগাথা' (কবিতায় ভারতবর্ষের ইতিহাস), এই তিনখানি কাব্যের কথা জানা যায়। ১২৮২ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। এই ঘনিষ্ঠতা বহুকালস্থায়ী হয়েছিল। 'ভারতী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার (১২৮৪ শ্রাবণ) অন্যতম উৎসাহী ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনায় (১২৮৪) রবীন্দ্রনাথ এঁর কাছেই প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলেন। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র (১২৮৮) কয়েকটি গান অক্ষয়বাবুর রচিত। 'সন্ধ্যাসংগীত' (১২৮৯) রচনার সময়েও ইনিই রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেছিলেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার প্রসঙ্গক্রমে অক্ষয়চন্দ্র 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' নামে একটি কবিতা লেখেন। 'ভারতী'তে (১২৮৯ অগ্রহায়ণ) এবং 'প্রভাতসংগীত'এর প্রথম সংস্করণে (১২৯০ বৈশাখ) দুটি কবিতা একত্র স্থান পেয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সিন্ধুদূতের সমালোচনাকালেও (১২৯০ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রের প্রভাবমুক্ত ছিলেন না।

২ জীবনস্মৃতি, ভগ্নহৃদয়।

৩ উত্তরা: ১৩৩৮ আশ্বিন, পৃ ৩১৫; পরিচয়: ১৩৩৮ মাঘ পৃ ৩৭৯ (ছন্দ, প্রথম সং, পৃ ১৩৪); বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ ৭৪।

মন্বেচারী কি দোষাছে,

যেমন্নাচা তেম্নি নাচে।

দ্বিতীয় ছত্র হইতে 'নাচাও' শব্দের 'ও' অক্ষর ছাড়িয়া দিয়াছি; তাহার কারণ এই 'ও'টি হসন্ত 'ও', পরবর্ত্তী 'তে'র সহিত ইহা যুক্ত।"

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এখানে রামপ্রসাদী ছন্দকে 'আধুনিক' অর্থাৎ সাধুছন্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে দুই উপায়ে। এক, রামপ্রসাদী ছন্দ থেকে 'হসন্তের ভঙ্গি' হরণ করে এবং প্রচলিত রীতিতে 'অক্ষর'এর মাপ সমান রেখে। দুই, রামপ্রসাদী ছন্দের হসন্তকে যুক্তাক্ষরে পরিণত করে এবং অক্ষরের মাপ সমান রেখে। পরবর্তী কালে দেখি রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই দুই পন্থাই অবলম্বন করেছেন। প্রথম পন্থার নিদর্শন পাই অন্তত দুই জায়গায়। 'সবুজপত্রে'র (১৩২৪ চৈত্র) একটি প্রবন্ধে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ইত্যাদি ছড়াটিকে তিনি 'সাধু বাংলার ছন্দে' রূপান্তরিত করেছেন এভাবে—

বারি ঝরে ঝরঝর নদিয়ায় বান

শিবু ঠাকুরের বিয়ে তিন মেয়ে দান।

—ছন্দ, প্রথম সং, পৃ ৩৫

দ্বিতীয়ত, 'পরিচয়'এর একটি প্রবন্ধে (১৩৩৯ শ্রাবণ, পৃ ৫৫) 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি' ইত্যাদি প্রাকৃত-বাংলার রচনাটিকে তিনি সাধুছন্দে রূপান্তরিত করেছেন এভাবে—

রূপরসে ডুব দিনু অরূপের আশা করি,

ঘাটে ঘাটে ফিরিব না বেয়ে মোর ভাঙা তরী।

কিন্তু চলতি বাংলার ছন্দকে সাধুছন্দে রূপান্তরিত করার দ্বিতীয় প্রণালীটাই সিন্ধুদূত-সমালোচকের ব্যক্তিত্ব-নির্ণয়ের পক্ষে অধিকতর সহায়ক। এণ্ডারসন সাহেবের কাছে এক পত্রে (সবুজপত্র, ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বাংলা সাধুছন্দে হসন্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগানো হয় না। অথচ জিনিসটা ধ্বনি-উৎপাদনের কাজে ভারি মজবুত। হসন্ত শব্দটা স্বরবর্ণের বাধা পায় না বলিয়া পরবর্তী শব্দের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাকে ধাক্কা দেয় ও বাজাইয়া তোলে। 'করিতেছি' শব্দটা ভোঁতা, উহাতে কোনো সুর বাজে না কিন্তু 'কচি' শব্দে একটা সুর আছে। 'যাহা হইবার তাহাই হইবে' এই বাক্যের ধ্বনিটা অত্যন্ত ঢিলা। কিন্তু যখন বলা যায় 'যা হবার তাই হবে' তখন 'হবার' শব্দের হসন্ত 'র' 'তাই' শব্দের উপর আছাড় খাইয়া একটা জোর জাগাইয়া তোলে।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে 'যা হবার তাই হবে' কথাটার উচ্চারণরূপ হচ্ছে 'যা হবার্তাই হবে'। ১৩৩৮ সালের মাঘসংখ্যা 'পরিচয়ে' (পৃ ৩৮৮-৮৯) রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত-বাংলার ধ্বনিরূপ বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে বলেছেন—

"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি

এখানে 'রূপ্' আপন হসন্ত প্-এর ঝোঁকে 'সাগরে'র সা-টাকে টেনে আপন করে নিয়েছে, মাঝে ব্যবধান থাকতে দেয়নি।…'ডুব্' আপনার হসন্তর টানে 'দিয়েছি'র দি-টাকে করলে আত্মসাৎ"।[১] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি' কথাটার উচ্চারণরূপ হচ্ছে 'রূপ্সাগরে ডুব্দিয়েছি'। প্রাকৃত-বাংলার হসন্তভঙ্গি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে 'বাংলাভাষা-পরিচয়' (১৯৩৮) গ্রন্থে। এই বইএ একস্থানে (পৃ ৬৪) তিনি বলেছেন, "চলতি ভাষার কবিতা

১ ছন্দ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ১৫২।

বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপ মেনে নিয়েছে। হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়, তাতে যুক্তবর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চলতি ভাষার ছন্দ সেই যুক্তবর্ণের ছন্দ।" অতঃপর দৃষ্টান্তস্বরূপ—

অচিন ডাকে নদীর বাঁকে
ডাক যে শোনা যায়

বাউলগানের এই পংক্তিটার সম্পর্কে বলেছেন, "যদি উচ্চারণ মেনে বানান করা যেত তাহলে বাউলের গানের চেহারা হত—

অচিণ্ডাকে নদীর্বাঁকে ডাক্‌যে শোনা যায়।

সাধুভাষার কবিতায় বাংলা শব্দের হসন্তরীতি যে মানা হয়নি তা নয়, কিন্তু তাদের পরস্পকে ঠোকাঠুকি ঘেঁষাঘেঁষি করতে দেওয়া হয় না। বাউলের গানে আছে 'ডাকের চোটে মন যে টলে'। এখানে 'ডাকের' আর 'চোটে', 'মন' আর 'যে' এদের মধ্যে উচ্চারণের কোনো ফাঁক থাকে না।" এই প্রসঙ্গে একটু পরে আবার বলছেন, "চলতি ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া, তাতে বাংলার হসন্তসংঘাতের স্বাভাবিক ধ্বনিকে স্বীকার করেছে।···সাধুভাষার পদ্য-উচ্চারণকালে হসন্তের টানে শব্দগুলি গায়ে গায়ে লেগে যাবে না; অর্থাৎ বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনির নিয়ম এড়িয়ে চলতে হবে।

সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।

চলতি বাংলায় 'নদ' আর 'তুমি', 'মোর' আর 'মনে' হসন্তের বাঁধনে বাঁধা। এই পয়ারে ঐ শব্দগুলিকে হসন্ত বলে যে মানা হয়নি তা নয়, কিন্তু ওর বাঁধন আলগা করে দেওয়া হয়েছে। 'কান' আর 'আমি', 'ভ্রান্তির' আর 'ছলনে' হসন্তের রীতিতে হওয়া উচিত ছিল যুক্তশব্দ, কিন্তু সাধুছন্দের নিয়মে ওদের জোড় বাঁধতে বাধা দেওয়া হয়েছে। একটা খাঁটি ছড়ার নমুনা দেওয়া যাক।

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারি মধ্যে বসে আছেন শিবু সদাগর।

এটা পয়ার কিন্তু চোদ্দ অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে গেছে। তবু উচ্চারণ মিলিয়ে বানান করলে চোদ্দ অক্ষরের বেশি হবে না।—

এপার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারি মধ্যে বসে আছেন্সিবু সদাগর।"

দেখা যাচ্ছে চলতি বাংলার ছন্দ সম্বন্ধে সিন্ধুদূত-সমালোচক ও রবীন্দ্রনাথের মত এবং বিশ্লেষণপ্রণালী অবিকল এক। সুতরাং উভয়কে একই ব্যক্তি বলে স্বীকার করা অযৌক্তিক নয়। যদি তাই হয় তবে মজার কথা এই যে, ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ যে মত ব্যক্ত করেছেন ১৮৮৩ সালেই অর্থাৎ পঞ্চান্ন বছর আগেই তাঁর মনে সেই মত সুস্পষ্ট আকার ধারণ করেছিল।

উপরে যেসব যুক্তি দেখানো হল তা ছাড়া আরও আনুষঙ্গিক যুক্তি উপস্থিত করা যেতে পারে। সিন্ধুদূত-সমালোচক ও রবীন্দ্রনাথের প্রযুক্ত শব্দ ও ভাষারীতির সমতাগত যুক্তিও উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু বোধ করি সেসব যুক্তি প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন। সিন্ধুদূত-সমালোচকের মতে রামপ্রসাদের ছন্দই হচ্ছে বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ, আর রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলা ছন্দ 'রামপ্রসাদের পদে আপন

স্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে', আমার বিবেচনায় দুই মতের এই সম্পূর্ণ ঐক্য থেকেই দুই জনের অভিন্নতা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথের যেসব উক্তি আমরা উদ্ধৃত করেছি তার বহুস্থলেই চলতি বাংলার ছন্দকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলার স্বাভাবিক ছন্দ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সিন্ধুদূত-সমালোচনায় (১৮৮৩) এই স্বাধীন মত প্রকাশ পেয়েছে যে, 'যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে'। চলতি বাংলার ছন্দ পরবর্তীকালে যাঁর হাতে এতখানি শক্তি ও পরিণতি লাভ করেছে সেই রবীন্দ্রনাথই যদি উক্ত স্বাধীন মতবাদের পোষক বলে প্রতিপন্ন হন তাহলে বিস্মিত হবার কারণ নেই, বরং সেটাই স্বাভাবিক বলে গণ্য হবার যোগ্য। যাহোক, সিন্ধুদূত-সমালোচনাকালে উক্ত অভিমত প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ 'ভবিষ্যতের ছন্দ'কে 'রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী' করার কি প্রয়াস করলেন সে-বিষয়ে সংক্ষেপে দুয়েকটি কথা বলেই প্রবন্ধ সমাপ্ত করব। প্রথমেই বলা যায় যে, উক্ত অভিমত প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। সিন্ধুদূত-সমালোচনা প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালের শ্রাবণ মাসে। আর, ঐ বছরেরই ফাল্গুন মাসে 'ছবি ও গান' কাব্যখানি প্রকাশিত হয়। এই কাব্যেই দেখা যায় উক্ত অভিমতকে কার্যে পরিণত করবার অর্থাৎ চলতি বাংলার হসন্তঝংকারকে কাজে লাগিয়ে বাংলা ছন্দকে রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী করবার চেষ্টা চলছে। এই হিসাবে 'ছবি ও গান'কে 'ক্ষণিকা'র অগ্রদূত বলে স্বীকার করতে হয়। অতঃপর 'কড়ি ও কোমল' কাব্যেও (১৮৮৬) এছন্দের যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু তখনকার এই প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হয়নি। অন্যত্র[১] এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি, এখানে আর কথা বাড়াব না। এর বহুকাল পরে 'কল্পনা'র একটি কবিতায় ('হতভাগ্যের গান', ১৮৯৭) এবং 'কথা'র কয়েকটি কবিতায় (১৮৯৯) রামপ্রসাদী ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অবশেষে 'ক্ষণিকা'র (১৯০০) সময় থেকে এই ছন্দের জয়যাত্রা শুরু হল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই চলতি বাংলার ছন্দ উনবিংশ শতকেও স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, এই শতকের একেবারে শেষ অংশে এছন্দের ব্যবহারগত শক্তি ও সৌন্দর্য আবিষ্কৃত হয়। অতএব সাধুসাহিত্যগ্রাহ্য ছন্দ হিসাবে এটিকে কার্যত বিংশ শতকের ছন্দ বলেই স্বীকার করতে হয়।

১২৯০ সালেই রবীন্দ্রনাথ চলতি ছন্দের শক্তি ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং জোরের সঙ্গে সেকথা ঘোষণাও করেছিলেন। ১৩২১ সালে তিনি বললেন, "আমার শেষ বয়সের কাব্যরচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি।...তার সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার সাধনা করিয়াছি। তাহাতে সাধুলোকেরা ছি ছি করিয়াছে।" বস্তুত তিনি এই লৌকিক ছন্দটিকে 'ভদ্রসাহিত্যসভায়' সম্মানের আসন দিতে খুবই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ১৩২৪ সালেও তাঁকে ক্ষুব্ধকণ্ঠেই বলতে হয়েছে, এ ছন্দের "শক্তি যে কত তার সম্পূর্ণ পরিচয় হল না। আজকের দিনের ডিমক্রেসির যুগেও সে ভয়ে ভয়ে দ্বিধা করে চলেছে; কোথায় যে তার পংক্তি এবং কোথায় নয় তা স্থির হয়নি। এই সংকোচে তার আত্মপরিচয়ের খর্বতা হচ্ছে।" ১৩৫১ সালেও এই খর্বতা সম্পূর্ণ ঘোচেনি এবং ওই উক্তির সত্যতা আজও অনেকাংশেই স্বীকার্য।

---

১ ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১৯-২৩।

কুণাল ও কাঞ্চনমালা শ্রীনন্দলাল বসু

টাকি
লিথোপ্রিণ্ট
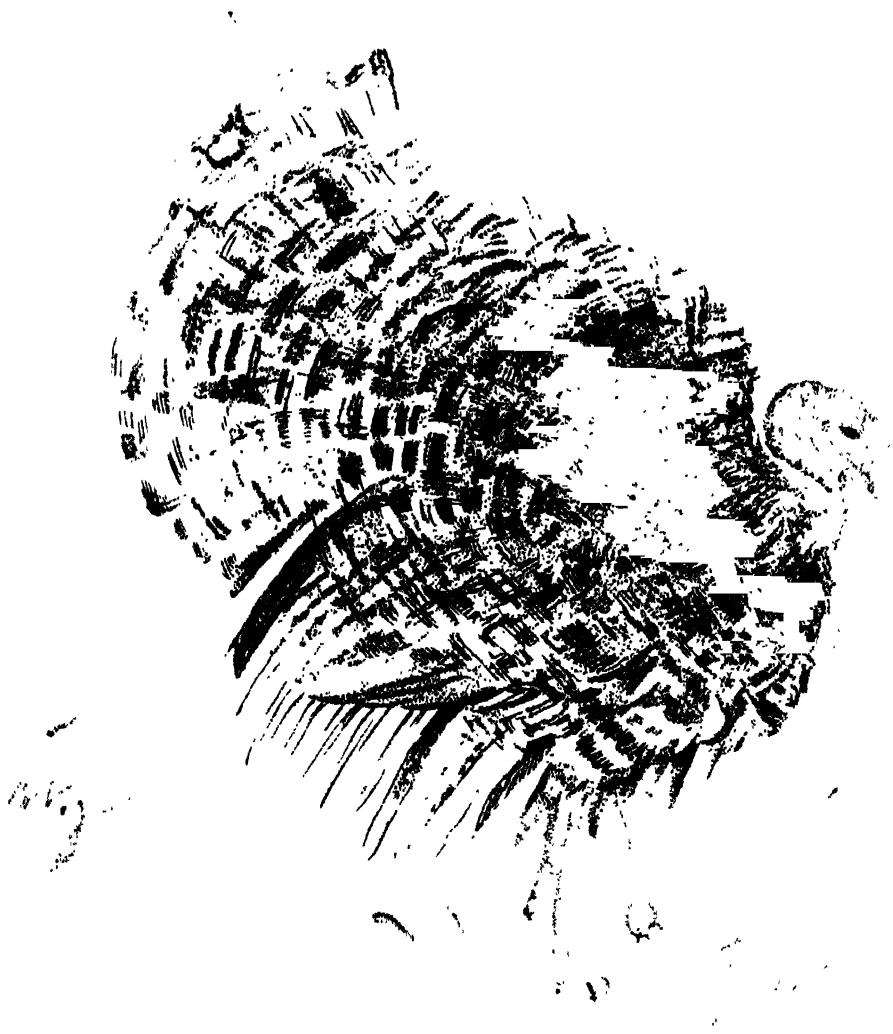
শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

আফ্রিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু ছিন্ন করি নিয়ে গেল তোরে
প্রাচী ধরিত্রীর বক্ষ হতে
রে আফ্রিকা,
রেখে দিল নির্বাসনে মহা-অরণ্যের অন্ধকারে ॥

লতাগুল্ম-অবরুদ্ধ বনঘনিমায়
চিনে নিতেছিলে পথ
তিমির বিদীর্ণ করি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ;
বিদ্রূপ করিতেছিলে ভীষণেরে
নিজেরে বিরূপ করি—
ভয়মোচনের মন্ত্রে
আপনারে দিতেছিলে বিভীষার প্রচণ্ড মহিমা
তাণ্ডবের দুন্দুভি বাজায়ে।
অরণ্যের প্রেরণায়
রচনা করিতেছিলে
জীবনের অনুষ্ঠান
অরণ্যের মতো,
অর্থগ্রন্থিহীন,
খচিত বিবিধ বর্ণে,
সহজে উদ্ভূত জটিলতা ॥

সেদিন উঠিতেছিল দূর মহাদেশে
নব নব বাণীর নির্ঘোষ
নব নব দিন-অভ্যুদয়ে
মানবচিত্তের তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ-'পরে।

উন্মথিত ইতিহাস
প্রকাশ লভিতেছিল অকস্মাৎ সৃষ্টিতে প্রলয়ে ;
বারম্বার অবলুপ্ত সভ্যতার ভূগর্ভবিলীন
কবরের 'পরে
উঠেছে হঠাৎস্ফূর্ত প্রতাপের স্পর্ধিত পতাকা ॥

সৃষ্টির আরম্ভযুগে থাকে যে স্তম্ভিত অন্ধকার
গর্ভে বহি শিশু সূর্যতারা
নিভৃতে আছিলে তুমি
তেমনি তমিস্রঘন
ধরণীর ধ্যানের মন্দিরে।
অন্ধকারভাণ্ডারের রহস্যসম্পদ যত,
অধরা, অছোঁওয়া, নিতেছিলে সন্ধান তাহার
মায়াবিনী প্রকৃতির যত মায়া
ধরিতে শিখিতেছিলে ইন্দ্রিয়ের ফাঁদে ॥

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
কালো অবগুণ্ঠনের তলে
আছিলে অপরিচিতা তব প্রতিবেশিনীর কাছে।
রূপমদোদ্ধত ইয়ুরোপ
দস্যুবেশে গিয়েছিল দীপহীন তোমার প্রাঙ্গণে—
তোমার বক্ষের 'পরে চালায়েছে রথ,
যেখানে বেদনাভরা মানবহৃদয়
তরুচ্ছায়ে ছিল প্রসারিত।
সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করেছিল অন্ধকারে
নির্লজ্জ অমানুষিতা।
অশ্রু তব রক্ত-সাথে মিশে
ভাষাহীন ক্রন্দনের পথ

দিয়েছে পঙ্কিল করি—
দস্যুপদপাদুকার তলে
অশুচি কর্দম সেই
চিরচিহ্ন দিয়ে গেছে তোমার দুর্ভাগা ইতিহাসে॥

তখনি তাদের দেশে দয়াময় দেবতার নামে
মন্দিরে বাজিতেছিল পূজাঘণ্টা প্রভাতে সন্ধ্যায়,
শিশুরা খেলিতেছিল মা'র কোলে,
অবাধে ধ্বনিতেছিল কবির সংগীতে
সুন্দরের আরাধনা॥

আজ হেরো, পশ্চিমদিগন্তে হোথা
ঝঞ্ঝামেঘে উঠে ওই বজ্রের ঝঞ্ঝনা—
ধূলিবাষ্প-আবর্তের আবিল আকাশে,
দিন বুঝি হল অবসান।
পশুরা উঠিল গর্জি ছিল যারা গোপন গহ্বরে—
নখে নখে ছিন্ন করিতেছে তারা
অঙ্গনের বহুমূল্য আস্তরণ,
ধূলিরে করিছে অবারিত॥

এসো তুমি যুগান্তের কবি—
আত্ম-অবমাননার আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে
ওই চিরনিপীড়িতা মানবীর কাছে,
ওই অবমানিতার দ্বারে,
ক্ষমা ভিক্ষা করো।
হোক তাহা তব সভ্যতার
হিংস্র প্রলাপের মাঝে শেষ পুণ্যবাণী॥

স্বপ্ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইঁটের-টোপর-মাথায়-পরা শহর কলিকাতা
অটল হয়ে বসে আছে, ইঁটের আসন পাতা।
ফাল্গুনে বয় বসন্তবায়, না দেয় তারে নাড়া—
বৈশাখেতে ঝড়ের দিনে ভিত রহে তার খাড়া।
শীতের হাওয়ায় থামগুলোতে একটু না দেয় কাঁপন
শীতবসন্তে সমানভাবে করে ঋতুযাপন।
অনেক দিনের কথা হল, স্বপ্নে দেখেছিনু,
হঠাৎ যেন চেঁচিয়ে উঠে বললে আমায় বিনু
"চেয়ে দেখো"— ছুটে দেখি চৌকিখানা ছেড়ে,
কলকাতাটা চলে বেড়ায় ইঁটের শরীর নেড়ে।
উঁচু ছাদে নিচু ছাদে পাঁচিল-দেওয়া ছাদে
আকাশ যেন সওয়ার হয়ে চড়েছে তার কাঁধে।
রাস্তা গলি যাচ্ছে চলি অজগরের দল,
ট্র্যামগাড়ি তার পিঠে চেপে করছে টলমল।
দোকান বাজার ওঠে নামে যেন ঝড়ের তরী,
চউরঙ্গির মাঠখানা ঐ যাচ্ছে সরি সরি।
মনুমেণ্টে লেগেছে দোল উল্‌টিয়ে বা ফেলে,—
খ্যাপা হাতির শুঁড়ের মতো ডাইনে বাঁয়ে হেলে।
ইস্কুলেতে ছেলেরা সব করতেছে হৈ হৈ—
অঙ্কের বই নৃত্য করে ব্যাকরণের বই।
মেজের 'পরে গড়িয়ে বেড়ায় ইংরেজি বইখানা,
ম্যাপগুলো সব পাখির মতো ঝাপট মারে ডানা।
ঘণ্টাখানা দুলে দুলে ঢঙ ঢঙা ঢঙ বাজে—
দিন চলে যায়, কিছুতে সে থামতে পারে না যে।
রান্নাঘরে কেঁদে বলে রান্নাঘরের ঝি,
"লাউ কুমড়ো দৌড়ে বেড়ায়, আমি করব কী!"

হাজার হাজার মানুষ চেঁচায়, "আরে থামো থামো।
কোথা যেতে কোথায় যাবে, কেমন এ পাগ্‌লামো।"
"আরে আরে চলল কোথায়" হাবড়ার ব্রিজ বলে,
"একটুকু আর নড়লে আমি পড়ব খ'সে জলে।"
বড়োবাজার মেছোবাজার চীনেবাজার থেকে
"স্থির হয়ে রও, স্থির হয়ে রও" বলে সবাই হেঁকে।
আমি ভাবছি, যাক-না কেন, ভাবনা কিছুই নাই—
কলকাতা নয় দিল্লি যাবে, কিম্বা সে বোম্বাই।

হঠাৎ কিসের আওয়াজ হল, তন্দ্রা ভেঙে যায়—
তাকিয়ে দেখি, কলকাতা সেই আছে কলকাতায়॥

৬ পৌষ, ১৩৩৬

পূর্বগামী আফ্রিকা কবিতাটির সহিত দ্বিতীয়সংস্করণ বা অধুনাপ্রচলিত পত্রপুট কাব্যের ষোল-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়; উহা গদ্যছন্দে লেখা; রচনার স্থান ও কাল—শান্তিনিকেতন, ২৮ মাঘ, ১৩৪৩। উদ্‌ধৃত কবিতা তাহারই অমিত্রাক্ষর ছন্দবদ্ধ পাঠ। স্বপ্ন কবিতাটি দ্বিতীয়ভাগ সহজপাঠে প্রকাশিত 'একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু' কবিতার পাঠান্তর; উভয়ের ছন্দও পৃথক্।

কবিতা দুইটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত দুখানি পাণ্ডুলিপি হইতে শ্রীকানাই সামন্ত কর্তৃক সংকলিত।

রেখাচিত্র

শ্রীনন্দলাল বসু

বাংলা লিপির সংস্কার

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

বানানের তর্ক এখানে তুলব না। অনেক দেশজ এবং তদ্ভব শব্দের বানান বদলানো দরকার তা স্বীকার করি, কিন্তু সে আলোচনার ক্ষেত্র আলাদা। লিপি-সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে যাঁরা বাংলা বানানকে ঢেলে সাজবার প্রস্তাব করেছেন তাঁরা অকারণ বিরুদ্ধতার সৃষ্টি ক'রে নিজেদেরই অসুবিধা ঘটিয়েছেন। ঋর কাজ রি দিয়ে, উ-ঊ এবং ই-ঈর কাজ উ এবং ই দিয়ে, ন-ণ-এর কাজ ন দিয়ে, য-জ-এর কাজ জ দিয়ে, শ-ষ-স-এর কাজ স দিয়ে চলতে পারে কিনা, সে-বিচারে প্রবৃত্ত হবার আগে দেখতে হবে চলবার প্রয়োজন কিছু আছে কি না।

চলা শক্ত সেটা স্বীকার করা ভালো। সংস্কৃত বাঙালী জাতির অর্ধেকের দেবভাষা, তাদের শাস্ত্রের ভাষা। সংস্কৃত হয়তো বাংলার প্রমাতামহী, কিন্তু মাতা এবং মাতামহীদেরও প্রত্যেকের চাইতে তারই সঙ্গে বাংলার চেহারার আদল বেশী। এসব কথা না-হয় ধর্তব্যের মধ্যে নয়, কিন্তু ইংরেজীর পরে সংস্কৃত এখনো বহুল পরিমাণে আমাদের সংস্কৃতির ভাষা। আমাদের মুখের আটপৌরে ভাষাতেও তৎসম শব্দের ছড়াছড়ি। তৎসম শব্দগুলির নূতন বানান সহজে আমাদের ধাতে সইবে না। এ হল একদিক্‌কার কথা; আর একদিকে মনে রাখতে হবে, যে, সংস্কৃত থেকে এসে বাংলার পরিবারস্থ হয়ে যারা ঢুকেছে তারা অনেকেই নিজেদের প্রাচীন আদব-কায়দার অনেকখানিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে। সন্ধিতে, সমাসে, কৃৎ-তদ্ধিত প্রত্যয়াদির যোগাযোগে এখনো তাদের সেই সাবেক চাল পুরোমাত্রায়ই বর্তমান, সে চাল তাদের কি রকম ক'রে ভোলানো যাবে? সে যে বড্ডই মেহনতের কাজ হবে। যোগ না লিখে ধরা যাক আমরা জোগ লিখতে রাজি হলাম; বিয়োগকে বিজোগে, বিয়োগান্ত নাটককে বিজোগান্ত নাটকে রূপান্তরিত না করলে তাদের জাতের ঠিক থাকবে না।

যুগোপযোগী জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম পরিভাষার জন্য সারাক্ষণ আমাদের সংস্কৃতের দ্বারস্থ হতে হয়, সংস্কৃত রীতিতে সংস্কৃত শব্দ ভেঙে গ'ড়ে জোড়াতাড়া দিয়ে অন্য কত রকমের জরুরী প্রয়োজন আমরা নির্বাহ করি, কেন করি সে কথা না-হয় উহ্যই রইল। সংস্কৃত বানান বর্জিত হলে, এই ধরনের অনেক সুবিধার থেকে কতক পরিমাণে আমরা বঞ্চিত হব।

অন্ততঃ একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে লিপি-সংস্কার যত বেশী জরুরী, বানান-সংস্কার তত নয়, বানানের সংস্কার সহজও নয়। বানান সব ঠিকই থাকবে, আসা ও আশা, ভাসা ও ভাষার তফাত আমরা রাখব, শয্যা ও সজ্জা, গূঢ় ও গুড়, শব ও সব এক হয়ে যাবে না, অথচ আমরা যে-প্রয়োজনে লিপি-সংস্কার করতে চাই তা সাধিত হবে, এটা সম্ভব কিনা দেখা উচিত।

বাংলা লিপির বিরুদ্ধে প্রথম এবং প্রধান অভিযোগ, এর অক্ষর বা ধ্বনিচিহ্নের অকারণ বাহুল্য। দ্বিতীয় অভিযোগ, ঠাটটা ধ্বনি-অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এ লিপি সর্বত্র ধ্বনি-অনুসারী নয়। তৃতীয় অভিযোগ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঐ, ঔ, ইকার, ঈকার, ঐকার এবং ঔকারের আঁকড়ি, ট এবং ঠ-এর ল্যাজ, রেফ এবং চন্দ্রবিন্দু এগুলি উপরের থাকে; উকার, ঊকার, ঋকার, ৠকার এবং হস্ চিহ্ন নীচের থাকে; বাকী সব অক্ষর মাঝের

স্বরবর্ণের কাজে আকার ইকারকে লাগাতে গেলে দেখতে অত্যন্ত খাপছাড়া হবে। ে ি ামটি ধুে খাে া (এই আমটি ধুয়ে খাও), কেমন বাংলা লিপি ব'লেই মনে হচ্ছে না।

সমস্যাটাকে যত জটিল মনে হচ্ছে আসলে যে সেটা তা নয়, তার ইঙ্গিত বাংলা লিপিতেই একটি এবং দেবনাগরী লিপিতে কয়েকটি রয়েছে। বাংলায় যেমন অ-এ আকার লাগিয়ে আ হয়, অ-এ ওকার ঔকার যোগ ক'রে দেবনাগরী লিপিতে ও ঔ-র কাজও দিব্যি চ'লে যাচ্ছে, বাংলাতেও চলতে পারে, এবং কয়েকটির কাজ যদি চলে ত বাকীগুলিরই বা কেন চলবে না ?

বাংলা স্বরবর্ণ-পর্যায়ের রূপ তাহলে দাঁড়াবে অ (+অকার), আ, অি, অী, অু, অূ, অৃ, অে, অৈ, অো, অৌ। এবং সেই সঙ্গে সূত্র রচনা করতে হবে : ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরান্ত হলে, স্বরবর্ণের "অ" অংশ লোপ পায়।

কিন্তু বাংলা স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত চিহ্নগুলির দোষ, তারা যে কে কোথায় বসছে তার ঠিক নেই। কেউ উপরে, কেউ নীচে, কেউ আগে, কেউ পিছনে, কেউ দুদিক্ বা তিন দিক্ জুড়ে, যার যেখানে খুশি। ধ্বনির ক্রম অনুসারে যার স্থান পরে তাকে নিয়ে আগে বসানো বে-আদবির সামিল, আর ভাগাভাগি ক'রে সামনে পিছনে বসানোর তো মানেই হয় না কিছু। বাংলা লিপি এখন তিন থাক জুড়ে লেখা হয়, নীচের তলাটা ফেলে রাখতে হয় কেবল উকার, ঊকার, ঋকার এবং হসন্ত চিহ্নের জন্য। অধোগতির চেয়ে ঊর্দ্ধগতি ভাল, সুতরাং অন্যদের নীচে নামানোর অপচেষ্টা না ক'রে এই পাঁচটিকে টেনে উপরে উঠিয়ে দেওয়া যায় কিনা দেখা যেতে পারে। এই কটি কথা মনে রেখে এবার একটি একটি ক'রে স্বরধ্বনি-চিহ্নগুলির বিচার করা যাক।

অ। এটি বাস্তবিক এখন একাধারে অকারান্ত এবং হসন্ত অ, তার প্রমাণ অ-এ ওকার যোগ ক'রে দেবনাগরী লিপিতে ও নিষ্পন্ন হচ্ছে, কিন্তু সন্ধির নিয়ম অনুসারে অকার এবং ওকার মিলে ঔকার হয়। সে যেমনই হোক, আমরা নূতন লিপিতে এটিকে হসন্ত অ বা মূল স্বর বলেই গ্রহণ করব। আরও সংক্ষিপ্ততর চিহ্ন একটা নেওয়া যেতে পারত, কিন্তু অ আমাদের বর্ণমালার প্রথম বর্ণ, তাছাড়া যে ফুটকি-যুক্ত একটি বক্র রেখা এবং সূক্ষ্ম-কোণ-সম্বলিত একটি দ্বিভুজ আমাদের বর্ণমালার অধিকাংশ বর্ণের মূলীভূত উপাদান, সে দুটিই এই অক্ষরটিতে রয়েছে। হসন্ত অ-র অন্য-বর্ণ-নিরপেক্ষ ব্যবহার কিছু থাকবে না, তবে সংস্কৃতের উদ্ধৃতি ইত্যাদিতে লুপ্ত অ রূপে মাত্রাহীন হ (২)-এর পরিবর্তে এর ব্যবহার চলবে। স্বরবর্ণমালার প্রথম বর্ণ নিষ্পন্ন করবার জন্য এতে এবারে একটি অকার যোগ আবশ্যক হচ্ছে। অক্ষরের উপরে যেখানে আমরা মাত্রা টেনে অক্ষরান্তরে চ'লে যাই সেইখানে ছোট্ট একটি v চিহ্নকে অকাররূপে ব্যবহার করলে বেশ কাজ চ'লে যায়, দেখতেও মন্দ হয় না, বাংলা লিপির একটানা মাত্রা-সমাবেশের একঘেয়েমি এতে কাটে। এই চিহ্নটি লেখা সহজ, টানালেখায় উপরের মাত্রা একটু কাঁপিয়ে দিলেই অকার হয়ে যাবে, নূতন একটি ধ্বনিচিহ্ন যে ব্যবহার করতে হচ্ছে তাই কিছুদিন পরে কারও মনে থাকবে না। বাংলায় অকারান্ত ধ্বনি এত বেশী, যে, খুব সহজে লেখা যায় এমন চিহ্নই অকার রূপে গ্রহণ করা উচিত। নূতন বর্ণমালায় অ-এর রূপ তাহলে দাঁড়াচ্ছে (ত লিখে তার সঙ্গে ফুটকি-হীন ন জুড়ে অ লেখা হবে না, অ একটানে লেখা হবে)—

আ। গোলমাল কিছু নেই

ই। ইকারটিকে তার যথাস্থানে অর্থাৎ পরে সরিয়ে দিয়েও মুস্কিল থেকে যায়, তার আঁকড়ির

ঝোঁকটা থাকে বাইরের দিকে। ঝোঁকটাকে ফিরিয়ে দিলেও corn বা শিংবাগানো টাইপের সমস্যা থেকে যায়, নয়ত আঁকড়িটাকে এত সংকীর্ণ ক'রে নিতে হয় যে সেটা প্রায় লোপ পেয়ে যায়। ইকারের আঁকড়িটাকে না নিয়ে আমরা যদি স্বয়ং ই-র কাছ থেকেই তার আঁকড়িটাকে ধার নিই তাহলে সব গোল মেটে, পাই

ঈ। বাংলায় ইকার এবং ঈকারের যে দ্বন্দ্ব, তার একটা খুব সহজ সমন্বয়ের ইঙ্গিত বাংলা লিপিতেই রয়েছে। ঋকারের দ্বিত্ব ক'রে আমরা ৠকার ক'রে থাকি, ইকারের দ্বিত্ব ক'রে ঈকার কেন করা যাবে না? শুধু আঁকড়িটার দ্বিত্ব করলে নিজের থেকেই সেটা দেখতে অনেকখানি এখনকার ঈকারের মত হয়ে যাবে। হাতের লেখায় এখনকার ঈকারের মতই লেখা চলবে। পাচ্ছি

উ। বাংলায় দুই রকম উকারের ব্যবহার এখনই রয়েছে। রু লিখতে, ত্রু লিখতে আমরা যে উকার-চিহ্নটি ব্যবহার করি, সেটি ধ্বনিক্রমের যথাস্থানে, অর্থাৎ ব্যঞ্জনের ডাইনে বসে, লেখাও খুব সহজ, দেখতেও আমার বিবেচনায় নীচস্থ উকারের চেয়ে অনেক ভাল। এ জিনিস ত আমাদের রয়েইছে, সর্ব্বত্র ব্যবহারের জন্য একমাত্র একেই নিলে ক্ষতি কি? পাই

ঊ। উকারের দ্বিত্ব ক'রে ঊকার, টানা লেখায় ইংরেজি *w*-এর মত একটানে লেখা হবে, পাচ্ছি

ঋ। বাংলায় ঋকারেরও দুই রূপ, এবং এর বেলাতেও, জানি না আমাদের স্বভাবের কোন বৈপরীত্যের বশে, যেটি সহজ এবং শোভন সেটির দিকে না তাকিয়ে অন্যটির আমরা বহুল ব্যবহার ক'রে থাকি। হৃ লিখতে আমরা যে ঋকার ব্যবহার করি তাকে কাজে লাগালে পাই

এবং ঋকারেরই দ্বিত্ব ক'রে ৠ, বাংলায় যার ব্যবহার প্রায় নেই।

এ। বাংলায় একার বসে বাঁয়ে, তার বসা উচিত ডাইনে। তার ঝোঁকটাকে বাঁদিকে ফিরিয়ে দিয়ে তাকে ডাইনে নিয়ে বসালে কাজ যে চলতে পারে না তা নয়; কিন্তু বাঁদিকে ঝোঁক, এমন জিনিস লিপিকারের লিখতে অসুবিধা। তাছাড়া আকার ঘেঁসা একারের মত দেখতে একটি ব্যাবৃত একারের আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, বর্তমান একারটিকে উল্টেপাল্টে সে প্রয়োজন মেটাবার মত কোনো যোগ্যতা তার মধ্যে খুঁজে পেলাম না। আমি তাই স্বয়ং এ-কেই একটু বদলে এবং ছোট ক'রে নিয়ে করতে চাই

টানা লেখায় এই একারের ঝোঁকটাকে বাঁদিক্ থেকে ডাইনে ঘুরিয়ে নিয়ে পরের অক্ষরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া চলবে, লেখা হবে

ব্যাবৃত এ, বা এ্যা। ব্যাবৃত একার বাস্তবিকই আকার ঘেঁসা একার। একারের নীচেটাকে আকারের মত ক'রে নামিয়ে এনে পাই

মনে করতে হবে ব্যাবৃত এ, এ-রই পৃথক্ বৈকল্পিক একটি রূপ, তাহলেই বানান-বিপর্যয় কিছু হবে না।

ঐ। অকারের সঙ্গে ইকার জুড়ে করতে চাই

ঐ আসলে কি জানি না, বাংলা চলতি-উচ্চারণে অ এবং ইর dipthongই ত বটে।

ও। চেহারার ধরণটা মোটামুটি ও-র কাছ থেকে ধার ক'রে পাই

টানা লেখায় হবে

ঔ। ওকারের সঙ্গে উকার জুড়ে বাংলা উচ্চারণে ঔ ও এবং উ-রই dipthong।

স্বরবর্ণমালার রূপ এবারে দাঁড়াচ্ছে :

শেষের dipthong বা যুগ্মস্বরদুটিকে নিয়ে মোট বারোটি। ছাপাখানায় টাইপ দরকার হবে দশটি, দীর্ঘ ঈকারের জন্যে একটি আলাদা টাইপ ধ'রে। দেখতে হবে যে এই দশটি টাইপে আমাদের স্বরবর্ণ-পর্যায়ের সমস্ত প্রয়োজন ত মিটছেই, অধিকন্তু একটি ব্যাবৃত এ এবং একটি ব্যাবৃত একার বেশী পাওয়া যাচ্ছে।

এবারে ব্যঞ্জনবর্ণের পালা।

একটি অকার সঙ্গে ক'রে ব্যঞ্জনবর্ণের এলাকায় এসে দেখি, কাজ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। কয়েকটি ছাড়া সমস্ত যুক্তাক্ষর বিদায় নেবার জন্য তৈরি হয়েই ব'সে আছে। অকার সঙ্গে আছে ব'লে, যে-বর্ণ স্বরান্ত নয় তাকেই হসন্ত বা হসন্তবৎ বর্ণ ব'লে চিনতে পারছি, সুতরাং হস্ চিহ্নেরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে, কেবল দিক্ বাক্ ইত্যাদি তৎসম শব্দের বানান ঠিক রাখবার জন্যে একে ধ'রে রাখতে হচ্ছে। রাখতে হলে একে নীচতলার থেকে মাঝতলায় তুলে আনতে হয়। অনুস্বারের প্রসঙ্গে এর কথা পরে আবার বলছি।

যে যুক্তাক্ষর কটির ছুটি ক'রে দেওয়া যাচ্ছে না তারা হচ্ছে ক্ষ, জ্ঞ আর ন্দ্র। কারণ, ক+ষ, জ+ঞ, ন+দ+র-এর যুক্তধ্বনির থেকে এদের উচ্চারণ স্বতন্ত্র। ছেলেবেলায় দেখেছি, বর্ণপরিচয়ের কোনো কোনো বইয়ে ব্যঞ্জনবর্ণমালার সঙ্গে ক্ষ অক্ষরটিকে জুড়ে দিয়ে তার সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয়

সাধিত হত, অন্য যুক্তবর্ণের থেকে তার এই স্বাতন্ত্র্য-বিধান খুবই সমীচীন ছিল ব'লে আমার মনে হয়। এই স্বাতন্ত্র্য জ্ঞ পূরোমাত্রায় এবং ন্দ্র কিছু পরিমাণে দাবী করতে পারে। ঞর অন্য-ব্যঞ্জন-নিরপেক্ষ ব্যবহার বাংলায় নেই ব'লে এবং জ্ঞ ভিন্ন অন্য সমস্ত যুক্তবর্ণে তার উচ্চারণ ন ব'লে, সেগুলিকে এই স্বাতন্ত্র্য দেওয়া যেতে পারে না।

প্রায় একই কারণে মফলা আর যফলা রেখে দিতে চাই। সবাই জানেন সংযুক্তবর্ণের শেষে ম-এর এবং কোথাও কোথাও য-এর উচ্চারণ-বৈকল্য ঘটে। যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত হচ্ছে, লিখব বাগমী কিন্তু পড়ব বাজ্ঞী, এতটা আশা করা শক্ত। কোনো সূত্র দিয়ে এর নিয়ম বাঁধা যাবে না, বাগমানা ঘোড়াকে কেউ যদি বাজ্ঞানা ঘোড়া পড়তে চায়, তাকে কি বলব? যফলার উচ্চারণ শব্দের গোড়ার দিকে এক রকম, শব্দের শেসে অন্যরকম। শব্দের মাঝখানকার উচ্চারণের আবার বাঁধাধরা কিছু নিয়ম নেই, যেমন প্রত্যয়, বিখ্যাত। অন্ততঃ নিয়ম কিছু থাকলেও তাকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। যফলা রেখেও বানানকে যে ধ্বনি-অনুসারী করতে পারব না তা অবশ্য এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তবু এটিকে রাখতে চাইছি এই কারণে যে বানান-সংস্কারকেরা পরে ইচ্ছা করলে অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে প্রয়োজন মত য় বা যফলা যোগ ক'রে উচ্চারণের তফাৎ বোঝাতে পারবেন। তখন হয়ত প্রত্যয় প্রত্যয়ই থাকবে, বিখ্যাত হবে বিখয়াত। সহ্য লিখতে যফলা এবং হ্যারিসন লিখতে য় ব্যবহার করা হবে।

মনে রাখতে হবে, যফলা ও মফলা যে বর্ণে যুক্ত হবে তার কোনো রূপান্তর ঘটবে না।

যে যুক্তিতে হস্ চিহ্নকে বাদ দিতে চাইছি সেই যুক্তিতে খণ্ড ত-কে ঝেড়ে ফেলা যায়। বাকী থাকে বর্গীয় বর্ণ ২৫টি আর য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়, ং, ঃ, ঁ। বর্গীয় বর্ণের কথায় পরে আসছি, অন্যগুলির আলোচনা শেষ ক'রে নিই।

য, র, ল। এদের নিয়ে গোলমাল কিছু নেই। রফলা এবং রেফ থাকবে না ব'লে নূতন লিপিতে রয়ের সাক্ষাৎ একটু বেশী ঘন ঘন পাওয়া যাবে। রেফকে রাখতে হলে মাথার উপর থেকে নামিয়ে বাঁদিক্ ঘেঁসে পাশে বসাতে হয়।

(অন্তস্থ) ব। বাংলায় এই ব-এর অন্য-ব্যঞ্জন নিরপেক্ষ উচ্চারণ বর্গীয় ব-এর উচ্চারণের সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু যুক্তবর্ণে এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ আছে, যেমন বিল্ব, বিশ্ব, শিবত্ব। যুক্তাক্ষর থাকছে না, সুতরাং এই স্বতন্ত্র উচ্চারণ নির্দ্দেশ করবার জন্য একটি স্বতন্ত্র অক্ষরের প্রয়োজন। অন্তস্থ ব হিসাবে ব-এর নীচে বাঁ দিক ঘেঁসে একটি হসন্তের মত চিহ্ন দেওয়া অক্ষর এখনও বাংলা অভিধান ইত্যাদিতে চলে, কিন্তু টানা লেখায় এটি লেখা শক্ত, তাই আমি এ কাজের জন্যে নিতে চাই

পেটকাটা ব ব'লে অন্যান্য অক্ষরের মধ্যে এই অক্ষরটিরও সঙ্গে ছেলেবেলায় আমাদের পরিচয় হয়েছিল মনে পড়ে, হঠাৎ কবে, কেন এবং কোথায় যে সে উবে গেল জানি না। অসমীয়াতে এই অক্ষরটি ৱ, তাতে আমাদের অসুবিধা কিছু নেই। কথা উঠতে পারে, সংযুক্ত বর্ণের অন্তর্গত অন্তস্থ বয়েরও ত বাংলায় উচ্চারণ-বৈকল্য ঘটে, আমরা লিখি বিল্ব, পড়ি বিল্ল; তাহলে মফলার মত বফলাও রেখে দিতে চাইছি না কেন। এই জন্য চাইছি না যে বাংলায় অন্য-ব্যঞ্জন নিরপেক্ষ অন্তস্থ বয়ের স্বতন্ত্র উচ্চারণই যখন নেই, তখন যুক্তবর্ণে তার উচ্চারণ-বৈকল্য ঘটে একথারও কোনো মানে থাকে না। কেবল মাত্র ব ফলার জায়গাতেই অন্তস্থ ব চলবে, অন্যত্র বানানে এবং উচ্চারণে বর্গীয় ব-এরই ব্যবহার বাহাল থাকবে।

শ, ষ, স। বাংলায় শ্রী শৃঙ্খলের শ-এর উচ্চারণ দন্ত্য ; বস্ত, স্থাপন, স্নানের অর্থাৎ দন্ত্যবর্ণের পরবর্তী স-এর উচ্চারণও দন্ত্য, অন্যত্র এদের উভয়েরই উচ্চারণ ষ-এর সঙ্গে অভিন্ন, অর্থাৎ শ-এর মত। সম্প্রতি স্টেশন, স্টাইল ইত্যাদিতে স-এর দন্ত্য উচ্চারণ চলছে, যদিও ইংরেজী ভাষার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই তাদের কাছে স্টেশন এবং ষ্টেশনে তফাৎ কিছুমাত্র নেই। আমি স এবং শ-এর গা ঘেঁসে একটি বিন্দুচিহ্ন স্থাপন ক'রে দন্ত্য উচ্চারণ নির্দ্দেশ করার পক্ষপাতী। মুছলিম না লিখে তাহলে স্বচ্ছন্দে মুস.লিম লেখা যাবে। বিন্দুচিহ্নটিকে আরও অনেক কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমন ইংরেজীর z-এর উচ্চারণ বোঝাতে জ., fool-এর f-এর উচ্চারণ বোঝাতে ফ.।

হ। সাধারণ ভাবে একে নিয়ে গোলমাল কিছু নেই, বর্গীয় বর্ণের প্রসঙ্গে এর সম্বন্ধে সামান্য কিছু যা আমার বক্তব্য আছে বলব।

ড়, ঢ়, য়। ড, ঢ এবং য এর গা ঘেঁসে ডানদিকে বিন্দুচিহ্নটিকে সরিয়ে আনলে তিনটি অক্ষরের সাশ্রয় হয়। অন্ততঃ টাইপ রাইটারে আমি তাই করবার পক্ষপাতী।

ং, ঃ, ঁ। তিনটিই থাকতে পারে, কেবল তিনজনের পদ-মর্যাদা সমান ক'রে দিতে চাই। মাথার উপর থেকে নেমে চন্দ্রবিন্দুকেও অনুস্বার বিসর্গের মত পাশে বসতে হবে। স্বরান্ত ব্যঞ্জনের মাথার উপরকার চন্দ্রবিন্দু স্বর-চিহ্নের পরে বসবে, অনুস্বার ও বিসর্গ যেমন বসে। খুব ভাল হয় যদি ° এই চিহ্নটিকে অনুস্বার রূপে ব্যবহার করা যায় এবং তার পাশে ছোট্ট একটি হস্ চিহ্ন জুড়ে চন্দ্রবিন্দু নিষ্পন্ন ক'রে নেওয়া হয়। আরও একটি অক্ষরের তাহলে সাশ্রয় হয়। হস্ চিহ্নটিকে তৎসম শব্দের যথাযথ বানান এবং অতি দ্রুত উচ্চারণ বোঝাবার কাজে লাগানো যেতে পারবে। যুক্ত বর্ণের প্রথম বর্ণ অনুনাসিক হলে সেই অনুনাসিক বর্ণের কাজও ° চিহ্নটি দিয়ে চলতে পারে যেমন অন্য কোনো কোনো ভারতবর্ষীর ভাষায় চলে। চন্দ্রবিন্দু দেখতে কতকটা এখনকার অনুস্বারের মত হয়ে যাবে, এবং তার নামটা বেমানান হবে, তা হোক্।

প্রস্তাবিত লিপিতে মোট ধ্বনিচিহ্নের সংখ্যা তাহলে দাঁড়াচ্ছে, স্বরবর্ণের জন্য দশটি, বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণ পঁচিশটি, অন্য ব্যঞ্জনবর্ণ দশটি, ক্ষ, জ্ঞ, দ্র এবং যফলা ও মফলা, এছাড়া একটি হস্ চিহ্ন এবং একটি বিন্দু, সর্ব্বসাকল্যে ৫২টি। ইংরেজী বর্ণমালার সংখ্যাও তাই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলা ধ্বনিচিহ্নের সংখ্যা ইংরেজীর সমান ক'রে নেবার জন্য লাটিন লিপি গ্রহণের চাইতে সহজ উপায় আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে।

যুক্তাক্ষর নির্মূল করবার কাজে যদি নামাই গেল তাহলে ছদ্মবেশী যুক্তাক্ষর বা যুক্তাক্ষরধর্মী অক্ষরগুলিকেও সেই সঙ্গে ছেঁটে ফেলতে পারলে মন্দ কি ? বর্গীয় মহাপ্রাণ বর্ণগুলি, অর্থাৎ খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ আর ভ এই পর্যায়ে পড়ে। এরা সব মহাপ্রাণধ্বনি, সুতরাং একটি মহাপ্রাণ-ধ্বনিচিহ্ন গ্রহণ করলে একটিকে দিয়ে দশটির কাজ চ'লে যেতে পারে।

চ-এর মহাপ্রাণ ছ। একটু ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চ-এর সঙ্গে হ-এর মত একটি চিহ্ন জুড়ে ছ নিষ্পন্ন হয়েছে। এই চিহ্নটি প্রায় স্পষ্টতঃ খ, ঘ, থ এবং ফ-এতেও আছে ; কেবল একটি দাঁড়ি যুক্ত হয়েছে তার সঙ্গে। বঙ্গীয়-লিপির যাঁরা স্রষ্টা, বর্গীয় মহাপ্রাণবর্ণগুলি গড়বার সময় তাঁদের মনে দাঁড়ি-যুক্ত বা দাঁড়ি-হীন হ-এর আকারের একটি হ-কার যে কোথাও ছিল, এ বিষয়ে আমার অন্ততঃ কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আমার প্রস্তাবিত হকার চিহ্ন গ্রহণ করলে মহাপ্রাণ বর্ণগুলির যে রূপ দাঁড়াবে তার দ্বারাও আমার এ

উক্তি সমর্থিত হবে। আমি হ-কার বা মহাপ্রাণ চিহ্ন ব'লে যে চিহ্নটিকে নিতে চাইছি তা এই দাঁড়ি-যুক্ত হ-এরই মতন দেখতে হবে— ʰ

এই চিহ্নের দ্বারা নিষ্পন্ন বর্গীয় মহাপ্রাণ বর্ণগুলির চেহারা তাহলে দাঁড়াবে এই রকম :

কʰ গʰ চʰ জʰ টʰ ডʰ তʰ
দʰ পʰ বʰ

কি এমন মন্দ দেখতে হচ্ছে? ক-এর গায়ে খ, গ-এর গায়ে ঘ তো স্পষ্টই রয়েছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ছটি কেবল একটি দাঁড়ি-সমন্বিত হয়েছে বলা যেতে পারে। ত-এর সঙ্গে আমার প্রস্তাবিত হ-কার যোগ ক'রে তারপর অনাবশ্যক বোধে ত-এর ল্যাজটা ছেঁটে দিয়ে বাংলা লিপির স্রষ্টারা থ গড়েছিলেন, আমাদের থ-এ ত-এর ল্যাজটা বজায় রইল।

মহাপ্রাণ চিহ্ন গ্রহণ করলে বাংলা বর্ণমালার মোট সংখ্যা ৫২ থেকে নেমে এসে ৪৩এ দাঁড়াবে।

আমার মনে হয়, এই মহাপ্রাণ চিহ্ন গ্রহণ করাই উচিত। যা-কিছু যুক্তি সঙ্গত তাই করাই বিধেয়, বিশেষতঃ লিপিসংস্কার যখন আমাদের করতেই হচ্ছে। খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ আর ভ বাস্তবিকই ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ, প আর ব-এর মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপ; একটি ধ্বনিচিহ্নের দ্বারাই যে এদের নিষ্পাদন সম্ভব সেকথা ত অস্বীকার করবার জো নেই? যে-কাজ একটি চিহ্নের দ্বারা চলতে পারে পারে তার জন্য দশটি কেন আমরা ব্যবহার করব?

আশা করি এ পর্য্যন্ত আমি যা বলেছি তাতে ঝগড়ার কথা কিছু নেই। Latin scriptএর সহায়তায় বাংলা লেখার প্রস্তাবও আমাদের কালে হয়েছে, আমি সে জায়গায় কয়েকটি অক্ষরের রূপান্তর চাইছি মাত্র। যে ধ্বনিচিহ্নগুলির সহায়তায় এই রূপান্তর সাধিত হবে তারা হচ্ছে

v এ া ও ʰ অর্থাৎ সংখ্যায় মোটে পাঁচটি। একমাত্র অকার ভিন্ন এদের কাউকেই যে মনগড়া বলা চলে না তা উপরে যথাযথ স্থানে বলেছি। এই পাঁচটি ধ্বনিচিহ্ন আয়ত্ত করতে ক'দিন বা ক' ঘণ্টা লাগবে? আমার প্রস্তাবিত একার, ব্যাবৃত একার এবং ওকার-কে একবার দেখে নিলে, বাংলা যারা জানে তারা অন্য কিছু ব'লে ভুল করবে না। আমার বিশ্বাস, বিশেষ কিছু আয়াস স্বীকার না ক'রেই লেখাপড়া জানা যে-কোনো বাঙালী পুরনো লিপি, নূতন লিপি দুই-ই অবলীলায় পড়তে পারবেন। আস্তে আস্তে পুরনো লিপি আমরা ভুলব, পুরনো সমস্ত বইয়ের নূতন লিপিতে ছাপা সংস্করণ এক সময়ে বাজারে পাওয়া যাবে। হয়তো আজ থেকে দশ বৎসর পরে শিশুদের জন্যে বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ ব'লে কিছু আর থাকবে না, ৪৩টি ধ্বনিচিহ্ন এবং ১০টি সংখ্যা-চিহ্ন আয়ত্ত করতে পারলেই তারা যে-কোনো বাংলা বই তুলে নিয়ে অনর্গল পড়তে পারবে।

লেখার অসুবিধা এতে বিন্দুমাত্রও বাড়বে না, অন্ততঃ গড়পড়তায় অসুবিধা অনেক কমবে তা জোর ক'রেই বলা যায়। আমি কিছুকাল ধ'রে যখন তখন এই লিপিতে যা মনে আসছে লিখে যাচ্ছি, কিছু

অসুবিধা বোধ ত করছিই না, লেখা সহজ হচ্ছে, দেখতেও ভাল লাগছে লেখাগুলোকে, সবচেয়ে বড় কথা যে বেশ বাংলার মতই দেখাচ্ছে।

লিপিকে যুগোপযোগী ক'রে নিতে হলে অদল-বদল কিছু করতেই হবে। প্রাচীন বাংলার পাণ্ডু-লিপি দেখলে বোঝা যাবে, এ রকম অদল-বদল একাধিকবার হয়েছে। কতগুলি পরিচিত চেহারার অক্ষরকে আর দেখতে পাব না, এটা যে-কোনো প্রিয়বিচ্ছেদের মতই প্রথমটা মনে লাগবে, ক্রমে সয়ে যাবে। আমার ধারণা অল্প দিনেই সয়ে যাবে। দেখতে হবে আমি কাউকেই ঠিক বাদ দিতে চাইছি না। স্বতন্ত্র স্বরবর্ণ এবং স্বরান্ত ব্যঞ্জনের সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনিচিহ্নের জন্য হ্রস্ব অক্ষরই রইল বলা যেতে পারে। বর্গীয় মহাপ্রাণ বর্ণগুলিও বর্ণমালায় স্বচ্ছন্দে নিজের নিজের স্থান দখল ক'রে থাকতে পারে, কেবল তাদের চেহারাটা যাবে বদলে। হকারান্ত ক-কে হকারান্ত ক না ব'লে সোজাসুজি খ বলতেও কিছুই বাধা নেই। যুক্তাক্ষরগুলি জড়াজড়ি ক'রে তালগোল না পাকিয়ে পাশাপাশি থাকলে যদি কাজ চ'লে যায় তাতে দুঃখ করবার কি আছে? উচ্ছল, বিহ্বল লিখতে চ ছ, এবং হ ব পাশাপাশি রেখে এখনও অনেকে লিখে থাকেন। যুক্তাক্ষর না থাকলে বাংলা লিপি বেশী জায়গা জুড়বে এ ভয়ের কারণ আছে বটে, কিন্তু যুক্তাক্ষরের ব্যবহার বাংলায় এত বেশী নয় যে সেটুকু জায়গা আমরা ছাড়তে পারব না। জায়গা বাস্তবিক জুড়বে অ-কার। কিন্তু অকারের জন্যে একটি ধ্বনিচিহ্ন নেই, আধুনিক যুগের লিপি হিসাবে বাংলার এটি অত্যন্ত বড় ত্রুটি, এ ত্রুটির প্রতিকার করতেই হবে, সেজন্য দরকার হলে নিজেদের খানিকটা অসুবিধা আমরা করব। কিন্তু অকার যেটুকু জায়গা জুড়বে তার চেয়ে বেশী জায়গা আমাদের বাঁচবে, আমার প্রস্তাবিত লিপি তিন থাকের বদলে দুই থাকে লেখা হবে ব'লে।

বানানের তর্ক তুলব না বলেছিলাম, কিন্তু এটুকু বলতে বাধা নেই যে আমার প্রস্তাবিত লিপি গৃহীত হলে বানান-সংস্কারকের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। অক্ষর-সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে বানান-সংস্কারের আর প্রয়োজন থাকবে না, অকারান্ত শব্দের হসন্তবৎ এবং প্রকৃত উচ্চারণের তফাৎ বোঝাবার জন্য স্থানে অস্থানে হস্ চিহ্ন বা ওকার ব্যবহার করতে হবে না, কই এবং কৈ-এর দ্বন্দ্ব মিটবে, অন্যকে অন্ন না ক'রেও তার ঠিক উচ্চারণটি বোঝানো যাবে, পদ্মকে পদ্দঁ লিখতে হবে না জানলে কে না খুশী হবে?

আমার প্রস্তাব গৃহীত হলে ছাপাখানার মালিকদের এক পয়সা খরচ হবে না, ৭টি বা উর্ধ্বপক্ষে ৯টি নূতন টাইপ ঢালাই করাতে যা খরচ হবে, বর্জিত অক্ষরগুলির টাইপ ওজনদরে বিক্রি ক'রে তার চেয়ে ঢের বেশী তাঁরা পাবেন। টাইপরাইটার, লাইনো-টাইপে বাংলা ছাপার কাজ ইংরেজীরই মত সহজ হবে। বিন্দুচিহ্নিত ড, ঢ, য, শ, স-এর স্বতন্ত্র টাইপ রাখলেও বাংলার অক্ষর-সংখ্যা হবে ৪৮, অর্থাৎ ইংরেজীর চেয়ে ৪টি কম, ইংরেজীর যুক্তস্বর বা dipthong দুটি-দুটি চারটিকে হিসাবে না ধ'রেই।

পরিশেষে বক্তব্য, বাংলা লিপিকে আমার এই প্রস্তাবের অনুবর্তী কোনো-একটি পথে কোনো-না-কোনো দিন চলতেই হবে। বানান-সমস্যা নিয়ে মানুষের এক রকম ক'রে চ'লে যায়, কিন্তু আমাদের আজকের দিনের এই লিপি-সমস্যা নিয়ে সভ্য জগতে এবং কাজের জগতে বরাবরই আমাদের খুঁড়িয়ে চলতে হবে। চিরকালই কি ইংরেজীর লাঠি ভর ক'রে চলব? একটি প্রবন্ধে যতটা আভাস দেওয়া সম্ভব তার চেয়ে ঢের বেশীদিক্ ভেবে এবং বিচার ক'রে নূতন লিপিপদ্ধতির এই খসড়াটিকে সুধীজনের সম্মুখে আমি উপস্থিত করছি, ত্রুটি যা আছে সহজেই তাঁরা তা শুধরে নিতে পারবেন। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, একে চলতে দিলেই এ লিপি বেশ স্বচ্ছন্দে চলবে এবং কেউ কোনো অসুবিধা বোধ করবেন না। যদি সর্বত্র একে

চলতে দিতে আমার দেশবাসীদের কোনো কারণে এখনই মন না ওঠে, অন্ততঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ লিপি আপাততঃ চলুক। অবলীলায় পড়তে পারা এবং লিখতে পারার জন্য এ লিপি আয়ত্ত করা মাত্র কয়েক দিনের অভ্যাসের কাজ। বিকল্পে সাধু ও চলতি দুটি-ভাষা এখন বাংলা দেশে চলছে, ভারতের একাধিক প্রদেশে বিকল্পে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের লিপির প্রচলন রয়েছে, আমাদের লিপিতে বিকল্পে পাঁচটি মাত্র ধ্বনিচিহ্নকে চলতে দেওয়া হোক। খুব বেশী জুলুম হবে যদি মনে হয়, হকার জুড়ে বর্গীয় মহাপ্রাণ বর্ণ-গুলির নিষ্পত্তি না হয় নাই হ'ল। চারটি মাত্র নূতন ধ্বনিচিহ্ন গ্রহণ করলেই তাহলে আমাদের চ'লে যাবে।

আলোচনা

সংস্কৃত সাহিত্য ও চিত্রকলার আদর্শ

বিশ্বভারতী পত্রিকায় (কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫০) প্রকাশিত শ্রীযুত নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় লিখিত "গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী" নামক প্রবন্ধটি নানা কারণে খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছে। এতে লেখক যে পরিমাণ অনুসন্ধিৎসা, পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই তৃপ্তিদায়ক। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের উৎকর্ষ প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি যে যুক্তিতর্ক ও আলোচনাপদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা খুব নির্ভুল মনে হয় না। উপস্থিত মন্তব্যে শুধু এটুকুই দেখাতে চাই যে, তিনি তাঁর প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে যে প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করেছেন সেগুলি খুব নির্ভুল, অন্তত নিঃসন্দিগ্ধভাবে, প্রযুক্ত হয় নি।

চিত্রবিশেষ দেখে যে দ্রষ্টার মন পর্যাকুল হয়, তার প্রাচীন নজীর দেখাতে গিয়ে প্রবন্ধলেখক কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' থেকে নিম্নোক্ত কবিতাংশটি উদ্ধৃত করেছেন (পৃ. ১৯১) :

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্।
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ ॥

লেখক এমনভাবে উপর্যুক্ত স্থলটি নিজ প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করেছেন যাতে পাঠকদের মনে হতে পারে যে, দুষ্মন্ত কোনো ছবি দেখেই হয়ত চরণ ক'টি আবৃত্তি করেছিলেন ; বাস্তবিক তা নয়, হংসপদিকার গান শুনেই রাজা কথাগুলি বলেছিলেন। যাক্, এ ভুল হয়ত ততটা মারাত্মক নয়। রাজার পর্যাকুলতাকে যে লেখক একটা রসগত ব্যাপার বা æsthetic phenomenon বলে ধরে নিয়েছেন, তা নির্ভুল নয়। উদ্ধৃত কবিতায় কালিদাসের ব্যবহৃত "জন্তু" শব্দটি বেশ অর্থপূর্ণ। এখানে মানুষের চরিত্রের জন্তুধর্ম বা biological aspectই উপলক্ষিত হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে। এরূপ জন্তুধর্ম, সাপের বা হরিণের আত্মবিস্মৃত ভাবে বাঁশির সুর শোনার বেলায় প্রকাশ পায়। কাজেই, বর্তমান চিত্রসমালোচনার প্রসঙ্গে উক্ত কবিতাটির উল্লেখ আশানুরূপ সমুচিত (appropriate) হয়েছে কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ।

যাক্, এ ত্রুটিও হয়ত উপেক্ষার যোগ্য, কিন্তু 'পটের উপর বাস্তব বস্তুর ভ্রম জন্মাইবার চেষ্টা না করিয়া চিত্রকলা সম্ভব' এই থিয়োরিটিকে অপ্রমাণ করবার জন্যে লেখক অভিজ্ঞান-শকুন্তলের বিদূষকের উক্তির যে নজীর তুলেছেন (পৃ. ১৯৪) সেটা আদৌ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

(১) সংস্কৃত নাটকের বিদূষক একটি প্রথা-নিয়ন্ত্রিত (conventional) চরিত্র। অলংকারশাস্ত্রমতে তার লক্ষণ :

কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্মবপুবেশভাষাদ্যৈঃ।
হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাৎস্বকর্মজ্ঞঃ॥ —সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ

এ লক্ষণ থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে হাস্য সৃষ্টি করাই বিদূষকের মুখ্য কাজ। অতএব কালিদাস যে একে রাজার চিত্রের সমজ্‌দার হিসাবে দাঁড় করাবেন তা একটু অসম্ভব বলে মনে হয়[১]। বিদূষক যা বলেছেন সেটাকে ফাঁকা প্রশংসা (empty compliment) মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। বিদূষকের মতো রাজানুগ্রহজীবীর পক্ষে এরূপ compliment দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। উদ্ধৃত বিদূষকের উক্তির পরেই অভিজ্ঞান-শকুন্তলে আছে সানুমতীর উক্তি। তিনি বলছেন : অহো, রাজর্ষির কী নিপুণতা! মনে হচ্ছে সখী আমার সামনেই আছেন (অম্মো রাত্রসিণো নিউণদা। জাণে সহী অগ্‌গদো মে বট্টদি-ত্তি)।

সানুমতী যে এ নাটকের আগের কোনো দৃশ্যে কখনো শকুন্তলাকে কোনো উপায়ে দেখেছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই। তবে তিনি কী করে জানতে পারলেন যে, সখী অর্থাৎ সপত্নী শকুন্তলার চেহারার সঙ্গে রাজার আঁকা নারী-চিত্রের খুব মিল আছে? সানুমতী যদি শকুন্তলাকে কখনো না দেখে থাকেন তবে তাঁর উক্তিকে ফাঁকা প্রশংসা ছাড়া আর কি বলতে পারা যায়? রাজার মুখে কালিদাস সানুমতীর প্রশংসার যে উত্তর বসিয়েছেন তাতেও আমাদের সন্দেহ দৃঢ় হয়। রাজা বললেন, চিত্রে যা যা ভালো করে করা যায় না সে সকলকে অন্য রকম করে করা হয়। তবু, রেখা দ্বারা তাঁর লাবণ্যের কিছু অনুসরণ করা গিয়েছে।

যদ্‌ যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা।
তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্‌॥

সেকালকার চিত্রের সামর্থ্যসীমা কালিদাসের জানা ছিল অর্থাৎ তিনি নিশ্চয় জানতেন যে কোনো ব্যক্তির স্বরূপচিত্র (portrait) যতই উত্তম হোক্ না কেন তার অবিকল চেহারা হতে পারে না; তাই রাজাকে দিয়ে সানুমতীর প্রশংসার প্রতিবাদ করিয়েছেন। অবশ্য সানুমতী রাজার প্রতিবাদকে স্নেহ ও সৌজন্যের প্রকাশ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। এসবের জন্যে বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লিখিত স্থলটির প্রামাণ্য অনেক কমে গিয়েছে।

(২) রাজার আঁকা ছবি প্রসঙ্গে, বিদূষকের যে চিত্র দেখার জ্ঞান কালিদাস দেখিয়েছেন তাতেও আমাদের আশঙ্কা সত্য বলে মনে হয়। যেমন, বিদূষক যখন সখিদ্বয় সহ শকুন্তলার ছবি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "এদের মধ্যে তত্রভবতী শকুন্তলা কোনটি (কদমা এত্থ তত্তহোদী সউন্দলা)?" তখন সানুমতী বললেন "যে লোক এমন রূপ দেখেও চিনতে পারে না তার দৃষ্টি বৃথা (অণভিণ্ণো কৃখু এরিসস্‌স রূবস্‌স মোহদিট্‌ঠী অয়ং জণো)।" বিদূষককে সানুমতীর এরূপ প্রশংসাদানের পর তার সমজ্‌দারিতার উপর বিশ্বাস রাখা শক্ত হয়।

(৩) বিদূষকের জিজ্ঞাসার উত্তরে রাজা যখন বললেন, 'তিনটির মধ্যে কোনটিকে তুমি শকুন্তলা বলে মনে করছ', তখন বিদূষক শকুন্তলার যে বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটি কথা আছে যে, অন্য লক্ষণের

১। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র কোনো কোনো পাঠে বিদূষকের উদ্ধৃত উক্তিটি অন্যরূপে পাওয়া যায় (Pischel কৃত প্রথম সংস্করণ ও Monier Williams কৃত সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। এতে সন্দেহ বিশেষ দৃঢ় হয়।

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

মধ্যাহ্ন : লিনো প্রিণ্ট

শহরের রাস্তা

শ্রীনন্দলাল বসু

সঙ্গে শকুন্তলার "মুখের উদ্‌গত স্বেদবিন্দু দেখেও" (উব্‌ভিন্নসেঅবিন্দুণা বঅণেণ) তিনি তাকে চিনতে পেরেছেন। হঠাৎ মনে হতে পারে, রাজার চিত্রাঙ্কনে এমন নিপুণতা ছিল যে তিনি মুখের ঘামটুকুও আঁকতে পেরেছিলেন ; কিন্তু রাজার পরবর্তী কথা থেকে জানতে পারা যায় যে, বিদূষক যাকে ঘাম বলে মনে করেছেন তা হচ্ছে চিত্রস্থ শকুন্তলার গণ্ডদেশের উপর পতিত বিরহতাপিত রাজার নয়নভ্রষ্ট অশ্রুবিন্দুর দাগমাত্র। চিত্র দর্শনে এমন সুপটু বিদূষকের সঙ্গে চিত্রকলার সমালোচক ও ইতিহাসজ্ঞ Vasaria তুলনা খুবই অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্যজনক।

(৪) বিদূষক যখন শকুন্তলার চিত্র দেখে বললেন যে "এ বেটা মধুকর…তত্রভবতীর মুখের দিকে ছুটচে" (এস দাসীএ পুত্তো…অত্তহোদীএ বঅণং অহিলঙ্ঘদি মহুঅরো) তখন রাজা উত্তর দিয়েছেন বটে "এ ধৃষ্টকে বাধা দাও" (বার্যতাম্ এষ ধৃষ্টঃ), কিন্তু তার থেকে এই প্রমাণ হয় না যে, রাজার চিত্রে বাস্তবতার ভ্রম উপস্থিত হবার কারণ ছিল। প্রবন্ধ লেখক যদি রাজার ও বিদূষকের পরবর্তী উক্তিগুলি ভালো করে পড়তেন তবে তিনি এ ভুল করতেন না। যেহেতু রাজা সজ্ঞানে ভ্রমরকে বাধা দেওয়ার কথাটি বলেন নি। কারণ কিছু পরে রাজার উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বিরহব্যথায় আত্মহারা হয়েই বিদূষকের উক্তিকে সত্য বলে মনে করেছেন, কথাটা যে চিত্রদর্শন প্রসঙ্গে হচ্ছিল তিনি তা ভুলেই গিয়েছিলেন।

(৫) উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলির পরে প্রবন্ধকার লিখেছেন, "শুধু একটি নয়, চিত্র বাস্তবেরই ভ্রম— এই ধারণা সূচনা করে এরূপ বহু প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত করা যায়। নাটকের মধ্যে মালবিকাগ্নিমিত্র, রত্নাবলী, নাগানন্দ, মালতীমাধব, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, কর্পূরমঞ্জরী ও অন্যত্র চিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। সর্বত্রই চিত্র সম্বন্ধে বক্তব্য ও মনোভাব এক— চিত্র বাস্তবজগতের প্রতিচ্ছবি।"

লেখক হয়ত বাহুল্যভয়ে উল্লিখিত বইগুলি থেকে তাঁর প্রমাণস্থলগুলি উদ্ধার করার চেষ্টা করেন নি। করলে খুব ভাল করতেন। তাতে তাঁর ভুলের পরিমাণ কিছু কম হত। তিনি দেখতে পেতেন যে 'কর্পূরমঞ্জরী'তে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত চিত্র সম্পর্কিত উল্লেখ মোটেই নেই। অন্যান্য নাটকে চিত্র সম্বন্ধে যে সকল প্রসঙ্গ আছে তাদের দ্বারা প্রবন্ধলেখকের মত সমর্থন লাভ করে কিনা তাতে ঘোর সন্দেহ। প্রাচীন ভারতীয় নাট্য, বা অভিনয়কলার প্রয়োগে বাস্তবানুসরণের (realism) ক্ষেত্র কত সংকীর্ণ তা যদি তিনি জানতেন তবে এরূপ প্রমাণ উল্লেখ করতে গিয়ে সতর্ক হতেন। যাঁরা এ বিষয় বিস্তারিত জানতে চান তাঁরা Calcutta Sanskrit Series এ প্রকাশিত "অভিনয়দর্পণ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী ভূমিকা pp. xxi-xxviii পড়ে দেখতে পারেন। কোনো কোনো সংস্কৃত নাটকে, যেমন 'বিক্রমোর্বশী'তে, হঠাৎ পাত্রপাত্রীদের কারো কারো আকাশে উঠে পড়বার কথা আছে ; সেগুলিকে বাস্তব ঘটনা বলে ধরে নেওয়া গেলে, এরোপ্লেন আবিষ্কর্তার গৌরব অনেকটা ম্লান হতে পারে বটে, তবে সে সঙ্গে আমাদের বুদ্ধিমত্তার গৌরবও উজ্জ্বলতা হারাবে। কাজেই সংস্কৃত নাটকে উল্লিখিত কোনো বিষয়কে, কোনো 'থিয়োরি'র প্রমাণ বলে গণ্য করবার আগে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রবন্ধলেখক যে বলেছেন, (সংস্কৃত সাহিত্যে) "সর্বত্রই চিত্র সম্বন্ধে বক্তব্য ও মনোভাব এক— চিত্র বাস্তবজগতের প্রতিচ্ছবি" (পৃ. ১৯৪), একথা মোটেই সত্য নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের একাধিক স্থলে এমন কথা আছে যা প্রবন্ধলেখকের উক্তির সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ উৎপাদন করে। তারই দুয়েকটি এখানে উল্লেখ করব।

যার অবলম্বনে চিত্র আঁকা হয় সে বস্তুর সঙ্গে চিত্রের কতখানি সম্পর্ক থাকা উচিত সে সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের শিল্পীদের মত পাওয়া যায় 'কামসূত্রে'র যশোধরকৃত টীকায় উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটি থেকে—

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্। সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥

এ শ্লোক থেকে আমরা জানতে পারি যে চিত্রের ছয়টি অঙ্গের মধ্যে 'সাদৃশ্য'ও একটি অঙ্গ। এর মোটামুটি অর্থ এই যে, কোনো বস্তু ও তার চিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য না থাকলে তা অঙ্গহীন বিবেচিত হবে। এখন জিজ্ঞাস্য 'সাদৃশ্য' শব্দের অর্থ কি? আপ্তের সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান থেকে এর প্রাথমিক অর্থ পাওয়া যায় likeness, resemblance, similarity। কোনো বস্তুর চিত্র সে বস্তুর যতখানিই অনুরূপ হোক্ না কেন, বস্তু ও চিত্রের মধ্যে পুরোপুরি মিল থাকা কোনো মতেই সম্ভবপর নয় অর্থাৎ এ উভয় কখনো identical বা সর্বৈব সমান হতে পারে না। কাজেই 'সাদৃশ্য' শব্দ দ্বারা বস্তু ও তার চিত্রের মধ্যে কতখানি সাম্য বুঝতে হবে সে তথ্যটি অভিধান থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল না। কিন্তু অভিধানের অসম্পূর্ণতার জন্যে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা গ্রন্থে সাদৃশ্য কথার প্রয়োগ আছে। সে সকল থেকে এর যথার্থ মানে বুঝবার সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভবে' অন্যূন পাঁচবার 'সাদৃশ্য' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তাঁর দুটি ব্যবহারের এখানে আলোচনা করব। কুমারসম্ভবের পঞ্চম সর্গে আছে—

য উৎপলাক্ষি প্রচলৈর্বিলোচনৈস্তবাক্ষিসাদৃশ্যমিব প্রযুজ্যতে (৩৫)। হে পদ্মনয়নে, যারা তাদের চঞ্চল চক্ষুগুলির দ্বারা তোমার চক্ষুসাদৃশ্য অভিনয় করে।

এখানে পাওয়া যাচ্ছে হরিণের চোখ ও পার্বতীর চোখের সাদৃশ্য। এ সাদৃশ্য যে বস্তুদ্বয়ের সর্বৈব সাম্য নয় (যে সাম্যদ্বারা এক বস্তুতে আর এক বস্তুর ভ্রম হতে পারে) তা বোধ হয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। রঘুবংশের পঞ্চদশ সর্গে আছে—

বয়োবেষবিসংবাদী রামস্য চ তয়োস্তদা। জনতা প্রেক্ষ্য সাদৃশ্যং নাক্ষিকম্পং ব্যতিষ্ঠত॥ ৬৭॥

বয়স ও বেশের মিল নেই [অথচ] রামের ও তাদের দুজনের [কুশীলবের] মধ্যে সাদৃশ্য আছে দেখে, জনগণের নেত্রে পলক রইল না।

এস্থলটি থেকে বোধ হয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, সর্বাংশে সাম্য না থাকলেও, অর্থাৎ দুটি বস্তুর মধ্যে আংশিক ঐক্য থাকলেও তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলা যায়। কারণ বাপ ও ছেলের মধ্যে যে সাদৃশ্য থাকতে পারে তা কখনো সর্বাংশে সাম্য হতে পারে না। অর্থাৎ, এদের একজনকে দেখে অপর জন বলে কেউ ভুল করতে পারে না। এস্থলে স্মরণ করা উচিত যে, সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে যে উপমার প্রসঙ্গ আছে তারও অবলম্বন আংশিক সাম্য; আর এ আংশিক সাম্যকেই সেখানে বলা হয়েছে 'সাদৃশ্য'। কালিদাসের উল্লিখিত ব্যবহার দুটি থেকে চিত্র সম্পর্কিত সাদৃশ্য কথার মানে যদি পরিষ্কার না হয়ে থাকে, তবে মেঘদূতে সাদৃশ্য শব্দের একটি ব্যবহারও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে উত্তরমেঘে যক্ষ মেঘকে বলছেন যে, তুমি আমার প্রিয়াকে দেখবে যিনি—

মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী। বিরহকৃশ আমাকে কল্পনা করে [আমার] প্রতিকৃতি আঁকতে রত।

স্মৃতি থেকে কোনো ব্যক্তির অবিকল ছবি আঁকার কথা একালেও শোনা যায় না। তখনকার দিনে (অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বছর আগে কালিদাসের কালে) যে এরূপ ব্যাপার সম্ভবপর ছিল তা মনে হয় না। কাজেই মেঘদূতের উল্লিখিত প্রয়োগ থেকে 'সাদৃশ্য' কথার মানে পাওয়া যাচ্ছে, রূপগত আংশিক সাম্য অর্থাৎ তন্মূলক প্রতিকৃতি এরূপ প্রতিকৃতিকে বস্তুর এমন অনুকৃতি মনে করা যায় কি, যে-অনুকৃতি দেখলে তাতে আসল বস্তুটির ভ্রম হবে?

নাটক ছাড়া অন্যান্য সংস্কৃতগ্রন্থ থেকে তাঁর মতবাদের পোষক মনে করে লেখক যে কয়েকটি বচন স্বীয় প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন তাদের মানে বুঝবার সময়েও উপরে আলোচিত 'সাদৃশ্য' শব্দের কথা মনে রাখতে হবে; তবেই তাদের আসল অর্থ বোঝা যেতে পারে। **শ্রীমনোমোহন ঘোষ**

সন্ধ্যাতারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিন যায়, আঁধার হয়ে আসে।
সঙ্গীহারা সন্ধ্যাতারার ছায়া
নামে আমার অতল দিঘির কালো জলে—
নেবে না, ডোবে না ;
ঢেউ দিই, যায় না স'রে।
জ্বলতে থাকে—
যেন ব্যর্থ আশায় তাকিয়ে থাকাটা
নিত্য হয়ে রইল,
যেন একটি সন্ধ্যার
অনন্ত বিরহজ্বালা।

[শান্তিনিকেতন
ফাল্গুন, ১৩৪২]

রেখাচিত্র
শ্রীনন্দলাল বসু

নন্দলাল বসু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

…চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর নাম আমাদের দেশের অনেকেরই জানা আছে। নিঃসন্দেহ আপন আপন রুচি মেজাজ শিক্ষা ও প্রথাগত অভ্যাস অনুসারে তাঁর ছবির বিচার অনেকে অনেক রকম করে থাকেন। এরকম ক্ষেত্রে মতের ঐক্য কখনো সত্য হতে পারে না, বস্তুত প্রতিকূলতাই অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠতার প্রমাণরূপে দাঁড়ায়। কিন্তু নিকটে থেকে নানা অবস্থায় মানুষটিকে ভালো করে জানবার সুযোগ আমি পেয়েছি। এই সুযোগে যে-মানুষটি ছবি আঁকেন তাঁকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর ছবিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছি। এই শ্রদ্ধায় যে দৃষ্টিকে শক্তি দেয় সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের গভীরে প্রবেশ করে।

নন্দলালকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন চীনে জাপানে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার ইংরেজ বন্ধু এল্‌ম্‌হর্‌স্‌ট। তিনি বলেছিলেন, নন্দলালের সঙ্গ একটা এডুকেশন। তাঁর সেই কথাটি একেবারেই যথার্থ। নন্দলালের শিল্পদৃষ্টি অত্যন্ত খাঁটি, তাঁর বিচারশক্তি অন্তর্‌দর্শী। একদল লোক আছে আর্টকে যারা কৃত্রিম শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করে দেখতে না পারলে দিশেহারা হয়ে যায়। এই রকম করে দেখা খোঁড়া মানুষের লাঠি ধরে চলার মতো, একটা বাঁধা বাহ্য আদর্শের উপর ভর দিয়ে নজির মিলিয়ে বিচার করা। এই রকমের যাচাই-প্রণালী ম্যুজিয়ম সাজানোর কাজে লাগে। যে জিনিস মরে গেছে তার সীমা পাওয়া যায়, তার সমস্ত পরিচয়কে নিঃশেষে সংগ্রহ করা সহজ, তাই বিশেষ ছাপ মেরে তাকে কোঠায় বিভক্ত করা চলে। কিন্তু যে আর্ট অতীত ইতিহাসের স্মৃতিভাণ্ডারের নিশ্চল পদার্থ নয়, সজীব বর্তমানের সঙ্গে যার নাড়ীর সম্বন্ধ, তার প্রবণতা ভবিষ্যতের দিকে; সে চলছে, সে এগোচ্ছে, তার সম্ভূতির শেষ হয় নি, তার সত্তার পাকা দলিলে অন্তিম সাক্ষর পড়ে নি। আর্টের রাজ্যে যারা সনাতনীর দল তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে জীবিতের জন্যে শ্রেণীবিভাগের বাতায়নহীন কবর তৈরি করে। নন্দলাল সে জাতের লোক নন, আর্ট তাঁর পক্ষে সজীব পদার্থ। তাকে তিনি স্পর্শ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে দরদ দিয়ে জানেন; সেই জন্যই তাঁর সঙ্গ এডুকেশন। যারা ছাত্ররূপে তাঁর কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছে তাদের আমি ভাগ্যবান বলে মনে করি,—তাঁর এমন কোনো ছাত্র নেই এ কথা যে না অনুভব করেছে এবং স্বীকার না করে। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর নিজের গুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণা আপন স্বভাব থেকেই পেয়েছেন সহজে। ছাত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাইরের কোনো সনাতন ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা তিনি কখনোই করেন না; সেই শক্তিকে তার নিজের পথে তিনি মুক্তি দিতে চান এবং তাতে তিনি কৃতকার্য হন যেহেতু তাঁর নিজের মধ্যেই সেই মুক্তি আছে।

কিছুদিন হল, বোম্বায়ে নন্দলাল তাঁর বর্তমান ছাত্রদের একটি প্রদর্শনী খুলেছিলেন। সকলেই জানেন, সেখানে একটি স্কুল অফ আর্ট্‌স আছে, এবং এ কথাও বোধ হয় অনেকের জানা আছে, সেই স্কুলের অনুবর্তীরা আমাদের এদিককার ছবির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে লেখালেখি করে আসছেন। তাঁদের নালিশ এই যে, আমাদের শিল্পসৃষ্টিতে আমরা একটা পুরাতন চালের ভঙ্গিমা সৃষ্টি করেছি, সে কেবল সস্তায়

চোখ ভোলাবার ফন্দি, বাস্তব সংসারের প্রাণবৈচিত্র্য তার মধ্যে নেই। আমরা কাগজে পত্রে কোনো প্রতিবাদ করিনি— ছবিগুলি দেখানো হল। এতদিন যা বলে তাঁরা বিদ্রূপ করে এসেছেন, প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রমাণ। দেখলেন বিচিত্র ছবি, তাতে বিচিত্র চিত্তের প্রকাশ বিচিত্র হাতের ছাঁদে; তাতে না আছে সাবেক কালের নকল, না আছে আধুনিকের; তা ছাড়া কোনো ছবিতেই চলতি বাজারদরের প্রতি লক্ষ্য মাত্র নেই।

যে নদীতে স্রোত অল্প সে জড়ো করে তোলে শৈবালদামের ব্যূহ, তার সামনের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। তেমন শিল্পী সাহিত্যিক অনেক আছে যারা আপন অভ্যাস এবং মুদ্রাভঙ্গীর দ্বারা আপন অচল সীমা রচনা ক'রে তোলে। তাদের কর্মে প্রশংসাযোগ্য গুণ থাকতে পারে কিন্তু সে আর বাঁক ফেরে না, এগোতে চায় না, ক্রমাগত আপনারই নকল আপনি করতে থাকে, নিজেরই কৃতকর্ম থেকে তার নিরন্তর নিজের চুরি চলে।

আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড়ত্ব দ্বারা এই সীমাবন্ধন নন্দলাল কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না, আমি তা জানি। আপনার মধ্যে তাঁর এই বিদ্রোহ কতদিন দেখে আসছি। সর্বত্রই এই বিদ্রোহ সৃষ্টিশক্তির অন্তর্গত। যথার্থ সৃষ্টি বাঁধা রাস্তায় চলে না, প্রলয়শক্তি কেবলই তার পথ তৈরি করতে থাকে। সৃষ্টিকার্যে জীবনী শক্তির এই অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ। কোনো একটা আড্ডায় পৌঁছে আর চলবেন না, কেবল কেদারায় বসে পা দোলাবেন, তাঁর ভাগ্যলিপিতে তা লেখে না। যদি তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভবপর হত তা'হলে বাজারে তাঁর পসার জমে উঠত। যারা বাঁধা খরিদদার তাদের বিচারবুদ্ধি অচল শক্তির খুঁটিতে বাঁধা। তাদের দরযাচাই-প্রণালী অভ্যস্ত আদর্শ মিলিয়ে। সেই আদর্শের বাইরে নিজের রুচিকে ছাড়া দিতে তারা ভয় পায়, তাদের ভালো লাগার পরিমাণ জনশ্রুতির পরিমাণের অনুসারী। আর্টিস্‌টের কাজ সম্বন্ধে জনসাধারণের ভালো লাগার অভ্যাস জমে উঠতে সময় লাগে। একবার জমে উঠলে সেই ধারার অনুবর্তন করলে আর্টিস্‌টের আপদ থাকে না। কিন্তু যে আত্মবিদ্রোহী শিল্পী আপন তুলির অভ্যাসকে ক্ষণে ক্ষণে ভাঙতে থাকে, আর যাই হোক্, হাটে বাজারে তাকে বারে বারে ঠকতে হবে। তা হোক্, বাজারে ঠকা ভালো, নিজেকে ঠকানো তো ভালো নয়। আমি নিশ্চিত জানি, নন্দলাল সেই নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা করেন, তাতে তাঁর লোকসান যদি হয় তো হোক্। অমুক বই বা অমুক ছবি পর্যন্ত লেখক বা শিল্পীর উৎকর্ষের সীমা— বাজারে এমন জনরব মাঝে মাঝে ওঠে, অনেক সময়ে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে লোকের অভ্যস্ত বরাদ্দে বিঘ্ন ঘটেছে। সাধারণের অভ্যাসের বাঁধা জোগানদার হবার লোভ সামলাতে না পারলে সেই লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর যাই হোক, সেই পাপলোভের আশঙ্কা নন্দলালের একেবারেই নেই। তাঁর লেখনী নিজের অতীত কালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রিণী। বিশ্বসৃষ্টির যাত্রাপথ তো সেই দিকেই; তার অভিসার অন্তহীনের আহ্বানে।

আর্টিস্‌টের স্বকীয় আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর চরিত্রে, তাঁর জীবনে। আমরা বারম্বার তার প্রমাণ পেয়ে থাকি নন্দলালের স্বভাবে। প্রথম দেখতে পাই আর্টের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ নির্লোভ নিষ্ঠা। বিষয়বুদ্ধির দিকে যদি তাঁর আকাঙ্ক্ষার দৌড় থাকত, তা হলে সেই পথে অবস্থার উন্নতি হবার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সাঁচ্চাদাম-যাচাইয়ের পরীক্ষক ইন্দ্রদেব শিল্পসাধকদের তপস্যার সম্মুখে রজত-নূপুরনিক্কণের মোহজাল বিস্তার করে থাকেন, সরস্বতীর প্রসাদস্পর্শ সেই লোভ থেকে রক্ষা করে, দেবী অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে সার্থকতার মুক্তিবর দেন। সেই মুক্তিলোকে বিরাজ করেন নন্দলাল, তাঁর ভয় নেই।

তাঁর স্বাভাবিক আভিজাত্যের আর একটি লক্ষণ দেখা যায়, সে তাঁর অবিচলিত ধৈর্য। বন্ধুর মুখের অন্যায় নিন্দাতেও তাঁর প্রসন্নতা ক্ষুণ্ণ হয়নি, তার দৃষ্টান্ত দেখেছি। যারা তাঁকে জানে এমনতরো ঘটনায় তারা দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু তিনি অতি সহজেই ক্ষমা করতে পেরেছেন। এতে তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করে। তাঁর মন গরিব নয়। তাঁর সমব্যবসায়ী কারো প্রতি ঈর্ষার আভাস মাত্র তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পায়নি। যাকে যার দেয় সেটি চুকিয়ে দিতে গেলে নিজের যশে কম পড়বার আশঙ্কা কোনোদিন তাঁকে ছোটো হতে দেয় নি। নিজের সম্বন্ধে ও পরের সম্বন্ধে তিনি সত্য ; নিজেকে ঠকান না ও পরকে বঞ্চিত করেন না। এর থেকে দেখতে পেয়েছি, নিজের রচনায় যেমন নিজের স্বভাবে তিনি তেমনি শিল্পী, ক্ষুদ্রতার ত্রুটি স্বভাবতই কোথাও রাখতে চান না।

শিল্পী ও মানুষকে একত্র জড়িত করে আমি নন্দলালকে নিকটে দেখেছি। বুদ্ধি, হৃদয়, নৈপুণ্য অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির এরকম সমাবেশ অল্পই দেখা যায়। তাঁর ছাত্র, যারা তাঁর কাছে শিক্ষা পাচ্ছে, তারা এ কথা অনুভব করে এবং তাঁর বন্ধু যারা তাঁকে প্রত্যহ সংসারের ছোটো বড়ো নানা ব্যাপারে দেখতে পায় তারা তাঁর ঔদার্যে ও চিত্তের গভীরতায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। নিজের ও তাঁদের হয়ে এই কথাটি জানাবার আকাঙ্ক্ষা আমার এই লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। এ রকম প্রশংসার তিনি কোনো অপেক্ষা করেন না কিন্তু আমার নিজের মনে এর প্রেরণা অনুভব করি।

[বিচিত্রা]

কোপাই

শ্রীনন্দলাল বসু

শিল্পী নন্দলাল

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

আর্টিস্টের মনের উপলব্ধি, সহজ কথায় আমরা যে বস্তুকে 'ভাব' আখ্যা দিয়ে থাকি, এই ভাব যখন 'ভাষা'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ ভাব যখন উপযুক্ত আধারে বা আশ্রয়ে রূপ পায়, তখনই আমরা উদ্দিষ্ট রসবস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হই। রসবস্তু যে আমাদের মনকে স্পর্শ করতে পারে তা কেবল ভাষার গুণে বা কেবল ভাবের শক্তিতে নয়। ভাব ও ভাষার সংযোগে যে কেন্দ্রীভূত শক্তি জাগে, রসবস্তুর মর্মগত কেন্দ্রীভূত সেই শক্তিই, এক সুনির্দিষ্ট পথে রসবস্তুকে অনুভব করায়। এই অবস্থায় আমাদের বিচারবিশ্লেষণের বুদ্ধি অন্তরালে থেকে যায়।

বোঝবার চেষ্টা মাত্রেই রসের অখণ্ডত্ব লোপ পায়; রসবস্তুর উপাদান ভাব ও ভাষা পৃথক হয়; ভাব ও ভাষার প্রকৃতি বুঝি কিন্তু বোঝবার মুহূর্তে ভাব ও ভাষার কোনোটাই আমাদের মনে রসসঞ্চার করে না।

রসসঞ্চার করবার উদ্দেশ্যে মানুষ যা সৃষ্টি করল সেই বস্তুকে জানবার বা বোঝবার আগ্রহ কেন হয়? যে মনের ধর্ম হল রসোপলব্ধি তারই ধর্ম আবার বিচার বিশ্লেষণ; রসোপলব্ধির মুহূর্তে মানুষের মনের সেই দিকটা বা সেই প্রবৃত্তিটা নিরস্ত থাকলেও পরে সেই বুদ্ধি পুরোভাগে এসে জানবার বোঝবার চেষ্টা করে। বিচারবুদ্ধি জানতে চায়, যে রসবস্তু মনে উদ্দীপনা জাগালো তার কার্যকারণ। কেন এমন অনুভূতি হল? কোন্ উপাদানে এই রসবস্তু গঠিত হল? কী এর স্বরূপ, কোথায় উৎপত্তি, কোথায় স্থিতি, পরিণামই বা কী? এই অনুসন্ধানের চেষ্টায় আমাদের প্রধান সহায় হল রস প্রকাশিত হচ্ছে যে আধারে তাই।

ভাষাকে চিনতে চিনতে ভাষার অন্তরের বস্তু যে ভাব তাকে চিনতে শিখি; ক্রমে ভাবের উৎস যে মন সেই মনকে আমরা চিনতে চাই। অর্থাৎ, আর্টিস্টের মনের পরিচয়ে তার প্রতিভার স্বরূপ আমরা বুঝতে চাই। সব সময় এখানেই আমাদের কৌতূহল বা জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় যে তা নয়। প্রতিভার মূল্যবিচারের চেষ্টা চলে তাকে যুগ-যুগ-প্রসারিত পরম্পরার ভূমিকায় রেখে। যে বস্তু আমরা উপভোগ করলাম বা যে রূপের ছলে তাকে উপভোগ করলাম, তা নূতন না পুরাতন? এইভাবে বিচারের শেষ নেই; অসংখ্য প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতে পারে। কিন্তু যে প্রশ্নেরই উত্তর পেতে চাই-না রসবস্তুর আধারভূত যে ভাব ও ভাষা তাকে চিনতে চিনতেই সেই উত্তর পাব। কারণ, ভাষা এবং ভাষা যে ভাব প্রকাশ করছে এই দুটিই বিচারবুদ্ধির হাতের কাছে এবং ধরাছোঁওয়ার ভিতরে; উভয়ে মিলে আবার যে রসকে প্রকাশ করছে বিচারবুদ্ধির পক্ষে তা জানবার স্বাধীন স্বতন্ত্র কোনো উপক্রম সহজ বা সম্ভবপর নয়।

এই ভূমিকার পর শিল্পী নন্দলাল সম্বন্ধে এই আলোচনায় আমরা কী আশা করতে পারি তা বোঝা সহজ হবে। এ হল নন্দলালের রসসৃষ্টির ভিতর দিয়ে নন্দলালের রসস্রষ্টা মনের কাছাকাছি পৌঁছোবার চেষ্টা মাত্র। নন্দলালের প্রতিভার কাছে আমরা কী পেয়েছি, সেই প্রতিভার অভিনবত্ব

কোথায়, তারই আলোচনায় প্রথমে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্‌। নন্দলালের প্রতিভার কেন্দ্রীভূত রূপ প্রকাশিত হয়েছে আমাদের দেশের আধুনিক চিত্রের সংস্কৃতিতে। তাঁর চিত্রের ভাষায় তাঁর মনের পরিচয় আমরা পাব, এবং সেই চিত্রের ভাষাকে সমসাময়িক চিত্রের ভূমিকায় দেখলেই তাঁর প্রতিভার অভিনবত্ব বোঝবার পথ মুক্ত হবে।

প্রথমেই একটা সংশয়ের নিরসন হলে ভালো হয়। কোনো আর্টিস্ট সত্যই নতুন কিছু দেয় কিনা বা যখন দেয় সেই নূতনত্ব আসে কোন্‌দিক থেকে— ভাষা, ভাব, অথবা ভাষা ও ভাবের সংযোগ থেকে? ভাবের দিক দিয়ে আর্টিস্ট নতুন কী দেবে? ভাব নির্দিষ্ট; নতুন ভাব দেওয়ার অর্থ প্রায় সব ক্ষেত্রেই হল নতুন পথে ভাবের মুখোমুখি ক'রে দেওয়া, নতুন ভাব সৃষ্টি করা নয়। তেমনি ভাষাও সুনির্দিষ্ট, তার ভঙ্গী বা প্রয়োগ নতুন। কবিকে কাব্য রচনা করতে হলে মানুষের মুখের কথাতেই অর্থযুক্ত বাক্য বিন্যাস করতে হয়, আর্টিস্টকে আঁকতে হলে পরিচিত রেখা রঙ ও বস্তুরূপের আশ্রয় নিতে হয়— অন্য উপায় নেই।

ভাব নির্দিষ্ট, ভাষা নির্দিষ্ট; কোনটিতেই যথার্থ নূতনত্ব সম্ভব নয়— নূতনত্ব আসছে ভাব ও ভাষার সংযোগ থেকে। প্রতিভাবান আমরা তাঁদেরই বলি যাঁদের হাতে সুনির্দিষ্ট ভাব আর সুনির্দিষ্ট ভাষা মিলিত হয়ে অভিনব বিগ্রহ সৃজিত হয় রসের।

সৃষ্টির উপলক্ষ নতুন। কারণ, দেশকাল পাত্রের একরূপ সমাবেশ একাধিক বার হওয়া সম্ভব নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হয়, সেই পরিবর্তনে নূতনত্বের যে স্বাদ তা ব্যক্তিই পায়; শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বা প্রতিভার মূল্য তাই এত বেশি। কোনো দেশের সংস্কৃতিতে কোনো কারণে তেমন মনের বা প্রতিভার অভাবে যখন পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখা সম্ভব হয় না, তখনই জীবনের সঙ্গে শিল্পের যা সম্পর্ক তা ছিন্ন হয়ে যায়।

ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতির এরকম একটা অবসাদের সময় অবনীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ে নব্যকালের উপযোগী নতুন চিত্রকলার শুরু হল। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের ভাষাকে মার্জিত করলেন; নবাগত বিলেতি আঁকবার রীতি, অর্থাৎ বিলেতি শিল্পের ভাষা, তার বিজাতীয়তা দূর করলেন তিনি আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতিসংযোগের দ্বারা। আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে নন্দলালের প্রবেশ অবনীন্দ্রনাথকে অনুসরণ ক'রে, তাঁর প্রথম পরিচয় অবনীন্দ্রনাথের অনুগামী রূপে— কাজেই অবনীন্দ্রনাথের কৃতির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে ও তুলনা না করলে নন্দলালকে বোঝাও সম্ভব হয় না। অবনীন্দ্রনাথ যে কালের মানুষ শিল্পের ইতিহাসে সেই কালকে রোমান্টিক বলা হয়। রোমান্টিক এই ইংরেজি কথার একটা ইঙ্গিত বা প্রধান ইঙ্গিত তীব্র আত্মসচেতন ও কল্পনাবিলাসী মনের দিকে। অবনীন্দ্রনাথের এরূপ আত্মসচেতন মনের থেকে পুরাকালীন ভারতীয় শিল্পীমনের ব্যবধান হল প্রচুর। ভারতীয় ক্লাসিক শিল্পের নিখুঁত গঠন বা আলংকারিক গুণ অবনীন্দ্রনাথকে তেমন আকৃষ্ট করতে পারে নি। অতীতের সঙ্গে তাঁর মনের যোগ রইল কাব্যরসের মধ্যস্থতায়। কাব্যে তিনি যে কল্পনার জগৎ পেলেন তাকে নিয়ে এলেন বর্তমান কালে। বিলেতি শিল্পের অঙ্কনরীতিতে তাঁর শিক্ষা, কিন্তু বিলেতি শিল্পের আদর্শ যা প্রচলিত ছিল তা তিনি গ্রহণ করলেন না। বিলেতি অঙ্কনরীতির ছাঁকনিতে দেশীয় চিত্র সংস্কৃতির যতটা ধরা পড়ল তাই দিয়ে তিনি রীতি বা পদ্ধতিকে রূপান্তরিত ও উন্নীত করলেন নিজস্ব এক ঢঙে বা স্টাইলে— তাতে রইল বিলেতি স্বভাবানুগ চিত্ররীতির অনুরূপ আলোছায়াপাতের মায়া।

নন্দলাল আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন অবনীন্দ্রনাথের আত্মসচেতন ও কল্পনাপ্রবণ মনের সৃষ্ট আলেখ্যরচনার ভাষাকেই অবলম্বন করে, কিন্তু নব্যকালের মনের সঙ্গে তাঁর মনের বিশেষ কোনো যোগ ছিল না। নব্যকালীন অবনীন্দ্রনাথের মন যে প্রাচীনকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল সেই প্রাচীনেরই সংস্কৃতিতে ও সংস্কারে লালিত পালিত প্রভাবিত মন নিয়ে নন্দলাল প্রবেশ করলেন নব্যকালে; তখন নব্যরুচির প্রভাব পড়ল তাতে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের ভাষার মধ্য দিয়ে। তবু নন্দলালের মানসিক গঠনের স্বকীয়তা, তাঁর প্রতিভার শক্তি ও ভিন্নমুখিতা, অবনীন্দ্রনাথের ভাষাকে আশ্রয় করবার মুহূর্তেই ঐ ভাষাকে রূপান্তরিত করতে প্রবৃত্ত হল। আত্মসচেতন কল্পনাপ্রবণ মনের যে ভাষা, তাতে দেখা দিল ভারতীয় ক্লাসিক রীতির গুণ। অবনীন্দ্রনাথ যা এড়িয়ে গিয়েছিলেন সেই প্রতীকী গঠননিষ্ঠ রূপ ও মণ্ডনের রুচি স্বভাবানুগ রীতির মোড় ফিরিয়ে দিল গঠনের দিকে, মণ্ডনের দিকে। সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায় এই যে, আত্মসচেতন রোমান্টিক মনের ভাষা ক্লাসিক রীতির বাঁধনে বাঁধা পড়ল। এবং নন্দলালের প্রতিভায় অতীত ভারতের ধ্যান ধারণা বিশ্বাস যুগান্তরের দূরত্ব দূর ক'রে দিয়ে বর্তমান কালে ও বর্তমান কালোপযোগী শিল্পের ভাষায় নতুন অভিব্যক্তি লাভ করল।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে এই যে, নন্দলালের মধ্য দিয়ে এই যে পরিবর্তন দেখা দিল, রূপ যে গঠনের ও মণ্ডনের ছন্দ পেল, এর মূলে আছে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া না শিল্পীর আপন প্রতিভার সহজ প্রকাশ মাত্র? পূর্বেই বলেছি, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নন্দলালের মনের বিকাশ সেখানে সংস্কারে ও সংস্কৃতিতে মিলে সমাজের একটা অখণ্ডরূপ ছিল, অর্থাৎ সমাজ জীবন্ত ছিল এবং তার ধারাবাহিকতায় হঠাৎ কোথাও একটা অপঘাত ঘটেনি। ভারতীয় ভাবধারার প্রতি আস্থা নন্দলালকে চেষ্টা ক'রে চিন্তা ক'রে লাভ করতে হয়নি, সহজ বিশ্বাসের বলে পৌরাণিক কালকে ও পৌরাণিক কল্পনাকে তিনি সত্য ব'লে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন; পুরাতনের সঙ্গে নন্দলালের মনের এই মিল ছিল ব'লেই তাঁর প্রতিভার মিল হল পুরাকালীন প্রতিভার সঙ্গে— ভারতীয় ক্লাসিক শিল্পের ভাষার অন্তরে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল। কাজেই, নন্দলালের সঙ্গে পুরাতনের সম্বন্ধ প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নয়।

নন্দলালের প্রতিভার গতি অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হলেও ঐ প্রবাহের গভীরতা বা প্রসার সর্বত্র এক নয়। চিত্রকলার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার প্রথম প্রকাশের উল্লেখ করা গেছে। ক্রমে নন্দলালের প্রতিভার গতি চিত্রের সীমা অতিক্রম করে বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে সমগ্র রূপকলার সংস্কৃতিতে ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়েছে। এই প্রসার তাঁর মানসিক প্রসারেরই অনুগত এবং তাঁর প্রতিভার মূলশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং বলা যেতে পারে, সেই প্রতিভার এক-একটি প্রবৃত্তি বা এক-একটি ক্ষমতা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ক্ষেত্র বেছে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। যেমন দেখা যায়, ক্লাসিক শিল্পের গঠনের প্রতি যে অনুরাগ যে আকর্ষণ ছিল পরবর্তী কালে সেই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রার চলচ্চিত্রমালার অভিমুখে। কিন্তু বাস্তবজগতের বাস্তবতাকে তিনি নেননি; সেখানে তাঁর মণ্ডনের রুচি প্রহরী থেকেছে; তাঁর রচনায় পেয়েছি গঠনের আভিজাত্য এবং মণ্ডনের ছন্দ।

নন্দলালের মণ্ডনধর্মী মন আমাদের রূপকলার সংস্কৃতিকে নানাভাবে মণ্ডিত করেছে এবং চিত্রকলার ক্ষেত্রেও উপকরণের মর্যাদা ও তার ব্যবহারে নৈপুণ্য এই বস্তুটি এনে দিয়েছে। এই কার্যে নন্দলালের উত্তরজীবনের পরিবেশ, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট আশ্রমবিদ্যালয় বিশেষ অনুকূল হল।

আধুনিক কালে শিল্পাদর্শ জাতীয় জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করতে পারেনি নানা কারণে।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিল্পগোষ্ঠী সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছিলেন জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের পুরোধা হিসাবে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, ঘরকরনায়, আসবাবে, তৈজসপত্রে শিল্পরুচির স্থান ছিল না ; তবে বিকৃত বিলেতি রুচির ছাপ ছিল যথেষ্ট— এর প্রতিকার বা পরিবর্তন করবার পথ ছিল না। যুগধর্মে আর্টিস্ট আর কারিগর উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ঘটেছিল বিস্তর এবং যেমন বিলেতি স্বভাবানুকারী রুচির আওতায় মণ্ডনের রুচি হয়েছিল নষ্ট তেমনি আবার মণ্ডনকর্মকেই ঠেলে রাখা হয়েছিল— তা অশিক্ষিত কারিগরের কাজ, শিল্পীর নয়, এই ধারণা থেকে। শান্তিনিকেতন-আশ্রমের উৎসবে অভিনয়ে নন্দলালের মণ্ডন প্রতিভার প্রাথমিক প্রয়োগ ; ক্রমে তা বিভিন্ন ব্যাপারে ও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, বিভিন্ন কারুকর্মে ভারতীয় শিল্পরুচির নূতন প্রবর্তনা এনে দিয়েছে।

নন্দলালের প্রতিভার ক্রিয়ায় নন্দলাল-পরবর্তী শিল্পীদের ক্লাসিক শিল্পসংস্কৃতির আত্মীকরণ সুসাধ্য হয়েছে, পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রাকেও অলংকরণের দৃষ্টি দিয়ে দেখবার ও দেখাবার শক্তি হয়েছে।

আমরা ভারতবাসী, য়ুরোপের প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও চিত্তধারার সঙ্গে আমাদের চিন্তা ও চেষ্টার তুলনা না করে তার মূল্য নির্ধারণ করতে সাহস পাইনে। এবং আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের এত কাছাকাছি এসেছে যে তুলনা করাও স্বাভাবিক। অতএব, আধুনিক য়ুরোপীয় শিল্পচেষ্টার পটভূমিকায় নন্দলালের প্রতিভাকে দেখাবার চেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্বভাবের অনুকরণ-চেষ্টার প্রতিক্রিয়া হিসাবে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য আর্টে নিত্যনূতন পথ আবিষ্কারের যে চেষ্টা দেখা যায়—তার মৌল প্রবৃত্তি হল মণ্ডনের গুণ আয়ত্ত করা। এই গুণ তাঁরা নানা দেশের ও নানা যুগের শিল্পসংস্কৃতির বিচারবিশ্লেষণ ক'রে বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করতে চাইছেন। বিশ্লেষণবুদ্ধিকেই সহায় করার দরুন নিত্যনূতন মতবাদের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে ; শিল্পীরা বুদ্ধি দিয়ে মণ্ডনের গুণ বুঝছেন, কাজে তা খাটাতে গিয়ে বাধা পাচ্ছেন। ফলে তাঁদের সিদ্ধি যেমনই হোক, মোটের উপর বলা চলে যে, শিল্পকলায় মণ্ডনের প্রভাব আধুনিকত্বের পরিচায়ক। নন্দলালের শিল্পের ভাষা আধুনিক।

এখন, নন্দলালের ভাষার আধুনিকত্ব আমরা জানলাম, কিন্তু তাঁর এই ভাষা এ দেশের পরম্পরাগত শিল্পভাষার পাশাপাশি তেমন 'অভিনব' মনে হয় না, মনে হয় অতিপরিচিত, তার কারণ কী ? কারণ শুধু এই যে, তাঁর চিত্রের যা গুণ তা বিচারবিশ্লেষণের ফলে আসেনি, এসেছে সহজাত সংস্কার ও প্রবৃত্তি থেকে। তাই তাঁর প্রতিভায়, তাঁর সৃষ্টিতে, আধুনিকত্ব আছে কিন্তু আধুনিক বিচারনির্ভর মনের ঔদ্ধত্য নেই। আন্তরিক উপলব্ধি থেকে অন্তর্দৃষ্টি থেকে নন্দলালের ভারতীয়-সংস্কারে-পরিপক্ব মন নানা শিল্প-সংস্কৃতির থেকে যে গঠনের ছন্দ ও মণ্ডনের গুণ আত্মসাৎ করেছে, বাহ্যিক চাকচিক্য ও আড়ম্বর নেই ব'লেই (অর্থাৎ, সম্পূর্ণ আত্মীকরণ এবং ভাব ও ভাষাকে একযোগে রসে উত্তীর্ণ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে ব'লেই) তাকে তথাকথিত নব্য মনের বিচারে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা আছে প্রচুর। সেই ভ্রম নিরসনে কিছুমাত্র সহায়তা যদি করে তাহলেই শিল্পী নন্দলালের প্রতিভার এই আংশিক আলোচনা সার্থক হবে।

ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তাধারা

শ্রীশচীন সেন

ভারতে বৃটিশ-শাসন কোন বিশেষ দিন বা ক্ষণ বা ঘটনার সাহচর্যে স্থাপিত হয় নি—ধীরে ধীরে এর প্রভাব সুবিস্তৃত হয়েছে এবং অত্যন্ত পরোক্ষভাবে এর বিরুদ্ধশক্তি পরাহত হয়েছে। ইতিহাসের এটা একটা পরম বিস্ময়কর ঘটনা যে, বিদেশী-শাসন বিনা আড়ম্বরে এতবড় একটা প্রাচীন মহাদেশে নিজের শক্তি এতটা নিবিড়ভাবে বিস্তার করল, এবং সেই বিস্তারণে ভারতবাসীর সহায়তা খুব উপেক্ষার বস্তু ছিল না। পলাশীযুদ্ধ থেকে সিপাহীবিদ্রোহ পর্যন্ত, এই একশত বৎসরের মধ্যে, ভারতবর্ষে বিদেশী-শাসন যে শুধু শিকড় গাড়লো তা নয়, ইংরেজ-শাসনকাণ্ড পল্লবিত হয়ে উঠল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন বাণিজ্যের বনেদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য শাসনভারের দায়িত্বগ্রহণে ক্রমশ এগিয়ে এলেন, তখন মুসলমান আমলের ছিল ক্ষয়িত অবস্থা। কোম্পানির প্রভাব-প্রসারণ তখনও বিদেশী-শাসনের রূপ নিয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু বণিকের মানদণ্ড যখন শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত হল, তখন ইংরেজ-শাসন অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তিতে অবস্থিত। এত বড় ঘটনাকে এত সহজে মেনে নেওয়া সে-কারণেই সম্ভব হয়েছিল।

মুসলমান আমলে শাসকশ্রেণীর সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা অভিজাত মুসলমানের প্রাপ্য ছিল। সেনাধিপতিত্ব, রাজস্বসংগ্রাহকের পদ, বিচারপতি বা অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মচারীর পদ ইত্যাদি সর্ববিধ সুবিধা উচ্চবংশীয় মুসলমানের সম্মুখে বিস্তৃত ছিল। এবংবিধ বৈধ উপায়ে অর্থ ও প্রভাব অর্জনের পথ ব্যতীত শাসকসম্প্রদায়ের গোত্রজ হওয়ার দরুন বহুবিধ দ্বার উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু কোম্পানির শাসনভিত্তি যতই দৃঢ়তর হতে লাগল, মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের অর্থ ও প্রভাব অর্জনের পথ ক্রমশই সংকুচিত হয়ে এল। ফলে, শাসনভার থেকে তাঁরা যে শুধু বিচ্যুত হলেন তা নয়, তাঁরা সমস্ত দায়িত্ব-সম্পাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। মানীর অভিমান তাতে আহত হল, এবং আহত অভিমানে গুমরে গুমরে তাঁদের অপচয়ের পথ তাঁরা নিজেরাই আরও বিস্তৃত করে দিলেন। ঐতিহাসিক ভাবে একথা বলা যায় যে, নিম্নলিখিত বিধান অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রভাব ও বিভব অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল—

(১) সেনানীর পদ-মর্যাদা থেকে ক্রমশ মুসলমানদের অপসারণ। কারণ ব্রিটিশ-শাসনের নির্বিঘ্নতার জন্য এর প্রয়োজন ছিল।

(২) শাসনকার্যের প্রয়োজনীয় পদ থেকে মুসলমানদের ক্রমশ অপসারণ।

(৩) ইংরেজ-শাসিত আদালতের বিধি ও বিধানের পরিবর্তনের জন্য মুসলমানী আইনের অভিজ্ঞ-বর্গের বহুবিধ অসুবিধা মুসলমান-প্রভাবকে ব্যাহত করল।

(৪) জ্ঞান ও ধর্মপ্রচারের জন্য অবৈধ লাখেরাজ জমিদান বাতিল করবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার দরুন মুসলমান সমাজ আহত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি।

(৫) ভারতবাসী জাতিধর্ম-নির্বিশেষে কোম্পানির অধীনে চাকুরী গ্রহণ করতে পারবেন—১৮৩৩ সনের এবংবিধ ঘোষণা অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রভাবকে ব্যাহত করবার পথকে বিস্তৃততর করল।

(৬) ১৮৩৫ সনে ইংরেজী ভাষা বৃটিশভারতে সরকারী ভাষা বলে স্বীকৃত হওয়াতে অভিজাত

মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক অসুবিধা সৃষ্ট হল, কারণ ইংরেজী ভাষা শিক্ষাব্যাপারে মুসলমান সম্প্রদায়ের তখনও যথেষ্ট সংকোচ ছিল।

মুসলমান মননের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। তাঁরা ভুলতে পারেন নি যে, মুসলমান সম্রাটের নোকর হিসাবে ইংরেজ প্রথম পত্তন স্থাপন করে এবং তাঁদের হাত থেকে শাসনভার কৌশলে হস্তান্তরিত হয়। মুসলমান সমাজ ধর্মভীরু, এবং তাঁদের ধর্মনীতি মনের সমস্ত অর্গল রুদ্ধ করে নিজধর্মকে শ্রেষ্ঠাসনে আসীন করতে চায়—তাই চিন্তাধারায় ঔদার্য থাকলেও সহনশীলতা নেই, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থাকলেও সমন্বয়-প্রচেষ্টা নেই। মনের মাটি আঁট ধরে গেছে। হিন্দু মননে যে পলি পড়েছে মোসলেম চিন্তনে তার অভাব পদে পদে অনুভব করা যায়। কিন্তু মননে এই আঁটালো মাটির জন্যই ব্রিটিশ-শাসনকে মুসলমান সমাজ সানন্দে গ্রহণ করতে পারেন নি—নিজেদের বিভবকে দাসত্বের পরাভবে ডুবিয়ে দিতে আপত্তি প্রকাশ করেছেন। যে কোন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার চেষ্টা হিন্দু সমাজে পরিলক্ষিত হয় সবচেয়ে বেশি—কিন্তু মুসলমান সমাজের ঋজুতা ও দৃঢ়তা ইংরেজ-শাসনকে অবিসংবাদিত সত্য ও অনিবার্য ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করতে দেয়নি, তাই ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সংঘবদ্ধ অভিযোগ মুসলমান সমাজ প্রকাশ করেছিলেন। ভারতীয় ওহাবি-আন্দোলন সেই নালিশ বহন করে এনেছিল। এই আন্দোলনের ব্যাপকতা লক্ষ্য করবার বিষয়—কারণ, নেতৃবর্গ মুসলমান সমাজের জনসাধারণের সাহায্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ভারতীয় ওহাবি আন্দোলনের সঙ্গে আব্দুল ওহাব-প্রবর্তিত ওহাবি-ধর্মের গভীর যোগ না থাকলেও এ কথা বলা যায় যে, সৈয়দ আহামদ মক্কায় গিয়ে আব্দুল ওহাবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে সৈয়দ আহামদ-এর শিক্ষায় ও দীক্ষায় ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা ভারতের ইতিহাসে ওহাবি আন্দোলন বলে প্রচলিত। সৈয়দ আহামদ ১৭৮৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩১ সনে মারা যান। তিনি ধর্মপ্রচারক ছিলেন, এবং ইসলামধর্মে ধর্ম ও রাজনীতির যোগ অত্যন্ত সুগভীর। ইসলামধর্ম রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হবার প্রথম কারণ যে, মহম্মদ ভগবানের দূত এবং মহম্মদ শুধু ধর্ম-প্রবর্তক নন—তিনি শাসননীতি ও ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং সামরিক ও বে-সামরিক শাসনকার্যের কর্মকর্তা। মহম্মদের পরে মুসলমানগণের ধর্মনেতা-নরপতি "খলিফা" বলে অভিহিত হত। মহম্মদ ব্যতীত ভগবানের দূত হিসাবে কেহ গৃহীত হয়নি এবং নরপতি হিসাবে বাগদাদে খলিফার পতন হলেও ধর্মনেতা হিসাবে খলিফা গৃহীত হতেন। ১৯২৪ সনে তুরস্কের গণতন্ত্র এই খলিফা-পদকে বাতিল করেন।

ইসলামধর্মানুসারে মোসলেম-রাষ্ট্র ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন নয়, এবং বিধর্মীর স্থান ইসলাম-রাষ্ট্রে অত্যন্ত নিম্নে। ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই সংযোগ থাকার দরুন মোসলেম-রাষ্ট্রে বিধর্মীর স্থান এবং বিধর্মীর শাসনে মুসলমানের বাস—এই উভয় ব্যবস্থাই অসন্তোষজনক। মোসলেম-রাষ্ট্রের বিধি ও বিধান কোরান হতে গৃহীত, ফলে মুসলমান সমাজে বিধর্মী শাসক বা বিধর্মী নাগরিক—দুই-ই উপেক্ষার বস্তু। ইসলাম ধর্মের বিধান অনুসারে ভারতীয় ওহাবিদল ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ-প্রবৃত্তি জাগ্রত করে রাখলেন। তাঁরা সৈয়দ আহামদকে "ইমাম" বলে গ্রহণ করেছিলেন, এবং ধর্মযুদ্ধকে তাঁদের ধর্মনীতির ভিতর প্রধান স্থান দিয়েছিলেন। ভারতীয় ওহাবিদল ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন, এবং ধর্মযুদ্ধের মন্ত্র হিসাবে যে-সব ঘোষণা প্রচার করেছিলেন তার মূলকথা নিম্নে দেওয়া হল—

(১) ধর্মযুদ্ধ লাভজনক ব্যাপার, কারণ জাগতিক সুখ-সুবিধা তখনই লাভ করা যায় যখন মুসলমানধর্ম সংরক্ষিত হয় এবং মুসলমান রাজা সর্বদেশে ইসলামধর্ম প্রচার করতে সক্ষম হন।

(২) বিধর্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

(৩) নেতার সঙ্গে যুক্ত হও এবং বিধর্মীকে আহত কর।

(৪) ধর্মযুদ্ধে যিনি যোগদান করবেন তিনি ভগবানের নিকটে সাতহাজারগুণ উপকার লাভ করবেন ; যিনি ভগবানের কাজে একটি যোদ্ধাকে সাজিয়ে দেবেন তিনি ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গের পুরস্কার পাবেন।

(৫) যে সব ভারতীয় মুসলমান নরক থেকে পরিত্রাণ পেতে চান তাঁরা হয় বিধর্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন অথবা বিধর্মী-শাসিত দেশ হতে পলায়ন করবেন।

(৬) যাঁরা এই যুদ্ধ বা পলায়ন কার্যে বাধা দেবেন তাঁরা প্রবঞ্চক।

(৭) যে-দেশে শাসকের ধর্ম ইসলাম নয় সে-দেশে হজরত মহম্মদের বিধান প্রয়োগ করা যায় না।

ডক্টর ডাব্লু ডাব্লু হাণ্টার তাঁর The Indian Mussalmans গ্রন্থে ভারতীয় ওহাবিদলের প্রচারিত ধর্ম-সাহিত্য হতে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করে ধর্মযুদ্ধের মূলমন্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন। উক্ত ঘোষণাগুলি হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থ হতে চয়িত।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ওহাবি আন্দোলনকে জন-আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কারণ মৌলভী ও মোল্লার সাহায্যে গ্রামে গ্রামে এই ধর্মযুদ্ধের বাণী প্রচারিত হয়েছিল। শাসকসম্প্রদায় প্রথম অবস্থায় ওহাবি আন্দোলনকে দমন করবার চেষ্টা করেন নি কিন্তু পরে ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশনের সাহায্যে ওহাবিদলপতিদের আটক রেখে আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিলেন। ৩নং রেগুলেশন বিনা বিচারে আটক রাখবার ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলকে দিয়েছিল, এবং তারই সাহায্যে আন্দোলনের ব্যর্থতাসাধন করা হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে প্রথম অবস্থায় হিন্দু সিপাহীদের বিদ্রোহ ঘোষণা হলেও ওহাবিদলের অনেক সভ্য সেই বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন। এবং তাঁদের ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিলাভের প্রয়াসে সিপাহীবিদ্রোহকে পুষ্ট করেছিলেন। ১৮৬৪ সালের আম্বালা বিচার, ১৮৬৫ সালের পাটনা বিচার, ১৮৭০ সালের মালদহ বিচার, ১৮৭০ সালের রাজমহল বিচার এবং ১৮৭১ সালের বিচার—এ সব বিচার থেকে প্রমাণ হয় যে, ওহাবি ষড়যন্ত্র অত্যন্ত ব্যাপক ছিল এবং সিপাহীবিদ্রোহের পূর্বে ও পরে তাঁরা ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ অভিযোগ প্রকাশ করেছেন। বহু ওহাবি বন্দীদের দ্বীপান্তরে পাঠান হয়েছিল। গভর্নর-জেনারল লর্ড মেয়ো এবং বাংলার চীফ জাস্টিস মিঃ নর্মান ওহাবি ঘাতকের হাতে প্রাণ দান করেন।

সিপাহীবিদ্রোহ ও ওহাবি-আন্দোলন দলনে শাসকসম্প্রদায় যে দৃঢ়তা দেখালেন তাতে মুসলমান সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় আতঙ্কিত হলেন। ওহাবি-আন্দোলন পোষণে অভিজাত সম্প্রদায়ের সাহায্য উপক্ষেনীয় ছিল না কিন্তু শাসকবর্গের সঙ্গে সরাসরিভাবে বিরুদ্ধতা করবার অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না। তাই তাঁরা যখন দেখলেন যে, শাসকসম্প্রদায় ওহাবি-আন্দোলন সমূলে ছেদন করতে উদ্যত এবং সিপাহীবিদ্রোহের দায়িত্ব মুসলমান সম্প্রদায়কে বহন করতে হচ্ছে, তখন আভিজাতশ্রেণী আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন এবং শাসকের অনুগ্রহ-প্রার্থনায় এগিয়ে এলেন। এই নব আন্দোলনের স্রষ্টা সার সৈয়দ আহামদ, এবং একে আলিগড় আন্দোলন বলে অভিহিত করা যায়। মুসলমান সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় ইসলামধর্ম-ব্যাখ্যানে তিনটি মত সংগ্রহ করলেন—

প্রথম, মক্কার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নেতৃবর্গের স্বাক্ষরে এক ঘোষণা প্রকাশিত হল যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দায়িত্ব মুসলমানের নেই।

দ্বিতীয়, উত্তর ভারতের মুসলমান আইনজ্ঞবর্গ প্রচার করলেন যে, ইসলাম ধর্ম যেখানে সংরক্ষিত হয় সেখানে জেহাদের প্রয়োজন নেই, এবং জেহাদ ঘোষণার সর্ত ভারতবর্ষে বিরাজ করে না।

তৃতীয়, কলিকাতা মহম্মডান সোসাইটি ঘোষণা করলেন যে, ভারতবর্ষ "দার-উল-ইসলাম" এবং ইসলামবন্ধু দেশে জেহাদ চালনা বিধিসম্মত নয়।

ব্রিটিশ ভারত "দার-উল-হার্ব" নয়—অর্থাৎ শত্রুর অধীনে নয় এবং ব্রিটিশ ভারত "দার-উল-ইসলাম" এবংবিধ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করায় মুসলমান সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় শান্ত হলেন এবং ধর্মযুদ্ধের বিপত্তি থেকে রক্ষা পাবার সুযোগ পেলেন। এই নতুন দৃষ্টিকোণের উপর ভিত্তি স্থাপন করে আলিগড়-আন্দোলনসৌধ স্থাপিত হল। তাই আলিগড় আন্দোলন পুরাপুরি ভাবে অভিজাত সম্প্রদায়ের আন্দোলন—তাদের স্বার্থে আলিগড়-আন্দোলন অভিষিক্ত হল এবং তাদেরই প্ররোচনায় আন্দোলন রূপায়িত হল। ওহাবি-আন্দোলনে যে জনবোধ ছিল আলিগড়-আন্দোলন সেই বোধ হতে বিচ্ছিন্ন হল। শিক্ষিত সমাজের রথ শাসকসম্প্রদায়ের মন্দিরের দ্বারে এসে উপস্থিত হল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শাসকবর্গের দাক্ষিণ্যপূর্ণ দৃষ্টি হিন্দুসমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় ভোগ করেছিল—আলিগড় আন্দোলন মুসলমানের দাবি শাসকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করল। এবং লর্ড মেয়োর গভর্নমেণ্ট (১৮৬৯-৭২) প্রথম মুসলমান সমাজের দিকে অনুগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখ ফেরালেন। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি একটি স্মরণীয় ঘটনা। আলিগড় আন্দোলন তথা সার সৈয়দ আহামদ-এর আন্দোলনের মূলকথা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তার ভিত্তিস্বরূপ যে-সব ফর্মুলা দাঁড়িয়ে আছে তা প্রধানতঃ এই—

(১) ভারতের ভবিষ্যৎ ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সংযুক্ত— অতএব, ব্রিটিশ শাসনকে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

(২) ইংরেজ ও মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মোসলেম নিষ্ঠা জাগ্রত করতে হবে।

(৩) শাসকবর্গের মধ্যে যে মোসলেম-বিরুদ্ধ ধারণা আছে, তা দূরীভূত করতে হবে। ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনে মুসলমানগণ যেন যোগ না দেন, এবং সেকারণেই হিন্দুর সঙ্গে সহযোগিতার বিরুদ্ধে আলিগড় আন্দোলন বদ্ধপরিকর হয়েছিল।

(৪) হিন্দুদের সমকক্ষ হবার জন্য মুসলমান সমাজের প্রতি রাষ্ট্রের অধিকতর পরিপোষণ ও সহায়তার দাবি জানানো হল।

মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা সার সৈয়দ প্রাণপণে করেছিলেন এবং জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করবার বিরুদ্ধে তিনি রায় দিয়েছিলেন। তিনি গভর্নমেণ্টের কার্যাবলীর সমালোচনা পছন্দ করতেন এবং প্রয়োজন হলে তিনি তার তীব্র নিন্দারও পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারত ইংলণ্ড হতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন এবং এবং ভারতবর্ষে জাতি ও ধর্ম-বৈষম্য থাকার দরুন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রগতি সমস্তরে প্রবাহিত না হওয়ার জন্য আইনসভায় নানাবিধ স্বার্থ যুক্তনির্বাচনের সাহায্যে প্রতিফলিত হওয়া সংগত নয়। তাঁর মতে, যত দিন এই জাতিগত

ও ধর্মগত বৈষম্য থাকবে, পৃথক নির্বাচন ব্যতীত অন্য পথ নেই, এবং যুক্ত নির্বাচন শুধু সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নির্যাতনের কবলে ফেলবে।

১৮৫৮ সন হতে ১৮৯৮ সন পর্যন্ত মুসলমান সমাজ সার সৈয়দের নেতৃত্বে হিন্দুসমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্রিটিশ শাসকবর্গের দিকে এগিয়ে চলল। ভারতের ইতিহাসে বিদেশী শাসনের আওতায় এই দুই সম্প্রদায়ের পৃথককরণের বীজ রোপিত হল—এতদিনকার আশ্লেষের ভিতর বিশ্লেষের তপ্ত ও দূষিত নিশ্বাস প্রবাহিত হল। কিন্তু সার সৈয়দের নেতৃত্ব মুসলমান সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। ব্রিটিশ শাসকবর্গ মুসলমান সম্প্রদায়কে করত অবিশ্বাস এবং হিন্দুর শিক্ষিতসমাজ রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রগতিসূচক আন্দোলনের সাহায্যে এগিয়ে চলছিল। হয়ত সার সৈয়দের নেতৃত্ব এমনভাবে না আসলে মোসলেম অভিজাত সম্প্রদায় রাষ্ট্রের তাচ্ছিল্য ও অনাদরে অত্যন্ত হেয় স্থান অধিকার করত। কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ের এই সাম্প্রদায়িক জাগরণ নতুন বিষবৃক্ষ রোপণ করল। মৌলনা মহম্মদ আলি জাতীয় কংগ্রেসের কোকনাদ অধিবেশনে সার সৈয়দ সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষ্যে সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন : No well-wisher of Mussalmans, nor of India as a whole, could have followed a different course in leading the Mussalmans. এ কথা স্বীকার্য যে, অভিজাত সম্প্রদায়ের পক্ষে সার সৈয়দের আন্দোলন একমাত্র রক্ষাকবচ ছিল—কারণ শাসকবর্গের কোপাগ্নি থেকে মুসলমান সমাজকে রক্ষা করতে হলে মুসলমানের নিষ্ঠাকে প্রমাণ করবার প্রয়োজন হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সেই চেষ্টায় জাতির সমগ্রতাবোধ কতখানি আহত হল, তা বিচার করবার প্রয়োজন আলিগড় আন্দোলনে স্বীকৃত হয় নি। এই আলিগড় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হল—

প্রথম, ১৯০৬ সনে নিখিল ভারত মোসলেম লীগ স্থাপন।

দ্বিতীয়, আগাখাঁর নেতৃত্বে লর্ড মিণ্টোর নিকট পৃথক নির্বাচনের জন্য দাবি পেশ।

আলিগড় আন্দোলনের বিজয়বার্তা ঘোষিত হল ১৯০৯ সনের মর্লে-মিণ্টোর শাসনসংস্কার আইনে পৃথক নির্বাচন স্বীকার করা। আগা খাঁর ডেপুটেশনকে মৌলনা মহম্মদ আলি command performance আখ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন। লর্ড মেয়োর প্রবর্তিত গৃহবিবাদের প্রচেষ্টা (অর্থাৎ 'counterpoise of natives against natives') মর্লে-মিণ্টোর শাসনসংস্কার আইনে সার্থকতা লাভ করল। তখন মোসলেম লীগ ঠিক সার সৈয়দ প্রবর্তিত পথ অনুসরণ করে আসছিল, এবং বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন সার্থক হওয়ার দরুন মুসলমান সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর পৃথককরণ প্রবৃত্তি আরও সজাগ হয়ে উঠল। কিন্তু মিঃ জিন্না প্রমুখ মুসলানগণের সাহায্যে মোসলেম লীগ সার সৈয়দ আহামদ প্রবর্তিত পন্থা ত্যাগ করে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যোগসাধনের চেষ্টায় প্রযুক্ত হল। তারই ফলে ১৯১৬ সনে কংগ্রেস-লীগ প্যাক্ট। ইংরেজ শাসনে হিন্দু ও মুসলমানের প্রথম মিলন বলা যায় সিপাহীবিদ্রোহে এবং দ্বিতীয়বার মিলন এই ১৯১৬ সনের কংগ্রেস-লীগ প্যাক্টের সাহায্যে। এই দ্বিতীয় মিলন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ছিল।

১৯২০ সনে খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হল। ভারতে খিলাফৎ আন্দোলনের ভিতর প্রথম স্বীকৃতি যে, ভারতের মুসলমানগণ সর্বপ্রথমে মুসলমান, এবং তাঁদের ধর্ম ইসলামের স্বার্থ ও মোসলেম-রাষ্ট্রবিধান সংরক্ষণের শিক্ষা দান করে। জাতীয় কংগ্রেস এই খিলাফৎ আন্দোলনকে অনুমোদন করলেন। ১৯২০ সনে কংগ্রেসের কলিকাতার অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হল যে : it is the duty of every non-Muslim Indian in every legitimate manner to assist his Muslim brother in

his attempt to remove the religious calamity that has overtaken him. এই খিলাফৎ আন্দোলনের মূল-প্রেরণা ছিল—বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ, ভারতের বাইরে মোসলেম রাজশক্তির প্রতি প্রীতি জ্ঞাপন এবং রাষ্ট্রবিধানে ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করা। উক্ত প্রেরণা ওহাবি-আন্দোলন হতে বিভিন্ন নয়। আলিগড় আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে যে বিচ্ছিন্নতা ঘোষিত হয়েছিল, খিলাফৎ আন্দোলনে তা অস্বীকৃত হল—কারণ খাঁটি ইসলাম-সম্মত বিধান না হলেও খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দুর সাহায্যে পরিপুষ্ট হয়েছিল, এবং আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও ডাঃ আনসারী হিন্দুর সহযোগিতা শুধু অস্বীকার নয়, বরঞ্চ কামনা করেছিলেন। ১৯২১ সনে করাচীতে মৌলনা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির বিচারে বিচারকের ভাষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ওহাবি আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলনের কর্মসূচীর ভিতর সাদৃশ্য যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। বিচারকের রায় দ্রষ্টব্য : They relied upon religious propaganda. They openly gloried in hatred of the British Government, and maintained first, that their religion compels them to do certain acts ; secondly, that no law which restrains them from doing those acts which their religion compels them to do has any validity ; and thirdly, that in answer to the charge of breaking the law of the land it is sufficient to raise and prove the plea that the act which is alleged to be an offence is one which is enjoined by their religion. ইসলামী রীতি অনুসারে অনেক মুসলমান আফগানিস্থানে পালিয়ে যাবার জন্য অভিযান করেছিলেন, কারণ ইংলণ্ড তাদের খলিফাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন নি—ফলে ভারতবর্ষ "দার-উল-হার্ব" বলে পরিগণিত হবে। ওহাবি আন্দোলনেও এই সব নীতি অনুসৃত হয়েছিল। গভর্নমেণ্টের মতে খিলাফৎ আন্দোলন মোপলা-হাঙ্গামার জন্য দায়ী। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধনের জন্য খিলাফৎ আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের সহযোগিতা থাকলেও আন্দোলনকে সার্থক করবার হেতু কংগ্রেসের ছিল না। উহা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জন করবার কৌশল হিসাবে গৃহীত হয়েছিল—নতুবা কংগ্রেসের আদর্শ ও খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্দেশ্যের মাঝখানে বিরাট সমুদ্র বিরাজ করে।

সার মহম্মদ ইকবাল প্রকৃতপক্ষে সার সৈয়দ আহামদের শিষ্য। আলিগড় আন্দোলনকে তিনি নতুন দর্শন দিলেন, কারণ ইকবাল ছিলেন একজন কবি, দার্শনিক ও রাজনীতিক। "প্যান-ইসলাম"-সম্ভূত তাঁর দৃষ্টি, তাই তিনি প্রচার করলেন : Islam is non-territorial in its character, and its aim is to furnish a model for the final combination of humanity by drawing its adherents from a variety of mutually repellant races, and then transforming this atomic aggregate into a people possessing self-conciousness of its own. তাঁর মতে ধর্মহীন রাষ্ট্র ইসলাম-বিগর্হিত অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে দ্বৈতবাদ নেই—রাষ্ট্র ধর্ম হতে বিচ্যুত হতে পারে না। ধর্মনেতা ও নরপতি একই আসনে আসীন—তাই তিনি তুরস্কের ধর্মচ্যুত রাষ্ট্রকে ধর্মহানি হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি তুরস্কের জাতীয় কবি Zia-র সঙ্গে বিশ্বাস করেন : In order to create a really effective unity of Islam, all Moslem countries must first become independent, and then in their totality, they should range themseves under one Caliph. Is such a thing possible at the present moment? If not today, one

must wait. সার মহম্মদ ইকবালের চিন্তনধারা এবং ইসলামের দর্শনধারা তাঁর প্রণীত **Reconstruction of Religious Thought in Islam** গ্রন্থে ব্যাখ্যাত আছে। তিনি গণতন্ত্রের পক্ষপাতী নন—কারণ তাঁর কল্পিত রাষ্ট্রে অবিশ্বাসী বা বিধর্মীদের স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ।

মিঃ জিন্নার মতে সার মহম্মদ ইকবাল পাকিস্থান আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান হোতা। তিনি পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান এক মোসলেম রাষ্ট্রের অধীনে দেখতে চান। কিন্তু সেই রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন রাষ্ট্র হবে এবং ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করবে—এমন কোন ইঙ্গিত তিনি করেন নি। সার মহম্মদ ইকবালের পাকিস্থান মিঃ জিন্নার পাকিস্থান হতে বিভিন্ন।

ডক্টর এডওয়ার্ড টমসন বলেন যে, সার মহম্মদ ইকবাল তাঁর কাছে স্বীকার করেছেন যে: The Pakisthan plan would be disastrous to the British Government, disastrous to the Hindu community, disastrous to the Muslim community. কিন্তু ইকবাল ডক্টর টমসনকে নাকি বলেছেন যে: I am the President of the Moslem League and therefore it is my duty to support it. —Dr. Edward Thompson in Enlist India For Freedom, p. 58

১৯১৬ সনের কংগ্রেস-লীগ প্যাক্ট ১৯১৭ সনে ভারতের জাতীয় দাবি বলে মিঃ মণ্টেগুর নিকট উপস্থাপিত হয়েছিল। এই প্যাক্ট মিঃ জিন্নার সহায়তায় সাধিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯১৯ সনের মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার আইন যখন জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন—মিঃ জিন্না কংগ্রেস হতে দূরে গিয়ে মোসলেম লীগকে মুসলমান সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গঠন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। অথচ গোড়ায় মোসলেম লীগ যখন এই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংরক্ষণে গঠিত হয়েছিল, তিনি যোগদান করতে অস্বীকার করেছিলেন। মিঃ জিন্না তাঁর চৌদ্দ দফা দাবি নিয়ে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন এবং প্রথম অবস্থায় তাঁর দাবি জাতীয়তাবাদী মহলে ব্যঙ্গের বস্তু হলেও দেখা গেল যে, ১৯৩৫ সনের ভারতীয় শাসনসংস্কার আইনে তার বেশির ভাগ দাবিই গৃহীত হয়েছে। মোটামুটিভাবে তাঁর দাবি নিম্নে দেওয়া হল—

(১) ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের বিধানে রচিত হবে।

(২) সর্বপ্রদেশে শাসনসংস্কার সমভাবে বিস্তৃত হবে।

(৩) সংখ্যালঘিষ্ঠের যথাযথ প্রতিনিধি থাকবে এবং কোন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রাধান্য হ্রাস করা হবে না।

(৪) ভারতীয় আইনসভায় মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের ন্যূন হবে না।

(৫) বিভিন্ন সম্প্রদায় পৃথক নির্বাচন কেন্দ্রের সাহায্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন, যদিচ তাঁরা ভবিষ্যতে পৃথক নির্বাচন কেন্দ্র বাতিল করতে সক্ষম হবেন।

(৬) প্রাদেশিক সীমা এমনভাবে পরিবর্তিত হবে না যাতে পঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ব্যাহত হয়।

(৭) ধর্ম ও আচার পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। সভা, সমিতি ও শিক্ষা সর্বব্যাপারে স্বাধীনতা থাকবে।

(৮) এমন কোন আইন বা প্রস্তাব সদস্যসভায় বা নির্বাচিত সভায় গৃহীত হবে না যদি উক্ত

সভার কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সভ্য আপত্তি প্রকাশ করেন যে, সেই আইন বা প্রস্তাব উক্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী।

(৯) সিন্ধুদেশ বোম্বে প্রদেশ থেকে বিভিন্ন হবে।

(১০) অন্যান্য প্রদেশের শাসনসংস্কার উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে ও বেলুচিস্থানে বাহাল থাকবে।

(১১) সরকারী চাকুরিতে মুসলমানগণকে যথাযথ অংশ দিতে হবে।

(১২) মুসলমানের সংস্কৃতি-সংরক্ষণের ব্যবস্থা শাসনসংস্কার আইনে বিধিবদ্ধ থাকবে।

(১৩) কোন মন্ত্রণাপরিষদ অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান সভ্য ব্যতিরেকে গঠিত হবে না।

(১৪) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত শাসনসংস্কার আইনে কোন পরিবর্তন হতে পারবে না।

উক্ত চৌদ্দ দফা দাবির পর ১৯৪০ সনে মোসলেম লীগের লাহোর-অধিবেশনে মিঃ জিন্না ঘোষণা করেন যে, হিন্দু ও মুসলমান দুটি জাতি বা নেশন, এবং মুসলমানদের ভিন্ন এলাকা চাই বাস করবার জন্য এবং রাষ্ট্র চাই শাসন করবার জন্য। তাঁর নবদর্শনানুসারে এক প্রস্তাব গৃহীত হল যে, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে যে সব স্থানে মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যাধিক্য আছে তাঁরা বিভিন্ন ও স্বাধীন রাষ্ট্রস্থাপন করবেন এবং নিখিলভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোন বিষয়ে তাদের অধীনতা থাকবে না। সেই রাষ্ট্রগুলি সর্বব্যাপারে স্বাধীন থাকবে এবং সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিভিন্ন স্বার্থরক্ষণের যথাযথ বন্দোবস্ত থাকবে। মিঃ জিন্নার নতুন পাকিস্থান-আন্দোলনে আলিগড়-আন্দোলনের রূপ ও ঢঙ আছে যথা—

(১) ইংরেজের সাহায্যে সিদ্ধিসাধন।

(২) হিন্দুর সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন।

(৩) বিদেশী শাসকের পোষকতায় অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষণ। এই পাকিস্থান-আন্দোলন আংশিকভাবে ওহাবি আন্দোলনের রূপান্তর মাত্র যথা—

(অ) যেখানে মুসলমানের সংখ্যা অধিক, সে-প্রদেশকে "দার-উল-ইসলাম" বলে গৃহীত হবে।

(আ) হিন্দুশাসনের বিরুদ্ধে "জেহাদ" ঘোষণা এবং ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত।

সার মহম্মদ ইকবালের চিন্তাধারায় মিঃ জিন্নার চিন্তাধারা পরিপুষ্ট, তাই তিনি "প্যান-ইসলাম" দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করতে পারেন নি। লাহোর অধিবেশনে পাকিস্থানের পরিকল্পনা নতুন সাজে তিনি উপস্থাপিত করলেন এবং সেই অধিবেশনেই একটি প্রস্তাব গৃহীত হল যে, প্যালেস্টাইনে আরবদের দাবি মেটাতে হবে এবং কোন মোসলেম রাজশক্তি বা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য ভারতীয় সেনা প্রেরিত হবে না। পাকিস্থান রাষ্ট্রে ইসলাম রীতি ও নীতি প্রবর্তিত হবে না—অর্থাৎ তুরস্কের মত রাষ্ট্রকে ধর্মের প্রভাব ও বোঝা হতে বিচ্ছিন্ন করে গঠিত হবে—এবংবিধ ইঙ্গিত ভারতীয় মুসলমানের চিন্তাধারায় এখনও সুস্পষ্ট হয় নি। মোসলেম আইনে অভিজাতবংশীয় ও শিক্ষিতসমাজ জনগণের পক্ষে ভোট দিলেই যথেষ্ট—সেই নীতি পাকিস্থান রাষ্ট্রে গৃহীত হবে কিনা, তা এখনও আখ্যাত হয়নি। মোসলেম-রাষ্ট্রে সাধারণ লোক অপেক্ষা অভিজাতবংশীয় লোকের কদর বেশি বলেই মিঃ জিন্না সর্বসাধারণের ভোটের সাহায্যে নির্বাচনপ্রথা বা সমস্যাসমাধানের পথকে শ্রেষ্ঠ পথ বলে গণ্য করেন না।

পাকিস্থান পরিকল্পনার রূপান্তরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ১৯৩০ সনে মোসলেম লীগ-এর এলাহাবাদ অধিবেশনে সার মহম্মদ ইকবাল বলেছিলেন : I would like to see the Punjab,

the North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan amalgamated into a single state. Self-government within the British Empire or without the British Empire and the formation of a consolidated North-West Indian Moslem State appears to me to be the final destiny of the Moslems at least of North-West India.

সার মহম্মদ উত্তর-পশ্চিম ভারতকে একটি রাষ্ট্রে সংগঠন করে নিখিল-ভারত যুক্তরাষ্ট্রের এক অংশ হিসাবে কল্পনা করেছিলেন। মুসলমানপ্রধান রাষ্ট্রকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করবার পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা তখনও রাজনৈতিক মহলে উত্থাপিত হয়নি। প্রকৃত পক্ষে, মিঃ জিন্না তাঁর পাকিস্থান কল্পনা গ্রহণ করেছেন কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় মুসলমান ছাত্রবৃন্দের বিবৃতি থেকে। ১৯৩৩ সনে আসলাম খাঁ, রহমত আলি, শেখ মহম্মদ সাদিক এবং ইনায়েত উল্লা খাঁ-স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি কেম্‌ব্রিজ হতে গোপন ভাবে প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষ কোন এক দেশের নাম বা এক জাতির নিবাস নয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান ভারতবর্ষের অন্য জাতি হতে বিশিষ্ট রূপে বিভিন্ন : We do not inter-dine ; we do not inter-marry. Our national customs and calendars, even our diet and dress are different. অবিকল এই যুক্তি মিঃ জিন্না ১৯৪০ সনের মোসলেম লীগ-এর লাহোর অধিবেশনে পাকিস্থান-পরিকল্পনা ব্যাখ্যানে প্রয়োগ করেছিলেন। উক্ত কেম্‌ব্রিজ বিবৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রচার করেছিল : While he (Sir Muhammad Iqbal) proposed the amalgamation of these Provinces (*viz.*, the Punjab, the North-West Frontier Province, Kashmir, Sind and Baluchistan) into a single state forming a unit of the All-India Federation, we propose that these Provinces should have a separate Federation of their own. There can be no peace and tranquility in this land if we, the Muslims, are duped into a Hindu-dominated Federation where we cannot be the master of our own destiny and captains of our own souls.

বাংলা প্রদেশ পাকিস্থান এলাকার বাইরে ছিল। সার মহম্মদ ইকবালের অভিভাষণে বা কেম্‌ব্রিজ বিবৃতিতে কোথাও পাকিস্থান সম্পর্কে বাংলা প্রদেশের কথা বলা হয়নি। লাহোর প্রস্তাবে বাংলা প্রদেশের কথা প্রথম উল্লিখিত হয়।

মুসলমান রাজনৈতিক মহলে কেম্‌ব্রিজ বিবৃতি ১৯৩৩ সনে কোন দাগ কাটতে পারে নি। ১৯৩৩ সনে ভারতীয় শাসনসংস্কার সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার সময় মুসলমান প্রতিনিধিবর্গ কেম্‌ব্রিজ-বিবৃতিকে "student's scheme" বলে উপেক্ষা করেছিলেন এবং "chimerical and impracticable" বলে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সনে ডক্টর সৈয়দ আবদুল লতিফ ঘোষণা করেন যে, ভারতবাসী এক জাতি নয় এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির বিভাগ অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রবিভাগের প্রয়োজন আছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি। এবং সংস্কৃতির বিভাগ অনুসারে রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারিত হবে বলে তিনি হিন্দু মুসলমানের আবাসভূমির অদল-বদল সুপারিশ করেন। ১৯৩৮ সনে সার আবদুল্লা হারুন হিন্দু ও মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্রের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। ১৯৩৯ সনে সার মহম্মদ শা

নওয়াজ খাঁ তার Confederacy of India গ্রন্থে ভারতবর্ষকে পাঁচ বিভাগে ভাগ করেছেন, এবং প্রত্যেক বিভাগ বিভিন্ন রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হবে। এই বিভিন্ন রাষ্ট্র "Confederacy of India" গঠন করবে, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে : The foreign element amongst us is quite negligible and weare as much sons of the soil as the Hindus are. Ultimately our destiny lies within India and not out of it. ১৯৪০ সনে মিঃ রহমত আলি তাঁর পাকিস্থান রাষ্ট্রের এলাকা বিস্তৃত করে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যথা—পাকিস্থান (পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, কাশ্মীর, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), উসমানিস্থান (হায়দারাবাদ) এবং বাঙ্গী-ইসলাম (বাংলা ও আসাম)। এই তিনটি রাষ্ট্র সম্মিলিত হয়ে এক যুক্তরাষ্ট্র গড়বে। ১৯৪০ সনে মোসলেম লীগের লাহোর অধিবেশনে মিঃ জিন্না তাঁর পাকিস্থান-পরিকল্পনার প্রথম রূপদান করেন। তাঁর যুক্তি ও কল্পনা ১৯৩৩ সনের কেম্‌ব্রিজ বিবৃতি ও ১৯৩৫ সনের মিঃ রহমত আলির কেম্‌ব্রিজ অভিভাষণ হতে গৃহীত। তাঁর লাহোর প্রস্তাব-ব্যাখানে তিনি জেহাদ ঘোষণা করলেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে এবং পার্লামেণ্টারি অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ দ্বারা শাসনবিধানের বিরুদ্ধে, ১৯৪১ সনে সার সিকান্দার হিয়াত খাঁ ভারতের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনা প্রচার করেন। তিনি ভারতবর্ষকে সাত ভাগে ভাগ করেন। কিন্তু ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি। যদিচ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার-সীমা অত্যন্ত সংকুচিত থাকবে। আজাদ মোসলেম বোর্ড যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে গ্রহণ করেছে এবং লীগের লাহোর প্রস্তাবকে সমর্থন করেনি। মিঃ জিন্নার পাকিস্থান পরিকল্পনা মুসলমান সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তি দ্বারা সমর্থিত, এমন কথা বলা যায় না।

মিঃ জিন্না "টু-নেশন থিওরি"র সাহায্যে ভারতীয় সমস্যার সমাধানের পথ আবিষ্কার করেছেন, এবং সেই সমাধানের পথ সম্বন্ধে ডক্টর টমসন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : Two nations, Mr. Jinnah, confronting each other in every province ? every town ? every village ?

Two nations confronting each other in every province, every town, every village. That is the only solution.

That is a very terrible solution, Mr. Jinnah.

It is a terrible solution. But it is the only one.

এই নিবন্ধে মুসলমান রাজনীতিকের চিন্তাধারার সূত্র আখ্যাত হল বটে, কিন্তু কোন আলোচনের চেষ্টা এখানে নেই। এতে এই কথাটাই সুস্পষ্ট হয় যে, ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ইসলামের আবেষ্টন ও প্রভাবকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রনীতি এখনও ধরা দেয়নি—তারই ফলে ভারতীয় মুসলমান রাজনীতিক যতটা মুসলমানধর্মী ততটা ভারতীয় নন। কেন নন, সে প্রশ্ন আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, অপরাধ শুধু বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের নয়, অপরাধ সমগ্র জাতির। কারণ সমাজবোধ ও সমগ্রতাবোধের বাধা প্রতি পদে পদে।

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীবিনোদচন্দ্র চৌধুরী

বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার্তিক-পৌষ ১৩৫০

লে-আউট
ডিজাইনিং
ব্লক মেকিং
আর্ট প্রিন্টিং
স্লাইড মেকিং
★ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিল্পীর -
তত্ত্বাবধানে হাফটোন ও লাইন -
ব্লক এবং বহুবর্ণ চিত্রের উৎকৃষ্ট
মুদ্রণ নিখুঁতরূপে করা হয়।
Phone: B. B. 3793
Gram: 'Otogravure'
বেঙ্গল
অটোটাইপ
কোম্পানী
প্রসেস এনগ্রেভারস
আর্ট প্রিন্টারস
এবং ডিজাইনারস
২১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট · কলিকাতা

ডিজাইনের সৌষ্ঠব
অলঙ্কার নির্মাণে—ডিজাইনের সৌষ্ঠব, মনোরম কাজ এবং স্বর্ণের বিশুদ্ধতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দোকানে নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ হাল ফ্যাসনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অল্প সময়ে পছন্দ মত জিনিষ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। মফঃস্বলের অর্ডার ভি. পি. ডাকে পাঠান হয়। পুরাতন স্বর্ণের পরিবর্ত্তে নূতন অলঙ্কার পাওয়া যায়। কাজের তুলনায় মজুরী সুলভ এবং প্রত্যেকটি অলঙ্কারের জন্য গ্যারান্টি থাকে।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক-পৌষ ১৩৫১

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

প্রতি সংখ্যা এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। বিশ্বভারতী পত্রিকা এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়স্বরূপ হইবে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হইবে।

সম্পাদনা-সমিতি

সম্পাদক : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সদস্যবর্গ :

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

শ্রাবণ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। বৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়—শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র ও বৈশাখ-আষাঢ়। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। বার্ষিক মূল্য রেজেস্ট্রী ডাকে ৫।০। বিশ্বভারতীর সদস্যগণ পক্ষে ৪।০। চিঠিপত্র, প্রবন্ধাদি ও টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণীয় :

কর্মাধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা
বিশ্বভারতী কার্যালয়
৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

টেলিফোন : বড়বাজার ৩৯৯৫

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান

মূল্যবান লিথো কাগজে মুদ্রিত

সুদৃঢ় শোভন বাঁধাই

উপহারোপযোগী নূতন সংস্করণ

মূল্য পাঁচ টাকা

আত্মজীবনী

তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য তিন টাকা

সঞ্চয়িতা

যাঁহারা সঞ্চয়িতা প্রথম খণ্ড (মাঘ ১৩৫১) কিনিয়াছেন কিন্তু এ যাবৎ দ্বিতীয় খণ্ড (চৈত্র, ১৩৫০) কেনেন নাই তাঁহাদিগকে প্রথম খণ্ডের সহিত প্রদত্ত পত্রী পাঠাইয়া ৩১শে মার্চ ১৯৪৫ তারিখের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। ঐ তারিখের পর দ্বিতীয় খণ্ড সঞ্চয়িতা স্বতন্ত্র আর বিক্রয় করা হইবে না। দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য চারি টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা
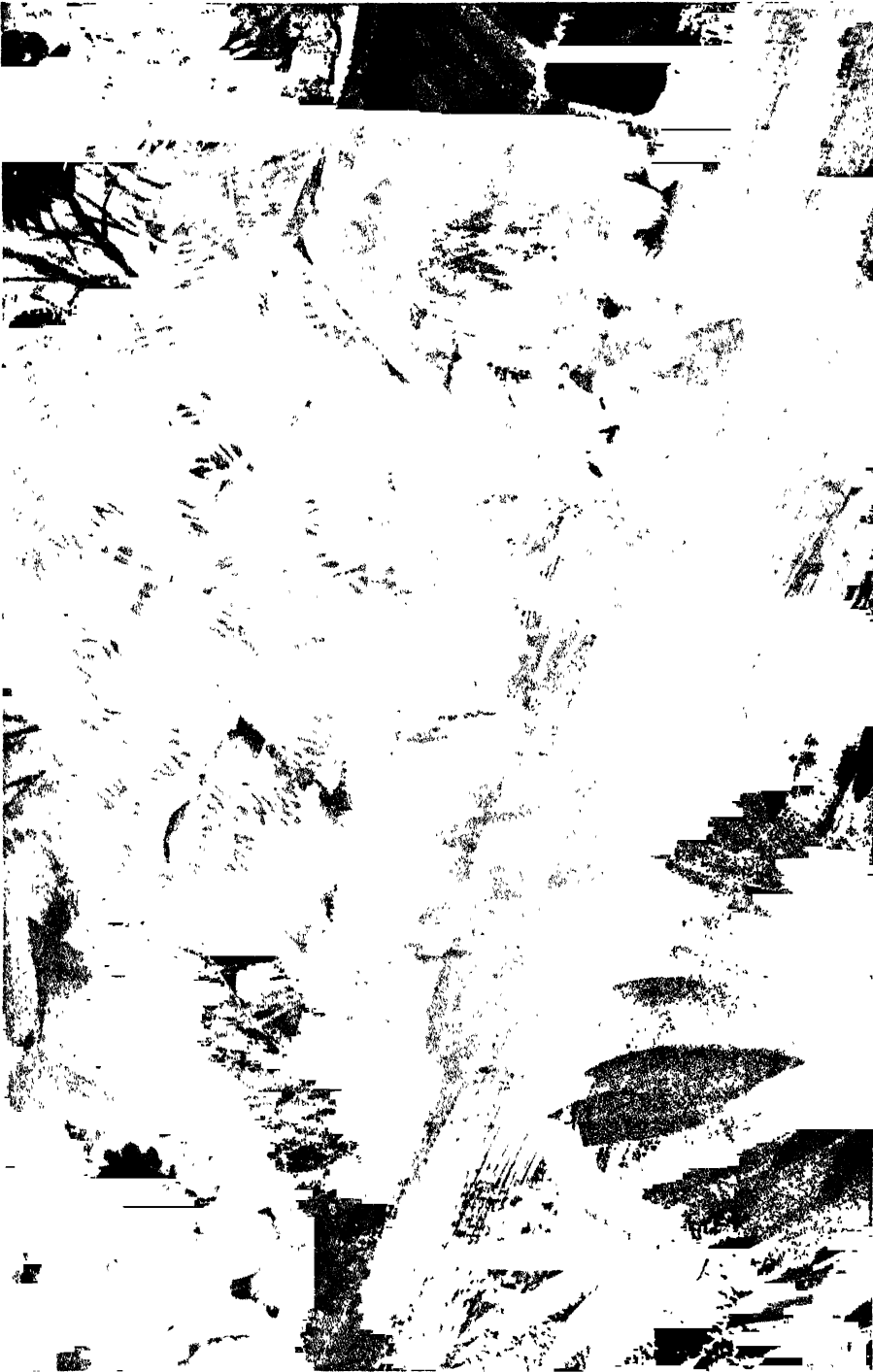
শান্তিনিকেতনের পথ

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক - পৌষ ১৩৫১

ছবি-আঁকিয়ে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছেঁড়াখোঁড়া মোর পুরোনো খাতায়
ছবি আঁকি আমি যা আসে মাথায়
যক্ষনি ছুটি পাই।
বঙ্কিম মামা বুঝিতে পারে না ;
বলে যে, কিছুই যায় না তো চেনা ;
বলে, কী হয়েছে, ছাই।
আমি বলি তারে, এই তো ভালুক,
এই দেখো কালো বাঁদরের মুখ,
এই দেখো লাল ঘোড়া—
রাজপুত্তুর কাল ভোর হলে
দণ্ডকবনে যাবেন যে চ'লে—
রথে হবে ওরে জোড়া।
উঁচু হয়ে আছে এই যে পাহাড়,
খোঁচা খোঁচা গায়ে ওঠে বাঁশঝাড়,
হেথা সিংহের বাসা।
এঁকে বেঁকে দেখো এই নদী চলে,
নৌকো এঁকেছি ভেসে যায় জলে,
ডাঙা দিয়ে যায় চাষা।
ঘাট থেকে জল এনেছে ঘড়ায়—
শিবুঠাকুরের রান্না চড়ায়
তিন কন্যা যে এই।

সাদা কাগজের চর করে ধূ ধূ,
সাদা হাঁস দুটো ব'সে আছে শুধু,
কেউ কোথাও নেই।
গোল ক'রে আঁকা এই দেখো দিখি,
সূর্যের ছবি ঠিক হয়নি কি,
মেঘ এই দাগ যত।
শুধু কালি লেপা দেখিছ এ পাতে—
আঁধার হয়েছে এইখানটাতে,
ঠিক সন্ধ্যার মতো।
অমি তো পষ্ট দেখি সবকিছু—
শালবন দেখো এই উঁচুনিচু,
মাছগুলো দেখো জলে।

"ছবি দেখিতে কি পায় সব লোকে,
দোষ আছে তোর মামারই দু চোখে"
বাবা এই কথা বলে।

৬ পৌষ, ১৩৩৬

হনুচরিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হনু বলে, "তুলব আমি গন্ধমাদন,
অসাধ্য যা তাই জগতে করব সাধন।"
এই ব'লে তার প্রকাণ্ড কায় উঠল ফুলে।
মাথাটা তার কোথায় গিয়ে ঠেকল মেঘে,
শালের গুঁড়ি ভাঙল পায়ের ধাক্কা লেগে,
দশটা পাহাড় ঢাকল তাহার দশ আঙুলে।
পড়ল বিপুল দেহের ছায়া যে দিক বাগে
দুপরবেলায় সেথায় যেন সন্ধ্যা লাগে,
গোরু যত মাঠ ছেড়ে সব গোষ্ঠে ছোটে।

সেই দিকেতে সূর্যহারা আকাশতলে
দিন না যেতেই অন্ধকারের তারা জ্বলে,
শেয়ালগুলো হুক্কাহুয়া চেঁচিয়ে ওঠে।
লেজ বেড়ে যায় হু হু ক'রে এঁকে বেঁকে,
লেজের মধ্যে বন্যা নামল কোথা থেকে,
নগরপল্লী তলায় তাহার চাপা পড়ে।
হঠাৎ কখন্ মস্ত মোটা লেজের বাধায়
নদীর স্রোতের মধ্যখানে বাঁধ বেঁধে যায়,
উপড়ে পড়ে দেবদারুবন লেজের ঝড়ে।
লেজের পাকে পাহাড়টাকে দিল মোড়া,
ঝেঁকে ঝেঁকে উঠল কেঁপে আগাগোড়া,
হুড়্দাড়িয়ে পাথর পড়ে খ'সে খ'সে।
গিরির চূড়া একপাশেতে পড়ল ঝুঁকি,
অরণ্যে হয় গাছে গাছে ঠোকাঠুকি,
আগুন লাগে শাখায় শাখায় ঘ'ষে ঘ'ষে।
পক্ষী সবে আর্তরবে বেড়ায় উড়ে,
বাঘভালুকের ছুটোছুটি পাহাড় জুড়ে,
ঝরনাধারা ছড়িয়ে গেল ঝর্ঝরিয়ে।
উপুড় হয়ে গন্ধমাদন পড়ল লুটে,
বসুন্ধরার পাষাণবাঁধন যায় রে টুটে
ভীষণ শব্দে দিগ্দিগন্ত থর্থরিয়ে।
ঘূর্ণিধুলা নৃত্য করে অম্বরেতে,
ঝঞ্ঝাহাওয়া হুংকারিয়া বেড়ায় মেতে,
ধূসর রাত্রি লাগল যেন দিগ্বিদিকে।
গন্ধমাদন উড়ল হনুর পৃষ্ঠে চেপে,
লাগল হনুর লেজের ঝাপট আকাশ ব্যেপে,
অন্ধকারে দন্ত তাহার ঝিকিমিকে।

২ পৌষ, ১৩৩৬

এই দুটি কবিতা এ পর্যন্ত কোনো পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে শ্রীকানাই সামন্ত কর্তৃক সংকলিত।

ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিত

১৮৮৭-১৮৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ শ্রীইন্দিরা দেবীকে যে-সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থখানি প্রধানত তাহারই সংকলন, কেবল প্রথম আটখানি চিঠি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা। এই সময়ে লিখিত যাবতীয় চিঠি শ্রীইন্দিরা দেবী দুটি খাতায় স্বহস্তে নকল করিয়া রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়াছিলেন। এই খাতা দুটি অবলম্বন করিয়াই ১৩১৯ সালে 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয়; এই পত্রপর্যায়ের বহুসংখ্যক চিঠি রবীন্দ্রনাথ তখন গ্রন্থান্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, অনেক চিঠির অংশবিশেষ সাধারণের সমাদরযোগ্য নহে সম্ভবত এইরূপ মনে করিয়াই তিনি বর্জন করেন।

সম্প্রতি এই খাতা দুইখানি পাওয়া গিয়াছে এবং শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত হইয়াছে। যে-সকল চিঠি ছিন্নপত্রে মুদ্রিত হয় নাই এখন হইতে সেগুলি ধারাবাহিকভাবে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। বর্জিত পত্র ও পত্রাংশ পরিশিষ্টে যোগ করিয়া ছিন্নপত্রের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশেরও সংকল্প আছে।

শিলাইদহ হইতে ১১ মার্চ ১৮৯৫ তারিখে শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিত একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে এই চিঠিগুলি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, এই পত্রধারার ভূমিকাস্বরূপে নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল :

...আমার বোধ হয় বহুকাল থেকে তোকে আমি এ সব জায়গা থেকে যে-সকল চিঠি লিখেছি সকলেরই ভাবখানা এক। বারবার আমি একই কথা একই আগ্রহকে একই ভাষায় প্রকাশ করেছি—আমার আর অন্য উপায় নেই—কারণ, আমি ঠিক একই ভাব প্রতিবারেই নতুন করে অনুভব করি। আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে, তোকে যে সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কতদিন কত মুহূর্ত্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি—সেগুলো বোধ হয় তোর চিঠির বাক্সর মধ্যে ধরা আছে—আমার চোখে পড়লেই আবার সেই সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে। ওর মধ্যে যা কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত সেটা তেমন বহুমূল্য নয় কিন্তু যেটাকে আমি বাইরের থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, যেটা এক-একটা দুর্লভ সৌন্দর্য্য, দুর্মূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামান্য উপার্জ্জন—যা হয়ত আমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি, যা কেবল আমার সেই চিঠির পাতার মধ্যে রয়েছে জগতের আর কোথাও নেই—তার মর্য্যাদা আমি যেমন বুঝ্‌ব এমন বোধ হয় আর কেউ বুঝ্‌বে না। আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস্—আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্য্যসম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব— কেননা, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তাহলে এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব—তখন এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে—তখন পূর্ব্বজীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে। তখন আজকেকার এই পদ্মার চর এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্তজ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাট্‌কাভাবে ফিরে পাব—আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।

সাজাদপুর

[জানুয়ারি ১৮৯০]

এখানকার এন্‌ট্রান্স স্কুলের ছাত্রেরা একটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভা করেছে—তাতে তারা নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন—সেই সভার মুখ উজ্জ্বল করবার জন্যে এখানকার মাষ্টাররা আমাকে পাক্‌ড়াও করতে এসেছিলেন—আমার কবিত্ব এবং অন্যান্য বিবিধ সদ্‌গুণ সম্বন্ধে যখন তাঁরা সকলে মিলে লাগলেন— যখন সকল মাষ্টার এবং সকল পণ্ডিতের মধ্যে আমার গুণব্যাখ্যা নিয়ে রীতিমত রোখ চেপে গেল,

একজন যেখেনে থামেন আরেকজন সেখেন থেকে আরম্ভ করেন—একজন যদি বলেন কবি, আরেকজন বলেন শ্রেষ্ঠ কবি, আরেকজন বলেন যেমন ভাষা তেম্‌নি ভাব, চতুর্থ বলেন সকলি নূতন, বাঙ্গলা সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে এমন কিছু হয়নি—পঞ্চম যা বল্লেন তা লোকসমাজে প্রকাশযোগ্য নহে, ষষ্ঠের কথা শুনে আমার কর্ণাগ্রভাগ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করলে—সপ্তম কিছু বলবার পূর্ব্বেই আমি অগৌণে তাঁদের সুনীতিসঞ্চারিণী সভায় উপস্থিত হতে সম্মতি দান করলুম। এখানকার স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার আমার হেঁয়ালি নাট্যের[১] বিশেষ ভক্ত—তিনি বল্লেন, আমার "হেঁইলি নাট্য" বাঙ্গলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন—"পড়্যা আমরা হেস্তা কুট্‌পাট্‌!" পর্শুদিন সুনীতিসঞ্চারিণী সভায় যাওয়া গেল। ছেলেতে বুড়োতে মিলে শ'পাঁচছয় লোক উপস্থিত—কেউবা একরত্তি, পায়ে জুতো নেই, বেঞ্চির উপরে বসে পা দোলাচ্চে আর খক্‌খক্‌ করে কাশ্‌চে, কেউবা মস্ত ডাগর, কালো আল্‌পাকার চাপকানের উপর ঘড়ির চেন—অর্থাৎ আমাদের মুন্সেফ্‌ উকীল ইত্যাদি। আমি নিতান্ত মুষড়ে বসে আছি, হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মুখ লাল হয়ে উঠেছে—এমন সময়ে এক ব্যক্তি প্রস্তাব করলেন ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন্‌—মুন্সেফবাবু বল্লেন আমি অনুমোদন করি। বিনাবাক্যব্যয়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করলুম। ছাত্রেরা আজ বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। সেই অপেক্ষা করে বসে আছি। ...... তারপরে ওরি মধ্যে একটি ডাগর-ডোগর ছেলে উঠে Modesty সম্বন্ধে ইংরিজি ভাষায় একটি বক্তৃতা পাঠ করলে, বল্লে— Modesty is an ornament of mind. Modest men are praised and immodest men are blamed by all. Every man is pleased to see a modest man, but a proud man is very much disliked. Newton was a modest man. When his dog upset an ink bottle on his papers, Newton said to his dog—My friend, you do not know what harm you did to me—such was his modesty. Brethren, let us all be like Newton. One day Chaitanya was walking in the street—a dog was lying on his way—Chaitanya said—My friend, please move a little—the dog moved away at once—such was the force of modesty. The dog required no beating. We should treat every man like this dog. এইরকম অনেক সদুপদেশ দিয়েছিল। দ্বিতীয় ছাত্র উঠে সুললিত বঙ্গভাষায় বলতে লাগল—"একদা সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছিলাম। নিদাঘমার্ত্তণ্ডতাপে পরিতাপিত হইয়া এক বিহঙ্গকূজিত মনোরম উপবনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। (সুদীর্ঘ বর্ণনা)। একস্থানে দেখিলাম একদল পুরুষ পরুষবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক ঘোরতর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। জানিতে পারিলাম না ইহারা কে—সঙ্গীগণ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়াতে তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক কুমুদকহ্লারশোভিত হংসসারসসেবিত সুশীতল সরোবরতীরে উপস্থিত হইলাম (দীর্ঘ বর্ণনা)। সেখানে কতকগুলি অপূর্ব্ব-সুন্দরী যুবতী জলক্রীড়া করিতেছে—দেখিয়াই বোধ হইল তাহারা দেবকন্যা। পরে জানিতে পারিলাম পূর্ব্বোক্ত পুরুষগণ ঔদ্ধত্য অহঙ্কার—এবং এই সুন্দরী যুবতীগণ বিনয়। বিনয়ের অশেষ গুণ। যতগুলি

---

১ 'ভারতী' পত্রে 'হেঁয়ালি নাট্য' নামে ১২৯২-১২৯৪ সালে প্রকাশিত, পরে 'হাস্যকৌতুক' গ্রন্থে সংকলিত।

গুণে সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর মানবকলেবর বিভূষিত করিয়াছেন তন্মধ্যে বিনয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। আহা! মানবের মধ্যে বিনয়গুণ সন্দর্শন করিলে নয়ন আনন্দাশ্রুজলে প্লাবিত ও অন্তঃকরণ হর্ষপারাবারে নিমগ্ন হয়।" ইত্যাদি। তারপরে আর একটি ছেলে উঠেই আরম্ভ করে দিলে—

বিনয়ের তুল্য গুণ আর কোথা নাই—
বিনয়ীর বশ হয় সর্ব্বলোকে ভাই,
পিতামাতা সকলের বাধ্য হয়ে রবে—
তবে ত তোমারে সবে বিনয়ী কহিবে। ইত্যাদি

আর একটি ছেলে বিনয় থেকে আরম্ভ করলে, শেষ করলে প্রকৃত প্রেম কাকে বলে এবং ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা। প্রত্যেক বক্তৃতার পরে খানিকক্ষণ চটাপট্ হাততালি পড়তে লাগল। আমি তো নিতান্ত হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছি—এমন সময়ে Headmaster এসে বল্লেন, আরো অনেক রচনা আছে কিন্তু আপনার বক্তৃতা শোনবার জন্যে সকলে উৎসুক হয়ে আছেন। মুখটুক শুখিয়ে, হাত পা কালিয়ে, কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করতে লেগে, কেশে কুশে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করে দিলুম। বল্লুম, বিনয় সম্বন্ধে কিছু বলবার পূর্ব্বেই একান্ত বিনীতভাবে বলা আবশ্যক, আমার বলবার শক্তি নেই—বিশেষতঃ বিনয় সম্বন্ধে আমি যে বেশী কথা বলতে পার্ব্ব এমন সাধ্য আমি রাখিনে। বিনয় যে একটা সদ্‌গুণের মধ্যে সে সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ববক্তা ছাত্রবৃন্দের আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। নিউটন বিনয়ী ছিলেন বটে তার আর কোন সন্দেহ নেই— এইরকম ত ব্যাপার। ক্রমে ক্রমে বলতে বলতে দুটো চারটে কথা বেরিয়ে গেল। তারপরে আমি বসলে পর পরে পরে দুজন উঠে আমার এবং আমার পিতৃপিতামহের গুণব্যাখ্যা করতে লাগল। প্রথমে উঠলেন হেড্ পণ্ডিত। তিনি বল্লেন তাঁর বলবার ক্ষমতা নেই কিন্তু আমার বক্তৃতা শুনে এমনি মুগ্ধ হয়েছেন যে সামলাতে পারচেন না—কবিত্বশক্তি, বক্তৃতাশক্তি এবং তার উপরে সঙ্গীতশক্তি আমি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই বলে ধপ্ করে বসে পড়লেন। সেকেণ্ড মাষ্টার উঠে বল্লেন—পণ্ডিত মহাশয় যা বল্লেন তাতে আমার মন তৃপ্ত হল না—যথেষ্ট বলা হয়নি। যিনি আজ আমাদের সভায় উপস্থিত আছেন তিনি বড় সাধারণ লোক নন—স্বর্গীয় মহাত্মা (এইখেনে প্রায় পাঁচ মিনিটকাল তাঁর নাম মনে পড়ল না, পাশের থেকে কে বলে দিলে) দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম কে না জানে, সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর নাম রাষ্ট্র বল্লে অত্যুক্তি হয় না—তিনি এঁর পিতামহ—রাজর্ষি বল্লেও হয় মহর্ষি বল্লেও হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁর পিতা! তারপরে এল কবিত্বশক্তি এবং "হেঁইলি নাট্য", আমি শুনে অপ্রস্তুত। তারপরে বল্লেন বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার দরকার কি—Example is better than precept— ইনিই বিনয়ের দৃষ্টান্তস্থল ইত্যাদি ইত্যাদি। সবাই হাততালি দিলে। তারপরে সভা ভঙ্গ হল।

সাজাদপুর
রবিবার, ২০ মাঘ [১২৯৭, ফেব্রুয়ারি ১৮৯১]

সকালে উঠে অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে বিস্তর গড়িমসি করতে করতে সেই ডায়ারিটা[২] লিখছিলুম —ঘণ্টা দুয়েক হল দেড়পাতা-খানেক লিখেছিলুম—এমৎকালে বেলা দশটার সময় হঠাৎ রাজকার্য্য উপস্থিত

২ 'সাধনা' পত্রে প্রকাশিত পঞ্চভূতের ডায়ারি।

হল—প্রধানমন্ত্রী এসে মৃদুস্বরে বল্লেন, একবার রাজসভায় আসতে হচ্চে। কি করা যায়—লক্ষ্মীর তলব শুনে সরস্বতীকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠতে হল—সেখানে ঘণ্টাখানেক দুরূহ রাজকার্য্য সম্পন্ন করে এইমাত্র আস্‌চি। আমার মনে মনে হাসি পায়—আমার নিজের অপার গাম্ভীর্য্য এবং অতলস্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা কল্পনা করে সমস্তটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়। প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কি মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্ব্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপরে বসে বসে ভাণ করচি যেন এই সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মত দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্ম্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই সমস্ত ছেলেপিলে-গরুলাঙ্গল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কি ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়। বোট থেকে কাছারি পর্য্যন্ত আমি হেঁটে আসবার প্রস্তাব করে-ছিলুম, নায়েব বিজ্ঞভাবে বল্লেন—কাজ নেই! কি জানি যদি ঐ ভুলে আঘাত লাগে! Prestige মানে হচ্চে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জান্‌ত, তাহলে আপনাদের একজন বলে চিন্‌তে পারত, সেই ভয়ে সর্ব্বদা মুখোষ পরে থাকতে হয়। সাধারণ ইতর মানুষের মত পদযুগল চালনা করে এই ইতর পৃথিবীর উপর দিয়ে চলিনে, বন্দুক ঘাড়ে বরকন্দাজ হুহুঙ্কারে সম্মুখ থেকে সকলকে হাঁকিয়ে দিয়ে চলেছে—যেন আমার চেয়ে অগ্রবর্ত্তী হওয়া লোকের পক্ষে একটা বেআদবী। কিন্তু ছদ্মবেশ করলেও মন থেকে বিশ্বাস দূর হয় না যে আমাকে আমারি মত দেখাচ্চে—এবং আমি যেমন অভিনয় করচি ওরা তেম্‌নি অভিনয়মাত্র করচে। ওরা বল্‌চে, "আঃ কাজ কি গোলমালে। নাহয় রাজাই সাজালে!" কেবল আমিই আমার আপনাকে বল্‌চি, "আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা!"—

বোলপুর, ১৫ই মে, ১৮৯২

বেলি[৩] স্পষ্টই বল্‌চে সে বিলেতের নীচেই বোলপুর ভালবাসে, খোকাও[৪] সেই মতে ডিটো দিয়ে যাচ্চে—রেণুকা[৫] কোনপ্রকার ব্যক্ত শব্দে আপন মনের ভাব প্রকাশ করতে পারচে না। দিবানিশি নানা প্রকার অব্যক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করচে, এবং তাকে সাম্‌লে রাখা দায় হয়েচে।—সে কেবল চতুর্দ্দিকেই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করচে এবং অঙ্গুলির অনুগামী হবার চেষ্টা করচে—আমার সঙ্গে যে এক রেজিমেণ্ট ভৃত্য এসেছে সকলেই প্রায় সেই ক্ষুদ্র মহাপ্রভুকে নিয়েই নিযুক্ত আছে—এই ভৃত্যদের কর্ত্তৃক তার দুরন্ত বেগবান ইচ্ছাসকল ক্রমাগত প্রতিহত হয়ে প্রতিমুহূর্ত্তেই তীব্র আর্ত্তনাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠচে।—আমার পুত্রসন্তানটি নিস্তব্ধ নীরব স্থিরভাবে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে—কি ভাবচে তা কারো বোঝবার যো নেই।

---

৩ জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা দেবী।

৪ জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫ দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা দেবী।

বোলপুর, মঙ্গলবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ [১২৯৯]

"জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর"—ও একটা বয়সের একটা বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সব-প্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়। যেমন নব-দন্তোদ্গতা রেণুকা মনে করচেন সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে দিতে পারেন—ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায় মনটা যথার্থ কি চায় এবং কি চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সঙ্কীর্ণ সীমা অবলম্বন করে, জলতে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবী করে বস্‌লে কিছুই পাওয়া যায় না—অবশেষে একটা কোন কিছুর ভিতরে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায়। প্রভাতসঙ্গীতে আমার অন্তর্প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখী উচ্ছ্বাস, সেই জন্যে ওটাতে আর কিছুমাত্র বাচবিচার বাধাব্যবধান নেই। এখনো আমি সমস্ত পৃথিবীকে একরকম ভালবাসি—কিন্তু সে এরকম উদ্দামভাবে নয়—আমার ভালবাসার জ্যোতিষ্কলোক থেকে একটা দীপ্তি প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত মানবের উপর পড়ে—সেই দীপ্তিতে এক এক সময় পৃথিবীটা ভারি সুন্দর এবং ভারি আপনার বোধ হয়। যাদের খুব ভালবাসা যায় তারা সীমাবদ্ধভাবে আমাদের মনের গতিরোধ করে না, তাদের মধ্যে আমাদের হৃদয় চিরকাল সঞ্চরণ করতে পারে—যাদের আমরা ততটা ভালবাসিনে, তারা আমাদের কাছে অসীম নয়। তাদের আমরা আংশিকভাবে দেখি, তারা যতটুকু প্রতীয়মান কেবল ততটুকু, এই জন্যে তারা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকলে অস্বচ্ছ দেয়ালের মত আমাদের চারদিক থেকে রুদ্ধ করে রাখে, মনকে কোন একটা চিন্তার প্রসারতার মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলে পদে পদে তাদের উপরে গিয়ে ঠেকে যায়, এবং আপনার মধ্যে সে বিরক্ত-ভাবে ফিরে আসে। এই জন্যে সকল সময়ে সাধারণের সঙ্গ ভাল লাগে না। যখন ঘরে আছি তখন দেয়াল বেশ লাগে, এমন কি, তখন দেয়াল না হলে চলে না। যখন বাইরে গেছি তখন সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল চল্লে আদবে ভাল লাগে না। অতএব লোকারণ্যের উপর বিরক্তি প্রকাশ করচি বলে মনে করিস্‌নে আমি একেবারে মিস্তান্থ্রোপ্ হয়ে গেছি—আমি কেবল এইটুকু বলতে চাই, এক একটা সময় আসে যখন এতগুলো লোক না থাকলে বেশ চলে যায়।··· আমার যে কিছুমাত্র ধৈর্য্য নেই। সেটা বোধ হয় পুরুষ-মানুষের একটা লক্ষণ—তারা একেবারে হুড়মুড় করে সমস্তটা নিকেশ করে ফেলতে চায়, বেশ ধীরে নিঃশব্দে সুচারু সুনিপুণ সুন্দররূপে কিছু করে উঠতে পারে না—পৃথিবীতে চিরকাল মজুরের কাজ করে করে তাদের এই দশা হয়েছে। মেয়েরা আজকাল পুরুষদের এই সকল মজুরী কার্য্যভার লাঘব করবার চেষ্টায় আছে, তাহলে আমাদের পরুষ নীরস স্বজাতীয়ের পক্ষে মন্দ হয় না—একটুখানি চারুতা চর্চা করবার অবকাশ পাওয়া যায়—কিন্তু এই প্রকাণ্ডকায় হতভাগারা সে দিকে যে বেশি মন দেবে তা মনে হয় না—বোধ হয় অধিক সময় পেলে অজগরের মত আহার করবে এবং অজগরের মত নিদ্রা দেবে। অদূর ভবিষ্যতে পুরুষ-জাতির ভারি একটা লাঞ্ছনার সময় আস্‌চে বলে মনে হয়। সভ্যতা ক্রমেই এমন সুকুমার সূক্ষ্মতার দিকে যাচ্চে যে এই মোটা জন্তুগুলো ভারি ফাঁপরে পড়বে। পৃথিবীর আদিম অবস্থাতেই ম্যামথ্ ম্যাষ্টডন্ প্রভৃতি বিপুলকায় প্রাণীর প্রাদুর্ভাব ছিল—তাদের জোরই বা কত—চামড়াই বা কি শক্ত—তারা ত সব উচ্ছন্ন গেল। এখন কচি-চামড়া সাড়েতিনহাত মনুষ্য পৃথিবীর রাজা। কিন্তু আমাদের সময় প্রায় হয়ে এসেচে—এখন আরো কচির আবশ্যক।*

* এই চিঠির একাংশ জীবনস্মৃতির প্রভাতসংগীত অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বোলপুর, বুধবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯

সেদিন সন্ধেবেলায় খোকাতে বেলাতে একটা বিষয় নিয়ে তর্ক হয়ে গেছে, সেটা উদ্ধৃত করবার যোগ্য। খোকা বল্লেন—"বেলা, আমার জল ক্ষিধে পেয়েচে।" বেলা বল্লেন—"দুর ফোক্‌লা, জল ক্ষিধে বুঝি বলে। জল তেষ্টা।" খোকা অত্যন্ত দৃঢ়স্বরে—"না জল ক্ষিধে।" বেলা—"আঁ্যা খোকা! আমি তোর চেয়ে তিন বছরের বড়, তুই আমার চেয়ে দুবছরের ছোট, তা জানিস্। আমি তোর চেয়ে কত বেশি জানি?" খোকা সন্দিগ্ধভাবে—"তুমি এত বড়!" বেলা—"আচ্ছা, বাবাকে জিজ্ঞাসা কর্।" খোকা অকস্মাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে—"তেম্‌নি আমি যে দুধ খাই, তুমি যে দুধ খাও না।" বেলা অবজ্ঞাভরে—"তাতে কি! মা ত দুধ খায় না তাই বলে কি মা তোর চেয়ে বড় নয়!" খোকা সম্পূর্ণ নিরুত্তর, এবং বালিশে মাথা রেখে চিন্তান্বিত। তখন বেলা বক্‌তে আরম্ভ করলে "O father, একজনের সঙ্গে আমার ভয়ানক ভয়ানক friendship। সে পাগ্‌লী, সে এমন মিষ্টি! Oh, I can eat her up!" বলে ছুটে রেণুকে গিয়ে এক পত্তন চটকে চুমো খেয়ে কাঁদিয়ে দিয়ে এল।

কালকে বেলা বড় ব্যথিত হয়ে এসেছিল! ঘটনাটা হচ্ছে, কাল স্বয়ম্প্রভারা[৭] ছোট বাঙ্গলাতে মাছের তরকারী রাঁধতে গিয়েছিল। সেখানে একটা পাগল কতকগুলো আম নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল—ছোট বৌ[৮] স্বয়ম্প্রভারা ভয় পেয়ে তাকে বিদায় করে দেয়। আমি দোতালার ঘরে চুপ্‌চাপ্ শুয়েছিলুম। বেলা ছোট বাঙ্গলা থেকে ফিরে এসে আমাকে কাতরভাবে বলতে লাগল, "বাবা, একজন ভারি গরীব লোক, বেচারার ক্ষিধে পেয়েচে তাই আম নিয়ে নীচের বাঙ্গালায় বসেছিল তাকে লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে দিলে।" বারবার করে বলতে লাগল, "বেচারা ভারি গরীব, তার কিচ্ছু নেই, এতটুকু একটু কাপড় পরা, বোধ হয় শীতকালে কিচ্ছু পরতে পায় না, তার শীত করে। সে তো কিচ্ছু দোষ করেনি। তার নাম জিজ্ঞাসা করলে, সে নাম বল্লে। বল্লে সে স্বর্গে থাকে। তাকে তাড়িয়ে দিলে, সে বেচারা কিচ্ছু বল্লে না। এমনি চলে গেল।"—আমার এম্‌নি মিষ্টি লাগল! বেলিটার বাস্তবিক ভারি দয়া। কাল সে এমন সত্যিকার কাতরতার সঙ্গে বল্লে—এই অনর্থক নিষ্ঠুরতা তার কাছে এমনি অকারণ বোধ হয়েছিল শুনে আমার মনটা ভারি আর্দ্র হয়েছিল। বেলিটা বড় হলে খুব স্নেহময়ী সরলস্বভাব লক্ষ্মী মেয়ে হবে। খোকাটারও ভারি স্নেহশীল ভাব। রেণুকে সে এম্‌নি ভালবাসে। এমনি মিষ্টি মিষ্টি করে আদর করে, তার সমস্ত উপদ্রব এমন সহিষ্ণুভাবে সহ্য করে যায়—যে অনেক মাও এমন করে না।

বোলপুর, রবিবার, ১০ই জ্যৈষ্ঠ [১২৯৯]

কাল বিকেলে ভয়ানক বৃষ্টি বাদল দুর্য্যোগ গেছে, সেটা আক্ষেপের বিষয় নয়। বরঞ্চ ভালই; গাছপালাগুলো এবং পৃথিবীর তৃণ-আবরণ বেশ একটু সবুজ চিক্‌চিকে টস্‌টসে হয়ে উঠুক্। দেখে চোখ জুড়োক। আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত স্নিগ্ধ সজল মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যাক্—বনভূমি গাঢ় ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আসুক, অবিরল বৃষ্টিধারা দিক্‌বধূদের অবগুণ্ঠন রচনা করে দিক্, ঘন পল্লবের উপর ঝর্‌ঝর্ বৃষ্টিপতনের শব্দে অরণ্য মুখরিত হয়ে উঠুক, ছোট বড় ক্ষণজীবন জলস্রোত বিচিত্র লীলা ও কলরবে

---

৭ ভাগিনেয়ী স্বয়ম্প্রভা দেবী, শরৎকুমারী দেবীর কন্যা

৮ পত্নী মৃণালিনী দেবী

নিশ্চল বিস্তীর্ণ ভূমিকে চারিদিক থেকে শৈশবচাঞ্চল্যে সজীব করে তুলুক। হয়েওচে সেই রকম। আজ সকালে সমস্ত আকাশ জলভারাক্রান্ত মেঘে যেন নত হয়ে পড়চে, এবং দিগ্বিদিক্ বর্ষার ছায়ায় সুস্নিগ্ধ হয়ে রয়েচে। ...... খোকাটা ভাল করে কথা কইতে পারে না বলে ওর মনের যা কিছু মনেই থেকে যায়, এবং সমস্ত উদ্যম মনের ভিতরে ক্রমিক কাজ করে, এইজন্যে ওর মনে চিন্তার রেখাগুলো খুব গভীর হয়ে পড়ে। বেলা ক্রমিক কথা কয়ে কয়ে ভাল করে কিছু ভাববার এবং ধারণা করবার অবসর পায় না—ওর সমস্ত মানসিক শক্তি অবিরল বাক্য রচনা করতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। কিন্তু ওর মনটি ভারি দয়ার্দ্র—খোকা সেদিন একটা পিঁপড়ে মারতে যাচ্ছিল দেখে ও নিষেধ করবার কত চেষ্টা করলে। দেখে আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হল—আমার ছেলেবেলায় ঠিক ঐ রকম ভাব ছিল, কীটপতঙ্গকেও কষ্ট দেওয়া আমি সহ্য করতে পারতুম না। কিন্তু বড় হয়ে তার চেয়ে কত কঠিন হয়ে গেছি। মনে আছে তখন পরদুঃখে বড় মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পেতুম। এখন আর কই তেমন হয়? বেলা বড় হয়ে এলেও কি এই রকম ক্রমশঃ কঠিন হয়ে আসবে। তা না হতেও পারে—ও কিনা মেয়ে। এক ত ওকে নিজের হাতে কোন নিষ্ঠুরতার কাজ করতে হবে না, তা ছাড়া মেয়েদের মনে চিরকালই একটা ইল্যাষ্টিসিটি থাকে, একেবারে পেকে শক্ত হয়ে যায় না। আমি ছেলেবেলায় জীবের কষ্ট সম্বন্ধে যেরকম অতিসচেতন ছিলুম সেরকম ভাব এখনও থাকলে পৃথিবীতে পদক্ষেপ করা দায় হয়ে উঠত; বোধ হয় পিয়ের্ লটির মত কেবলি বেদনা ও মৃত্যুর দ্বারা আহত হয়ে পদে পদে কেবল ঐ নিয়েই বিলাপ পরিতাপ করতুম। সে বড় উৎপাত! তা ছাড়া, যে সকল বিষয়ে সাধারণতঃ লোকে কোন ব্যথা অনুভব করে না সে সম্বন্ধে নিজের বেদনা প্রকাশ করলে অন্য লোকে অত্যন্ত চটে ওঠে; তারা মনে করে, এ লোকটা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ কর্‌বার চেষ্টা করচে। মনে আছে, আমার বড়রা যখন দয়ার পাত্রকে দয়া করতেন না তখন আমার একটা কিছু যথাসাধ্য বল্‌তে কিম্বা করতে ইচ্ছে করত, কিন্তু ঐ লজ্জায় করতে পারতুম না—পাছে তাঁরা মনে করতেন, ইস্, ইনি যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে আমাদের সকলের উপরে টেক্কা দিতে এসেচেন। মানসিক অনুভবশক্তি সম্বন্ধে নিজের চতুর্দ্দিকের চেয়ে অধিক চেতনাসম্পন্ন হওয়া ভারি আপদের। প্রথমে সেটাকে গোপন করা এবং অবশেষে সেটাকে কমিয়ে আনাই হচ্চে সুযুক্তিসঙ্গত। মনে আছে, ছেলেবেলায় একদিন * * * সঙ্গে গাড়িতে যাচ্চি, পথিমধ্যে একজন ব্রাহ্মণ পথিক আমাদের গাড়ি থামিয়ে বল্লে, আপনারা আমাকে গাড়িতে একটু স্থান দিতে পারেন, আমি পথের মধ্যে নেবে যাব। * * * ভারি রাগ করে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি সেই ঘটনায় ভয়ানক মর্ম্মাহত হয়েছিলুম—একে ত বেচারা শ্রান্ত পথিক, তাতে সে অপমানিত লজ্জিত ও নিরাশ হয়ে চলে গেল। কিন্তু * * * যেখানে দয়া অনুভব করলেন না সেখানে দয়া প্রকাশ করতে আমার ভারি লজ্জা করল—আমি অত্যন্ত কষ্টেও কিছু বলতে পারলুম না, কিন্তু আমার * * * খুব আঘাত লেগেছিল।

শিলাইদহ, রবিবার, ১২ই জুন [১৮৯২]

কালকের চিঠিতে জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যা লিখেচিস্ তা ঠিক কথা। আমরা যে যেখানে এসে পড়েছি আমাদের যথাসাধ্যমত সেই জায়গাটুকু সুখে শান্তিতে উজ্জ্বল করে তোলাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

তোদের প্রসন্ন প্রফুল্ল সুন্দর মুখে, নিঃস্বার্থ সেবা স্নেহ ভালবাসায় তোরা তাই করিস্—তার চেয়ে আর কিছু করবার নেই। আমরা সবাই তা পারি নে। আমরা অভিশপ্ত জীব, এমন একটা দুর্দ্দান্ত অশান্তি সাথের সাথী নিয়ে জন্মগ্রহণ করি যে, সহজ ভাবে সুন্দরভাবে পৃথিবীকে সুখী করা, স্নিগ্ধ করা আমাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না; আমরা কেবল ধড়ফড় করে যে জায়গাটাতে থাকি তার চতুর্দ্দিক ঘুলিয়ে তুলি—জগৎকে মধুর করতে জানি নে,—ঠিক তার বিপরীত। পুরুষ জাতটাকে আমি শতসহস্র ধিক্কার দিই—পৃথিবীতে এমন জঞ্জাল আর নেই।

সাজাদপুর, ৩০শে জুন [১৮৯২]

মেয়েদের নূতন জীবনে প্রবেশ করার যে কি ভাব তা পুরুষের পক্ষে বোঝা একটু শক্ত, বিশেষতঃ আমাদের মত হাড়পাকা বুড়ো লোকের। বোধ হয় ওর মধ্যে খুব একটা নেশা আছে—ঈষৎ আশঙ্কা মিশ্রিত থাকাতে ওর তীব্রতা আরো অনেকটা বাড়িয়ে তোলে। ... সেই বন্ধনমুক্তির মধ্যে অনেকখানি উল্লাস এবং একটুখানি দুঃখও আছে বোধ হয়। আমার পক্ষে কল্পনা করা দুরূহ, একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে অপরিচিত স্থানে দিন রাত কেমন করে কাটে! মনে করলে অসহ্য শ্রান্তি বোধ হয়। তার কারণ আমি নিজে পুরুষমানুষ। মেয়েরা সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত ঐ কাজ করে আস্‌চে। ওটা তাদের নিতান্ত স্বাভাবিক হয়ে গেছে। একটা নতুন স্বামীকে হাতে করে নিয়ে তার সুখ দুঃখ তার ইচ্ছা অনিচ্ছা বিচার করে একটা সুগম্ভীর পুঁতুলখেলা করতে বোধ হয় বেশ লাগে—বিশেষতঃ সেটাই যখন জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য। আমরা বৃদ্ধবয়সে জীবনের অনেকগুলো বৈরাগ্যের মধ্যে রুদ্ধালোকে বসে বসে ফিলজফি করচি, আমরা কি করে ঠিক বুঝব। একজন নবীনা তার সমস্ত প্রস্ফুটিত হৃদয় মন নিয়ে যখন একটা জীবন থেকে আর-একটা নূতন আশাপূর্ণ জীবনের উপরে গিয়ে পড়ে তখন সেই প্রথম মুহূর্ত্তে তার সমস্ত অস্তিত্ব কি রকম একটা দীপ্তিতে উজ্জ্বল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে! আর একজনের নবীন জীবনের নব আশার কথা আমার মত লোকের কাছে একটা বহুদূরের দৃশ্যের মত বোধ হয়, সে জায়গা থেকে আমরা যেন অনেককাল হল চলে এসেচি। কিন্তু আমাদেরও একটা বৃহৎ নব জীবন আছে—সম্মুখে এক একবার খুব একটা প্রশস্ত আশার সঙ্গীত শুন্‌তে পাই, যেন দূরে আকাশব্যাপী একটা অর্গান্ থেকে আস্‌চে। আমাদের নব জীবন হচ্চে যখন সুখ ছেড়ে সন্তোষের বৃহৎ রাজ্যে প্রবেশ করি—বৃথা সন্ধান পরিত্যাগ করে সমস্ত কর্ত্তব্যগুলিকে অকাতরে গ্রহণ করি—সেও একটা বৃহৎ স্বাতন্ত্র্য লাভ করা, আপনার সমস্ত বোঝা এবং পাথেয় স্কন্ধে করে রাজপথে বেরিয়ে পড়া। এখন আমাদের সামনের নহবৎখানা থেকে ঠিক সাহানা বাজচে না। কানাড়ার তান দিয়েচে—রাত্রি যতই গভীর হবে ততই সেটা মধুর শোনাবে। পিছন ফিরে পৃথিবীটাকে দেখ্‌তে এখন বেশ লাগে—তোরা সবাই এখনকার নতুন কালের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের নানা দিকে নানা ভাবে প্রবাহিত হতে যাচ্চিস্, সবসুদ্ধ মিলে তার একটা ভারি মধুর সঙ্গীত আছে—তোদের ঐ নবজীবনের বিচিত্র আনন্দধ্বনি আমি যেন বেশ স্নিগ্ধশীতল শান্ত হৃদয়ে শুনতে পারি এবং আমার জীবনদিগন্ত থেকে একটি সুন্দর স্নেহ-আনন্দের আভা তোদের নবীন সংসারের উপর যেন শান্তিবচনের মত পড়ে। মঙ্গল আমার হৃদয় থেকে প্রতিফলিত হয়ে তোদের ললাটে গিয়ে পড়ুক।

সাজাদপুর, ৪ঠা জুলাই [১৮৯২]

আজ সাজাদপুর স্কুলের ছাত্রসভায় আমাকে যেতে হয়েছিল। ··· বেলা চারটের সময় সভাগৃহে গিয়ে উপস্থিত হলুম। আমাকে গিয়ে সভাপতির আসনে বসতে হল। যদিও আমার সভ্যেরা সমস্তই প্রায় অপ্রাপ্তবয়স্ক অজাতশ্মশ্রু পাড়াগেঁয়ে ছাত্র, তবু দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা করবার আসন্ন সম্ভাবনায় সমস্ত ক্ষণ আমার বুকে ব্যথা করতে লাগল—মনকে নানারকম ভরসা দিয়ে কিছুতেই সেটা নিবারণ করতে পারলুম না। প্রথম ছাত্রটি অতি অদ্ভুত ইংরিজিতে স্বাস্থ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে বল্‌তে লাগ্‌ল, বল্লে—Used key is not dirty. Great men always take care of their health. Take for instance Pundit Vidyasagar & Keshab Chandra Sen. They took great care of their health. If you do not take care of your health you get ill and you cannot study or do anything. এই রকম সব জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী ইংরাজিতে এবং বাঙ্গলাতে শোনা গেল। অবশেষে আমাকেও এক সময়ে উঠে দাঁড়াতে হল—আমি যথাসাধ্য সংক্ষেপে সেরে দিলুম, গম্ভীরস্বরে বল্লুম—ছাত্রগণ! আজ তোমরা যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলে সেই জিনিষটা এবং মৌখিক আলোচনা করবার শক্তি উভয়েরই অভাব থাকাতে আমি আজ অধিক কিছু বলতে পারব না—তা ছাড়া বিষয়টা এম্‌নি যে ও বিষয়ে নূতন কথা বলা ভারি শক্ত—কিন্তু শরীর অসুস্থ হলে কি কষ্ট এবং সুস্থ থাকলে কি সুখ, অনুমান করি সে বিষয়ে তোমরা এমনি পরিষ্কার বুঝেছ যে আমি ও সম্বন্ধে কোন নতুন কথা না বল্লেও তোমরা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে চেষ্টা করবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। বল্‌তে বল্‌তে আরো দুটো চারটে কথা বেরিয়ে পড়ল, এবং বক্তৃতাটা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়নি।

সাজাদপুর, ৫ই জুলাই [১৮৯২]

আজ আমাদের এখানে পুণ্যাহ। কাল রাত্তির থেকে বাজনা বাজ্‌চে। কাল সন্ধের সময় এখানে হঠাৎ কোথা থেকে একটা Brass band এসে উপস্থিত—ইংরিজি ধাঁচের দিশি সুর বাজায় কতকটা থিয়েটারের কন্সর্টের মত— ভ্যাঁপ্পো ভ্যাঁপ্পো করে এবং খুব প্রাণপণ জোরে ড্রাম্ পিটোয়, বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। কিন্তু আজ সকালে একটা সানাইয়েতে ভৈরবী বাজাচ্ছিল, এম্‌নি অতিরিক্ত মিষ্টি লাগছিল যে সে আর কি বল্‌ব—আমার চোখের সামনেকার শূন্য আকাশ এবং বাতাস পর্য্যন্ত একটা অন্তর্নিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে যেন স্ফীত হয়ে উঠ্‌ছিল—বড় কাতর কিন্তু বড় সুন্দর—সেই সুরটাই গলায় কেন যে তেমন করে আসে না বুঝতে পারিনে—মানুষের গলার চেয়ে কাঁসার নলের ভিতরে কেন এত বেশি ভাব প্রকাশ করে! এখন আবার তারা মূলতান বাজাচ্চে—মনটা বড়ই উদাস করে দিয়েচে—পৃথিবীর এই সমস্ত সবুজ দৃশ্যের উপরে একটি অশ্রুবাষ্পের আবরণ টেনে দিয়েচে—একপর্দ্দা মূলতান রাগিণীর ভিতর দিয়ে সমস্ত জগৎ দেখা যাচ্চে—যদি সব সময়েই এইরকম এক একটা রাগিণীর ভিতর দিয়ে জগৎ দেখা যেত তাহলে বেশ হত—আমার আজকাল ভারি গান শিখতে ইচ্ছে করে—বেশ অনেকগুলো ভূপালী ··· এবং করুণ বর্ষার সুর—অনেক বেশ ভাল ভাল হিন্দুস্থানী গান—গান প্রায় কিচ্ছুই জানিনে বল্লেই হয়।

নাটোর, ১লা ডিসেম্বর [১৮৯২]

কাল ত লোকেনে[১] আমাতে বেরিয়ে পড়া গেল। ঘোড়ার গাড়িতে দীর্ঘ পথ যেতে হয়। সম্মুখে আটাশ মাইল পথ এবং কেবল "আমরা দুজনে যাত্রী"। লোকেন একটা সিগারেট এবং একখানা বই আরম্ভ করে দিলে—আমি গুন্ গুন্ স্বরে "সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি" গান ধরলুম—এইরকম করে যখন প্রায় মাইল দশেক অতিক্রম করেছি, এবং সূর্য্য ক্ষীণজ্যোতি হয়ে অস্তাচলের খুব কাছে গিয়ে পৌচেছে এমন সময় লোকেন আমার ঐ গানটা উপলক্ষ্য করে বৈষ্ণব কবিদের বিরুদ্ধে তর্ক আরম্ভ করে দিলে—সে তর্ক কোন কালে শেষ হত কিনা জানিনে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের তর্কের মাঝখানে একটি কৃশকায়া নদী এসে একটি লম্বা দাঁড়ি টেনে দিলে। সেই নদীতীরে গাড়ি থেকে নেবে একটি নৌসেতু পদব্রজে পার হয়ে ওপারে যেতে হল—ওপারে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল, আকাশে আধখানি চাঁদ উঠেছে এবং সুন্দর জ্যোৎস্না। দুজনে পরামর্শ করা গেল, হেঁটে যতটা দূর পারা যায় যাওয়া যাক্। তখন তর্ক বন্ধ করে সেই জ্যোৎস্না এবং গাছের ছায়ায় খচিত নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে আমরা দুই পথিক নিঃশব্দে মন্দগমনে চলতে লাগলুম—কাল বুধবারে অদূরবর্ত্তী গ্রামে একটা হাট ছিল, সেখানে হাট সেরে দুই চারজন গ্রামবাসী এবং জনপদবধূ গল্প করতে করতে গৃহে ফিরে যাচ্ছিল। একখানি শূন্য-বোঝাই গরুর গাড়িতে গাড়োয়ান র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে নিদ্রামগ্ন এবং গরু দুটি আপন মনে আস্তে আস্তে বিশ্রামশালার দিকে চলেচে। মাঝে মাঝে এক একটা ঘন গাছপালায় আচ্ছন্ন গ্রামের কাছাকাছি আস্‌চি—সেখানে গোয়ালঘর থেকে খড়-জ্বালানো ধোঁয়া বায়ুহীন শীতরাত্রে উপরে উঠতে না পেরে হিমভারাক্রান্ত হয়ে স্তরে স্তরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েচে। এমন করে মাইল দুয়েক গিয়ে তারপরে আমরা আবার গাড়িতে উঠলুম।···

শিলাইদহ, ১৮ই ডিসেম্বর [১৮৯২]

যেমন বজ্র পড়ে গেলে তবে তার আওয়াজ পাওয়া যায়—তেমনি পরস্পর দূরে থাকলে যথাসময়ে কোন আওয়াজ পাবার যো নেই, ঘটনা নিঃশেষ হয়ে গেলে পর তখন চিঠিতে তার আলোচনা করতে হয়। আমার দাঁত-কানের ব্যথার খবর এতদিনে বুঝি তোদের কানে গিয়ে পৌছল? যখন সুকোমল তুলোর স্তর দিয়ে আচ্ছন্ন করে নিজের কপোলদেশ বহুযত্নে লালন পালন করছিলুম—পীড়িত শিশুসন্তানকে যেমন ঢেকে ঢুকে ঘিরে ঘেরে রাখে নিজের এই মুখমণ্ডলটিকে তেমনি করে রেখেছিলুম তখন পৃথিবীর লোক আমাকে সুখী এবং সুস্থ জ্ঞানে দিব্যি নিশ্চিন্ত ছিল—আর এখন যখন তার স্মৃতিমাত্র এবং কষের দাঁতের ফুলোর ঈষৎ মাত্র অবশিষ্ট আছে তখন ভয় ভাবনা ভৎর্সনা নানারকম শোনা যাচ্চে। এখন সেই হতভাগ্য কপোলে চপেটাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করচে, "তোর এমন দুর্লভ বেদনাটা যদু বাবুর উপর দিয়েই কাটালি! এমন একটা বৃহৎ উপসর্গ ন দেবায় ন ধর্ম্মায় গেল!"··· ব্যামো করে আজকাল কোন "ফল" নেই, তাই আজকাল শরীর ভাল রাখবার প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি আছে। কিন্তু শরীরের রহস্য প্রায় মনের রহস্যেরই অনুরূপ। এই ত্রিশটা বৎসর ধরে পোড়া শরীরটার সঙ্গে এক প্রকারের পরিচয় হয়েছে, যা করলে যা হয়, না হয়, কতকটা বুঝে নিয়েছিলুম। এবং বহু অভিজ্ঞতার পর সেই ভাবে সবে চলতে আরম্ভ করেছি।

---

১ লোকেন্দ্রনাথ পালিত

এমন সময় একত্রিশ বৎসরের সময় দেখা গেল পূর্ব্বে যা করলে যা না হত, এখন তা করলে তা হয়—আবার ফের নতুন শিক্ষা নতুন পরিচয়। আবার ত্রিশটা পঁয়ত্রিশটা বৎসর ঠেকে ঠেকে নতুন নতুন আবিষ্কার করে যখন সবে শিখেছি কখন্ ফ্ল্যানেল্ পরতে হবে, কখন দরজা জান্‌লা বন্ধ করতে হবে, কখন গরম জলে নাইতে হবে, কখন ভূষির তাপ, কখন্ পুলটিস্, কখন্ গলা ভাত, কখন্ মৌরলা মাছের ঝোল—তখন সে বহুমূল্য বহুদিনলব্ধ অভিজ্ঞতা খাটাবার আর বড় বেশি দিন বাকি থাকবে না।··· জিজ্ঞাসা করি, এই দাঁতে ব্যথা, কানে ব্যথা, গলায় ব্যথা, এগুলো এতকাল ছিল কোথায়? পূর্ব্বাহ্লে যদি একটু নোটিশ পেতুম্ তাহলে পৃথিবীর মধ্যে এতদেশ থাকতে নাটোরে এ কুকীর্ত্তি হবে কেন? মানুষের মনটাও যথেষ্ট আন্‌রীজ্‌নেব্‌ল্, বিবেচনা করে দেখতে গেলে শরীরটা তার নীচেই। আচ্ছা, রীজ্‌ন্ নামক পদার্থটা তাহলে আছে কোথায়? কেবল সালির সাইকলজির মধ্যে? আজ তোর চিঠি পড়ে আমার মাথায় এই রকমের অনেকগুলো সুগভীর সমস্যার উদয় হচ্চে।

কটক, ২০শে ফেব্রুয়ারি [১৮৯৩]

দেখিস্ আমার লেখা আজ খুব হু হু করে এগিয়ে যাবে—চৈত্র মাসের সাধনার জন্যে যে ডায়ারিটা লিখতে আরম্ভ করেছিলুম এবং যা ভাঙ্গা রাস্তায় বহুভারগ্রস্ত গোরুর গাড়ির মত কিছুতে এগোতে পারছিল না, আজ সেটা নিশ্চয় শেষ করে ফেল্‌ব। যখন মন একটু খারাপ থাকে তখনই সাধনাটা অত্যন্ত ভারের মত বোধ হয়। মন ভাল থাকলে মনে হয়, সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি। তখন মনে হয়, আমি দেশের কাজ করব এবং কৃতকার্য্য হব। তখন লোকের উৎসাহ এবং অবস্থার অনুকূলতা কিছুই আবশ্যক মনে হয় না, মনে হয় আমার নিজের কাজের পক্ষে আমি নিজেই যথেষ্ট। তখন এক এক সময়ে আমি নিজের খুব দূর ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখত পাই—আমি দেখতে পাই, আমি বৃদ্ধ পক্ককেশ হয়ে গেছি, একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খল অরণ্যের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌচেছি, অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বরাবর সুদীর্ঘ একটি পথ কেটে দিয়ে গেছি এবং অরণ্যের অন্য প্রান্তে আমার পরবর্ত্তী পথিকেরা সেই পথের মুখে কেউ কেউ প্রবেশ করতে আরম্ভ করেচে, গোধূলির আলোকে দুই একজনকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্চে। আমি নিশ্চয় জানি, "আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে।" ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আন্‌ব—নিদেন আমার দুচারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে তখন আবার সাধনার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় সাধনা আমার হাতের কুঠারের মত, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে এ'কে আমি ফেলে রেখে মর্‌চে পড়তে দেব না—এ'কে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরো আমার সহায়কারী পাই ত ভালই,—না পাই ত কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।

কটক, ২৭শে ফেব্রুয়ারি [১৮৯৩]

কিন্তু * * * ব'লে যিনি বেদীতে বসেছিলেন, তিনি এমন সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে, শ্রোতাদের কিছুমাত্র ধৈর্য্য ছিল না। ওরকম ক্রমাগত কথা শুন্‌তে শুন্‌তে মন একেবারে যেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায়—উপাসনার ঠিক বিপরীত ফল হয়। এর চেয়ে ঘরে বসে তাসপাশা খেল্‌লে মন ভাল থাকে।

ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় এই জন্যেই যেতে ইচ্ছে করে না। সব জিনিসেরই ভালমন্দ অধিকার-অনধিকার আছে। যে কেউ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন তেমন করে বলুক্ তাই যে প্রতি সপ্তাহে ধৈর্য্য সহকারে শুনে যাওয়া একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে, তা কিছুতেই বলা যায় না। বরং তাতে মনের ভিতরে একটা অশান্তি এবং বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হয়। যে ভাল করে বলতে পারে সেই বল্‌বে এবং তারই কথা শুন্‌ব, এই হচ্চে নিয়ম। বিষয় যত উচ্চ, বল্‌বার লোকের ক্ষমতাও তত বেশি হওয়া চাই। কিন্তু হয়ে পড়েছে এম্‌নি যে প্রায় ধর্ম্মবক্তৃতাই অযোগ্য বক্তার হাতে। তার কারণ, লোকে মনে করে ধর্ম্মের কথা কানে উঠলেই যেন একটা পুণ্য আছে, এইজন্যে একটা উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপরে চড়ে যে যেমন করে বলুক লোকে নীরবে শুনে কর্ত্তব্য পালন করে যায়। এইজন্যে ধর্ম্মবক্তা সম্বন্ধে আর যোগ্যতা বিচার হয় না। আমার ত মনে হয়, এ নিতান্ত অন্যায়। যার যে বিষয়ে রসবোধ বেশি আছে সেই বিষয়ে সে গোঁজা-মিলন সইতে পারে না। যাদের ধর্ম্মবোধ এবং সাহিত্যবোধ কিছু আছে তারা যে ভাবহীন রসহীন অনর্গল পুরোণো বাজে কথা কি রকম করে সহ্য করে আমি ত ভেবে পাইনে। যাদের সে বোধ নেই তাদের যে এরকম বক্তৃতায় বোধ জন্মাবে তারও সম্ভাবনা দেখিনে। আসল, George Elliot যাকে Other-worldliness বলেন ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকের অজ্ঞাতসারে সেই ভাবটা আছে—তারা মনে করে, যে সময়টা যে কোনরকম ধর্ম্ম সম্পর্কীয় ব্যাপারে ব্যয় করা গেল সেটা যেন একটা investmentএর মত, কোন একটা খাতায় জমা হয়ে যেন তার সুদ বাড়তে চল্‌ল। কিন্তু আমার মনে হয়, ভাল প্রসঙ্গ যদি কেউ ভাল করে ব্যক্ত না করে তবে সেটা শোনা একটা মহৎ লোকসান। তাতে কেবল মানসিক স্বাদ খারাপ হয়ে যায়— অন্তরের একটি স্বাভাবিক সচেতন বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। নিয়মিত বেসুরো গান শোনা মানুষের পক্ষে যেমন অশিক্ষা, নিয়মিত অনুপযুক্ত ধর্ম্মবক্তৃতা শোনা মানুষের পক্ষে তেমনি একটা ক্ষতিজনক কাজ। এইজন্যে আমি নিজেও বেদীতে উঠে বল্‌তে চাইনে, জানি সে বিষয়ে আমার স্বাভাবিক ক্ষমতা নেই। মনের মধ্যে একটা অনিবার্য্য আহ্বান নেই—এবং প্রতি বুধবারে নিয়মিত * * * র বক্তৃতা শুনে আসাও আমার কর্ত্তব্য জ্ঞান করিনে। বড়দাদা যখন একটা কিছু বলেন তখন আমার সমস্ত চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং উপকার হয়; অক্ষম লোকে যখন বল্‌তে আরম্ভ করে তখন মনের মধ্যে যে একটা অসহ্য অধৈর্য্য এবং বিরক্তি উপস্থিত হয় তাতে কেবল অপকার হয়।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত]

প্রাচীন ভারতে নারীর আদর্শ ও অধিকার

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

নর ও নারী এই দুই লইয়াই মানব-সংসার। যতদিন মানুষের সৃষ্টি, ততদিন এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। শ্রুতি বলেন, আদিতে একমাত্র পরমপুরুষ ছিলেন একা। একা একা তাঁহার ভাল লাগিল না।

স বৈ নৈব রেমে। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। ১, ৪, ৩

তখন সেই প্রজাপতি নিজেকে দুইভাগে বিভক্ত করিলে পুরুষ ও নারীর উৎপত্তি হইল। সেই পুরুষ প্রকৃতিই আদি পতি ও পত্নী।

স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ
ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্॥ ঐ

তাই শতপথ ব্রাহ্মণ বলিলেন এই যে জায়া তিনি নিজেরই অর্ধভাগ।

অর্ধো হ বা এষ আত্মনো যজ্জায়েতি॥ ৫, ২, ৩, ১০

পুরুষ ও নারী একই পরম পুরুষের দুইভাগ। এককে বাদ দিয়া অন্যে অসম্পূর্ণ। যে সমাজে নারীকে জ্ঞানহীন করিয়া শুধু পুরুষকেই শক্তিশালী করিতে চায় বা পুরুষকে পঙ্গু করিয়া শুধু নারীকেই প্রবল করিতে চায় তাহারা পরম পুরুষের এক অর্ধেক পক্ষঘাতগ্রস্ত করিয়া তাঁহার অংশমাত্র লইয়া অগ্রসর হইতে চাহে। শাস্ত্রে আছে রথের দুই চাকা, তাদের একটিকে বাদ দিয়া আর-একটিমাত্র চাকা লইয়া রথ চলিতে পারে না।

যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।

নরনারী উভয়ের প্রাণশক্তিতে ভারতের সাধনা দিনে দিনে অগ্রসর হইতেছিল। যেদিন হইতে নারীর সাধনাকে পঙ্গু করিয়া ভারতীয় সাধনা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল সেইদিন হইতে ভারতের সাধনার ইতিহাস নানা শোচনীয় দুর্গতিতে ভরিয়া উঠিল।

ঋগ্বেদে দেখি নববধূকে আশীর্বাদ করিয়া ঋষি বলিতেছেন, শ্বশুর শাশুড়ী ননদ দেবরের সকলেরই কাছে তুমি সম্রাজ্ঞী হও।

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু। ঋগ্বেদ। ১০, ৮৫, ৪৬

আপন সংসারের রানী হইয়া তুমি তোমার সংসারে প্রবেশ কর।

গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো॥ ঐ। ১০, ৮৫, ২৬

এই সংসারকে পরিচালনা করিবার জন্য সদা সাবধানে জাগিয়া থাক।

অস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি। ঐ। ১০, ৮৫, ২৭

তাই ঘরে ঘরে বধূকে "সুমঙ্গলী" বলিয়া স্বাগত করা হইয়াছে। সকলের কাছে নববধূর সৌভাগ্য-আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়াথাস্তং বি পরেতন। ঐ। ১০, ৮৫, ৩৩

নববধূর প্রতি তাঁহাদের আশীর্বাদ ছিল, ইন্দ্রাণীর ন্যায় নিত্য শোভনবোধনে প্রবুদ্ধ হইয়া জ্যোতির্মুকুটভূষণা উষার সঙ্গে তুমি নিত্য প্রতিজাগরিত থাকিও।

ইন্দ্রাণীব সুবুধা বুধ্যমানা
জ্যোতিরগ্রা উষসঃ প্রতি জাগরাসি॥ অথর্ববেদ। ১৪, ১, ২২

বধূকে সম্রাজ্ঞী হইতে আশীর্বাদ করার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাজ্ঞী হইবার উপায়ও বলা হইয়াছে। নদী তো অনেকই আছে, কিন্তুই সিন্ধুই আপন দাক্ষিণ্য ও উদারতার গুণে সকলের প্রধান হইয়াছে; তুমিও পতিগৃহে গমন করিয়া আপন মহত্ত্ব ও দাক্ষিণ্য-গুণে সম্রাজ্ঞীর পদলাভ করিও।

যথা সিন্ধুর্নদীনাং সাম্রাজ্যং সুষুবে বৃষা।
এবা ত্বং সম্রাজ্ঞ্যেধিপত্যুরস্তং পরেত্য॥ অথর্ববেদ। ১৪, ২, ৭৫

সকলের মধ্যে দাক্ষিণ্য ও কল্যাণ বিতরণ করিতে হইলে নারীকে পঙ্গু করিয়া রাখা চলিবে না।

আদর্শ ও অধিকার

এই তো হইল বৈদিক যুগের আদর্শের কথা। কথা হইল, সামাজিক ইতিহাসে আমরা এই আদর্শকে অনুসৃত দেখিতে পাই কিনা। বৈদিক যুগের পরে ক্রমে নারীদের অধিকার অনেক বিষয়ে যে সংকুচিত হইয়া আসিয়াছে তাহার কারণ আর্যগণ সন্ততিলাভের জন্য বাধ্য হইয়া শূদ্রকন্যাদের বিবাহ করিতেন। কন্যা কম ছিল বলিয়াই হউক বা শীঘ্র শীঘ্র বংশবিস্তার করিবার জন্যই হউক আর্যগণের মধ্যে শূদ্রকন্যাকে বিবাহ বিলক্ষণ প্রচলিত হইল। তাই যে সব অধিকার আর্যকন্যাগণ পাইতেন সেইসব অধিকার পরে শূদ্রকন্যাদের হয়তো দেওয়া হইত না। ক্রমে এইসব কারণে ভারতে নারীদেরই অধিকার কমিয়া আসিতে লাগিল। এখন তো ব্রাহ্মণকন্যা ব্রাহ্মণের পত্নী হইয়াও নারীরা শূদ্রারই সমতুল্য। বেদাদিতে তাঁহাদের অধিকার নাই। বলা বাহুল্য, পূর্বকালে এই সব শূদ্রকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের পুত্রেরা ব্রাহ্মণই হইতেন। তাহা প্রসঙ্গান্তরে দেখানো হইয়াছে।

মহাভারতের যুগে নারীদের অনেক অধিকার সংকুচিত, নারীদের চরিত্রের বিরুদ্ধে বহুকথা আলোচিত দেখিতে পাই (অনু, ৩৮; ৪০, ৪, ১২; আদি, ২০২, ৮; ৭৪, ৭৩; ২৩৩, ৩১; উদ্যোগ, ৩৭, ৫৭; ভীষ্ম, ৩৩, ৩২; দ্রোণ, ২৮, ৪২ ইত্যাদি)। তবু মহাভারতের ইতিহাসের মধ্যে নারীদের গৌরবের বহু সাক্ষ্য রহিয়া গিয়াছে। জায়াকে মাতৃবৎ সম্মানার্হা মনে করিবে—

ভার্যাং নরঃ পশ্যেন্মাতৃবৎ। আদি, ৭৪, ৪৮

স্ত্রীগণ যেখানে পূজিত, সেখানে দেবতারা সুখী। যেখানে নারীগণ অপূজিত সেখানে সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল!

স্ত্রিয়ো যত্র চ পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
অপূজিতাশ্চ যত্রৈতাঃ সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ অনুশাসন, ৪৬, ৫-৬

নারীগণ পূজনীয় মহাভাগ পুণ্য ও সংসারের দীপ্তিস্বরূপ। তাঁহারাই সংসারের শ্রী, তাই যত্নপূর্বক তাঁহারা রক্ষণীয়।

পূজনীয়া মহাভাগাঃ পুণ্যাশ্চ গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ো গৃহস্যোক্তাস্তস্মাদ্ রক্ষ্যা বিশেষতঃ॥ উদ্যোগ, ৩৮, ১১

কেহ কেহ বলিবেন, নারীদের প্রতি এই সব কথা শুধু ভাবুকতা মাত্র। আসলে নারীরা দাসী মাত্র। এই বিষয়ে তাঁহারা বর্তমানে হিটলারের দোহাই পর্যন্ত দেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, তাহা হইলে তাঁহারাই দাসী-পুত্র। সংস্কৃতে ইহার চেয়ে ঘৃণ্য গ্লানি আর নাই। সংস্কৃত নাটকগুলিতে অতি ইতরজনের প্রতি ইতরজনোচিত গালাগালি হইল "দাস্যাঃ পুত্রঃ"। পত্নীভাবে দেখিলেও নারীদের বড় পরিচয় তাঁহাদের মাতৃত্বে। "জায়া" কথার অর্থ পত্নী হইলেও তাহার মধ্যে মাতৃত্বই প্রধান কথা। যাহার মধ্যে নিজে জন্মগ্রহণ করা যায় তিনিই জায়া অর্থাৎ মাতৃরূপই নারীদের যথার্থ স্বরূপ। নারীদের প্রতি ভদ্রব্যবহার করার কথা সংহিতাকারগণ সকলেই বলেন। অসংগত ভাষা বা অভদ্র ব্যবহারে পুরুষ যে নিন্দার্হ ও দণ্ডনীয় তাহা প্রায় সর্বসম্মত। এরূপ ক্ষেত্রে অপরাধীকে ভদ্রতার শিক্ষা দিতে হইবে, ইহাই ছিল রীতি। এই প্রসঙ্গে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে উনষষ্টিতম প্রকরণে "নগ্নে বিনগ্নে" ইত্যাদি বচন দর্শনীয় (গণপতি শাস্ত্রী, ১৯২৪, পৃ. ২০)।

অথর্ববেদে দেখা যায় পূর্বকালে কন্যারাও ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া পতিলাভ করিতেন।

ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্। অথর্ব। ১১, ৫, ১৮

এখানে ভাষ্য বলেন, "অকৃতবিবাহা স্ত্রী ব্রহ্মচর্যং চরতি।" শুক্ল যজুর্বেদও কন্যাদের শিক্ষাদীক্ষা সমর্থন করেন। এমন কি স্মৃতির যুগেও এই প্রথার স্মৃতি মুছিয়া যায় নাই। দেবন্নভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকায় বিবাহকালে নারীদের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়—

বিবাহস্তু সমন্ত্রকঃ॥ সংস্কার কাণ্ড, স্ত্রীসংস্কার

মনুর মতে দেখা যায় যে বিবাহই স্ত্রীলোকের উপনয়ন।

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ॥ ২, ৬৭

ইহা উদ্ধৃত করিয়াও দেবন্নভট্ট হারীতের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। হারীত বলেন (২১, ২৩) নারীদের মধ্যে একদল ব্রহ্মবাদিনী অন্যেরা সদ্যোবধূ। ব্রহ্মবাদিনীরা উপনয়ন অগ্নীন্ধন বেদাধ্যয়ন ও স্বগৃহে ভিক্ষাচর্যা পালন করিবেন। সদ্যোবধূদের বিবাহকালে কথঞ্চিৎ উপনয়ন মাত্র করিয়া বিবাহ করিতে হইবে।—

দ্বিবিধাস্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃসদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাম্ উপনয়নম্ অগ্নিবন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে চ ভিক্ষাচর্যেতি। সদ্যোবধূনাং চোপস্থিতে বিবাহে কথংচিদ্ উপনয়নমাত্রং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ॥ স্মৃতিচন্দ্রিকা, সংস্কারকাণ্ড, স্ত্রীসংস্কারাঃ।

এই বিষয়ে কল্পান্তরাভিপ্রায় অর্থাৎ অন্যান্য স্মৃতির সমর্থন দিতে গিয়া তিনি যম হইতে উদ্‌ধৃত করেন—পুরাকালে নারীদের ও মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার হইত। তাঁহাদের পক্ষে বেদের অধ্যাপন ও সাবিত্রীবচন বিহিত ছিল। তাঁহাদিগকে পিতা পিতৃব্য বা ভ্রাতা পড়াইতেন, অন্যেরা নহে। স্বগৃহেই তাঁহারা ভৈক্ষচর্যা করিতেন। এবং তাঁহারা অজিন চীর জটাধারণ বর্জন করিয়া চলিতেন।

পুরাকালে তু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥
পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ।
স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষচর্যা বিধীয়তে॥
বর্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেব চ। ঐ। Mysore, G. O. L. S. p. *62*

ঠিক এই বিধানই পরাশরমাধবে দেখা যায়। সেখানেও যম ও হারীত হইতে এই ব্যবস্থা উদ্‌ধৃত

করা হইয়াছে (পরাশর মাধব, আচারকাণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, Bibliotheca India. A. S. B., চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কর্তৃক সম্পাদিত। পৃ. ৪৮৫)।

সাধনার ক্ষেত্রে নারীরা যথেষ্ট স্বাধীনতা পাইতেন। মহাভারতে দেখা যায়, কেহ কেহ নারীদের এই অধিকার পছন্দ করেন নাই। কুনির্গর্গো নামে এক মহাবীর্য ঋষি ছিলেন (শল্যপর্ব, ৫২, ৩), তাঁহার কন্যা কঠোর তপস্যা করিয়াও পরমাগতি লাভ করিতে পারেন নাই। নারদ বলিলেন, "হে অনঘে, তোমার বিবাহসংস্কার হয় নাই তখন কেমন করিয়া পরমলোক লাভ হইবে ?"

অসংস্কৃতায়াঃ কন্যায়াঃ কুতো লোকাস্তবানঘে। শল্যপর্ব। ৫২, ১০

তখন কন্যা বিবাহার্থিনী হইয়া তাঁহার তপস্যার অর্ধফল দিয়াও যে-কোনো বরকে প্রার্থনা করায় গালবি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া একরাত্রি মাত্র তাহার সঙ্গে বাস করেন (ঐ, ৫২, ১৩-২২)। ৫২তম অধ্যায়ে এই কথা। অথচ মহাভারতে সেই পর্বের ৫৪তম অধ্যায়েই সাধ্বী কৌমারব্রহ্মচারিণী তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী ধৃতব্রতা শাণ্ডিল্যসুতার বহু প্রশংসা আছে—

অত্রৈব ব্রাহ্মণী সিদ্ধা কৌমারব্রহ্মচারিণী।
যোগযুক্তা দিবং যাতা তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী॥
বভুব শ্রীমতী রাজন্ শাণ্ডিল্যস্য মহাত্মনঃ।
সুতা ধৃতব্রতা সাধ্বী নিয়তা ব্রহ্মচারিণী॥ শল্যপর্ব। ৫৪,৫-৭

স্ত্রীলোক হইলেও তিনি ঘোর তপস্যা করিয়া স্বর্গে গেলেন এবং মহাভাগা সেই নারী দেবব্রাহ্মণ-পূজিতা হইয়া রহিলেন—

সা তু তপ্ত্বা তপো ঘোরং দুশ্চরং স্ত্রীজনেন হ।
গতা স্বর্গং মহাভাগা দেবব্রাহ্মণপূজিতা। ঐ, ৮

আবার অনুশাসন পর্বে অষ্টাবক্র মুনি উত্তরদেশে গিয়া তপস্বিনী মহাভাগা দীক্ষাধর্মপালনে রতা এক বৃদ্ধা নারীকে দেখিলেন—

তপস্বিনীং মহাভাগাং বৃদ্ধাং দীক্ষামনুষ্ঠিতাম্। অনু, ১৯,২৪

পরে এই কন্যাকে অষ্টাবক্র বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ যত তপস্যাই থাকুক না কেন নারীদের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। বিবাহ নারীর অবশ্য ধর্ম।

শান্তিপর্বে (৩২০, ৭) "সুলভানাম ভিক্ষুকী"র কথা আছে। সেইখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, "স্ত্রীলোকদেরও বিবাহের পূর্বে বা বৈধব্যের পরে সন্ন্যাসে অধিকার আছে। তখন তাঁহারা ভিক্ষাচর্য মোক্ষশাস্ত্রশ্রবণ, একান্তে আত্মধ্যান, ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করিবেন।"

স্ত্রীণামপি প্রাগ্‌বিবাহাদ্ বৈধব্যাদূর্ধ্বং বা সন্ন্যাসে অধিকারোঽস্তি ইতি দর্শিতম্; তেন ভিক্ষাচর্যং মোক্ষশাস্ত্রশ্রবণম্ একান্তে আত্মধ্যানঞ্চ তাভিরপি কর্তব্যম্, ত্রিদণ্ডাদিকঞ্চ ধার্যম্।

এই সুলভার সঙ্গে রাজর্ষি ব্রহ্মবিত্তম জনকের গভীর যোগশাস্ত্রের কথা হয়।

রামায়ণেও সিদ্ধা ধর্মসংস্থিতা শবরীর কথা আছে (অরণ্যকাণ্ড, ৭৪ অ)। তাঁহার রম্য আশ্রমে রাম গিয়াছিলেন (৭৪, ৪-৫)। সেই সিদ্ধা সিদ্ধসম্মতা বৃদ্ধা শবরী (৭৪, ১০) রামকে স্বাগত করেন। সাধ্বী শংসিতব্রতা (৭৪, ৩১) জটাযুক্তা চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরা শবরী (৭৪, ৩২) জ্বলন্তপাবকসংকাশা হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন (৭৪, ৩৩)।

শ্রুতিতে ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেখা যায় পত্নীরা কটিতে মেখলা ধারণ করিতেন। তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য বিহিত ছিল। (স্মৃতি চন্দ্রিকা, সংস্কারকাণ্ড, স্ত্রীসংস্কার) কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে বৈদিককর্মে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের অধিকার (অধিকারিনিরূপণ, ১, ৬) বলিয়াই বলা হইয়াছে—"ঠিক এইরূপই নারীরও অধিকার, তাহাতে কোনো বিশেষ নাই।"

স্ত্রী চাবিশেষাৎ। ঐ, ১, ৭

আচার্য কর্ক তাঁহার ভাষ্যে কথাটা আরও ভাল করিয়া বলিয়াছেন। পরবর্তী সূত্রে কাত্যায়ন বলেন, নারীদের এই অধিকার সর্বত্র দেখাই যায়।—

দর্শনাচ্চ। ঐ। ১, ৮

ভাষ্যকার কর্ক এখানে বলেন, "যজমানকে মেখলার দ্বারা দীক্ষা দেওয়া হয়, যোক্ত্রের দ্বারা পত্নীকে। পুরুষের সঙ্গেই তাহার অধিকার, পৃথক নয়। একই কাজে যেমন যজমানসাধ্য কৃত্য আছে তেমনি পত্নী-সাধ্য কৃত্যও আছে।" (ঐ, ভাষ্য)

হারীতও যে নারীদের ব্রহ্মচর্য ও উপনয়নের অধিকার সমর্থন করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় তাঁহার "প্রাগ্‌রজসঃ সমাবর্তনম্" কথাতে। বৃহদ্দেবতাতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৭২-৮১ শ্লোকগুলিতে 'বাক্'এর কথাই বর্ণিত। ৮২, ৮৩, ৮৪ শ্লোকে বেদের কয়েকটি নারী ঋষির কথা বলা হইয়াছে। তাঁহাদের নাম ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা, উপনিষৎ, নিষৎ, জুহূনাম্নী ব্রহ্মজায়া, অগস্ত্যের ভগ্নী অদিতি, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রমাতা সরমা, রোমশা, উর্বশী, লোপামুদ্রা, নদীসকল, যমী, নারী শশ্বতী, শ্রী, লাক্ষা, সার্পরাজ্ঞী, বাক্, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, সূর্যা, সাবিত্রী, ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া বিঘোষিত।

ঘোষা গোধা বিশ্ববারা অপালোপনিষন্নিষৎ।
ব্রহ্মজায়া জুহূর্নাম অগস্ত্যস্য স্বসাদিতিঃ॥ ২, ৮২
ইন্দ্রাণী চেন্দ্রমাতা চ সরমা রোমশোর্বশী।
লোপামুদ্রাচ নদ্যশ্চ যমী নারী চ শশ্বতী॥ ২, ৮৩
শ্রীর্লাক্ষা সার্পরাজ্ঞী বাক্ শ্রদ্ধা মেধা চ দক্ষিণা।
রাত্রী সূর্যা চ সাবিত্রী ব্রহ্মবাদিন্য ঈরিতাঃ॥ ২, ৮৪

বৃহদ্দেবতা ইঁহাদিগকে 'ব্রহ্মবাদিনী' বলিয়াই ঘোষিত করিলেন, সমাজেও তাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী নামেই প্রখ্যাত ছিলেন। কাজেই নারীদের ব্রহ্মবাদিনী হওয়ার অধিকার তখনও ছিল।

গোভিল গৃহ্যসূত্রে একটি মন্ত্রে আছে—প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীম্ (২, ১, ১৯)। সেখানে ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন নারীদের যজ্ঞসূত্রধারণ প্রচলিত ছিল। হারীতও যে ইহা বৈধ বলিয়াছেন তাহা বুঝা যায় তাঁহার "প্রাগ্‌রজসঃ সমাবর্তনম্" এই কথায়।

আপস্তম্ব নারীদের শিক্ষা সমর্থন করিয়াছেন (যজ্ঞপরিভাষা, ২য় সূত্র ভাষ্য)। দুহিতাকে পণ্ডিতা করিবার ইচ্ছা থাকিলে (য ইচ্ছেদ্ দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত) কি করিতে হইবে তাহাও বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৬, ৪, ১৭) ব্যবস্থা দিয়াছেন। এখানে মূলের উদারতাটুকু শাঙ্কর ভাষ্য দেখাইতে পারেন নাই। বৌধায়নেও এইরূপ উদারতার অভাব দেখা যায় (গৃহ্যসূত্র, ৩, ৪)।

মীমাংসকদের মধ্যে প্রভাকর যে দ্বিজনারীর বেদপাঠ সমর্থন করিয়াছেন তাহা মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা দেখাইয়াছেন।[১]

মহাভারত নারীদের কোথাও কোথাও "অশাস্ত্রা" (অনু, ৪০, ১২) বলিলেও বহুস্থলে নারীদের শিক্ষাদীক্ষার কথা বলিয়াছেন। স্মৃতির যুগে মনু প্রভৃতি নারীদের শিক্ষার অধিকার অনেকটা সংকুচিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন নারীদের আবার বেদমন্ত্র দিয়া কি হইবে (৯, ১৮)? বৈবাহিক বিধিই তাহাদের বৈদিক সংস্কার (২, ৬৭)। যজ্ঞে নারীরা আহুতি দিতে পারেন না (৪, ২০৫-৬)। নারীরা যজ্ঞে আহুতি দিলে বা নারীদের দ্বারা যজ্ঞে আহুতি দেওয়াইলে নরকে পতিত হইতে হয় (১১, ৩৭)। কিন্তু এখানে মনে রাখা উচিত মনু বহুস্থলে নারীদের চরিত্রকেও বিষম আক্রমণ করিয়াছেন (২, ২১৩-১৫)। স্ত্রীদিগকে শারীর দণ্ড দিবার ব্যবস্থাও মনু দিয়াছেন (৮, ২৯৯-৩০০)। অথচ নারীদের প্রতি ভাল ব্যবহার ও নারীদের মহত্ত্বের কথাও মনুতে বহুস্থানে আছে।

বেদের মন্ত্রে কেহ কেহ নারীদের অধিকার অস্বীকার করিলেও মনে রাখিতে হইবে বহু বেদমন্ত্র নারীদেরই রচিত। বৃহদ্দেবতার উক্ত তালিকা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে, ঋগ্বেদেও দেখা যায় বহু নারী মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। রোমশা (১, ১২৬) লোপামুদ্রা (১, ১৭৯), বিশ্ববারা (৫, ২৮), অপালা (৮, ৮০), যমী (১০, ১০, ১৫৪), বসুক্রজায়া (১০, ২৮), ঘোষা (১০, ৩৯), সূর্যা (১০, ৮৫), উর্বশী (১০, ৯৫), সরমা (১০, ১০৮), বাক্ (১০, ১২৫), ইন্দ্রাণী (১০, ১৪৫), ইন্দ্রজননী (১০, ১৫৩), শচী (১০, ১৫৯), সর্পরাজ্ঞী (১০, ১৮৯), ইহা ছাড়াও আরও বহুনাম ঋগ্বেদসংহিতায় ও অন্যান্য বেদে পাওয়া যায়।

উপনিষদেও মৈত্রেয়ী, গার্গী, বাচক্লবী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনীর নাম পাওয়া যায়। গন্ধর্বগৃহীতা ও উমার কথা বলিয়া লাভ নাই। কারণ তাঁহারা সাধারণ বিধির বাহিরে। ব্রহ্মবাদিনী নারীরা বড় বড় সংসদে ও বিদ্বজ্জনের সভাতে যে যোগ দিতেন সে কথা নানা উপনিষদেই আছে।
দেখা যায়।

গোভিল গৃহ্যসূত্রে (২, ১, ১৯-২০) এবং কাঠক গৃহ্যে নারীদের বেদমন্ত্রে অধিকারের কথা দেখা যায়। নারীরা শিক্ষাও যে দিতেন তাহা বুঝা যায় পাণিনির "আচার্যা" এবং "উপাধ্যায়া" ও "উপাধ্যায়ী" (৩, ৩, ২১) শব্দগুলিতে। এখানে কাশিকাবৃত্তি কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। কাশকৃৎস্নি ছিলেন একজন মীমাংসাচার্য। তাঁহার মীমাংসার নাম কাশকৃৎস্নী (৪, ১, ৪)। সেই মীমাংসায় ব্যুৎপন্না নারীকে বলে কাশকৃৎস্না (৪, ১, ১৪)। প্রাচীন ব্যাকরণ আপিশল যে নারী শিখিয়াছেন তিনি আপিশলা (৪, ১, ১৪)। পতঞ্জলি ইঁহাদের পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে আরও জানিতে পারি যে, অনেক সময় নারীরা নারীগুরুর কাছেই শিক্ষা করিতেন (৪, ১, ৭৮)। পুরুষদের কাছে পুরুষছাত্রদের সঙ্গেও যে নারীরা অধ্যয়ন করিতেন তাহার কথাও আমরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর লেখক ভবভূতির উত্তররামচরিতে পাই। ভগবান বাল্মীকি যখন লবকুশকে ত্রয়ীবিদ্যা শিখাইতেছেন তখন নারী আত্রেয়ী সেই সঙ্গে পড়িতেন, তবে লবকুশের প্রতিভার সঙ্গে তিনি তাল রাখিয়া চলিতে পারিতে-ছিলেন না (দ্বিতীয় অঙ্ক)। মালতীমাধবে ভবভূতি দেখাইয়াছেন, নরনারী একত্র আচার্যকুলে পড়িতে

---

১ Prabhakar School and Popular Mimansa

পারিতেন। কামন্দকী সেখানে পড়িয়াছেন। ইহার প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বাণভট্ট তাঁহার কাদম্বরীতে দেখাইয়াছেন মহাশ্বেতার রূপখানি। ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা মহাশ্বেতার কায়া ছিল পবিত্রীকৃত—

ব্রহ্মসূত্রেণ পবিত্রীকৃতকায়াম্। কাদম্বরী, (নির্ণয়সাগর, ১৯১২) পৃ. ২৪৮

যাঁহারা দেবীদের পুরাতন মূর্তি দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন বহু দেবীরই উপবীত আছে। ধ্যানেও "নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্" প্রভৃতি কথা মেলে। মহাভারতে নারীদের বেদপাঠের রীতিমতই উল্লেখ আছে। শিবানামে বেদপারগা সিদ্ধা ব্রাহ্মণী সর্ববেদ অধ্যয়ন করিয়া অক্ষয় দেহলাভ করেন—

অত্র সিদ্ধা শিবানাম ব্রাহ্মণী বেদপারগা।
অধীতা সাখিলান্ বেদান্ লেভে স্বং দেহমক্ষয়ম্॥ উদ্যোগ। ১০৯, ১৯

ভারতবর্ষ সব সত্যের মূলে দেখিয়াছে ব্রহ্মকে। কাজেই তাঁহাদের মতে নরনারীর পার্থক্য কেন হইবে? শ্বেতাশ্বতর বলেন, "তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ"।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি। ৪,৩

স্ত্রীপুরুষ বলিয়া তবে কেন ভেদ হইবে? একই আত্মা যখন যে শরীরে যুক্ত হয় তখন তার সেই রূপ। এই পরিচয় তো বাহ্যমাত্র, আসলে সর্বত্রই আত্মা তো এক।

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদযচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥ শ্বেতা ৫,১০

জৈন ও বৌদ্ধসাধনাতেও বহু নারী তপস্যায় উচ্চতম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। থেরীগাথা গ্রন্থে এইরূপ বহু তপস্বিনীর পরিচয় আছে।

সংসারাশ্রমেও পত্নীর অধিকার কম ছিল না। যজ্ঞে ও সামাজিক ধর্মাচরণে পত্নীর পূর্ণ অধিকার ছিল (শতপথ ব্রাহ্মণ ১,৯,২,১৪ ; পাণিনি ৪,১,৩৩)। "জায়া" কথাতে অতটা অধিকার সূচিত হয় না। সেখানে তিনি পুত্রের জননী মাত্র। "পত্নী" কথাতে বুঝা যায়, নারীদেরও অধিকার ও নেতৃত্ব আছে। তবে অনেকস্থলে পত্নীকেও জায়া বলিয়া প্রকরণবিশেষে উল্লেখ করা হইয়াছে। মনুর স্ত্রীকে শতপথ ব্রাহ্মণ (১,১,৪,১৬) বলিলেন, জায়া ; মৈত্রায়ণী সংহিতা বলিলেন, পত্নী (৪,৮,১)। পূর্বে যেখানে জায়াই আহুতি দিতে পারিতেন সেখানে পরে সেই আহুতি দিতেন পুরোহিতেরা (ঋগ্বেদ ১,১২২,২। ৩,৫৩,৪-৬। ৮,৩১,৫। ১০,৮৬,১০ ইত্যাদি॥ শতপথ ব্রাহ্মণ ১,১,৪,১৩)। অর্থাৎ জায়ার এই অধিকারটুকু ক্রমশ সংকুচিত হইল।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেখা যায়, মন্ত্রপাঠে হোমে আহুতিতে স্ত্রী সমানভাবে যোগ দিতে পারিতেন, সামগানের সময়ে ধুয়াও ধরিতে পারিতেন। পরে এরূপ তর্কও উঠিল, যেহেতু স্ত্রীর নিজস্ব নাই তাই তাহার যজ্ঞ অসম্ভব। জৈমিনিতে এইরূপ তর্ক তুলিয়া তাহার উত্তর দিয়াছেন যে, অর্থে স্বামীর ও স্ত্রীর অধিকার সমবেত। "অর্থেন চ সমবেতত্বাৎ" (জৈমিনি, ন্যায়মালা, ৬, ১, ৩, ১৪)। কাজেই সেখানে ভাষ্যকার মাধবও বলেন, "নারীদেরও ধর্মকর্মের অধিকার আছে (অস্তি স্ত্রিয়াঃ কর্মাধিকারঃ)। এইরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর ও স্ত্রীর একই অধিকার এবং একত্র অধিকার" (জৈমিনীয় ন্যায়মালা, ৬,১,৩,১৬-১৭)। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে যজ্ঞপত্নীর কর্তব্যের কথা পাওয়া যায়। তাহার আদি—"বেদং পত্ন্যৈ প্রদায় বাচয়েদ্ হোতা অধ্যর্যুর্বা বেদোঽসি বিত্তিরসি" ইত্যাদি (১,১১)। মহাভারতে অনেকস্থলে নারীদের এই অধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

স্বামীর সেবা ছাড়া যাজ্ঞযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ উপবাস নারীদের নাই (অনু ৪৬,১৩ ; ৫৯,২৯)। অথচ বলিতেছেন, "আমি যথাবিধি সোমপান করিয়াছি" (আশ্রমিক, ১৭,১৭)। তাহাতেই মনে হয়, যজ্ঞে সোমের অধিকার তখনও নারীদের ছিল। রামায়ণেও দেখা যায়, কৌশল্যা ছিলেন দশরথের যজ্ঞাংশভাগিনী। মহাভারতে দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরা বিধিবৎ রাজসূয় যজ্ঞে অশ্ব সমানয়ন করিয়া দ্রুপদাত্মজাকে সেখানে যজ্ঞকর্মের জন্য বসাইলেন (অশ্ব, ৮৯,২)। মহাভারত এই কথাও বলেন, ধর্ম দারারই অধীন (দারেষধীনো ধর্মশ্চ, অশ্বমেধ ৯০,৪৮)। রামায়ণে দেখা যায়, জানকী নিয়মিত সন্ধ্যাবন্ধনাদির জন্য নদীর তীরে আসিতেন (সুন্দর ১৪,৪৯)। এখানে টীকাকার রামায়ণতিলকে তর্ক তুলিতেছেন যে, নারী তো বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন না, তবে বাকি কাজ করিতে পারেন। মূলে কিন্তু এই সব আপত্তি দেখা যায় না। বরং ইহার পূর্বেই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে তারা বেদ ও শাস্ত্রপ্রমাণে সিদ্ধ করিতেছেন যে, স্বামী ও স্ত্রী অভিন্ন (২৪,৩৮)। তারা তো মাত্র কপিকুলসম্ভবা। সীতাদেবীর সঙ্গে কি তাঁর তুলনা! তবু টীকাকার উৎসাহবশে নারীদের বেদাচার অপ্রমাণ করিতে চাহেন এমন কি সীতাদেবীর কথাপ্রসঙ্গেও। পরমপাবনী নারায়ণী সীতাদেবীকেও এইসব টীকাকাররা ছোট না করিয়া ছাড়িতে চাহেন নাই। সাধারণ নারীরা আর তাঁহাদের কাছে কতটুকু আশা করিতে পারে ?

প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা শুধু যাগযজ্ঞে নহে লোকশিক্ষার্থ নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার সময়েও স্ত্রীদের সঙ্গে লইতেন (অনু, ৯৩,২১)। মহাভারতের যুগে সভাতেও নারীদের স্থান প্রস্তুত রাখিতে হইত (আদি, ১৩৪,১১)। কখনও কখনও পরামর্শ দিবার জন্য নারীরা সভাতে আহুতা হইতেন। গান্ধারীকে এইরূপ সভাতে মন্ত্রার্থ আহ্বান করা হইয়াছিল (উদ্যোগ, ৬৭-৬)। দেবী গান্ধারী ছিলেন মহাপ্রজ্ঞা বুদ্ধিমতী "আগমাপায়তত্ত্বজ্ঞা" (আশ্র ২৮,৫)। ধর্মপ্রাণা গান্ধারীর আপনপর বলিয়া কোনো সংকীর্ণতা ছিল না। সত্যধর্ম রক্ষার্থ নিজের পুত্র পাপী দুর্যোধনকে তিনি ত্যাগ করিবার জন্য বারবার ধৃতরাষ্ট্রকে ধরিয়াছেন—

তস্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ। সভা, ৭৫,৮

গান্ধারীর জা' কুন্তীও বৈদিকমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন (বনপর্ব ৩০৪, ২০)। তপস্বিনী শাণ্ডিলী ছিলেন মনস্বিনী সর্বজ্ঞা সর্বতত্ত্বজ্ঞা (অনু, ১২৩, ২)। এক পতিব্রতা নারী সাঙ্গোপনিষৎ অধীতবেদ তপস্বী কৌশিককে সুন্দর ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন (বন, ২০৫, ৩৩-৩৮)। তপোবৃদ্ধা অরুন্ধতী বসিষ্ঠের সমানশীলা ও সমানব্রতাচারিণী ছিলেন (অনু, ১৩০, ২)। তাঁহার কাছে পিতৃগণ ও ঋষিগণ ধর্মের গুহ্যতম তত্ত্ব শুনিতে চাহিলেন এবং শুনিয়া ধন্য হইলেন (ঐ, ১৩০)। তপস্বিনী সুলভার কাছে সর্ববেদবিৎ ব্রহ্মবাদী জনক যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন তাহা শান্তিপর্বের ৩২০তম অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত। সেই সব কথা যোগতত্ত্বের সার। জনক তাঁহার স্বাগতার্থ পাদশৌচ করাইয়াছিলেন (৩২০, ১৪)। অনুশাসনপর্বের আরম্ভেই স্থবিরা শমসংযুতা তাপসী গৌতমীর কথা দেখা যায় (১, ১৭)। অশ্বমেধপর্বের ব্রাহ্মণীব্রাহ্মণসংবাদ (২০-২৫ অ) পতিশিষ্যা ব্রাহ্মণীর কথা সকলেই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

নারীগণ জ্ঞানে ধর্মে ও তপস্যায় অধিকারিণী ছিলেন বলিয়া যে সংসারের কাজে তাঁহারা মনোযোগ দিতেন না তাহাও নয়। দ্রৌপদী ধর্মজ্ঞা ও ধর্মদর্শিনী ছিলেন (মহা, শান্তিপর্ব ১৪, ৪)। নীতিশাস্ত্রেও

তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। বনপর্বে ২৮শ অধ্যায়ে তাহার সুন্দর পরিচয় মেলে। দ্রৌপদী তেজস্বিনী তবু তিনি শুধু তেজকেই ভাল বলেন নাই। তাঁহার মতে, ক্ষমাও চাই, আবার শুধু ক্ষমাও কিছু নয়—

ন শ্রেয়ঃ সততং তেজো ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা। বন, ২৮, ৬

তাই ক্রমাগত রুদ্রতা বা মৃদুতা দেখাইবে না ; উভয়ই যথাযোগ্যকালে দেখাইতে হইবে।

তস্মান্নাত্যুৎসৃজেৎ তেজো ন চ নিত্যং মৃদুর্ভবেৎ।
কালে কালে তু সংপ্রাপ্তে মৃদুস্তীক্ষ্ণোঽপি বা ভবেৎ। ঐ, ২৮, ২৩

মৃদুতাও যে মহতী শক্তি, তাহা দ্রৌপদী জানিতেন। তাই তিনি বলেন, মৃদুর দ্বারা দারুণ অদারুণ উভয়কে জয় করা যায়। মৃদুর অসাধ্য কিছু নাই, তাই মৃদুতাই তীব্রতর শক্তি।

মৃদুনা দারুণং হন্তি মৃদুনা হন্ত্যদারুণম্।
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিৎ তস্মাৎ তীব্রতরং মৃদু। ঐ ২৮, ৩

তবু তেজোময়ী দারুণ বৃত্তিরও সময় আছে। কাল উপস্থিত হইলে তাহা প্রয়োগ করিতেই হইবে।

তেজসশ্চাগতে কালে তেজ উৎস্রষ্টুমর্হসি। ঐ ২৮, ৩৫

এইজন্য যখন ভীম ও অর্জুন তাঁহাকে সভায় ক্লিশ্যমানা দেখিয়াও তেজ দেখাইলেন না তখন দ্রৌপদী দারুণ ভাষায় তাঁহাদের নিন্দা করিয়াছেন (বন, ১২, ৬৬)। তিনি বলিলেন, "ধিক্ ভীমের বলকে, ধিক্ পার্থের গাণ্ডীবকে। এই ক্ষুদ্রজনেরা যখন আমাকে অপমান করিতেছে তখন কেমন করিয়া ইঁহারা তাহা সহিতে পারিলেন ?"

ধিগ্ বলং ভীমসেনস্য ধিক্ পার্থস্য চ গাণ্ডিবম্।
যৌ মাং বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈর্মর্ষয়েতাং জনার্দন। ঐ ১২, ৬৭

দ্রৌপদী শুধু বীরত্বের উপদেশই দেন নাই ; নিজেও যথাযোগ্য স্থলে যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছেন। কীচক যখন তাঁহাকে অপমান করিতে উদ্যত তখন তিনি অতিরোষে কম্পমানা হইয়া মহাবেগে তাহাকে মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন।

প্রগৃহ্যমাণা তু মহাজবেন মুহুর্বিনিশ্বস্য চ রাজপুত্রী।
চিক্ষেপ তং গাঢ়মমৃষ্যমাণা প্রবেপমানাতিরুষা শুভাঙ্গী। বিরাট, ১৬, ৮

এই বীরত্বের সঙ্গে সঙ্গে দ্রৌপদীর জ্ঞানও কম ছিল না। ধর্মাচরণের কথা তো প্রথমেই বলা হইয়াছে। বনপর্বের ৩২শ অধ্যায়ে দ্রৌপদী নিরীশ্বরবাদ হঠবাদ প্রভৃতির চমৎকার সমালোচনা সবিস্তারে করিয়াছেন। সেগুলি পড়িয়া না দেখিলে উদ্ধৃত করিয়া বুঝানো যায় না। বৃহস্পতিপ্রোক্তা নীতিও তাঁহাদের ঘরোয়া বিচার সভায় আলোচিত হইত এবং কোনো কোনো ব্রাহ্মণ সেই সব বিষয়ে তাঁহার ভাইদের সঙ্গে যে আলোচনা করিতেন তাহাও দ্রৌপদীর কথাতেই বুঝা যায় (বন ৩২, ৬১)। ধর্মে ও জ্ঞানে এতটা দীপ্ত হইয়াও দ্রৌপদী গৃহকর্মে শিথিল হন নাই। সত্যভামার সঙ্গে তাঁহার সংবাদে দ্রৌপদীর গৃহধর্ম পালনের কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। বনপর্বের ২৩২তম অধ্যায়ে দেখিলে তাহা বুঝা যায়। পতিরা তো রাজা, তাঁহাদের রাজকোষ পর্যবেক্ষণ করিতেন দ্রৌপদী (বন, ২৩২, ৫৬), আয় ব্যয় সব জানিতেন দ্রৌপদী (ঐ, ৫৩)। অথচ গৃহে একটি অতিথি আসিলেও তাঁহার প্রতি কর্তব্যপালনে দ্রৌপদী পরাঙ্মুখ ছিলেন না (বন, ২৬৫, ৯)।

মহাভারতের মনস্বিনী নারীদের মধ্যে শুধু দ্রৌপদীর নামই নহে আরও অনেকের নাম করা যায়। বনপর্বের ৫৩শ অধ্যায় হইতে ৭৯তম অধ্যায় পর্যন্ত দময়ন্তীর সৌন্দর্য, মাধুর্য, তেজ, নীতি, ধর্মজ্ঞান সবই চমৎকার। যাঁহার জানিতে ইচ্ছা হয় তিনি মহাভারতে মূল আখ্যানগুলি দেখিবেন।

ধীমতী স্থলভার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পিঙ্গলা নামে এক বারনারীর কথা মহাভারতে আছে (শান্তিপর্ব, ১৬৪, ৫৭)। প্রেমের বেদনাতে তাঁহারও শান্তা বুদ্ধি ও গভীর জ্ঞান জন্মিয়াছিল (ঐ)। পিঙ্গলার গাথার কথা তাই মোক্ষধর্মপর্বে ভীষ্মের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় (ঐ ৫৬)। তাহার শ্রোতা যুধিষ্ঠির। এই পিঙ্গলাই একদিন আশা নিরাশা জয় করিয়া পরমাশান্তি লাভ করিয়াছিলেন (শান্তিপর্ব, ১৭৮, ৮)।

শকুন্তলার শ্রী ও মাধুর্যের কথাই সবাই জানেন। তাঁহার তেজও কিরূপ অপরিসীম ছিল তাহা জানিতে হইলে আদিপর্বের ৭৪তম অধ্যায়টি আগাগোড়া পড়িতে হয়।

ক্ষত্রিয়কন্যা বিদুলাও বহু বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিশ্রুতা ও বহুশ্রুতা তপস্বিনী হইয়াছিলেন।

ক্ষত্রধর্মরতা দান্তা বিদুলা দীর্ঘদর্শিনী।
বিশ্রুতা রাজসংসৎসু শ্রুতবাক্যা বহুশ্রুতা॥ উদ্যোগ ১৩৩, ৩

তেজের বিষয়ে বলিতে গেলে বিদুলার কথা সকলের আগে মনে হয়। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ১৩৩তম হইতে ১৩৬তম পর্যন্ত পুরাপুরি চারটি অধ্যায়ই বিদুলার অগ্নিময়ী বীরবাণীতে ভরা। আপন পুত্রদের বীর্যাভাব দেখিয়া তাঁহার যে বজ্রসার বাণী তাহা চিরদিন সর্বমানবের কর্ণে ধ্বনিত হইতে থাকিবে—আপন আত্মাকে অপমান করিও না, অল্পে আত্মাকে পূর্ণ করিতে যাইও না; ভয় ছাড়, সুমহৎ কল্যাণের জন্য মনকে মুক্ত কর।

মাত্মানমবমন্যস্ব মৈনমল্পেন বীভরঃ।
মনঃ কৃত্বা সুকল্যাণং মা ভৈস্ত্বং প্রতিসংহর। উদ্যোগ, ১৩৩, ৭

কুনদী অল্প জলে ভরিয়া যায়, ইন্দুরের অঞ্জলি অল্পে পূর্ণ হয়, কাপুরুষদের সহজে স্বল্পেই সন্তোষ হয়।

সুপূরা বৈ কুনদিকা সুপূরো মুষিকাঞ্জলিঃ।
সুসন্তোষঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনৈব তুষ্যতি। ঐ, ৯

অতএব কেন বজ্রাহত প্রেতের মত পড়িয়া আছ? হে কাপুরুষ উঠ, শত্রুনির্জিত হইয়া ঘুমাইয়া থাকিও না।

ত্বমেবং প্রেতবচ্ছেষে কস্মাদ্ বজ্রহতো যথা।
উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ মা স্বাপ্সীঃ শত্রুনির্জিতঃ। ঐ, ১২

হয় আপন বীর্যকে জাগ্রত কর, নয় তো শুভা ও ধ্রুবাগতি (মৃত্যুকে) আলিঙ্গন কর।

উদ্ভাবয়স্ব বীর্যং বা তাং বা গচ্ছ ধ্রুবাং গতিম্। ঐ, ১৮

মানুষ হও, কেবল সংখ্যাপূর্ণ করিবার মত নর বা নারী হইয়া লাভ কি?

রাশিবর্ধনমাত্রং স নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্। ঐ, ২৩

অর্থাৎ মানুষের পরিচয় তাহার মনুষ্যত্বে, শুধু সংখ্যাগত আধিক্য অথবা বাহুল্য দিয়া নহে। উদ্ধৃত করার চেষ্টা বৃথা বিড়ম্বনা; আগাগোড়াই পড়িয়া দেখা উচিত। আশ্রমবাসিক পর্বে মনস্বিনী বিদুলার কথা আবার উল্লিখিত দেখি (১৬, ২০)।

তাই নারীদের সেই যুগে যেমন সংসারধর্ম তেমনই মানুষোচিত তেজস্বিতা তেমনি জ্ঞান ও ধর্মের সাধনা দেখা যায়। এই সব সাধনার সর্বপথেই মহাভারতের যুগে নারীদের গতিবিধি দেখা যায়। ভীষ্মের দ্বারা নিগৃহীতা কাশীরাজকন্যা অম্বা তপস্যা করিতে বনে গেলেন।

বনং প্রায়াৎ সা কন্যা তপসে বৃতা। উদ্যোগ, ১৮৮, ১৫

বনে আশ্রমবাস করিয়া তিনি কঠোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন (ঐ, ১৯-২৯)। পুরুষদের মত নারীরাও তখন সংসারধর্ম পালন করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাই পুত্রবধূদের লইয়া সত্যবতী বনে গমন করিলেন (আদি, ১২৮, ১২)। ইহাদের বহুকাল পরে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীও বনে গিয়া শেষজীবনের তপস্যা পূর্ণ করেন (আশ্রমবাসিক ১৫শ)। সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণও বানপ্রস্থ আশ্রয় করিয়াই জীবনকে পূর্ণ করেন (মৌষল, ৭, ৭৪)।

নারীদের এই তপস্যার অধিকার জৈন ও বৌদ্ধগণের মধ্যেও অব্যাহত ছিল। বৌদ্ধযুগে মহাপ্রজাপতি গোতমী, তিস্‌সা, মিত্তা, ভদ্দা, ধীরা, উপশমা প্রভৃতি বহু শাক্যনারী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এই সব তপস্বিনীদের কথা ভাল করিয়া জানিতে হইলে থেরীগাথা গ্রন্থখানি দেখিতে হয়।

জৈনদের মধ্যে এখনও কেহ কেহ সন্ন্যাসিনী হন। তাঁহাদের সাধ্বী বলে। তাঁহাদের পৃথক উপাশ্রয় আছে। আচারাংগ সূত্রে ইঁহাদের (২, ১, ১, ১) "ভিক্ষুণী"ও বলা হইয়াছে। প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের সময় ব্রাহ্মী ও সুন্দরী নামে দুইভগ্নী প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন (জিনসেনকৃত মহাপুরাণ)। চেতকদুহিতা ব্রহ্মচারিণী চন্দনা ছিলেন মহাবীরশিষ্যা এবং ছত্রিশ হাজার ভিক্ষুণীগণমুখ্যা। তীর্থঙ্কর অজিতনাথের তিনলক্ষ বিশ হাজার শিষ্যা ভিক্ষুণী ছিলেন। আরও বহুস্থানে ভিক্ষুণীদের কথা পাওয়া যায়।

দক্ষিণভারতে অল্‌বার ভক্ত নারীদের মধ্যে অণ্ডাল একজন মহাগুরু। উত্তরভারতেও বহু বৈষ্ণব ভক্তনারী হইয়াছেন। মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে হেমলতা ছিলেন একজন প্রখ্যাত গুরু। কবি কর্ণপুর তাঁহার শিষ্য। মনস্বিনী গঙ্গা ও জাহ্নবী বহুলোককে ভক্তিশিক্ষা ও দীক্ষা দিয়াছেন।

তন্ত্রে তো নারীরা দেবী আদ্যাশক্তিরই অংশ, "মদংশা যোষিতা মতাঃ"। শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ তাঁহার তন্ত্রসারে বলেন :

সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া।
সর্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা।
গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি। ১. ৭৪

স্ত্রীর কাছে দীক্ষা শুভা, মায়ের কাছে দীক্ষার অষ্টগুণফল।

স্ত্রিয়া দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ। ঐ

মহানির্বাণতন্ত্রে তো স্বয়ং শিব বলিতেছেন—হে আদ্যাশক্তি, জগতে সকল নারী তোমারই স্বরূপ, জগতে তাঁহারা আচ্ছন্নবিগ্রহ।

তব স্বরূপা রমণী জগত্যাচ্ছন্নবিগ্রহা। মহানির্বাণ, ১০, ৮০

রম্যা রলাঁ

শ্রীলীলাময় রায়

রম্যা রলাঁ দেশকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, এইখানে তাঁর জিত। কালকে অতিক্রম করতে পারেননি, এইখানে তাঁর হার।

এ হার তাঁর একার নয়, একজন কি দু'জন বাদে আর সকলের। অথচ এ জিত তাঁর মতো একজন কি দু'জনের। আমরা আজ বিজেতাকে অভিনন্দন জানাব, কিন্তু বিজিতকেও সমবেদনা জানাতে ভুলব না। আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এমন নিগূঢ় যে হয়তো আমাদের আনন্দ-বেদনা মৃত্যুর পরপারে তাঁর কাছে পৌছবে।

আঠারো-উনিশ বছর বয়সে তাঁর "জন ক্রিস্টোফার" আমার হৃদয় হরণ করেছিল। "পীপ্‌ল্‌স্ থিয়েটার" আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইচ্ছা করত, জন ক্রিস্টোফারের মতো বাঁচতে, জনসাধারণের জন্যে সৃষ্টি করতে। জানতুম যে, জনসাধারণ আমাকে বুঝবে না, ক্রিস্টোফারকেও বুঝল না, সেইজন্যে আগে থাকতে শোক করতুম। শোক করতুম আর সুখী হতুম এই ভেবে যে, আমি সেই স্বল্পসংখ্যক দুঃখীজনের একজন যাদের কেউ বুঝবে না, অথচ যারা সকলের জন্যে সর্বস্ব দিয়ে গেছে। যখন বুঝবে তখন আর খুঁজে পাবে না, তার আগে আমরা জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ।

এই যে "elite" বা স্বল্পসংখ্যকের মোহ এ মোহ আমার অনেক দিন পর্যন্ত ছিল, এখনো পুরোপুরি যায়নি। কিন্তু রলাঁ তাঁর এ মোহ শেষ বয়সে কাটিয়ে উঠেছিলেন। যদি কেউ কোনো দিন তাঁর জীবনচরিত হৃদয় দিয়ে লেখেন তা হলে দেখাবেন, এইটুকুর জন্যে তাঁকে কী অমানুষিক দুঃখ পেতে হয়েছিল। নিজেকে বহুসংখ্যকের একজন ভাবা শুনতে যত সহজ আসলে তত নয়। যাঁদের এক ছটাক প্রতিভা আছে তাঁরাও এক-একটি কেষ্টবিষ্টু। রলাঁর মতো দুর্লভ প্রতিভার অধিকারীর পক্ষে নোবেল প্রাইজের সিংহাসন থেকে নেমে চাষী মজুরের সঙ্গে কাঁধ মেলানো ইতিহাসে অপূর্ব। সতেরো বছরের অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্বের পরে তিনি তাঁর জীবনের মূল সমস্যার মীমাংসায় পৌছেছিলেন।

তাঁর জীবনের মূল সমস্যা বলেছি। বলা উচিত ছিল, তাঁর সাহিত্যিক বা শিল্পী-জীবনের। এ ছাড়া তাঁর আরো একটা জীবন ছিল, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জীবন। তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিবেক। টলস্টয়ের পরে ইউরোপের বিবেক ছিলেন তিনি এবং বার্নার্ড্ শ। বিবেকের সঙ্গে আপোষ দু'জনের মধ্যে একজনও করেন নি। কিন্তু, শ'র বিবেকের চেয়ে রলাঁর বিবেক নির্ভরযোগ্য। গত মহাযুদ্ধে এর অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায়।

তার পর থেকে ইউরোপের বিবেকীদের দৃষ্টি শ'র প্রতি তেমন নয়, রলাঁর প্রতি যেমন। কিন্তু এবারকার এই মহত্তর যুদ্ধে দেখা গেল, রলাঁর বিবেকও অনির্ভরযোগ্য। বেঁচে থাকলে তিনি আর বিবেকীদের দৃষ্টিপথে পড়তেন না। সে দৃষ্টি পড়ছে অলডাস হাক্‌সলী প্রভৃতির উপর। যদিও এঁরা কেউ রলাঁর মতো, শ'র মতো, বিরাট পুরুষ নন। এইখানেই তাঁর ট্র্যাজেডী।

কিন্তু এর উপর তাঁর হাত ছিল না। এ ট্র্যাজেডী অনিবার্য। তাঁর জীবন আলোচনা করে আমি বুঝতে পেরেছি, তিনি কেন সেবারকার যুদ্ধে যোগ দেননি, কেন এবারকার যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়েছেন। কারণটা রাজনৈতিক বললে কিছুই বলা হয় না, কারণটা তাঁর স্বভাবের মধ্যে নিহিত। ওটা তাঁর নিয়তির' নির্দেশ। বিবেক হেরে গেছে নিয়তির হাতে। তাঁর দোষ নেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসীদের দেশে যে বিপ্লব ঘটে তার স্মৃতি ফরাসীমাত্রেরই মনোজীবনের অঙ্গ। এমন দিন নেই যেদিন তাদের মনে পড়ে না বিপ্লবী জনতার সুকৃতি বা দুষ্কৃতি, বিপ্লবী নেতাদের উদয় বা অস্ত। তার পরেও আরো কয়েক বার বিপ্লব ঘটে গেছে সে দেশে। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের আঠারো বছর পরে রলাঁর জন্ম। তাঁর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন আরো এক বার বিপ্লব বাধে, কিন্তু ইতিহাসে তাকে বিপ্লব বলে গণ্য করা হয় না। বলা হয়, কমুনার্দ্ বিদ্রোহ। রলাঁর মনোজগতে এইসব বিপ্লব বা বিদ্রোহের জের চলছিল জন্মকাল থেকে।

কিন্তু যাদের মাঝখানে তিনি মানুষ তারা মধ্যবিত্ত বা বুদ্ধিজীবী, তাদের স্বার্থ প্রথমবারের বিপ্লবেই সাধিত হয়েছে, দ্বিতীয় বারের অপেক্ষা রাখেনি। দ্বিতীয় বারের বিপ্লবে তাদের যেটুকু সহানুভূতি ছিল তৃতীয় বারের বেলা সেটুকুও রইল না। কমুনার্দ্ বিদ্রোহে তো তাদের সহানুভূতির বদলে অবজ্ঞার ভাব ছিল। মধ্যবিত্তরা বিপ্লবের নেতৃত্ব করা দূরে থাক, বিপ্লবকে হাড়ে হাড়ে ভয় করত। আবার বিপ্লব বাধবে, এতে তাদের অন্তরের সায় ছিল না; তবে তারা ভালো করেই বুঝত যে, জনসাধারণকে যদি তাতিয়ে কিম্বা মাতিয়ে রাখা না যায় ওরা বিপ্লবের কথা ভাববে। সেইজন্যে জার্মানীর সঙ্গে আবার কবে যুদ্ধ বাধবে, এবার ফ্রান্স জিতবে, এই ছিল তাদের নিত্যকার জল্পনা। আর ছিল আমোদপ্রমোদের ফলাও ব্যবস্থা। অন্তহীন মত্ততা। এবং তপ্ততা।

রলাঁ মানুষ হন এই আবহাওয়ায়। তিনিও মধ্যবিত্ত তথা বুদ্ধিজীবী। স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে যুদ্ধবিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়সুখ এই তো জীবনের লক্ষ্য। এর জন্যে যত পারো টাকা কামাও, যেমন করে পারো— ছলে বলে কৌশলে। তখনকার দিনের নৈতিক আদর্শ এর উপরে উঠত না। কিন্তু অতি অল্প বয়স থেকে রলাঁর তাতে বিরাগ আসে। প্রথমত তিনি প্রোটেস্টান্ট্ বংশের সন্তান, ফরাসী প্রোটেস্টান্ট্‌রা চরিত্র সম্বন্ধে কঠোর। দ্বিতীয়ত তিনি যখন স্কুলের ছাত্র তখন থেকে টলস্টয়ের শিষ্য। যাকে বলে জীবনের সাফল্য তার চরমে উপনীত হয়েও টলস্টয়ের তৃপ্তি হল না, তিনি একে একে সব ত্যাগ করলেন— যা কিছু অর্থকরী, যা কিছু অনর্থকরী। কী করে মানুষকে ভালোবাসবেন, মানুষের সেবা করবেন— সব মানুষের, দীনহীন মানুষের, এই চিন্তায় টলস্টয় বিভোর। এমন সময় রলাঁর চিঠি, অজানা অচেনা তরুণের চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছয়। নগণ্য একটি তরুণকে "প্রিয় ভ্রাতা" বলে সম্বোধন করে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন সে উত্তর দু'কথায় দায়সারা গোছের নয়। এই তরুণটি যেন তাঁর উত্তরাধিকারী, উত্তরাধিকারীকে সমস্ত জানাতে ও বোঝাতে হয়, তাই তিনি তাঁকে প্রকাণ্ড একখানি পত্র লিখেছিলেন। এই ভাবে রলাঁর মন্ত্রদীক্ষা হল।

স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি ইটালী যান, সেখানে দু'বছর কাটান। এক হিসাবে তাঁর শিক্ষানবিশি শেষ হয়েছিল স্বদেশেই। শিক্ষানবিশির পরে এক বছর দেশভ্রমণের রীতি ইউরোপের সনাতন প্রথা। রলাঁর ভ্রমণকাল কাটল ইটালীর রোম প্রভৃতি অঞ্চলে। সেখানে তাঁর আলাপ হল এক

বর্ষীয়সী জার্মান মহিলার সঙ্গে, নাম মাল্‌ভিডা ভন মাইজেন্‌বুগ। ইনি গ্যয়টের সময়কার মানুষ। ভাগ্‌নার, নীট্‌শে, মাৎসিনি, গারিবল্‌ডি, ইব্‌সেন প্রভৃতির অন্তরঙ্গ বন্ধু। রলাঁকে দেখে ইনি চিনতে পেরেছিলেন তাঁর অন্তরবাসীকে। দু'জনেই আদর্শবাদী, যে আদর্শ মরজগতে মহত্তম সেই আদর্শ দু'জনের। মালভিডা তাঁকে আত্মপ্রত্যয় দিলেন, অন্তগামী তারা যেমন সূর্যকে দেয়। রলাঁ যখন রোম থেকে ফিরলেন তখন তিনি আদর্শনিষ্ঠ হতে কৃতসংকল্প। তখন আর তাঁকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বলে ভুল করা যায় না। যাঁদের সে ভুল ছিল তাঁদের ভুল ভাঙতে দেরি হল না। একজন তাঁকে বিয়ে করলেন ও বিয়ের অল্পকাল পরে আলাদা হলেন।

উপরে যাকে স্কুল বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে কলেজ। রলাঁ হলেন সেখানকার অধ্যাপক। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের, অধ্যাপক হন। পরবর্তী বয়সে তিনি পদত্যাগ করেন। লেখা থেকে যা পেতেন তাতেই তাঁর চলত। সারা জীবন সামান্য খরচে চালিয়েছেন।

ইটালী থেকে ফেরার পরে তিনি যখন সাহিত্যে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর প্রিয় বিষয় হল বিপ্লব ও প্রিয় বিভাগ হল নাটক। জনগণের নাট্যশালা বলে তাঁর একটি পরিকল্পনা ছিল। সাধারণ রঙ্গালয় তো আমোদপ্রমোদের দোকান। তার জন্যে নাটক লেখা মানে দোকানদারি। যাতে দু'পয়সা হবে না তেমন কোনো নাটক কেউ অভিনয় করবে না। আর অভিনয় করলেও কেউ পয়সা দিয়ে দেখবে না। অথচ নাটকের মতো সার্বজনীন অভিজ্ঞতাকে আমোদপ্রমোদের আধার করে তাই দিয়ে বণিকবৃত্তি সম্পাদন যে ঘোর অসভ্যতা ও অনীতি। গ্রীকদের নাট্যশালা গির্জার মতো মন্দিরের মতো ধনগন্ধহীন ছিল। ফরাসীদের নাট্যশালাও তাই হবে। তার জন্যে তিনি লিখতে লাগলেন বিপ্লবের কাহিনী। বিপ্লবের ও ন্যায়নিষ্ঠতার। কিন্তু লিখলে কী হবে। বিপ্লবের প্রতি মধ্যবিত্তদের মনোভাব প্রসন্ন নয়, তাদের হাতেই কলকাটি। তাতে জল মেশাতে রলাঁ রাজি নন। সব চেয়ে দুঃখের কথা, জনগণ উদাসীন। হাড়ভাঙা খাটুনির পরে তারা চায় একটু রঙ্গ, একটু বিস্মৃতি। রলাঁ তা দিতে অক্ষম।

এর পরে তিনি নাটক লেখায় ক্ষান্তি দিয়ে জীবনচরিত ও উপন্যাস রচনায় মন দিলেন। এসব জনগণের জন্যে নয়। এগুলিতে বিপ্লবের কথা ছিল না, তবে বিদ্রোহের কথা ছিল। তাঁর মনের তার বিপ্লবের না হোক বিদ্রোহের সুরে বাঁধা প্রথম থেকেই। কিন্তু যুদ্ধের উপর তাঁর আন্তরিক বিরাগ। যুদ্ধ বলতে ফরাসীর কাছে বোঝায় জার্মানের সঙ্গে যুদ্ধ। জার্মান মানে মাল্‌ভিডা ভন মাইজেন্‌বুগ, জার্মান মানে বেঠোভেন। সংগীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আশৈশব। তিনি বোধ হয় মনে মনে চেয়েছিলেন সংগীতশিল্পী হতে, ঘটনাচক্রে হয়ে দাঁড়ালেন সংগীতসমালোচক ও সাহিত্যিক। সংগীত ভালোবাসতেন বলে সংগীতনায়কদেরও ভালোবাসতেন। তাঁদের মধ্যে বেঠোভেনকেই ভালোবাসতেন সকলের চেয়ে বেশী। বেঠোভেন ছিলেন তাঁরই মতো বিপ্লবী বা বিদ্রোহী। সেই বেঠোভেনের স্বজাতির বিরুদ্ধে অসিধারণ? কখনো নয়। রলাঁর "জন ক্রিস্টোফার"ও জার্মান। "জন ক্রিস্টোফার"এর স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ? কখনো নয়। যুদ্ধ যদি আর কারো বিরুদ্ধে হ'ত তা হলে হয়তো কথা ছিল। কিন্তু আর কারো বিরুদ্ধে হলেও তিনি যুদ্ধবিরোধী হতেন। কারণ, তাঁর হৃদয়টা আন্তর্জাতিক। তিনি জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন না। সেইজন্যে তাঁর পক্ষে কঠিন হ'ত যে কোনো জাতির বিরুদ্ধে খড়্গধারণ।

অথচ তিনি যে ঠিক অহিংসাবাদী ছিলেন তা নয়। তা যদি হতেন বিপ্লবের কথা ভাবতেন না।

বিপ্লব কি কোনো দিন বিনা রক্তপাতে হয়েছে? না, তিনি তা জানতেন। সেইজন্যে তাঁকে অহিংসক বলে ধরে নেওয়া যায় না। কিন্তু টলস্টয়ের প্রভাবে তিনি অহিংসার প্রয়োজন মানতেন। বিপ্লব বা বিদ্রোহ ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যদি অহিংসভাবে সিদ্ধ হয় তো অহিংসাই শ্রেয়, যদি না হয় তো হিংসার আশ্রয় নিতে হবে। উপায়কে উদ্দেশ্যের উপরে স্থান দিলে চলবে না। এটা যে কেবল তাঁর শেষ বয়সের যুক্তি তা নয়, এ যুক্তি বরাবরই তাঁর মনের তলে প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু একবার যদি এ যুক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তো যুদ্ধবিগ্রহেরও সমর্থন করা হয়। যুদ্ধবিগ্রহকে সমর্থন করলে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধে। বেঠোভেনের বিরুদ্ধে, মাইকেল এঞ্জেলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ? "ক্রিস্টেফার"এর বিরুদ্ধে, "গ্রাৎসিয়া"র বিরুদ্ধে যুদ্ধ? অসম্ভব।

গত মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে রাশিয়ায় যখন বিপ্লব ঘটে তখন রলাঁ পড়লেন দোটানায়। বিপ্লবী তিনি, তাঁর তো আনন্দে উদ্‌বাহু হওয়া উচিত। লেনিন নাকি তাঁকে সহযাত্রী হতে সেধেছিলেন স্থইট্‌জার্ল্যাণ্ড্ থেকে রুশ দেশে। তিনি গেলেন না। বিপ্লব হলেই প্রতিবিপ্লব হবে, উভয় পক্ষে হাতাহাতি বেধে যাবে, তার মানে গৃহযুদ্ধ। তাই হ'ল রাশিয়ায়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যিনি স্থইট্‌জার্ল্যাণ্ড্ থেকে প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন। তিনি কেমন করে গৃহযুদ্ধের পোষকতা করতেন? অসংগতির অপবাদ রটত। তবে এ কথাও ঠিক যে, তিনি রক্তপাতে কাতর ছিলেন। ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধ-জনিত যে ভয়াবহ রক্তপাত ও তদ্‌জনিত শোকতাপ ইউরোপের বক্ষ ব্যাকুল করেছিল রলাঁর বুকে বাজছিল সেই ব্যাকুল ব্যথা। এর উপর আবার বিপ্লব! তিনি প্রস্তুত ছিলেন না তার জন্যে।

মহাযুদ্ধের পরেও বহুকাল যাবৎ প্রস্তুত ছিলেন না। বিপ্লব যে মন্দ, এ যুক্তি তাঁর নয়। তাঁর যুক্তি, বিপ্লবের পদ্ধতি মন্দ। উদ্দেশ্য মন্দ নয়, উপায় মন্দ। বারবুস্‌কে লিখেছিলেন:

> I wrote in *Clérambault* (and I am more than ever of that opinion): It is not true that the end justifies the means. The means are ever more important for true progress than the end. . . . For the end (so rarely reached and always incompletely) but modifies the external relations between men. The means, however, shape the mind of man according either to the rhythm of justice or to the rhythm of violence.

কিন্তু উপায়ের উপর এতটা জোর দিলে প্রকারান্তরে বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করা হয়, কারণ ইতিহাসে এমন বিপ্লব কোথায় যাতে উপায়ের শুদ্ধিরক্ষা হয়েছে? এই স্বতোবিরোধ রলাঁকে নিষ্ফল করত যদি না তিনি আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করতেন গান্ধীকে। গান্ধীও বিদ্রোহী জননায়ক, অথচ তাঁর উপায় অশুদ্ধ নয়। রলাঁর মন যা চায় তিনি তাই, তিনিই সেই বিপ্লবী যাঁর যুক্তি বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করে না। গান্ধীকে রলাঁ ইউরোপের বিপ্লবী মহলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু ইউরোপের বিপ্লবীদের সম্মুখে তখন জরুরি প্রশ্ন: সোভিয়েট রাশিয়া যদি বিপন্ন হয় তা হলে কি উপায়ের কথা ভেবে সময় নষ্ট করা উচিত? রলাঁর গান্ধীচরিত এ প্রশ্নের উত্তর নয়! রলাঁ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত উপায়ের অশুদ্ধতা মেনে নিয়েছিলেন।

ভালো হোক মন্দ হোক এত কাল পরে একটা বিপ্লব ঘটেছে, তার ফলে জনসাধারণের অধিকার ও ক্ষমতা বেড়ে গেছে, এটা তো স্পষ্ট। কথা হচ্ছে, তার দুর্দিনে তাকে বাঁচাতে হলে হিংসার আশ্রয়

নেওয়া চলবে কিনা ? রলাঁ বললেন, চলবে। যদি সোভিয়েটকে নিয়ে যুদ্ধ বাধে তা হলে যুদ্ধে যোগদান চলবে কিনা ? রলাঁ বললেন, চলবে। এমনি করে তিনি যুদ্ধবিরোধী থেকে যুদ্ধসমর্থক হয়ে উঠলেন। কিন্তু এর জন্যে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের সীমা ছিল না। জার্মানীর সঙ্গে ইটালীর সঙ্গে যুঝতে হল ফ্রান্সকে। বেঠোভেনের সঙ্গে মাইকেল এঞ্জেলোর সঙ্গে তাঁকে। কী প্রগাঢ় বেদনা ! এ যেন নিজের হাতে নিজের পাঁজর ভাঙা।

খানিকটা আত্মপ্রতারণাও ছিল। রলাঁ মনে করেছিলেন, সময়মতো হস্তক্ষেপ করলে যুদ্ধ বাধবেই না। "য়্যাক্‌শন্‌" "য়্যাক্‌শন্‌" বলে তিনি যখন হাঁক ছাড়তেন তখন এই কথাটাই বোঝাতে চাইতেন যে, সময় থাকতে চেষ্টা করলে যুদ্ধ বন্ধ হবে। আমাদের অনেকেরই সেই ধারণা ছিল। হিট্‌লারকে উঠতে না দিলে কি এত বড় যুদ্ধ বাধত ? মুসোলিনিকে বাড়তে না দিলে কি হিট্‌লারকে হারানো এত শক্ত হত ? রলাঁর যুক্তি এক হিসাবে যুদ্ধবিরোধীরই যুক্তি। কিন্তু আমরা যেমন ছেলেমানুষ ছিলুম তিনিও তেমনি শিশু ভোলানাথ। জানতেন না যে, সরষের ভিতর ভূত থাকে।

লাভের মধ্যে হল এই যে, রলাঁর নৈতিক উচ্চতা টলস্টয়ের ধারেকাছেও রইল না। গান্ধীর কাছে তো নয়ই। নিয়তি।

তবে রলাঁ ছিলেন স্বভাবশিল্পী, সুযোগ পেলেই পিআনো নিয়ে বসতেন, বেঠোভেন বাজাতেন। নাটক বা উপন্যাস লিখতেন। লিখতেন সংগীতবিষয়ক প্রবন্ধ। মহাপুরুষদের জীবনদ্বন্দ্ব। জীবনছন্দ। তাঁর রামকৃষ্ণবিবেকানন্দচরিত একপ্রকার শিল্পকাজ। ও বই লিখে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার বা বিপ্লবী ইউরোপের জিজ্ঞাসা দূর করেননি। ভারতের আত্মার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন ইউরোপের আত্মার। সাধনার সঙ্গে সাধনার। আবিষ্কার করে আনন্দিত হয়েছেন যে, বাইরে আমাদের দূরত্ব যত হোক অন্তরে আমরা নিকট। এই আবিষ্কার তাঁকে শান্তি দিয়েছে শেষ বয়সের চরম অশান্তির মাঝে। বল দিয়েছেও।

সাহিত্য হিসাবে তাঁর জীবনবৃত্তগুলির মূল্য কত জানিনে। তাঁর নাটক বেশী পড়িনি, মূল্য আমার অজানা। দু'খানি উপন্যাস পড়েছি— "জন ক্রিস্টোফার" ও "মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা।" দ্বিতীয়টি শেষ করিনি। যতদূর পড়েছি তার উপর নির্ভর করে বলতে পারি প্রথমটির সমান হয়নি, কিন্তু তার চেয়েও গভীর হয়েছে। রসঘন হয়েছে। হয়েছে মর্মন্তুদ।

উভয় গ্রন্থেই গ্রন্থকারের মনে একই জিজ্ঞাসা। কেমন করে বাঁচব ? একই উত্তর, মিথ্যার সঙ্গে আপস করব না, সত্য করে বাঁচব। এর দরুন যদি দুঃখ পেতে হয়, দুঃখ পাব, এড়াব না। জীবনে বহু দুঃখ আছে, তা জেনেও জীবনকে ভালোবাসব। সেই তো বীরত্ব। মর্ত্যলোকে একমাত্র বীরত্ব।

ক্রিস্টোফার ও আনেৎ দুই উপন্যাসের নায়ক নায়িকা উভয়েই অসুখী। তাদের সুখী করার জন্যে তাদের স্রষ্টার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই। কিন্তু যাতে তারা খাঁটি থাকে, পোড়খাওয়া সোনার মতো খাঁটি, সৃষ্টিকর্তার সমস্তক্ষণ লক্ষ্য। সাংসারিক অর্থে তারা সাধু বা সাধ্বী নয়, কিন্তু উচ্চতর অর্থে তারা শুদ্ধ, তারা নির্মল। পিউরিটি বলতে কী বোঝানো উচিত তার একজোড়া নতুন উদাহরণ দিয়ে গেলেন রলাঁ। হয়তো শুধু এইজন্যেই তাঁকে এ দুটি মহাভারত রামায়ণ লিখতে হয়েছিল এত কাল ধরে।

মহাভারত-রামায়ণের সঙ্গে এ দুটি এপিক উপন্যাসের তুলনা করছি আর এক কারণে। উভয়েরই অন্তরালে রয়েছে দুই প্রলয়ংকর যুদ্ধ। ভাবী যুদ্ধের ছায়া পড়েছে "জন ক্রিস্টোফার"এর উপরে। "মন্ত্রমুগ্ধ

আত্মা"র উপর ভূত ভবিষ্যৎ উভয় যুদ্ধের ছায়া। সুতরাং পরোক্ষ ভাবে এ দুখানি যুদ্ধকাব্য। উচ্চাঙ্গের কিনা, স্মরণীয় কিনা, সে বিচার মহাকাল করবে।

আমাদের কারো কারো জীবনে রলাঁর এ দুটি পুঁথি স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপে "জন ক্রিস্টোফার" অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ওর সমকক্ষ অনেক। ওর চেয়েও মাথায় উঁচু টলস্টয়-ডস্টোয়েভ্স্কির একাধিক উপন্যাস। রলাঁর স্থান সাহিত্যের সভায় তাঁদেরই পাশে। তবে "জন ক্রিস্টোফার" বা "মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা" প্রধানত জীবনজিজ্ঞাসুদের জন্যে। "সমর ও শান্তি" বা "কারামাজভ" জীবনজিজ্ঞাসু তথা সর্বসাধারণের জন্যে।

"জন ক্রিস্টোফার" বিশেষ করে সংগীতপ্রেমিকদের জন্যে। এর পাতায় পাতায় সংগীত-প্রসঙ্গ। বোধ হয় বেঠোভেনের জীবনী লিখে রলাঁর সংগীত সম্বন্ধে বলবার কথা ফুরয়নি, তার সঙ্গে মিলেছে সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তব্য। ক্রিস্টোফারের সঙ্গে অলিভিয়ের। জার্মানের সঙ্গে ফরাসী। ক্রিস্টোফারকে জার্মান না করলে কি চলত না? না, চলত না। উঁচুদরের সংগীতকার যাঁরা তাঁদের শিক্ষা এক পুরুষের নয়, তিন-চার পুরুষের। বাখ্ ও বেঠোভেন প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে সংগীতশিল্পী। জার্মানীতে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত, ফ্রান্সে বিরল। তার পর, সংগীতশিক্ষা তো কেবল পরিবারে হয় না, হয় রাজা-রাজড়ার দরবারে। জার্মানীতে শত শত দরবার ছিল একশো বছর আগেও। ফ্রান্সে বড় জোর ছিল একটি। তার পর জার্মানী এমন দেশ যে তার ছোট বড় সব শহরেই থিয়েটার অপেরা কন্সার্ট ও সেই জাতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান অগুন্‌তি। পাড়ায় পাড়ায় জলসা, ঘরে ঘরে গানবাজনা। কাজেই ক্রিস্টোফারকে জার্মান করতেই হল। কিন্তু জার্মানীতে তখন সামরিকতার বাড়াবাড়ি, খুদে কর্তাদের সঙ্গে মুখ সামলে কথা কইতে হয়, কথায় কথায় বিধিনিষেধ। স্বাধীনচেতা ক্রিস্টোফারকে তাই বিপদে পড়ে ফেরার হতে হল প্যারিসে। সেখানে তার ধীরে ধীরে পসার জমল, নামডাক হল। প্যারিস যদিও ফ্রান্সের রাজধানী তবু আন্তর্জাতিকতার পীঠস্থানও বটে। গুণী লোক দেখলে ফরাসীরা খাতির করে। ক্রিস্টোফার তাদের একজন হয়ে উঠল, ফ্রান্সকে ভালোবাসল অলিভিয়েরকে বন্ধু পেয়ে। এদের দুজনের বন্ধুতা প্রেমের চেয়েও নিখাদ। দেশের ব্যবধান অলীক, ভাষার ব্যবধান অলীক।

অলিভিয়ের আদর্শবাদী সাহিত্যিক। ক্রিস্টোফার আদর্শবাদী সংগীতকার। এমনি আরো কয়েকজন আদর্শবাদীকে ও বাস্তববাদীকে আমরা পাচ্ছি, তাদের কেউ নারী কেউ পুরুষ। তাদের এক-এক জনের এক-এক ধারা, এক-এক দিকে গতি। একজনের নাম ফ্রাঁসোয়াজ উদোঁ। অভিনেত্রী। এঁর সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলছেন:

But especially he was indebted to her for a better understanding of the theatre; she helped him to pierce through to the spirit of that admirable art, the most perfect of all arts, the fullest and most sober. She revealed to him the beauty of that magic instrument of the human dreams,— and made him see that he must write for it and not for himself, as he had a tendency to do. . . . Françoise's ideas were in accordance with Christopher's who, at that stage in his career, was inclined towards a collective art, in communion with other men. Françoise's experience helped him to grasp the mysterious collaboration which is set ɪp bet-

ween the audience and the actor. . . . It was this comomn soul which it was the business of the great artist to express.

এর পরে আধুনিক ইউরোপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

Modern Europe had no common book : no poem, no prayer, no act of faith which was the property of all. Oh! the shame that should overwhelm all the writers, artists, thinkers, of to-day! Not one of them has written, not one of them has thought, for all. Only Beethoven has left a few pages of a new Gospel of consolation and brotherhood : but only musicians can read it, and the majority of men will never hear it.

রলাঁর সাধ ছিল সংগীতকার হতে। বিধাতা বাদী। পুর্বপুরুষরা সংগীতশিল্পী নন। নাট্যকার হতে স্পৃহা ছিল। তাঁর স্পৃহা থাকলে কী হবে, লোকের আগ্রহ ছিল না। বার বার তিন বার। এবার ঔপন্যাসিক। এবার সিদ্ধার্থ।

কিন্তু তাঁর সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলা যায় বেঠোভেন সম্বন্ধে যা তিনি বলে গেছেন। একটু ঘুরিয়ে বললে যা দাঁড়ায় তা এই :

Rolland has left a few pages of a new Gospel of consolation and brotherhood : but only seekers after Life can read it, and the majority of men will never hear it.

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বাংলা সাময়িক-পত্র

রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানি বাংলা সাময়িক-পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন ; যেগুলিতে সম্পাদক হিসাবে তাহার নাম ছিল, সেগুলির একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। ইহা তাঁহার জীবনী-লেখকের কাজে লাগিতে পারে।

১। **সাধনা** ৪র্থ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩০১—কার্তিক ১৩০২

২। **ভারতী** ২২শ বর্ষ, ১৩০৫

৩। **ভাণ্ডার** ১ম বর্ষ, বৈশাখ—চৈত্র ১৩২২

২য় বর্ষ, বৈশাখ—চৈত্র ১৩১৩

৩য় বর্ষ, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (যুগ্ম-সংখ্যা) ১৩১৪

৩য় বর্ষ ভাণ্ডারের দুই সংখ্যা যে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত, ইহার উল্লেখ ১৯০৭ সনের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সংকলিত তালিকায় আছে। ৩য় বর্ষের পরবর্তী সংখ্যাগুলি সম্পাদন করেন শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

৪। **বঙ্গদর্শন** নব পর্য্যায় ১ম—৫ম বর্ষ, ১৩০৮—১৩১২ সাল।

সহকারী সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ষষ্ঠ বর্ষ হইতে সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন।

৫। **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা** ১৮শ কল্প, ১৮৩৩—১৮৩৬ শক (১৩১৮—২১ সাল)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি জীবনচরিত আছে, কিন্তু তাহাতে আমাদের আশ মেটে না। অনুসন্ধান করিলে তাঁহার সম্বন্ধে এখনও অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁহার জীবনীর উপাদান-স্বরূপ আমি এরূপ কিছু তথ্যের উল্লেখ করিব।

১। জন্ম-তারিখ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম-তারিখ— ২২ বৈশাখ ১২৫৫ (৩ মে ১৮৪৮) বলিয়া প্রচলিত। তাঁহার জীবনীকার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষও এই তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন। জন্ম-তারিখটিতে ভুল আছে। শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পারিবারিক খাতায় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তাক্ষরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে রাশিচক্র ও জন্মকাল পাওয়া যায়, শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহা আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। উহা যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি :

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম— ১৭৭১ শক। ২২ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ। মে।

১৮৭১।০।২১।৫০।৫৯।৩০ ইং রাত্রি ১।৫৩ মিনিট
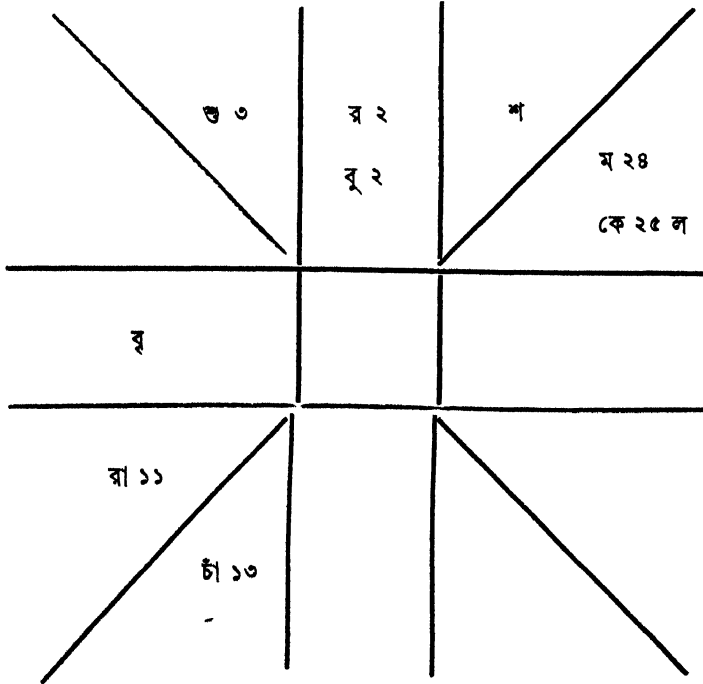
বৃহস্পতিবার, শুক্লপক্ষ, দ্বাদশী, হস্তা কন্যারাশি, বুধের দশা ১৬।৩।১১।৪৮।৪৫ ভোগ্য।

ইহা হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম-তারিখ ইংরেজী মতে ২৪ মে ১৮৪৯ পাওয়া যায়

বিবাহ

১৭৯০ শকের ২৩ আষাঢ় (৫ জুলাই ১৮৬৮) তারিখে কাদম্বরী [কাদম্বিনী] দেবীর সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। ১৭৯০ শকের শ্রাবণ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ হইতে আমরা তাঁহার বিবাহের সঠিক তারিখ পাই।

সংবাদটি এইরূপ :

ব্রাহ্ম-বিবাহ।—গত ২৩ আষাঢ় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যার যথাবিধি ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুষারে শুভ বিবাহ সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সভায় বহুসংখ্য ব্রাহ্ম এবং এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক ব্রাহ্মণ সকল উপস্থিত ছিলেন। দরিদ্রদিগকে প্রচুর ভক্ষ্য ভোজে পরিতৃপ্ত করিয়া বিস্তর অর্থ প্রদান করাও হইয়াছিল।

পুত্রের বিবাহে দেবেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না। তিনি একখানি পত্রে ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন :

ওঁ

Willow Banks
Murree Hills
20th July 1868

প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ

জ্যোতির বিবাহে যাহা কিছু আমার হৃদ্য ও কল্যাণকর কার্য্য হইয়াছে তাহা তোমার প্রযত্নেই হইয়াছে। ইহা হইতে প্রচুর মঙ্গল উৎপন্ন হইয়া তোমার হৃদয়কে আনন্দে সিক্ত রাখুক, এই আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি ৬ শ্রাবণ, ১৭৯০ শক

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

১৯ এপ্রিল ১৮৮৪ তারিখে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু ঘটে; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩৫। তিনি আর বিবাহ করেন নাই, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

গোপাল উড়ের দলের যাত্রা দেখিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে সর্বপ্রথম একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা উদিত হয়। ইহার ফলে ঠাকুরবাড়িতে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার উদ্ভব হয়। এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন— জোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। এই নাটকীয় দলে কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন।

ঠাকুরবাড়িতে প্রথমে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' এবং তাহার কিছু দিন পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হইল। দুই বারই অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই দুই অভিনয়ে যথাক্রমে কৃষ্ণকুমারীর মাতা ও সার্জনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালার পরিচালকেরা অভিনয়োপযোগী অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাংলা নাটকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের জুন (?) মাসে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস্' পত্রে প্রথমে বহুবিবাহ বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দিলেন। কিন্তু অল্প দিন

পরেই নাট্যশালা-কমিটি সংবাদপত্র হইতে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই নাটক-রচনার ভার অর্পণ করেন।

অল্প দিনের মধ্যেই বহুবিবাহ-বিষয়ক নাটকখানির রচনা শেষ করিয়া রামনারায়ণ তর্করত্ন জোড়াসাঁকো নাট্যশালা-কমিটির নিকট হইতে দুই শত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। নাটকখানির নাম— 'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক'।

ইহার পর নাটকটি অভিনয় করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে নাট্যশালা-কমিটি পুনর্গঠিত হইয়াছিল এবং 'বড়'র দল— গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে মহাসমারোহে 'নব-নাটক'-এর প্রথম অভিনয় হয়— ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি তারিখে। এই অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কনসার্টে হারমোনিয়ম বাজাইয়াছিলেন এবং নটীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন, তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত করিতেছি :

The play opened with the usual appearance of Nat and Nattee with the customary prologue. Both were clad beautifully and Nattee particularly presented a very graceful figure. Her attitude, gestures, and motions were as delicate as they were becoming, though her singing, we must confess, was not up to the mark.

এই অভিনয়ের সংবাদ পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ নাটোর হইতে গণেন্দ্রনাথকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন :

নাটোর

ওঁ কালীগ্রাম ৪ঠা মাঘ ১৭৮৮

[১৮৬৭, ১৬ জানুয়ারি]

প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ,

তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, সমবেত বাদ্য দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে, কবিত্বরসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দ্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্ব্বে আমার সহৃদয় মধ্যম ভায়ার [গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের] উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্ব্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়। সদ্‌ভাবের সহিত এ আমোদকে রক্ষা করিলে আমাদের দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতি

দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ঠাকুর-বাড়িতে 'নব-নাটক' উপর্য্যুপরি নয় বার অভিনীত হইয়াছিল।

জোড়াসাঁকো-নাট্যশালা-কমিটি বহুবিবাহ-বিষয়ক একখানি নাটক ছাড়া আরও দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে একটির বিষয়— হিন্দু মহিলাগণের বর্তমান দুরবস্থা। এই বিষয়ে 'হিন্দু মহিলা নাটক' রচনা করিয়া সোমড়া-নিবাসী বিপিনমোহন সেনগুপ্ত ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে দুই শত টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। কিন্তু নাটকখানি জোড়াসাঁকো-নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। কারণ, নাটকখানির 'বিজ্ঞাপন' হইতে জানা যায় যে, ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দেই ঐ 'নাট্যশালা-সমাজ বিগত-জীবন' হইয়াছিল।

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দেই জোড়াসাঁকো নাট্যশালা বিগতজীবন হইয়াছিল। শ্রীযুত পুলিনবিহারী সেনের সৌজন্যে আমেদাবাদ হইতে লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একখানি পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহা হইতে জোড়াসাঁকো-নাট্যশালা সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ পাওয়া যায়। পত্রখানি এইরূপ :

14th July [1867]
Ahmedabad.

My dear Goonoodada,

It is but a few days ago that I received a letter from yourself and one from Jadoo [Nath Mookerji]; and I have already replied to them. You can't expect any letters to reach you, at least in less than 10 days. The origin of the Jorasanko Theatre, is now hidden in the deep folds of rusty antiquity!! It is well that some worthy historian, should bring it out into light, and expel the gloom which still hangs about it. Who knew at that time —in those jolly days of our Eating Club, that acorn would grow into an oak?—that, small beginnings would give birth to mighty things?—that smoke would blaze into a tremendous conflagration?—who, I say, then looked into the seeds of time or would peep into the womb of futurity?—who knew in fact that a mouse would give birth to a mountain? Had all this been known to us, we certainly would have taken good care to note down every particular of its birth, would have marked, with a vigilant eye, every symptom which it presented in its embryo state. If we but carry ourselves a couple of years back, we would perhaps find ourselves seated in the snug little room of old, where we passed the brightest moments of our existence, *which* was the usual haunt of a few merry souls, would perhaps find ourselves seated in the snug little room of old, where we passed the dozen voices, where we used to enjoy the delicious songs of *Bama*, and pleasant buffooneries of *Jadoo*, where about all "hot, hot" কচুরি and ছোকা s used to be leaped up in pyramids; and it was there—in the self-same place that this Jorasanko Theatre got its being! Now let me leave aside all metaphors and rather be homely. It was *Gopal Oorria's Jatra*, that suggested us the idea of projecting a theatre. It was Gangooly [Saradaprasad], you and I that proposed it; and I don't think that Jadoo can claim the credit of being one of its projectors. I *do* think that he had no hand in the matter.

Yours affly
J N. Tagore.

আদি ব্রাহ্মসমাজ

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। সমাজের অধ্যক্ষ-সভার কর্মচারী-হিসাবে তিনি কখন কোন্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পুরাতন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সাহায্যে তাহার নির্দেশ দিতেছি :

বৈশাখ ১৭৯১ শক (এপ্রিল ১৮৬৯) : যুগ্ম-সম্পাদক (অন্যতর সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)।
মাঘ ১৭৯২ শক (ইং ১৮৭১) — ভাদ্র ১৮০৬ শক (ইং ১৮৮৪) : সম্পাদক

গ্রন্থপঞ্জী

'বসুমতী'-কার্যালয় হইতে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই; কোন্ গ্রন্থ কোন্ সালে প্রথম প্রকাশিত, তাহাও লিখিত হয় নাই। ফলে যাঁহারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা পাইতে চাহেন, তাঁহাদের কৌতূহল বসুমতী-গ্রন্থাবলীর সাহায্যে মিটিবে না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোন কোন গ্রন্থে আবার মুদ্রণকাল দেওয়া নাই (দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল' ও 'ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ'-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে)। ইহার ফলে এই সকল গ্রন্থ কোন্ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার জীবনীকার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষও এগুলির মুদ্রণকাল যথাযথ ভাবে উল্লেখ করিতে পারেন নাই। এই সকল কারণে আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত ও সংকলিত গ্রন্থগুলির একটি নির্ভরযোগ্য কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করিলাম; তালিকায় মুদ্রিত বাংলা তারিখগুলি মূল গ্রন্থ হইতে, এবং মাস-তারিখ-সম্বলিত ইংরেজী তারিখগুলি 'বেঙ্গল লাইব্রেরি'-সংকলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **কিঞ্চিৎ জলযোগ।** প্রহসন ১৭৯৪ শক, ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২। পৃ. ৮৬।

২। **পুরুবিক্রম নাটক।** ১৭৯৬ শকাব্দা, ৯ জুলাই ১৮৭৪। পৃ. ১৪৭। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" গানটি স্থান পাইয়াছে।

৩। **সরোজিনী** বা চিতোর আক্রমণ নাটক। ১৭৯৭ শকাব্দা, ৩০ নবেম্বর ১৮৭৫। ইহাতে মুদ্রিত "জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ" গানটি যে রবীন্দ্রনাথের রচনা, তাহা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' পুস্তক পাঠে জানা যায়।

৪। **এমন কর্ম্ম আর ক'রব না।** প্রহসন। আষাঢ় ১৭৯৯ শক। ইং ১৮৭৭। পৃ. ১১৬। ইহাই পরে 'অলীক বাবু' নামে প্রকাশিত হয়।

৫। **অশ্রুমতী নাটক।** শ্রাবণ ১২৮৬, ৪ নবেম্বর ১৮৭৯। পৃ. ২০৪। ইহাতেও রবীন্দ্র-নাথের রচিত গান আছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ "গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে" গানটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৬। **মানময়ী।** গীতি-নাটিকা। ১৮০২ শক, ইং ১৮৮০। পৃ. ১২। ইহাতেও রবীন্দ্র-নাথের গান, যথা, "আয় তবে, সহচরি," আছে।

৭। **স্বপ্নময়ী নাটক।** ১২৮৮ সাল, ২৪ মার্চ ১৮৮২। পৃ. ১৮৯। ইহাতে হিন্দুমেলায় পঠিত রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কবিতাটি— "দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর" স্থান পাইয়াছে।

৮। **হঠাৎ-নবাব।** প্রহসন, ফরাসী হইতে। বৈশাখ ১৮০৬ শক। ইং ১৮৮৪। পৃ. ১২৬। মলিয়ের-কৃত 'লে বুর্জোয়া জাঁতিয়ম' প্রহসন হইতে।

৯। **দ্বিতে বিপরীত।** কৌতুক-নাটিকা। ২৬ বৈশাখ ১৩০৩ শক। ইং ১৮৯৬। পৃ. ৩০। গানের স্বরলিপি-সম্বলিত।

১০। **স্বরলিপি-গীতিমালা।** ১৩০৪ সাল, মে ১৮৯৭। পৃ. ৩২০

১১। **পুনর্ব্বসন্ত।** গীতিনাট্য। ১ চৈত্র ১৩০৫ সাল, ১৪ মার্চ ১৮৯৯। পৃ. ৩০+৶০
শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের নিকট এই গীতিনাট্যের এক খণ্ড দেখিয়াছি।

১২। **অভিজ্ঞান শকুন্তলা।** নাটক। ১৩০৬ সাল, ১৮ অক্টোবর ১৮৯৯। পৃ. ১৪৬

১৩। **বসন্ত-লীলা**। গীতি-নাটিকা। ১৩০৬ সাল, ২৯ মার্চ ১৯০০। পৃ. ৩২

১৪। **ধ্যান-ভঙ্গ**। গীতি-নাটিকা। ১৩০৬ সাল, ১৫ এপ্রিল ১৯০০। পৃ. ৪৮

১৫। **অলীক বাবু**। প্রহসন। ১ বৈশাখ ১৩০৭, ১৩ এপ্রিল ১৯০০। পৃ. ৯৭

১৬। **উত্তর-চরিত**। নাটক। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭, ৭ জুন ১৯০০। পৃ. ১৫২

১৭। **রত্নাবলী নাটক**। ভাদ্র ১৩০৭ সাল, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০০। পৃ. ৯৫

১৮। **মালতী-মাধব**। নাটক। ১৩০৭ সাল, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০০। পৃ. ১৫১

১৯। **মৃচ্ছকটিক**। নাটক। ৮ মার্চ ১৯০১। পৃ. ২৩১

২০। **মুদ্রা-রাক্ষস**। নাটক। ১৩০৭ সাল, ১০ মার্চ ১৯০১। পৃ. ১৫৭

২১। **বিক্রমোর্ব্বশী**। নাটক। ১৩০৮ সাল, ৪ জুন ১৯০১। পৃ. ৮৪

২২। **মালবিকাগ্নিমিত্র**। নাটক। ১ আষাঢ় ১৩০৮, ১৫ জুন ১৯০১। পৃ. ৯৫

২৩। **মহাবীর-চরিত**। নাটক। ১৩০৮ সাল, ৮ অক্টোবর ১৯০১। পৃ. ১৮৫

২৪। **চণ্ডকৌশিক**। নাটক। ১৩০৮ সাল, ৪ ডিসেম্বর ১৯০১। পৃ. ৮৮

২৫। **বেণীসংহার নাটক**। ১৩০৮ সাল, ১৪ ডিসেম্বর ১৯০১। পৃ. ১৫৯

২৬। **প্রবোধ-চন্দ্রোদয়**। নাটক। ১৩০৮ সাল, ২৪ মার্চ ১৯০২। পৃ. ১১৭

২৭। **নাগানন্দ**। নাটক। ১৩০৯ সাল, ১ আগষ্ট ১৯০২। পৃ. ৮৭

২৮। **দায়ে পড়ে' দার-গ্রহ**। প্রহসন, ফরাসী হইতে। ১৩০৯ সাল, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০২। পৃ ৫৯। মোলিয়ের-কৃত 'মারিয়াজ ফোর্সে' অবলম্বনে।

২৯। **ভারতবর্ষে**। ভ্রমণবৃত্তান্ত, ফরাসী হইতে। ১৩১০ সাল, ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৩। পৃ. ৬৫। আঁদ্রে শেভ্রিয়োঁ-কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে।

৩০। **ঝাঁশির রাণী**। জীবনী, মরাঠী হইতে। ১৩১০ সাল, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৩। পৃ. ৭৩

৩১। **বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা**। নাটক। ১৩১০ সাল, ২০ ডিসেম্বর ১৯০৩। পৃ. ৭৩

৩২। **রজত-গিরি**। ব্রহ্মদেশীয় নাটক। ১৩১০ সাল, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪। পৃ. ৫৯

৩৩। **ধনঞ্জয়-বিজয়**। নাটক। ১৩১০ সাল, ৩ মার্চ ১৯০৪। পৃ. ৩৬

৩৪। **কর্পূর-মঞ্জরী**। নাটক। ১৩১১ সাল, ২৩ এপ্রিল ১৯০৪। পৃ. ৬৪

৩৫। **প্রিয়দর্শিকা**। নাটক। ১৩১১ সাল, ২৩ মে ১৯০৪। পৃ. ৫৪

৩৬। **ফরাসী-প্রসূন**। গল্প, কবিতা, ফরাসী হইতে। ১৩১১ সাল, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪। পৃ. ২৫৬।

৩৭। **প্রবন্ধ-মঞ্জরী**। ১৩১২ সাল, ১২ আগস্ট ১৯০৫। পৃ. ৫৮৬। ৬২টি প্রবন্ধের সমষ্টি।

সূচী: প্রবন্ধ॥ ১। ইংরেজী ও হিন্দু-সভ্যতা ২। ফের্ডিনা-ডে-লেসেপ এবং সুয়েজের খাল ৩। ভারত-বর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ৪। জীব-জগতের ক্রমাভিব্যক্তি ৫। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ৬। নিদ্রা, স্বপ্ন, মস্তিষ্ক ও আত্মা ৭। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ও কলিকাতার ভূতত্ত্ব ৮। রামিয়াড্ বা উনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ ৯। জাপানের বর্ত্তমান উন্নতির মূল-পত্তন ১০। জাপানের বর্ত্তমান উন্নতি ১১। ইংলণ্ডে স্বাধীনতার উন্নতি ১২। জাতি ও বংশের উৎকর্ষসাধন ১৩। সমাজ-বিজ্ঞান ১৪। ইন্দ্রিয়-বিভ্রম ১৫। নীলের

বাণিজ্য ১৬। জাতীয়তা ও বিজাতীয়তার উপদ্রব ১৭। জাতীয়তার নিবেদনে অনতিজাতীয়তার বক্তব্য ১৮। রুষীয় ভাষা ও সাহিত্য ১৯। মেঘনাদবধ কাব্য ২০। মনোবৃত্তির সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ ২১। কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন ২২। মারাঠী ও বাঙ্গালা ২৩। ভারতে নাট্যের উৎপত্তি ২৪। ভারতের নাট্যকলা রচনা-পদ্ধতি ২৫। আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেনলজি ২৬। সম্মোহন-তত্ত্ব ২৭। ভারতের দারিদ্র্য ও সাক্ষাৎ বাণিজ্য ২৮। বৃত্তি নির্ব্বাচন ২৯। লোক-চেনা ৩০। তুকারামের অভঙ্গ ৩১। বসন্ত-রোগ ৩২। ফরাসী ও ইংরাজ ৩৩। মুখ-চেনা ৩৪। বরিশালের পত্র। ৩৫। বীর-জননী ৩৬। একটি অপূর্ব্ব বাড়ী ৩৭। বড় লোকের মা ৩৮। যোগসিদ্ধ জ্ঞান ও যোগানন্দ ৩৯। আবেদন,— না আত্মচেষ্টা ৪০। স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ ৪১। অপরাধীগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ৪২। স্ত্রীপুরুষভেদে অপরাধের ন্যূনাধিক্য ৪৩। ইংলণ্ডে অপরাধীর সংশোধন-পদ্ধতি ৪৪। শিরোমিতি-বিদ্যা ৪৫। সঙ্গীতকলা।

সারসংগ্রহ॥ ৪৬। জাপানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ৪৭। বিংশতি শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অদ্ভুত কাণ্ড ৪৮। স্ত্রীলোকের কাজ করা কেন উচিত নহে ৪৯। ভাষা-শিক্ষার রহস্য ৫০। ভৌতিক বিজ্ঞানের দুরাকাঙ্ক্ষা ৫১। যুদ্ধের অভিনব অস্ত্র ৫২। সার্ব্বজনিক ব্যাঙ্ক ৫৩। ভবিষ্য যুগের ইংরাজ মহিলা ৫৪। দারিদ্র্য ও অপরাধ ৫৫। জীবিত পশুর দেহচ্ছেদ ৫৬। টেনিসনের ধর্ম্মবিষয়ক মত ৫৭। ইংরাজের উপর সূর্য্যতাপের প্রভাব ৫৮। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম ৫৯। হিন্দু বিজ্ঞান কিরূপে বিনষ্ট হইল ৬০। সাধারণ বিদ্যালয়ে কলাবিদ্যার শিক্ষা ৬১। অধ্যাপক টিণ্ড্যাল সম্বন্ধে স্পেন্সরের উক্তি ৬২। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে শ্রীমতী বেস্যাণ্টের মত।

৩৮। **এপিক্‌টেটসের উপদেশ**। ১৩১৪ সাল, ১৮ জুন ১৯০৭। পৃ. ॥০+৮০

৩৯। **জুলিয়স্ সীজার**। নাটক, ইংরেজী হইতে। ১৩১৪ সাল, ২৮ অক্টোবর ১৯০৭। পৃ. ১৩৩

৪০। **ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ**। পিয়ের লোটির ফরাসী হইতে। ১২ মার্চ ১৯০৯। পৃ. ৩৭৫

৪১। **মার্কাস্ অরিলিয়সের আত্মচিন্তা**। ইংরেজী হইতে। আষাঢ় ১৩১৮, ১২ নবেম্বর ১৯১১। পৃ. ৯৫

৪২। **সত্য, সুন্দর, মঙ্গল**। ভিক্টর কুজ্যাঁর ফরাসী হইতে। ২০ ডিসেম্বর ১৯১১। পৃ. ॥৵০+৩৬৯

৪৩। **Twenty-five Collotypes** from the Original Drawings by Jyotirindra Nath Tagore. 1914. W. Rothenstein একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া ইহা বিলাত হইতে প্রকাশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন,"...—I know of few modern portrait drawings which show greater beauty and thought."

৪৪। **শোণিত-সোপান**। গল্প, ফরাসী হইতে। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭, ইং ১৯২০। পৃ. ১০৪

৪৫। **অবতার**। উপন্যাস, গতিয়ের-এর ফরাসী হইতে। শ্রাবণ ১৩২৯, ইং ১৯২২। পৃ. ১৩২

৪৬। **মিলিতোনা**। উপন্যাস, গতিয়ের-এর ফরাসী হইতে। বৈশাখ ১৩৩০, ইং ১৯২৩। পৃ. ১৫৫

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচীর সৌজন্যে

বড়দিদি সৌদামিনী দেবী
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত

৪৭। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রহস্য** অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র। ইং ১৯২৪। পৃ. ৮৭২। বালগঙ্গাধর তিলককৃত গীতারহস্যের বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ফাল্গুন ১৩২৬, মার্চ ১৯২০। পৃ. ২৪০। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বিবৃত ও শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, ১ম-৫ম ভাগ। এই গ্রন্থাবলীতে ৬, ১০, ২৮-২৯, ৩৬-৩৮, ৪০-৪১ ও ৪৫ সংখ্যক পুস্তক ব্যতীত বাকি সকল পুস্তকই পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। অধিকন্তু পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত এই রচনাগুলিও স্থান পাইয়াছে:—২য় ভাগ গ্রন্থাবলী—(ফরাসী গল্পের অনুবাদ) বেড়ালের স্বর্গ, শেষ পাঠ, বার্লিনের অবরোধ, মুখোসপরা নাচের মজলিস, দর্পণ, মা, জল্লাদ, জ্যোৎস্নারাতে, খুকুমণি, শেষ পরী, ঘণ্টা, অভিশপ্ত বাড়ী, তার ভুল হয়েছিল। ৪র্থ ভাগ গ্রন্থাবলী—(পিয়ের লোটির ফরাসী হইতে) প্রবাসীর আত্মকথা, ঘণ্টা তিনেকের আত্মবিনোদন, ভারতের উপকূলস্থ "মাহে নগর", "গুবক-বন্দর"।

মাসিকপত্রে প্রকাশিত রচনা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনা ভারতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। তাঁহারই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাসে 'ভারতী' প্রথম বাহির হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:

> "জ্যোতির ঝোঁক হইল, একখানা নূতন মাসিক-পত্র বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় 'ভারতী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল; আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল। আমি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতাম।··· —পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ২০৫

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহু রচনা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বালক', 'সাধনা', 'সাহিত্য', 'পুণ্য' 'প্রবাসী'* 'বঙ্গদর্শন' (নব-পর্য্যায়), 'সমালোচনী', 'ভাণ্ডার' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'বঙ্গবাণী', এবং 'মাসিক বসুমতী'তেও তাঁহার কোনো কোনো রচনা মুদ্রিত হইয়াছে। এই সকল রচনার অধিকাংশই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করা বিধেয়।

---

* ১৩১৭-২০ সালের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত, De La Mazcliere-এর ফরাসী গ্রন্থ হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অনূদিত 'ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ', বিশেষতঃ ইহার 'মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা' (১৩১৯-২০) অংশ, একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। জ্যোতিবাবুর লিখিত 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি' ('প্রবাসী', মাঘ ১৩১৮) প্রবন্ধটি 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' পুস্তকের পরিশিষ্টস্বরূপ মুদ্রিত হওয়া উচিত।

সংগীত-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংগীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সংগীতে তাঁহার বিশিষ্ট দান— বাংলা গানে নূতন রীতিতে স্বর-সংযোজনা। এই রীতির পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথে। 'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দ গতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে স্বরে কথা যোজনার চেষ্টা করিতাম। কথাগুলি যে সুপাঠ্য হইত তাহা নহে, তাহারা সেই সুরগুলির বাহনের কাজ করিত।—'জীবনস্মৃতি', পৃ. ১২৩

বীণাবাদিনী। 'স্বরলিপি-গীতিমালা' পুস্তক প্রকাশের অব্যবহিত পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংগীত বিষয়ক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশের সংকল্প করেন। ১৩০৪ সালের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৯৭) ডোয়ার্কিন এণ্ড সনের সাহায্যে তাঁহার সম্পাদনায় 'বীণাবাদিনী' প্রকাশিত হয়। ইহাই বোধ হয় সংগীত-বিষয়ক সর্বপ্রথম মাসিকপত্র। প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় পত্রিকার শিরোভাগে "সাহিত্য সঙ্গীত কলাবিহীনঃ সাক্ষাৎপশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ" মুদ্রিত হইয়াছে। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে পত্রিকার শীর্ষদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত।

বীণাবাদন তত্ত্বজ্ঞঃ রাগবিদ্যা-বিশারদঃ
মূর্চ্ছনাশ্রুতিসম্পন্নঃ মোক্ষমার্গঞ্চ গচ্ছতি।

পত্রিকায় সংগীতবিষয়ক মূল প্রবন্ধ, প্রেরিত পত্র, স্বরলিপিতে ব্যবহৃত চিহ্নের ব্যাখ্যা, নানা বিষয়ক বাংলা ও হিন্দী গানের এবং গতের স্বরলিপি ইত্যাদি স্থান পাইত। ইহাতে কয়েকটি বাংলা গানের ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুযায়ী স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় "কলিকাতা সঙ্গীত-সমাজ" স্থাপনের সংকল্পের কথা প্রচারিত হইয়াছে। এই কলিকাতা সঙ্গীত-সমাজই পরে ভারত-সঙ্গীত-সমাজ নামে খ্যাত হয়।

'বীণাবাদিনী' দুই বৎসর চলিয়াছিল।

বিভিন্ন মাসিকপত্রেও অনেক গানের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৩২২ সালের ভাদ্রসংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁহার ফরাসী রাষ্ট্রসংগীতের অনুবাদ ও স্বরলিপির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা। 'বীণাবাদিনী' রহিত হইবার তিন বৎসর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ভারত-সঙ্গীত-সমাজ'এর মুখপত্র-স্বরূপ 'সংগীত-প্রকাশিকা' নামে সংগীত-বিষয়ক আর একখানি মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল— আশ্বিন ১৩০৮। 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা'র কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥ পত্রিকা-প্রকাশের "প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :

আজকাল, শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ-কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থসকল অনুবাদিত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে বহুলরূপে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত সঙ্গীত বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদির অনুবাদ কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। সঙ্গীত-নির্ণয়, সঙ্গীত-দর্পণ, সঙ্গীত-দামোদর, রাগ-বিবোধ, রাগ-সর্ব্বস্ব-সার, রাগার্ণব, নারদ-সংহিতা, ধ্বনি-মঞ্জরী, প্রভৃতি বিবিধ সঙ্গীত-গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রহিয়াছে— দুই একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে মাত্র। অনেকগুলি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও এখন দুষ্প্রাপ্য এবং আরও কিছুকাল পরে একেবারে বিলুপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া মূল ও অনুবাদ আমরা ক্রমশ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহার দ্বারা, "গ্রহ", "অংশ", "ন্যাস", "গ্রাম", "মূর্চ্ছনা", "বাদী", "সম্বাদী", "খাড়ব", "ঔড়ব", প্রভৃতি আর্য্য-সঙ্গীত-বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইবে এবং পূর্ব্বে রাগ-রাগিণীর কিরূপ মূর্ত্তি ছিল ও কালক্রমে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাও অবগত হওয়া যাইবে।

আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য,—তানসেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ওস্তাদ্‌দিগের পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ করা। স্বরলিপির অভাবে, অনেকগুলি পুরাতন গান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যাহা এখনও প্রচলিত আছে, তাহাও কালক্রমে মুখ-পরম্পরায় বিকৃত হইয়া যাইতেছে। অতএব, এ বিষয়ে আমাদের আর উদাসীন থাকা উচিত নহে; যাহাতে পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ হয়, সঙ্গীত-বেত্তা মাত্রেরই সে বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমরা যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি তাহা নিতান্ত সহজ নহে; সাধারণের নিকট হইতে যথেষ্ট উৎসাহ ও আনুকূল্য না পাইলে সুসিদ্ধ হওয়া দুষ্কর। আপাতত এই পত্রিকা সংকীর্ণ আকারে প্রকাশ করা যাইতেছে। সাধারণের উৎসাহ পাইলে ইহার আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা যাইবে।

আমাদের ভারতবর্ষই সঙ্গীত-কলার জন্মস্থান। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, এইখানেই সপ্তস্বর প্রথমে উদ্‌ভাবিত হইয়া পরে দেশবিদেশে প্রচারিত হয়। আমাদের সঙ্গীত-পদ্ধতিতে, বিশেষতঃ আমাদের রাগ-রাগিণীর স্বরবিন্যাসে ও মূর্ত্তি-কল্পনায় যেরূপ একটি কলা-নৈপুণ্য ও গুণপনা দেখা যায়, তাহা অন্য কোন সভ্যজাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় কি না সন্দেহ। এই সঙ্গীত-বিদ্যা আমরা কোন জাতির নিকট হইতে ধার করিয়া পাই নাই—ইহা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি।

এই জন্য বলিতেছি, যাহাতে আমাদের পুরাতন সঙ্গীত-বিদ্যা ও সঙ্গীত-কলার বহুল প্রচার ও স্থায়িত্ববিধান হয়, সে বিষয়ে শুধু সঙ্গীতানুরাগী কেন স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এবং এই ভরসাতেই আমরা এই দুরূহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি।

সোমেশ্বর কৃত রাগ-বিবোধ একটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-গ্রন্থ। প্রথমে ইহারই অনুবাদ আরম্ভ করা গেল।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা দশ বৎসর চলিয়াছিল। আমরা প্রথম দুই বৎসরের পত্রিকা দেখিয়াছি। ইহাতে সংগীত বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধাদি ছাড়া, অনেক হিন্দী ও বাংলা গানের স্বরলিপি এবং হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনূদিত 'রাগ-বিবোধ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই পত্রিকা সম্বন্ধে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি'তে প্রকাশ :

ত্রিপুরার স্বর্গীয় নৃপতি রাধাকিশোর মাণিক্য দেববর্ম্মণ বাহাদুর জ্যোতিবাবুকে সঙ্গীত বিষয়ক আর একখানি মাসিকপত্র সম্পাদন করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধক্রমেই জ্যোতিবাবু তখন "ভারত সঙ্গীত সমাজ" হইতে "সঙ্গীত প্রকাশিকা" নামে সঙ্গীত বিষয়ক একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। মহারাজা বাহাদুর ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করিতেন। কাগজখানি দশ বৎসর ছিল। মহারাজা বাহাদুরের আকস্মিক ও শোচনীয় মৃত্যুর পর বর্ত্তমান মহারাজার সাহায্যেও কিছু দিন চলিয়াছিল। পরে তিনি এই অর্থসাহায্য রহিত করায়, কাগজও বন্ধ হইয়া যায়। —পৃ. ২২১-২২

ভারতীর ভিটা

শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কর্মজীবন সম্বন্ধে বিবিধ অপ্রকাশিত তথ্য সংকলিত হইয়াছে। যে ভারতী পত্রিকা দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু প্রতিভাধর সাহিত্যিকের রচনা প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাণীর সেবা করিয়াছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সম্পাদক আখ্যা গ্রহণ না করিয়াও তাহার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রারম্ভযুগে উহার প্রধান পোষক ছিলেন, এ কথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও তেমন সুপরিচিত নহে। ভারতীর সেবায় অন্যতর উদ্যোগী কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী, "শুভবিবাহ-রচয়িত্রী" শরৎকুমারী চৌধুরাণী লিখিত এই প্রবন্ধে ভারতীর প্রারম্ভকালের একটি ঘরোয়া ছবি পাওয়া যায়। প্রবন্ধটি ভারতীর চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে লিখিত; লেখিকার কন্যা শ্রীউমা বসু এটি আমাদের দিয়াছেন।

যদিও শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামটী কখনই "ভারতী"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে "ভারতী" জ্যোতিবাবুরই মানস-কন্যা। আমি পঞ্জাব হইতে আসিয়া শুনিলাম যে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের কল্পনা জল্পনা চলিতেছে; প্রবন্ধাদি রচিত ও সংগৃহীত হইবার আয়োজন হইতেছে। একটি হল্‌দে রংএর বাক্স হইল "ভারতী"র ভাণ্ডার; প্রথমে সেটি জ্যোতিবাবুর কাছেই থাকিত, পরে কোন এক সময়ে সেই ভাণ্ডারটি আমাদের মাণিকতলা ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র ঘরের তাকের উপর রাখা হয়। সেই বাক্স ও কয়েকটি পরিত্যক্ত প্রবন্ধ অনেকদিন পর্য্যন্ত আমার সাথের সাথী ছিল— অল্প কিছুদিন হইল বিসর্জ্জন দিয়াছি।

সে সময় প্রতি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীর ভাণ্ডার লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া "ভারতী" সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে 'তাঁহাকে' [১] লইয়া ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইতেন এবং সেখান হইতে যোড়াসাঁকো ফিরিয়া যাইতেন।

কোন কোন দিন বৈকালে আমরা ৺জানকীবাবুর[২] রামবাগানস্থ বাড়ীতে যাইতাম— সেখানে ন বৌঠাকুরাণী, নতুন বৌ[৩], জ্যোতিবাবু, রবিবাবু প্রভৃতিও আসিতেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী তখন সেক্সপিয়ার পাঠ করিতেন— আমি যখনই যাইতাম অধিকাংশ সময়ই দেখিতাম তিনি সেক্সপিয়ার পড়িতেছেন, আবার কখন দেখিতাম সেতার শিক্ষা করিতেছেন, কখন বা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছেন বা ভাঁড়ার দিতেছেন। লেখাপড়া করিতেন বলিয়া তিনি কখনও গৃহস্থলীতে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন না— ইহা তাঁহার বিশেষ গুণপণার কথা।

সকলে মিলিত হইলে ভারতীর জন্য রচিত নূতন প্রবন্ধাদি পাঠ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের গান হইত, পরে আহারাদি সমাপনান্তে বাড়ী ফিরিতে রাত্রি ১০।১১টা বাজিয়া যাইত।

ভারতীর জন্মস্থান ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন ভবনটি তখন ভারতী-উৎসবে নিত্য মুখরিত। জ্যোতিবাবুর তেতলার ছাদে টবের গাছ সাজাইয়া বাগান করা হইয়াছিল, "তিনি"[১] নাম দিয়াছিলেন 'নন্দন-কানন'। সন্ধ্যার সময় পরিবারস্থ সকলেই সেখানে নিত্যনিয়মিত মিলিত হইতেন। তখন মহর্ষির সাত পুত্র, পাঁচটি পুত্রবধূ, চারিটি কন্যা, পাঁচটি জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র গুণসম্পন্ন গুণেন্দ্রনাথ[৪] বিদ্যমান; এতদ্ব্যতীত পৌত্র, দৌহিত্র, পৌত্রী দৌহিত্রী মিলিয়া ৩৪।৩৫ জন ছিলেন। ৺গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার সহোদরাদ্বয়ের সন্তানাদিও অনেকগুলি।

১। কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ২। জানকীনাথ ঘোষাল ৩। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী ৪। অবনীন্দ্রনাথের পিতা

নিত্যনিয়মিত গীত বাদ্য বিদ্যালোচনার মত মাঘোৎসব, জন্মোৎসব, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ব্যাপারও তখন নিত্যকর্ম্মের মধ্যেই ছিল। তা ছাড়া নাট্যাভিনয়, বিদ্বজ্জন-সমাগম, বসন্তোৎসব, এমন কি হোলি-খেলারও বিরাম ছিল না। তেতলায় পরিবারস্থ বয়স্কদিগের মেলা এবং বাগানে ছোট ছেলে মেয়েদের খেলাধূলা, ছুটাছুটি। তখন ছিল শুধু হাসিখেলা, শুধু মেলামেশা।

দেখিতে দেখিতে শ্রাবণ মাসে একদিন "ভারতী" প্রকাশিত হইল। অনেক গবেষণার পর আর্ট ষ্টুডিয়োর দেবী সরস্বতীর ছবির অনুকরণে ভারতীর মলাটের ব্লক প্রস্তুত হয় এবং তখনকার পক্ষে ছবিখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই সকলে মানিয়া লইয়াছিলেন।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হইলেন ভারতীর সম্পাদক। প্রতি মাসেই সম্পাদক মহাশয়ের, জ্যোতিবাবু, রবিবাবু ও 'তাঁহার' রচনা কিছু না কিছু প্রকাশিত হইতই। ছোট গল্প প্রথমে যেটি প্রকাশিত হয় তাহা রবিবাবুর, পরে তাঁহার একটি গল্প ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতে থাকে। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতি প্রায়ই থাকিত। "ভারতী" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার "দীপনির্ব্বাণ" উপন্যাস বাহির হয়; তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক "ছিন্নমুকুল" বোধ হয় ভারতীর তৃতীয় বৎসরে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন সকলের কি উৎসাহ! পূজনীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বোম্বাই হইতে প্রতি মাসেই রচনা পাঠাইতেন। ভারতীর খোরাকের অভাব কখনও হইত না; বাহিরের প্রবন্ধাদি বড় একটা আবশ্যক হইত না। এই সময় রবীন্দ্রনাথ বিলাতে, অসুস্থতাবশতঃ শ্রীযুক্ত জ্যোতিবাবু সস্ত্রীক দীর্ঘকালের জন্য ষ্টীমারে জলযাত্রা করিলেন, তখন "ভারতী" পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার "তাঁহার" উপর ন্যস্ত হইল। অনেক সময় দেখিয়াছি প্রবন্ধের জন্য প্রেসের লোক বসিয়া রহিয়াছে, "তিনি" তাড়াতাড়ি কিছু লিখিয়া দিলেন। বাল্যকাল হইতে "তাঁহার" কবিতা লেখা অভ্যাস ছিল, কিন্তু প্রবন্ধ ও গদ্য রচনা বোধ হয় ভারতীর জন্যই প্রথম রচিত হইয়াছিল। তখন "জ্ঞানাঙ্কুরে"র চিহ্নমাত্র ছিল না, "বঙ্গদর্শন" মধ্যাহ্ন-আকাশ হইতে চলিয়া পড়িয়াছে, আর "আর্য্যদর্শন" ধূমকেতুর মত বোধ হয় ছয় মাস বা নয় মাস অন্তর কদাচিৎ দেখা দিত। এমন সময় "ভারতী" যখন নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল তখন সাহিত্য-সমাজে যে আন্দোলন ও তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা এখনও থামে নাই। এখনও ভারতীর পাঠক ও সেবকের অভাব হয় নাই।

ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি-পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল— ভারতীর সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, মালা গাঁথেন না, ভারতী ধূলায় মলিন। এই দুর্দ্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন। ধূলা ঝাড়িয়া সস্নেহে ভারতীকে কোলে তুলিয়া লইলেন; সেই সঙ্কটকালে তিনি রক্ষা না করিলে আজ ভারতীর নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ও "তিনি" যে ভারতীর ভিত্তি স্থাপনা করেন সেই "ভারতী" আজ চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিল, ইহা অপেক্ষা আমার অধিক আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে। গত বৎসর হইতে "ভারতী" নবীন সম্পাদকের যত্নে নব উৎসাহে প্রকাশিত হইতেছে— ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি "ভারতী" যেন জন্মভিটায় চিরদিন বিরাজ করে।

আষাঢ় ১৩২৩

রাজনারায়ণ বসুর জীবনের এক অধ্যায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মনস্বী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ১৮৫১ হইতে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মেদিনীপুর সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৭৯, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলিকাতায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৮৭০-৮০, এই দশ বৎসর বাঙালী-জীবনের এক গৌরবময় যুগ। স্বদেশের উন্নতিকল্পে বহুমুখীন কর্মপ্রণালী বাঙালী-প্রধানগণ কর্তৃক এই সময়ে অনুসৃত হইয়াছিল। এই সব কর্মধারার উদ্গাতা এবং কর্মীপ্রধানদের অগ্রণী স্থানীয় ছিলেন মনস্বী রাজনারায়ণ। বসু মহাশয় আত্মজীবনীতে এ সমুদয়ের নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাকে ভিত্তি করিয়া সমসাময়িক পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রিকাদির সাহায্যে তাঁহার কার্যাবলীর পূর্ণ পরিচয় লাভ সম্ভবপর।

রাজনারায়ণের কর্মশক্তির উপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপরিসীম আস্থা ছিল। তিনি রাজনারায়ণের উপর যেমনটি নির্ভর করিয়া চলিতে পারিতেন, এমনটি বোধ হয় আর কাহারও উপর পারিতেন না। তাই তিনি ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দেই রাজনারায়ণকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "এ সময়ে যদি তোমাকে পাই তবে ইহা হইতে অধিক আহ্লাদ আর কিছুতেই নাই। তোমার মুখের প্রতিই আমি চাহিয়া আছি।"[১] রাজনারায়ণ কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করিয়াই মহর্ষির আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্যে কায়মনে যোগদান করেন। তিনি এতদিন কলিকাতার বাহিরে থাকিলেও বরাবর ইহার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, কাজেই স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি ইহার কর্মধারার সঙ্গে নিজেকে ওয়াকিবহাল করিয়া লইলেন। দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টী। ট্রাস্টীর ক্ষমতাবলে তিনি ১৭৯২ শকের মাঘ মাস (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৮৭১) হইতে অন্যান্যের সহিত রাজনারায়ণকেও ইহার অধ্যক্ষ-সভায় গ্রহণ করিলেন। প্রথম হইতেই রাজনারায়ণ ইহার সভাপতির কার্য করিতে থাকেন। তিনি যোগ্য সহকর্মীরূপে পাইলেন মহর্ষির পুত্র যুবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগে ১৭৯১ শকের প্রারম্ভেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৭৯২ শকের মাঘ হইতে ১৮০৬ শকের ভাদ্র মাস পর্যন্ত তিনি এককভাবে এই কার্যে লিপ্ত ছিলেন। রাজনারায়ণের প্রভাব তাঁহার এবং কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের উপর কিরূপ পড়িয়াছিল তাহা পরে আলোচ্য। কলিকাতার বাস তুলিয়া দিবার পরেও, রাজনারায়ণ আমরণ আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হাইকোর্টের উকীল ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিনিধি-সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রাজনারায়ণের কলিকাতায় বসতি স্থাপনের পূর্ব হইতেই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে

---

১ পত্রাবলী, পৃ. ৮৫-৬

আলোড়ন উপস্থিত হয়। কেশবপন্থী ব্রাহ্মদের মধ্যে নরপূজা ও অবতারবাদের সূচনা দেখিয়া রাজনারায়ণ ইহার বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ করেন। ব্রাহ্মবিবাহ যাহাতে আইনসংগত বলিয়া বিবেচিত হয় সেই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক আইন প্রণয়ন করানো সম্পর্কে একটি আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ হইতেই কেশবচন্দ্র সেন এই বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মদের একটি সভা আহ্বান করিয়া এ বিষয়ে মতামত লইবার জন্য এক কমিটি গঠন করেন। আইন-প্রণয়ন সম্পর্কে কমিটির সভ্যদের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। হিন্দু সাধারণের মধ্যেও ইহা লইয়া বাদানুবাদ চলে। এ সকল কারণে এ বিষয়ের আলোচনা কিছুকাল স্থগিত থাকে। কিন্তু ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে সরকার ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য অকস্মাৎ একটি প্রস্তাব বিজ্ঞপিত করিলেন। এবারে আদি ব্রাহ্মসমাজই অগ্রণী হইয়া এরূপ আইন-প্রণয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন এবং সভা-সমিতি করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মবিবাহ সংস্কৃত হিন্দু বিবাহ ছাড়া আর কিছুই নহে, এইরূপ ঘোষণা করিয়া 'ব্রাহ্মবিবাহ আইন' এই নামকরণে তাঁহারা বিশেষ আপত্তি তুলিলেন। সরকার এই আপত্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া 'ব্রাহ্মবিবাহ আইন' এই নামের পরিবর্তে 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' নামে ১৮৭২ সালের প্রথম দিকে উক্ত বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। এই আইনটি ১৮৭২ সালের তিন আইন নামে পরিচিত।

এই আইন যেদিন ব্যবস্থাপক সভায় বিধিবদ্ধ হয় সেদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসু পরিদর্শক রূপে উপস্থিত ছিলেন। এদিনকার সভার কৌতুককর বর্ণনা তিনি আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেশব-প্রবর্তিত বিবাহ-আইন আন্দোলনের বিরুদ্ধেও রাজনারায়ণ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবং ইহার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে পৌরোহিত্য করিয়া স্বাভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের মূল উদ্দেশ্য প্রচারে তিনি অতঃপর সবিশেষ অবহিত হইলেন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রদত্ত তাঁহার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা এবং পূর্ববর্তী ও এই সময়কার আদি ব্রাহ্মসমাজের ধর্মনীতি ও কর্ম-প্রণালী বিষয়ক বক্তৃতাসমূহ ইহা প্রকৃষ্টরূপেই সপ্রমাণ করে।

১৭৯৩ শকের মাঘ মাসে রাজনারায়ণের সভাপতিত্বে 'ব্রাহ্মবোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য "ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া সাধারণ লোকেদের ব্রাহ্মধর্ম উপদেশ করা"। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র এই সভার সম্পাদক ছিলেন। সভার অধীনে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতি মাসের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবারে উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয় রবিবারে সভাপতি রাজনারায়ণ ধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্য দুই রবিবারে মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা করিতেন।[২] সভা পল্লী-অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার কার্যক্রম ও পরিণতি সম্বন্ধে রাজনারায়ণ স্বয়ং লিখিয়াছেন :

> [১৭৯৩] শকে [১৮৭২] সালে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভা স্থাপন করি। আদি ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র উপাসনার স্থান, যে খুসী এস উপাসনা করিয়া চলিয়া যাও। রামমোহন রায়ের Trust Deed অনুসারে উহা এখন দস্তুরমোতাবেক সভায় পরিণত হইতে পারে না…আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রচার কার্য্যের কোন সংস্রব নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য আমি ঐ সভা

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৭৯৩, বৈশাখ ও মাঘ ১৭৯৪ শক দ্রষ্টব্য

সংস্থাপন করি। আদি ব্রাহ্মসমাজের লোক সভার কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য দাতব্য দিতেন। সভা একজন প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইনি দক্ষিণ বারাসত নিবাসী। ইনি দিন কতক খুব উৎসাহের সহিত দেশীয় ভাব রক্ষা পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার পর নানা কারণ বশতঃ আর অধিক দিন সভা টেঁকিল না। সেই সকল কারণের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔদাসীন্য একটি কারণ। কেশব বাবু আদি সমাজের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা অবধি তিনি কেমন ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে বলিতেন আমাদের এক্ষণে দুই মাত্র কার্য্য—আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রতি বুধবার নিয়মত উপাসনা করা এবং প্রতিমাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করা।৩

স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত এক দল ব্রাহ্মের সহিত ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দেই কেশবচন্দ্র সেনের মতবিরোধ উপস্থিত হয়। ইঁহারা কিছুকাল উক্ত সমাজ-মন্দিরে না গিয়া স্বতন্ত্র গৃহে উপাসনার ব্যবস্থা করেন। রাজনারায়ণ এই সমাজে আচার্যের কার্য করিতেন। আত্ম-চরিতে (পৃ. ১৯৬-৭) তিনি এবিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (আষাঢ় ১৭৯৪ শক) লেখেন:

জনরব এই যে, যে সকল ব্রাহ্ম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা পুনরায় ঐ সমাজের সঙ্গে মিলিয়াছেন কিন্তু এ জনরব অমূলক। নূতন সমাজের অধিকাংশ সভ্য এরূপ করেন নাই; অল্প সংখ্যক সভ্যই এইরূপ করিয়াছেন। কয়েক সপ্তাহ হইল শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ঐ সমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। স্থূল বিষয়ে…ঐক্য থাকিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অনৈক্য সত্ত্বেও আদি ব্রাহ্মসমাজ অন্য সমাজকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ নহেন।

উক্ত বিরোধ বিচ্ছেদে পরিণত হয় ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের বহু-আলোচিত কুচবিহার-বিবাহের পর। তখন কেশব-বিরোধী প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তাঁহারা স্বভাবতঃই নানা বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ আদি ব্রাহ্মসমাজের বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মদের মত ও উপদেশ যাজ্ঞা করিতেন। সকল বিষয়েই রাজনারায়ণের স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রখর ছিল। ব্রাহ্মধর্ম ভারতবাসীর জাতীয় ধর্ম, ইহাকে জাতীয় রূপ দেওয়াই যে সকল ব্রাহ্মের কর্তব্য, একথা তিনি বিভিন্ন সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকদের একাধিক পত্রে লিখিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক শিবচন্দ্র দেবকে ১৮৭৮, ১৫ই জুন এক পত্রে তিনি বলেন:

We should adopt a national form of divine worship, a national theistic text-book and national ritual as far as all this could be done consistently with the dictates of conscience. We should renounce marked foreign customs and manners that we might have without much thought or reflection but innocently, adopted from Europeans but which are repugnant to the general feeling of the nation and by renouncing which we do not act against Brahmoism . . . . .

We should conduct our reformatory movements in a national way so as to suit the tastes and ideas of the nation without compromising our Brahmo principles.

এই সময়কার সাধারণ জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে রাজনারায়ণের যোগ বিশেষ লক্ষণীয়। হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার মূলে রাজনারায়ণের ভাবধারা বিশেষ কার্য করিয়াছিল। হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশনেই (১৮৬৭ খ্রীঃ) পাঠের জন্য রাজনারায়ণ বোড়াল হইতে কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসী দ্বারা রচিত "বঙ্গের পূর্ব্ব মহিমা" শীর্ষক স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা সংশোধন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। প্রতি

৩ আত্ম-চরিত, পৃ. ১৯৩-৪

৪ ঐ, পৃ ২১৫

বৎসর মাঘ হইতে চৈত্রসংক্রান্তির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সাড়ম্বরে এই মেলার সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। রাজনারায়ণ ইহার অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। এই মেলা প্রায় বার বৎসর পর্যন্ত চলিয়াছিল। প্রতি বৎসরই একজন বিখ্যাত ব্যক্তি মেলায় পৌরোহিত্য করিতেন। ১৮৭৫, ১১ই ফেব্রুয়ারি ইহার যে সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে পৌরোহিত্য করেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। তিনি লিখিয়াছেন:

১৮৭৫ সালে যে মেলা হয় তাহার সভাপতির কার্য্য আমি সম্পাদন করি। ঐ মেলা কলিকাতার পার্সীর বাগান নামক বিখ্যাত উদ্যানে হইয়াছিল। এই মেলা উপলক্ষে বরদাবাসী সুবিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সের গান হয়। এবং যশোহরের নড়ালবাসী জমিদার রাইচরণ রায় ব্যাঘ্র-শিকারে নৈপুণ্য জন্য এক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। আমি সভাপতি স্বরূপে ঐ পদক তাঁহার গলায় পরাইয়া দিই। মৌলাবক্স তাঁহার সঙ্গীতক্ষমতা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

এ বৎসরের মেলায় ব্যায়াম-চর্চা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে, এবং বিশেষ করিয়া উক্ত রাইচরণ রায়ের বীরত্ব প্রকাশ সম্বন্ধে "অমৃতবাজার পত্রিকা" বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ এই:

গত মেলায় একটি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। যশোরান্তর্গত নড়ালের অন্যতম জমিদার বাবু রাইচরণ রায় তাঁহার বীরত্ব ও সাহসের জন্য মেলা কর্ত্তৃক সম্মানিত হন। রাইচরণ বাবু বাল্যকালাবধি ব্যায়ামচর্চ্চা করিয়া অন্যূন দেড় শত মনুষ্য-হন্তা ব্যাঘ্র বধ করিয়াছেন, রাইচরণ বাবুর এই বাঙ্গালীদুর্ল্ভ বীরত্ব ও সাহসের জন্য হিন্দু মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে একটী স্বর্ণ মেডেল প্রদান করেন।

হিন্দুমেলা একটি সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান। ইহার অধ্যক্ষতা করিতেন "নেশনাল সোসাইটি" বা জাতীয় সভা। এই সভার কার্য সম্বৎসর ধরিয়া চলিত। ইহার অধীনে একটি নেশনাল স্কুল বা জাতীয় বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়ে শারীরিক ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোঁড়া শিক্ষা দেওয়া হইত। সার্ভেয়িং, ইঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন, এবং সংগীতাদি শিক্ষারও এখানে ব্যবস্থা ছিল। প্রতি মাসে অন্তত এক বার করিয়া জাতীয় সভার অধিবেশন হইত এবং প্রত্যেক অধিবেশনেই এক এক জন প্রধান ব্যক্তি জাতীয় উন্নতির বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। বক্তাদের মধ্যে মনোমোহন বসু, দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, শ্যামাচরণ সরকার, সীতানাথ ঘোষ, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও তাঁহার কয়েকটি সুবিখ্যাত বক্তৃতা এই সভায় প্রদান করেন—"হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা", ১৮৭২, ১৫ই সেপ্টেম্বর; "সেকাল আর একাল", ১৮৭৩, ২৩শে মার্চ; "মেঘনাদবধ কাব্যের দোষ ও গুণ", ১৮৭৪, ৩০শে মে। ইহা ছাড়া "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" সম্বন্ধেও ১১ই আগস্ট ১৮৭২ রাজনারায়ণ জাতীয় সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সিভিলিয়ান জন বীম্‌স্ ফরাসী দেশের French Academy'র ন্যায় বঙ্গদেশে একটি অ্যাকাডেমি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ইহার উদ্দেশ্য—"সভ্যেরা বাঙ্গলা ভাষার শব্দ প্রয়োগের শুদ্ধতা বিষয়ে যাহা অবধারণ করিবেন তাহা আমাদিগের সকলকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে।" রাজনারায়ণ জাতীয় সভায় এই প্রস্তাবের বিপক্ষেই উক্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:

ভাষাকে প্রথমে স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। বৈয়াকরণিক ও আলঙ্কারিকেরা ভাষাকে প্রথমে নিয়মিত ও সীমাবদ্ধ করিবার নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন। ভাষা তাহা তুচ্ছ করতঃ একটি অট্টহাস্য করিয়া আপনার গতিতে চলিয়া যায়। তবে ভাষা স্বেচ্ছাচারবিশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় চিরকাল থাকে আমার এমত মত নহে। একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করিলে তাহাকে নিয়মিত করা কর্ত্তব্য। (আত্ম-চরিত, পৃ, ১৯৩)

রাজনারায়ণ ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করিতেন। একারণ সমসাময়িক অন্যান্য প্রচেষ্টার সঙ্গেও তাঁহার যোগ দেখিতে পাই। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও অন্যান্য কলেজের পূর্বতন

ছাত্রবৃন্দের সামাজিক মেলামেশার (College Reunion) জন্য তিনি জগদীশনাথ রায় নামক হিন্দু কলেজের আর একজন প্রখ্যাত সহাধ্যায়ীর সহযোগে একটি বাৎসরিক 'সম্মিলন' প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৭৫ সালের ১লা জানুয়ারি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকত কুঞ্জে'। এই অধিবেশনে রাজনারায়ণ "হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত" পাঠ করেন। এই সম্মিলন কয়েক বৎসর চলিয়াছিল। বাঙালী সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে যে "বিদ্বজ্জনগণসমাগম" হয় (১৮ই এপ্রিল ১৮৭৪) রাজনারায়ণও তাহার একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির উদ্যোগে ১৮৭৬, ২৬শে জুলাই Indian Association বা ভারত-সভা নামে রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হয়। রাজনারায়ণ ইহার কর্মকর্তৃ সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৮৭৮ সালে বিধিবদ্ধ বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-হস্তারক আইনের প্রতিবাদেও তিনি তৎপর হইয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের এ সময়কার আর একটি বড় কার্য— যুবক-মনে স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ-সাধন-প্রচেষ্টা। রাজনারায়ণে স্বদেশপ্রেম যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে রাজনারায়ণের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। মহর্ষির পরিবারে স্বদেশপ্রেমের স্রোত বহুকাল যাবৎ বহিয়া চলে। রাজনারায়ণ বাবুর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার পুত্র যুবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ এই স্রোতে একেবারে গা ঢালিয়া দিলেন। ইঁহারা নিজেদের স্মৃতিকথায় এ বিষয়ে সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। 'সঞ্জীবনী সভা'র কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিশদভাবে বলিয়া গিয়াছেন। ইহার সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ। মন্ত্রগুপ্তির সঙ্গে স্বদেশের উন্নতিমূলক বিবিধ কার্য সাধনের চেষ্টা ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য। স্বদেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধনেও সভা বিশেষ তৎপর ছিলেন।[৫]

যুবক-মনে স্বদেশপ্রেম স্থায়ী ভাবে উন্মেষিত করিবার জন্য রাজনারায়ণ ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে 'ধর্ম ও পুরাতত্ত্ব বিদ্যালয়' স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (আশ্বিন ১৮০৩ শক) এক পত্র লেখেন। এই পত্রে আছে:

> ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের মধ্যে স্বদেশের উপকার সাধন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'… ভারতবর্ষ আমাদিগের জন্মভূমি, ভারতবর্ষের উপকারসাধনে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব। মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত ভূমিখণ্ড কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেইরূপ হিন্দু-সমাজই আমাদিগের কার্য্যের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষ শরীর, মন, সমাজ, ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, শিল্প, বিজ্ঞান বিষয়ে যেরূপ উন্নত অবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, পুনরায় সেই অবস্থা লাভ করিতে এমনকি, তদপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা লাভ করিতে আমরা সমস্ত হিন্দুজাতিকে উত্তেজিত করিব। যাহাতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যকুলের আদি পুরুষ বৈবস্বত মনু হইতে রাজপুতনার বীরকুলচূড়ামণি প্রতাপ সিংহের সময় পর্য্যন্ত ভারতের মহিমার প্রধান কথা অবলম্বন করিয়া হিন্দু জাতি উন্নতির মঞ্চে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় আমরা প্রাণপণে এরূপ চেষ্টা করিব। যাহাতে হিন্দুগণ ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হয়, যাহাতে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, মান্দ্রাজী, প্রভৃতি হিন্দুবর্গ একহৃদয় হয়, যাহাতে তাহাদের সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য ধর্ম্মসঙ্গত বৈধ সমবেত চেষ্টা হয়, তাহাতে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব।

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে রাজনারায়ণ এ সকল কথা বলিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁহার স্বদেশবাসীরা দেশোন্নতিকল্পে কি কি কার্য করিয়াছেন তাহার হিসাব-নিকাশের সময় আসিয়াছে।

---

৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ, ১৬৪—১৭০ দ্রষ্টব্য

মন-খারাপ

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আমার মনে হয় যে, মন পদার্থটিকে নিয়ে আমরা একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে থাকি। অবিশ্যি, মন থাকলেই তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। সেই আন্দোলনের ফলে কখনো বা মন ভালো থাকে, কখনো বা মন খারাপ হয়ে যায়। তবে খারাপ হলে আমরা সেটা গোপন রাখতে চেষ্টা করি কিংবা না পারলে ছুতোনাতায় জানিয়ে দিই। মন ভালো থাকলে বিজ্ঞাপনের দরকার হয় না, কেননা সেটা আচরণে, হাবে ভাবে এবং কথাবার্তার উচ্চ গ্রামে আপনিই ধরা পড়ে।

তবু, মাথাধরা বা পেটের অস্বস্তির কথাটা সজোরে বলা চলে, যেহেতু তার অনুসন্ধানে অভিজ্ঞ চিকিৎসকও হার মানবেন। কিন্তু, মন খারাপ হয়েছে, এ কথাটা সর্বসমক্ষে অথবা পরিষ্কার করে জানাতে আমাদের বেশ একটু সংকোচ বোধ হয়। অথচ জানাবার জন্যেও মনটা সর্বদা উস্‌খুস্ করে। এবং যতক্ষণ না সে ভাবটা কেউ নজর করছে কিংবা তার খাতিরে আপনার দিকে একটু সসম্ভ্রম দৃষ্টিপাত করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মন শান্তি পায় না। যদি কেউ মন-খারাপের খাতির না করে, সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ায় অথচ প্রশ্ন করে না, সাধে না— তা হলে ? সূক্ষ্মস্নায়ু ব্যক্তিমাত্রেই বুঝতে পারবেন যে, অক্ষম আক্রোশে ভদ্র মানুষের সাধারণ মন-খারাপের উত্তাপটুকু কিরকম সাংঘাতিক অন্তর্বহ্নিতে পরিণত হয়ে যায়। মনে হয়, মন-খারাপের অতি ন্যায্য ও প্রাপ্য মর্যাদা থেকে আমাদের মন বৃথাই বঞ্চিত হচ্ছে এবং সেই অনুপাতে মনটা আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মন-খারাপের খাঁটি দাওয়াই যখন একটিমাত্র লোকের হাতে থাকে এবং সে লোক যেন কিছুই হয়নি অথবা কিছুই জানে না এই ভাব দেখিয়ে ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে শীতল দেহে, প্রসন্নচিত্তে, মুখে মিচকি-হাসি টেনে ঘোরাফেরা করে, তখন তুষানল কাকে বলে আপনি হয়ত তার কিছুটা বুঝতে পারবেন। আপনারই অন্তরের অজানা দাহিকা শক্তিতে আপনাকে আর একজন পরিপাটি করে ভেজে তুলছে, এর চেয়ে উন্মাদক প্যাশনের কথা কোনো রোমান্টিক কবিই কল্পনা করতে পারেননি।

মন-খারাপ ব্যাপারটা খুবই সাধারণ; একটা সাময়িক খেয়াল বললেও চলে। কিন্তু, এই নিরীহ খেয়াল দাঁড়ায় পরম ব্যাধিতে যখন আধির আধিপত্যটা নিত্যই বাড়তে থাকে। মনে করুন, কিছুদিন হল আপনার মন যেন কিছুতেই স্বস্তি বা স্ফূর্তি পাচ্ছেনা। অস্বস্তির কারণটা, অবিশ্যি, দূর হলে আপনার মন ভালো হয়ে যাবারই কথা। কিন্তু, মন-খারাপের উপলক্ষ্যটি গেল সরে অথচ তার জের চলল বেশ কিছুদিন। এবং মনটা ভারসাম্যে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই আবার কোনো সামান্য অজুহাতে ভারগ্রস্ত হয়ে গেল। তখন উপায় ? দেখা গেল, কিছুতেই কিছু ভালো লাগছেনা। ঘরের আসবাবগুলো এক জায়গা থেকে সরিয়ে আরেক জায়গায় রাখলেন, নতুন কিছু বই কিনলেন, পরচর্চ্চার জন্যে আড্ডায় গেলেন, কিন্তু এ যেন করতে হয় তাই করে যাচ্ছেন—চিত্তে প্রফুল্লতার স্পর্শ নেই, তুচ্ছতম উপলক্ষ্যে, এমন কি লজ্জার বিষয়, বিনা কারণেই, আপনার বিরক্তি ঘনিয়ে উঠছে এবং তারই ঝালটা গিয়ে পড়ছে এমন কোনো নিরীহা আত্মীয়া অথবা সরল নির্দোষ আত্মীয়ের ওপর যে বেচারির ষোল আনা স্বার্থ নির্ভর করছে আপনারই মন ভালো-থাকার ওপরে।

মন-খারাপ হলে সেটা স্পষ্টত প্রকাশ করা কিংবা তাই নিয়ে হৈ-চৈ করা নিতান্তই দুর্বলতার লক্ষণ। এ কথাটা অন্তত পুরুষেরা জানেন। কেননা, তাতে মন-খারাপের আত্মস্থ দুঃস্থ ভাবটুকু নষ্ট হয়ে যায়। ওটা হল একান্তই নিজস্ব অনুভূতি, পুষে-রাখার সামগ্রী, অল্প সময়ে তাকে ঝেড়ে ফেলা যায় না। হঠাৎ একটা আশ্চর্য ঘটনা বা পরিবর্তনের চমকে মন যদি স্বাভাবিক বিস্তার খুঁজে পায়, তবেই মন-খারাপের অদৃশ্য অস্পৃশ্য সূচ্যগ্র বিন্দুটি মিলিয়ে যায়, নইলে নয়। কিন্তু, যতক্ষণ চলে মন-খারাপের পালা ততক্ষণ তার মধ্যে চপল প্রকাশের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তরলচিত্ত পুরুষ হয়ত ঝাঁঝটা সময়ে-অসময়ে দেখিয়ে ফেলেন। কিন্তু, মোটের ওপর পুরুষ জাত আরো সতর্ক। হাতে বাসনও নেই, চাবির গোছাও থাকে না যে একটা মর্মভেদী শব্দের অর্থপূর্ণ ঝণৎকারে পুঞ্জীভূত গ্লানির সমাধান করে দেবেন।

অথচ, এমন পুরুষ মানুষও দেখেছি যাঁর প্রায়ই মন-খারাপ হয় এবং হওয়ামাত্রই চেঁচামেচি করে জানিয়ে দেন। তাঁর বিশ্বাস যে, বুদ্ধিমান্ লোকের মন-খারাপ হতেই হবে; কেবল যার মাথা খারাপ তারই মন-খারাপ হয় না। মোট কথা, তাঁর মন-খারাপের বিশেষ একটি ফিলজফি ও প্রকাশভঙ্গী আছে। প্রথমে তাঁর হয় খানিকটা উত্তেজনা। তারপর সে উত্তেজনাকে তিনি আত্মস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দমন করে ফেলেন। তিনি বাইরেও যান না, বৈঠকখানাতে গিয়েও শোন না। রোজকার মতই ঘরে থাকেন। খালি অত্যন্ত সহজ সুরে, খানিকটা পরে, গল্পচ্ছলে স্ত্রীকে জানিয়ে দেন, আজ আর কিছু খাবেন না। বলেই কথাটা ঘুরিয়ে অন্য কথা পাড়েন, এমন কি, স্ত্রীর সঙ্গে হাসি-তামাসা করেন— বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছেলেমানুষি শুরু করে দেন। তবে, সাপের হাসি বেদেয় চেনে। স্ত্রী কথা না বাড়িয়ে শুধু একটিবার জিজ্ঞাসা করেন, 'এক বেলা না দু বেলা?' কথার জবাব না পেয়ে ক্ষুদ্র একটি 'বেশ' বলে চলে যান।

তারপর প্রোসেশ্যন। প্রথমে আসেন মা, তারপর অন্যান্য আত্মীয়ার দল, খোঁজ নিতে। মা এসেই ছেলের গায়ে হাত দিয়ে দেখেন উষ্ণ কিনা এবং নিজের কপালে হাত ঠেকিয়ে উত্তাপটুকু মিলিয়ে নেন। নিশ্চিন্ত হয়ে শুরু করেন জেরা। ছেলেকে স্বীকার করতে হয়, শরীরটাই খারাপ। নাঃ, তেমন বেশি কিছু নয়, তবে, একেবারেই খেতে ইচ্ছে করছে না। অনিচ্ছায় খেলে স্বাস্থ্যহানির ভয়। অতএব— ভয়ে-ভয়ে মা উঠে গেলেন। তারপর এল বোন। আজকালকার চালাক-চতুর মেয়ে। আগেই ঠিক আঁচ করে নিয়েছে, তবে লোক-দেখানো আসতে হয়, নইলে ভায়ের চেয়ে ভাজেরই মুখভার হবে। কাজেই দু-একটা বাজে কথা বলেই ঘর থেকে চম্পট দেয়। শেষে এলেন বিধবা পিসিমা। ছেলের মুখ গম্ভীর দেখে নিজের মুখখানা আরো থম্‌থমে করে বেরিয়ে এলেন। তারপর ভাজকে ছাতের কোণে ইশারায় ডেকে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলেলন, 'ও ছেলে তো আমার তেমন নয় যে শুধু শুধু উপোস করবে! নিশ্চয়ই বৌমা এমন কিছু বলে থাকবে—'

চলল গবেষণা। যাঁকে নিয়ে গবেষণা, তিনি ততক্ষণ দরজাটি বন্ধ করে টেনে একটি ঘুম দিলেন। দিবানিদ্রার ফলে মন ও শরীর কোনোটাই তেমন ভালো হল না। স্ত্রীর সতর্ক দৃষ্টিকে তিনি যতই উপেক্ষা করুন না কেন, ধরা পড়ার উদ্‌বেগ চট করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘণ্টা কয়েক বিশুদ্ধ আড্ডা দিয়ে ভরাপেটে দেরি করে বাড়ি ফিরলেন। তারপর চাদর মুড়ি দিয়ে নিদ্রা। সকালে প্রথম চায়ের কাপ্‌টিতে মুখ দিয়ে, সিগরেট ধরিয়ে খবরের কাগজের ভাঁজ খুলতে গিয়ে যে সুখের আমেজ লাগছিল, ঠিক সেই সময়টিতে গঞ্জনায় আর চাপা দোষারোপে তিক্ত মুখখানা নিয়ে স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন এবং বাঁকা সুরে খাবারের কথা জিজ্ঞাসা

করলেন। নাঃ— এ পিণ্ডি কি না গিললেই নয়? আবার তাঁর মন খারাপ হল। আর সে বিগড়ে-যাওয়া মন পুনরায় ভালো হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগল। মাঝের দিনগুলো থম্‌থমে; অস্বস্তি-বিরক্তিতে চাপা গুমোটের সৃষ্টি হয়। লাভের মধ্যে একটা অহেতুক মনোমালিন্যের একগুঁয়ে আড়াল দাঁড়িয়ে ওঠে।

আমি কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি যে, মন-খারাপ করে বেশি ক্ষণ থাকা আমার কোষ্ঠীতে লেখেনি। বিশেষ করে, না-খেয়ে মন-খারাপ দেখাতে গেলে আমার শরীর খারাপ হয়। অবিশ্যি, আমিও দু-একবার সাধ্যসাধনার প্রত্যাশা করি। এবং যথোপযুক্ত বিনয় ও যত্ন প্রকাশে আমার মন বিগলিত হয়, কেননা জঠর পূর্বে থেকেই বিচলিত হয়ে থাকে। ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার ফলে আমার মনের গড়নটা একটু তীক্ষ্ণ আর অসহিষ্ণু। বাধ্যতামূলক পথ্য সেবনে এবং হামেশাই উপবাসে আমার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়ে থাকে। উপরন্তু মন-খারাপের খাতিরে আহার বর্জনের প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক বিরাগ আছে। তবে যে কারণে মন-খারাপ সেটা দূর না হলে আমার মন স্বস্তি মানে না। আবার, তাই বলে সামান্য একটু ব্যাপার থেকে ধুঁইয়ে অনেকখানি অশান্তি তৈরি করতে আমি প্রস্তুত নই। যে সব পুরুষ আত্মমর্যাদার জন্যে দু-তিন দিন অনাহারে থাকেন এবং শত অনুনয়েও অবনমিত হন না তাঁদের আচরণকে কিন্তু আমি কোনোমতেই সমর্থন করতে পারিনে, যদিও সে দৃঢ়তা আমার বিস্ময়ের বস্তু।

একবার কিন্তু আমি সত্যিই চেষ্টা করেছিলুম। সেই মন-খারাপের কঠোর ব্রতাচরণের ফলটা আজ আমি লিপিবদ্ধ করে যেতে চাই। পাঠকদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত উপকৃত হতে পারেন। অন্তত, বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলার আগে একটু চিন্তা করে দেখতে পারেন।

আমি একবার বিদেশে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। আমি যাঁর অতিথি তিনি শুধু আমার গুরুজন নন, দু-একটি বিষয়ে আমার গুরুও বটে। তাঁর কাছেই আমি প্রথম শিখি, কি করে মাত্র অর্থোপার্জন করে সাংসারিক দায়িত্ব থেকে বেকসুর খালাস পাওয়া যায়। পুরুষমানুষের কাজ চিন্তা করা, অতএব চিন্তা করা অর্থাৎ মাথার কাজ করাই পুরুষের একমাত্র করণীয়। নিজের জামা কাপড়, এমন কি, অর্থের হিসাব রাখা, প্রীমিয়মের টাকা পাঠানো, ব্যাঙ্কের টাকা তোলা, অফিসের জরুরি কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা, এমন কি, কোন্ দিন তাঁর কি এন্‌গেজমেণ্ট্ আছে সেটা যথাসময়ে স্মরণ করিয়া দেওয়া, বাড়ি মেরামত, মিস্ত্রি ডাকা, লৌকিকতা করা, যৌতুক পাঠানো, বিল সই করা, ইত্যাদি যাবতীয় বাজে ঝামেলার কাজ পুরুষমানুষের পক্ষে অসম্ভব। টাকাও রোজগার করব আবার কলমে কালি ভরব, এ রকম অশোভন চুক্তি করে কোনো ভদ্রলোকই সংসারক্ষেত্রে নামেন না। এই ধরনের কাজ কেউ তাঁকে করতে বললে তাঁর মন মুষড়ে যায়। আমি এই পুজনীয় আত্মীয়ের কাছে আরো একটি মূল্যবান্ শিক্ষালাভ করি যে চা-পান-সিগ্‌রেট প্রভৃতি নেশার বিষয়ে পুরুষ হবে অটোক্র্যাট। আর, যে সব স্ত্রী এই সব ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আসে তারা নিতান্তই ফচকে, কাণ্ডজ্ঞান-হীন এবং যে সব স্বামী তাদের ইঙ্গিতে চালিত হয় তাদের ভবিষ্যৎ-আশঙ্কায় শিহরণ লাগে।

আমি তাঁর উপদেশ ও আদর্শ দুটোকেই শ্রদ্ধা করি এবং কয়েকটা কাজও সেইমত করেছিলাম। সেই করাটাই আমার চরম মন-খারাপ ও লাঞ্ছনার ইতিহাস।

ঢিলা পাজামা ও পাঞ্জাবি ভদ্র ও সংগত বেশ বিবেচনা করে আমি পাশের বাড়িতে উক্ত সজ্জায় হাজির হয়েছিলাম। ফিরে এসে কিছুক্ষণ আমার বেশের ও কাণ্ডজ্ঞানের আলোচনা শুনতে হল। প্রতিবাদ

জানিয়েছিলাম, কিন্তু ব্যক্তিগত মতের প্রবল তোড়ে তা মিলিয়ে গেল। কিছুই বললুম না। কেবল কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ঘর থেকে উঠে আমি বারান্দার এক নিভৃত কোণে ঈজিচেয়ার দখল করলুম। সামনে প্রশস্ত নদী। আকাশে চাঁদ ছিল না। ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারে দু-চারটি তারা আমার মনোবেদনার মতই দব্‌দব্‌ করে জ্বলছিল। দূরে পাহাড়ের ধূসর রেখা, একটা নিঃসঙ্গ তাল গাছ, কয়েকটি পাখির কলতান। আদর্শ আবেষ্টনীতে মনের ব্যথা রঙে রসে অনবদ্য হয়ে উঠছিল। সেটাকে স্পষ্টতর মূর্তি দেবার জন্যে কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিলুম। মনে হল, আমার মত দুঃখী আর কেউ নেই। মধ্যবিত্ত ঘরে বিধবা মায়ের সন্তান। তার অদৃষ্টে আজ কিনা এই অনাদর লেখা ছিল! যেখানে তিলমাত্র ইচ্ছাজ্ঞাপনটুকুই আইনের সামিল ছিল, সেখানে আজ আসামীর মত সন্ত্রস্ত আত্মরক্ষায়-অসমর্থ মনোভাব! দূর প্রবাসে মায়ের জন্যে, বোনেদের জন্যে মনটা টন্‌টনিয়ে উঠল। আর কিছুক্ষণ প্রশ্রয় পেলে আমার মন-খারাপ ঘরোয়া স্নেহের ওপর একটি চমৎকার কবিতার জন্ম দিতে পারত। কিন্তু, পাঁচজন লোক এসে পড়াতে আমার দুঃখলালন অকালে বিনষ্ট হয়ে গেল। তবু, মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হল একটা নিঃস্পৃহ অনাসক্ত ভাব যার ফলে রাত্রে উপবাসটাই সমীচীন এবং যোগ্য প্রক্রিয়া বলে ধার্য করলুম।

আমার পূজনীয় আত্মীয়েরা আমার হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে পড়ার জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এবং অনুরোধও করলেন যে, এত দীর্ঘ রাত্রি সম্পূর্ণ অনাহারে যেন না কাটাই। কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করলুম, অনুশোচনার চিহ্ন নেই। দৃঢ়তা ফিরে পেলুম। কিছুক্ষণ পরে সবাই খেতে বসলেন এবং আরেক দফা অনুরোধ জানালেন। কিন্তু, যে কথাটির প্রত্যাশায় ছিলুম যথাস্থান থেকে তা এল না। চুপ করে বসে থাকা অসহ্য হয়ে উঠল। সমবেত ভোজনের অনাস্বাদিত রসে আমার মন-খারাপ যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমি লোকটি পরশ্রীকাতর নই, কিন্তু স্পর্শকাতর। তাই সেখান থেকে উঠে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

গভীর রাত্রি। নিদ্রার জড়িমা কেটে গিয়ে একটা ঘোর অস্বস্তি জেগে উঠছে। শরীরের মধ্যে কি যেন হয়েছে, উদর থেকে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত শূন্যতার কাকুতি; মাথা সম্পূর্ণ হালকা। বেশ কিছুক্ষণ অস্বস্তি চেপে রাখার চেষ্টা করলুম। যে মন-খারাপের সূত্রপাত এত কোমল ছিল সন্ধ্যাবেলায়, গভীর রাত্রে তার কঠিনতা এবং শারীরিক প্রতিক্রিয়া অনুভব করে উল্লসিত হলুম। ভাবলুম, ঠিক্ করেছি এবং কাল সারাটা দিন এই কষ্টে নিজেকে দগ্ধ করে ফেলব। কিন্তু শয্যারই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল স্থির নিশ্বাসের নিয়মিত উত্থান পতন। পরিতৃপ্ত সুপ্তির পিছনে আছে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যের পিছনে আছে রুচিকর খাদ্য— তবেই না এই সম্পূর্ণ বিশ্রাম সম্ভব। অবস্থার প্রতিতুলনায় মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। ভাবলুম, এই আত্মদমনের মূল্য দেয় কে? এ তো শুধু নিগ্রহ! কি লাভ? নিঃস্তব্ধ রাত্রি, অচেতন নিদ্রা। মন-খারাপ তো আছেই, কাল সকালে, চাই কি দিনভোর থাকতে পারে। অবস্থা বুঝে চালালেই চলবে। কিন্তু বাকি রাত কাটে কি করে! খাবার টেবিলের পাশে মীট্ সেফ-এর মধ্যে কয়েকখানা অবশিষ্ট চপ, টেবিলের ওপর এক ছড়া সুদৃশ্য কলার ছবি জেগে উঠল চোখের সামনে। জলের কুঁজোটা কোথায়? যাক্ প্রাণই যখন আটকায়, তখন গলায় আটকানোর রিস্‌ক্ নিতেই হবে।

নিঃশব্দে কার্য সমাধা করে ঘরে ফিরছি, পায়ে লেগে মেঝেতে রাখা জলের কুঁজো ওলটাল।

কি করে সে যাত্রা সামলেছিলুম তা ভগবানই জানেন। বারান্দায় টপ্ করে বেরিয়ে পড়ে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়েছিলুম, এইটুকুই মনে আছে। উদ্‌বেগের অন্ত ছিল না। কিন্তু, মুখরক্ষা হয়েছিল।

বাড়িতে বেড়ালের দৌরাত্ম্য ছিল, তার ওপর দিয়েই ব্যাপারটা গড়িয়ে গেল। আজও পর্যন্ত সেই আত্মীয়েরা জানেন না, সে রাতের অভিযানের কাহিনী। লাঞ্ছনার সীমানায় দাঁড়িয়ে এ-হেন সম্মান নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসা খুব কম লোকেরই ভাগ্যে ঘটে থাকে। এইটুকু শুধু বলতে চাই, পরের দিন সকাল বেলায় মাত্র একটু গম্ভীর মুখে ছিলুম, তার বেশি আর গড়াতে দিইনি। যা হলে হতে পারত, এই ভেবে আমি সেই থেকে সাবধানেই আছি। মন-খারাপ হয়, মেজাজ গরমও হয়; কিন্তু, ঐ পর্যন্ত। তার প্রকাশে উপবাসকে টেনে আনি না। ওটা পুরোহিত, ধর্মভীরু পেন্‌স্‌নার এবং অভিমানিনী মহিলাদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছি।

পুরুষের মন-খারাপ কেবল দাম্পত্য মনান্তর থেকেই হয় না। আরো নানা বাহ্য কারণ থাকে। যে অর্থ যে প্রতিষ্ঠা তার কাম্য, প্রাপ্য, অথচ অলভ্য সেটা অনেক সময়েই মন-খারাপের উদ্রেক করে যখন দেখা যায়, নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তি সেগুলিকে নেহাত বরাতের জোরে করায়ত্ত করে অশোভন ভাবে আত্ম-জাহির করছে। যখন মন চায় বৈচিত্র্য, অন্তত একটুখানি অদল-বদল, সে সময়ে বাধ্য হয়ে দিনের পর দিন একই কর্মসূচী অনুসরণ করতে মন বিদ্রোহ করে ওঠে। হাতে টাকা নেই অথচ একই মাসে অনেকগুলো বিয়ের নিমন্ত্রণ, তাতে মন-খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। বন্ধুবান্ধবদের কাছে যে খাতির, সমাজের কাছে যেটুকু চাহিদা, সেটুকু না মিললে মন কখনোই ভালো থাকতে পারে না। তারপর, মনে করুন, আপনারই ছোট শ্যালীটির বেশ বড় ঘরে বিয়ে হল এবং বরের চেহারাটি ভালো। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্তত মনের জোরে আপনার মন ভালো করা উচিত। আপনার যখন পড়তি বয়েস, ঘাটতি আয় এবং বাড়তি দেনা, সে সময়ে আপনার অর্থসাধ্য শক্তিসাপেক্ষ কর্তব্যগুলোর কথা যদি কেউ নিয়তই স্মরণ করিয়ে দেয় তাহলে মন-খারাপ অনিবার্য। যদি বয়েসে আপনি নবীন হন, তাহলেও মধ্যে মধ্যে আপনার স্বাভাবিক স্ফূর্তি লোপ পাবে। পরীক্ষা আছে, সিনেমা আছে, আর আছে মেয়ে-কলেজের মোড়, নিদেন, পাশের বাড়ির জানলা। এ সব ক্ষেত্রে বাধা দুর্লঙ্ঘ্য না হলেও, খানিকটা ধুকপুকুনির সৃষ্টি করতে পারে। পরীক্ষার চিন্তা দুশ্চিন্তারই নামান্তর— ভালো তৈরি হলেও দুর্ভাবনা, বে-পরোয়া কলম চালালেও বিপদ। সিনেমা সম্বন্ধে কারু বা যেতে না পেলে মন-খারাপ, কারু বা দেখে এসে মন-খারাপ। আর, হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে এতই সূক্ষ্ম কারণে মন-খারাপ আর মন-ভালো হয় যে তা নিয়ে রীতিমত গবেষণা করা যেতে পারে। ব্যাপারটা যদি বেশি দিন গড়ায়, উভয়-পক্ষের আকর্ষণ যদি সমান না হয় এবং যদি সামাজিক বাধা থাকে— তা হলে বেশ ঘোরালো রকমের মন-খারাপ হতে পারে। অবিশ্যি, ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর মন-মেজাজ অনেকখানি নির্ভর করে। কেউ বা অন্তরের ব্যথা অন্তরেই পোষণ করে, কেউ বা হৈ-চৈ করে খানিকটা ভার লাঘব করে। কেউ বা উৎসাহে কবিতা লেখে, বেশি করে খায় ও মোটা হয়; কেউ বা মন-ভারি করে থাকে, রোগা হয়ে যায়, কারু সঙ্গে মিশতে চায় না, সর্বদাই সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে থাকে। কেউ বা কাছে গিয়ে বোবা হয়ে যায়, না-বলা কথার দুঃখে বাড়ি এসে মন-খারাপ করে। আর যার হাঁক-ডাক বেশি, জোর করে আদায় যে করতে জানে, সে কোমর বেঁধে ঝগড়া করে আসে, আবার ঘরে ফিরে দুঃখ বোধ করে, কেন মিছিমিছি বকাবকি করে সময় নষ্ট করলুম! মোট কথা, মন-খারাপ কখনো না কখনো হবেই। তবে, কম আর বেশি।

মেয়েদের মন-খারাপটা একটু ঘন ঘন হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তর্মুখী। দু-এক জনকে

দেখেছি যারা বেশিক্ষণ মন-খারাপ করে থাকতে পারে না, অল্পেই সন্তুষ্ট হয়ে ভুলে যায়। কিন্তু, বেশির ভাগ মেয়ে মন-খারাপ হলে প্রশ্নের উত্তরে চাপা ঠোঁটে জবাব দেবে, 'কি আবার হবে! কিছুই হয় নি।' অথচ এই 'কিছুই হয় নি' জবাব থেকে আপনি অনেকখানি আন্দাজ করে নিতে পারবেন যদি আপনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি হন। কারু বা বারোমেসে মন-খারাপ থাকে। তাদের দেখলে মনে হয়, মন এদের শূন্য, বিবর্ণ। দুনিয়ার বিষাদের ভার নেমে এসেছে তাদের মুখে। তাদের সঙ্গে কথা বলা মুশকিল, সহানুভূতি জানানো বৃথা। লঘুপ্রকৃতি মেয়েদের মন-খারাপ একটা বিলাস, প্রজাপতির স্থির হওয়ার মতন। কিন্তু, যাদের মন ভারি স্পর্শকাতর, সংবেদনশীল, তাদের চট্ করে মন-খারাপ হয়। এবং সে মন-খারাপ মুছে ফেলতে অতি নিপুণ হাতের দরকার। আমি একজন মহিলাকে চিনি যাঁর মুখ দেখে আমি সকাল বেলাতেই বলে দিতে পারি, আজ সারাটা দিন তাঁর মন-খারাপ যাবে। তিনি কিছুই করেন না, খালি বলে দেন, 'আজকে আমায় ডেকোনা, খেতে বোলো না, ভাই— আমার গলা দিয়ে কিছু নামবে না।' সারাদিন কবিতার বই কোলে করে বসে থাকেন, নয়ত চুল খোলা, আলুথালু ভাব, আর গায়ে একটা গেরুয়া রঙের চাদর নিয়ে বাগানের কোণে আত্মগোপন করেন। সন্ধ্যায় খোলা জানলায় স্থির দৃষ্টিতে কি যেন উদাস হয়ে দেখেন— আন্মনা চোখে বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়ায়। তারপর দিনভোর উপবাস করে পরের দিন আবার সহজ মানুষ হয়ে যান! কখনো-কখনো দু-তিনদিন এ ভাবটা থাকে। তাঁকে সে সময়টিতে দেখলে মনে হয়, যেন গৌরী হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন মন-খারাপের ব্রত উদ্‌যাপন করতে। তাঁকে চিনে আমি বুঝেছি, মন একটি দুর্লভ বস্তু। এমন সুন্দর মন-খারাপ হতে পাওয়া একটা সৌভাগ্য আর সেই বিষাদটুকু এমন আদর্শভাবে ফুটিয়ে তোলাও রীতিমত আর্ট, যদি মুখখানি মানানসই হয়।

পুরুষ মানুষের সমস্তক্ষণ বাইরে-বাইরে কাজ। কাজেই, বেশিক্ষণ মন-খারাপ করে থাকার উপায় নেই। মেয়েদের কাজ বাড়িতে, অবসর আছে দুঃখলালনের। তাছাড়া, সংসারের সত্যিকারের দায়িত্ব এবং তার আনুষঙ্গিক অশান্তি তাঁদের জীবনে বরাদ্দ। তাই মন-খারাপ যত শীঘ্র হয় আবার সে মন-খারাপ তত গা-সওয়া হয়ে যায়। দুজনের জীবন আলাদা, কর্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র, পৃথক্ আবহাওয়ার মধ্যে ঘোরাফেরা; কাজেই, মনের গড়নে তফাত এবং সেই অনুসারে মন-খারাপের ধরনও আলাদা। পরস্পর এই নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে, কলহ করে। কিন্তু, একটু বুঝে চললে বোধ হয় মন-খারাপ এড়িয়ে যাওয়া যায়। আগেই বলেছি, ক্রনিক মন-খারাপ বড় সাংঘাতিক জিনিস। ওটা স্নায়ুর ব্যাধি। তবে, একটু-আধটু মন-খারাপ ভালো। তাতে সঞ্চিত গ্লানি খানিকটা বেরিয়ে যায়, আত্মপীড়নে দেহশুদ্ধি চিত্তশুদ্ধি দুই-ই হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে আত্মবিশ্লেষণের সুযোগও পান।

তরুণ বয়েসে এই ব্যাধিটার প্রকোপ বাড়ে। তবে, সেটা নিরীহ ব্যাধি, তার মূলে একটা কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। এবং সে দুঃখটা নৈমিত্তিক বলেই তার চিকিৎসা আছে। কোনো কোনো ভাগ্যবানের অন্তরে ঐশী অতৃপ্তির মতন অহেতুক মনোবেদনা সঞ্চারিত হতে থাকে। এরও মূল্য আছে আর্টের রাজ্যে। শেলি, কীট্‌স, টেনিসন ও রবীন্দ্রনাথের মন-খারাপ স্থায়ী না হলে কতো ভালো কবিতাই ভ্রূণাবস্থায় বিনষ্ট হত। কোনো তরুণ যদি কখনো এই সূক্ষ্ম বিষাদ অনুভব না করে থাকেন, তা হলে অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতারই রসাস্বাদনে তিনি বঞ্চিত হবেন। কবি হওয়া তো দূরের কথা, প্রকৃসিতে কবি হওয়াও চলবে না। এই 'hungering melancholy of youth'কে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদি একে উপহাস করি তা হলে

'Why did I laugh tonight'-এর মতন সনেট উপভোগ করতে পারব না। তাই বলছি, বিষাদের স্পর্শ মানুষের অন্তরে সোনালি দাগ কেটে যায় এবং সে বিষাদ ধারণার বস্তু, যেহেতু তার সঙ্গে মননের ও মানসের সম্পূর্ণ অন্বয়।

অনেক রকমের মন-খারাপের কথা আলোচনা করলুম। আমার মনে হয়, সব চেয়ে দুরারোগ্য রোগ হ'ল, মন-খারাপ করব বলে মন-খারাপ করা। তখন সাত্ত্বিক ভাবের শিল্পীজনোচিত খেয়াল দাঁড়ায় একটা কোপনতায়, অবাধ্য সংকল্পে। সুস্থ মানুষ হতে গেলে একে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। যে রকমেই হোক, মনকে এর হাত থেকে মুক্ত করা দরকার। নইলে 'mood to be moody' আপনার জীবনকে তো বটেই, আপনার সঙ্গে লিপ্ত অপর জীবনকেও দুর্বিষহ করে তুলবে। যদি দরকার হয়, একলাই জায়গা-বদল করবেন, নয়ত সস্ত্রীক বাড়ি-বদল করবেন— যাতে একই চরিত্র, জীবনপ্রণালী ও আবেষ্টনী আপনার মনকে জীর্ণ করে না ফেলে। আজকাল যুদ্ধের বাজারে অবশ্য ও-দুটোই অসম্ভব। তাই যুদ্ধোত্তর কালের জন্যে মন-খারাপের বিলাসিতাটুকু মুলতুবি রাখতে হবে। ভাবতে হবে, অন্য দেশে অন্য অবস্থায় মানুষ এর চেয়ে কত বেশি মন-খারাপ নিয়ে বেঁচে আছে। তাহলে, মিক্যবার না হয়েও আপনি জীবনের কাছে কিছু আশা করতে পারেন।

এই যে আমি এতক্ষণ মন-খারাপ করেছিলুম, লিখতে বসে এবং আপনাদের অযাচিত অনেক কথা শুনিয়ে আমার মনটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠছে। মন-খারাপের স্বপক্ষে-বিপক্ষে এত বলা সত্ত্বেও যদি আপনাদের কারু মন ভালো না হয়, তা হলে আপনাদের মন নিতান্তই খারাপ। আমি নাচার।

হাটতলা। শ্রীযদুপতি বসু

স্ফুলিঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুক্ত যে ভাবনা মোর
ওড়ে ঊর্ধ্বপানে
সেই এসে বসে মোর গানে।[1]

২

জানার বাঁশি হাতে নিয়ে
না-জানা
বাজান তাঁহার নানা সুরের
বাজানা।

৩

পুষ্পের মুকুল
নিয়ে আসে অরণ্যের আশ্বাস বিপুল।

৪

আকাশের আলো মাটির তলায়
লুকায় চুপে,
ফাগুনের ডাকে বাহিরিতে চায়
কুসুমরূপে।

লেখন-এর সমসাময়িক বা তাহার পরবর্তী এরূপ বহু শ্লোক-কবিতা এ পর্যন্ত কবির কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। বিভিন্ন পত্রিকা ও পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলন করিয়া এগুলির একটি সংগ্রহ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই এরূপ কবিতা যদি কাহারও সংগ্রহে থাকে ও জানান, উহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। বর্তমান সংখ্যার কবিতাগুলি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি হইতে শ্রীকানাই সামন্ত কর্তৃক সংকলিত হইয়াছে।

১ লেখন-এ ইহার ইংরেজি আছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাক্-ইতিহাস

শ্রীসুকুমার সেন

জয়দেবের পদগুলিতে যে ছন্দ অবলম্বিত হইয়াছে তাহা অন্ত্য প্রাকৃত অর্থাৎ অপভ্রংশ হইতে নেওয়া। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী এমন কি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি পশ্চিমে গুজরাট হইতে পূর্ব্বে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে অপভ্রংশ ও ইহার অর্ব্বাচীন রূপ 'অবহট্‌ঠ' বা 'অপভ্রষ্ট' প্রচলিত ছিল সাহিত্যের বাহনরূপে সংস্কৃতের হীন দোসর ভাবে। বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাদেশিক নব্য আর্য্য ভাষা দশম শতাব্দী হইতে ধীরে ধীরে পরিণত রূপ লাভ করিতে থাকিলেও তাহা সাহিত্যের বাহনরূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় নাই কোন প্রাচীন আদর্শ ছিল না বলিয়া। কিন্তু কথ্যভাষার পদ ও বাক্‌রীতি সমসাময়িক অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ রচনার মধ্যে প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং শুধু কালানুক্রম এবং বিষয় ধরিয়া নহে ভাষার হিসাবেও এই সময়ের অর্থাৎ নবম-চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ সাহিত্যকে বাঙ্গালা প্রভৃতি নব্য আর্য্যভাষার সাহিত্যের অরুণোদয় পর্ব্ব বলিয়া গ্রহণ না করিলে ইতিহাসের মর্য্যাদা উপেক্ষিত হয়।

অপভ্রংশ ছন্দ মোটামুটি প্রাকৃত ছন্দের মত মাত্রামূলক, সংস্কৃতের মত অক্ষরমূলক নয়। তবে পূর্ব্বতন প্রাকৃতের ছন্দ—প্রধানতঃ আর্য্যা—যেমন একঘেয়ে অপভ্রংশের ছন্দ তেমন নয়। অন্ত্যানুপ্রাসের সৃষ্টি এবং পদের পর্ব্বসংখ্যার স্বাধীনতা অপভ্রংশ ছন্দে অপরিসীম নমনীয়তা ও মাধুর্য্য দিয়াছে এবং তাহার উপরই নির্ভর করিয়া নব্য আর্য্যভাষায় ও সাহিত্যে অভূতপূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য ও অভাবনীয় শক্তিমত্তা পরিস্ফুট হইয়াছে।

বৌদ্ধ লেখকেরা চিরকালই সংস্কৃতের অপেক্ষা প্রাকৃতের অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের ভিক্ষু-শ্রাবকেরা বেশির ভাগ আসিতেন সাধারণ জনসমাজ হইতে। অপরপক্ষে ব্রাহ্মণ্য লেখকেরা লেখনী ধারণ করিতেন পণ্ডিত ও শিক্ষিত সমাজের মুখ চাহিয়া। বৌদ্ধেরা যখন সংস্কৃতে লিখিয়াছেন তখনও যথেচ্ছ প্রাকৃত বা প্রচলিত শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। ব্যাকরণে এবং পদপ্রয়োগেও বৌদ্ধ লেখকেরা পাণিনীয় শব্দানুশাসন মানিয়া চলেন নাই। উত্তরাপথের মহাযান-পন্থী বৌদ্ধেরা তাঁহাদের শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে ভাষায় তাহার অর্দ্ধেক সংস্কৃত আর অর্দ্ধেক প্রাকৃত। এই মিশ্র ভাষাকে বলা হয় "গাথা ভাষা" অথবা "বৌদ্ধ সংস্কৃত"। মনে হয়, মহাভারত ও অপরাপর পুরাণকাহিনী আদৌ এইরূপ জনসাধারণবোধ্য সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্র ভাষায় প্রচলিত ছিল। মহাভারতের বর্ত্তমান রূপেও পূর্ব্বতন মিশ্র ভাষার চিহ্ন নিঃশেষে লুপ্ত হয় নাই।

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে কথ্যভাষার প্রভাব ছন্দেও পরিলক্ষিত হয়। অন্ত্যানুপ্রাস অর্থাৎ মিল প্রাকৃত যুগের শেষ স্তরের—অর্থাৎ অপভ্রংশের—ছন্দের সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট লক্ষণ। মাত্রা (এবং অক্ষর) -সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি এবং লঘুগুরুক্রমের বিপর্য্যাস করিয়া ছন্দের বাহুল্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টিও এই যুগেই প্রকট হইয়াছিল। এই ছন্দ-ঐশ্বর্য্যের ভবিষ্যৎ বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদের দৃষ্টিতে প্রথম ধরা পড়ে। উদাহরণস্বরূপ ললিত-বিস্তরের একটি "গাথা" বা শ্লোক তুলিয়া দিতেছি। ললিতবিস্তর বুদ্ধের জীবনীকাব্য, গদ্যে পদ্যে রচিত।

রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। ললিতবিস্তরের গদ্যাংশ সাধু সংস্কৃতঘেঁষা। পদ্যাংশ প্রাকৃতঘেঁষা—বিশেষ করিয়া গাথাগুলি।

পুরি তুম নরবর স্থতু নৃপ যদভূ
নরু তব অভিমুখ ইম গিরমবচী।
দদ মম ইম মহি সনগরনিগমাং
ত্যজি তদ প্রমুদিতু ন চ মনু ক্ষুভিতো ॥[১]

পূর্ব্বে তুমি, হে নরবর, যখন নৃপসুত হইয়াছিলে, এক নর তোমার অভিমুখে এই বাক্য বলিয়াছিল—'দাও আমাকে এই মহী নগর-জনপদ সমেত'; তখন দান করিয়া তুমি প্রমুদিত (হইয়াছিলে, তোমার) মন ক্ষুব্ধ হয় নাই।

অষ্টম শতাব্দী হইতে শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষা সমস্ত উত্তরাপথের সাধু lingua franca হইয়া দাঁড়ায়। এই ভাষায় জৈনদের লেখা বই অনেক পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজপন্থী এবং শৈব যোগী নাথপন্থী সিদ্ধাচার্য্যেরা এই ভাষায় তাঁহাদের কড়চা বই এবং ছড়া ও গান লিখিয়া গিয়াছেন। ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশ হইলেও বাঙ্গালাদেশে এবং বাঙ্গালীর লেখা বলিয়া এই সকল রচনায় স্থানীয় (মাগধী) অপভ্রংশের ছাপ পড়িয়াছে। সুতরাং শুধু ভাবের দিক দিয়া নয় রূপের দিক দিয়াও এই রচনাগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের গণ্ডী-বহির্ভূত নয়। ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষাতেও ছড়া ও পদ রচনা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্য্যদের এই রচনাধারা পরবর্তী শতাব্দীগুলির মধ্য দিয়া অক্ষুণ্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাউল গানে ইহারই পরিণতি পাই। দেশীয় সাহিত্যের রূপ তখন অপরিণত, ভাষা অস্ফুট এবং প্রকাশভঙ্গি কুণ্ঠিত। সুতরাং সাহিত্যের পরিচিত ঠাট সিদ্ধাচার্য্যদের অপভ্রংশ দোহায় ও প্রাচীন বাঙ্গালা পদগুলিতে নাই। তবে বিষয়গৌরবে এই রচনাগুলি সমসাময়িক অভিজাত সাহিত্যের উপরে উঠিয়াছে। অত্যন্ত কঠিন কথা অতিশয় সহজ ও সরল রূপে প্রকাশিত হইয়া মনে গিয়া লাগে; ইহাই এই "মিষ্টিক" ছড়া-গানগুলির অনন্যসাধারণ উৎকর্ষ। সিদ্ধাচার্য্যেরা রাজসভার জন্য লেখেন নাই, পণ্ডিতগোষ্ঠীর জন্যও নহে। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহারা পাণ্ডিত্যকে ভয় করিয়া এড়াইয়া চলিতেন। পণ্ডিতদের উপেক্ষা ও ঘৃণা ছিল তাঁহাদের গর্ব্বের বিষয়,—"পাখি ন চাহই মোরি পাণ্ডিআচাএ" (অর্থাৎ, পণ্ডিতাচার্য্য আমার দিকে চায়ও না)। তাই তাঁহাদের রচনা যথার্থ ই অকৃত্রিম এবং উদার।

যাহারা গতানুগতিক ধর্ম্মসংস্কারের পাশে বদ্ধ হইয়া আচারবিচারের ঠুলি পরিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছে তাহাদের প্রতি সাধক-কবির সুতীব্র অশ্রদ্ধা।

কিং তহ দীবেঁ কিঁ তহ নিবেজ্জঁ
কিং তহ কিজ্জই মন্তহ সেব্বঁ।
কিং তহ তিত্থ তপোবন জাই
মোক্খ কি লব্ভই পানী হ্নাই ॥[২]

---

১ ত্রয়োদশ অধ্যায়। উদ্ধৃত কবিতার ছন্দোমাধুর্য্য রবীন্দ্রনাথের "কপোত দুটি ডাকে বসি শাখে মধুরে" ইত্যাদি কবিতাটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

২ দোহাকোষ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী সঙ্কলিত, পৃ ১০-১১।

কি (হইবে) তোর দীপে ! কি (হইবে) তোর নৈবেদ্যে ! কি তোর করা হইবে মন্ত্রের সেবায় ! কি তোর (হইবে) তীর্থ-তপোবনে যাইয়া ! জলে স্নান করিলে কি মোক্ষলাভ হয় ?

সাধক-কবিরা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রায়ই প্রচলিত কবিকল্পনার রূপকে ও উৎপ্রেক্ষায় মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এসো জপহোমে মণ্ডল-কম্মে
অণুদিন আচ্ছসি বাহিউ-ধম্মে।
তো বিণু তরুণি নিরন্তর-ণেহেঁ
বোধি কি লব্ভই এণ বি দেহে ॥[৩]

এই জপ-হোম ও মণ্ডল কর্ম্মরূপ বাহ্যধর্ম্মে অনুদিন (লিপ্ত) আছিস। তোর নিরন্তর স্নেহ বিনা, হে তরুণি, এই দেহে কি বোধি লাভ করা যায় ?

বৌদ্ধ ও শৈব তান্ত্রিক-যোগী সাধক-কবিরা গানে ও ছড়ায় তাঁহাদের সাধনতত্ত্ব ইঙ্গিতে বলিয়া গিয়াছেন "সন্ধা-ভাষা"-য়। সন্ধা-ভাষায় শব্দের বাহ্য অর্থ একরূপ আর ভিতরের অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের পদগুলি এইরূপ সাঙ্কেতিক শব্দে পূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ হেবজ্রতন্ত্র হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।[৪] অপভ্রংশ শব্দের বাহুল্য থাকিলেও পদটিতে প্রাচীন বাঙ্গালার ছাপ কিছু কিছু আছে। অনুবাদের মধ্যে বন্ধনীতে সন্ধা শব্দের অভিপ্রেত অর্থ দেওয়া গেল।[৫]

রাগ বরাড়ি

কোল্লই রে ঠিঅ বোলা মুম্মনি রে কক্কোলা।
ঘণ কিবিড় হো বাজ্জই করুণে কিঅই ন রোলা ॥
তহি বল খাজ্জই গাঢ়ে মঅণা পিজ্জই।
হলে কালিঞ্জর পণিঅই দুন্দুরু বজ্জিঅই ॥
চউসম কত্থুরি সিহ্লা কর্পূর লাই।
মালই-ইন্ধন সালি ভতহি ভরু খাই ॥
পেখণে খেট করন্তে সুদ্ধাসুদ্ধ ণ মুণিঅই।
নিরংসুঅ অঙ্গ চড়াই তঁহি জসরাব সুণিঅই ॥
মলয়জ কুন্দুরু বাটই ডিণ্ডিম তহি ন বাজিঅই ॥

...স্থিত বোল (বজ্র)...রে কক্কোল (পদ্ম); কৃপীট (ডমরু) ঘন বাজে, করুণা রোল করিতেছে না। সেখানে বল (মাংস) খাওয়া হয়, গাঢ়ভাবে মদন (মদ) পান করা হয়; ওলো কালিঞ্জর, (ভব্য লোক) প্রশংসিত হয়, দুর্দ্দুর (অভব্য ব্যক্তি) বর্জ্জিত হয়। চতুঃসম (বিষ্ঠা), কস্তূরী (মূত্র), সিহ্লক (স্বয়ম্ভু অর্থাৎ আর্ত্তব)

---

৩ পূর্ব্বোক্ত— দেহকোষ, পৃ ২১।

৪ গৃহীত পাঠ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২৯, পৃ ৪৬) ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের (Indian Historical Quarterly, VI, পৃ ৩৯৪) প্রদত্ত পাঠ ও পাঠান্তর অবলম্বনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

৫ ডাক্তার বাগচীর "The Sandhabhasa and Sandhavacana" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (Indian Historical Quarterly, VI, পৃ ৩৮৯-৩৯৬)।

কর্পূর (শুক্র) নেওয়া হইল ; মালতীন্ধন (ব্যঞ্জন) শালি তৃপ্তিকর (ভাত) খাওয়া হইল। প্রেক্ষণে (আগমনে) খেট (গমন) করা হইলে শুদ্ধাশুদ্ধ জানা যায় না ; নিরংশুক (অস্থি-আভরণ) অঙ্গে চড়াইলে তখন যশরাব শোনা যায়। মলয়জ (মহামাংস) কুন্দুরু (দ্বীন্দ্রিয়যোগে) বাটা হইতেছে, তখন ডিণ্ডিম (অস্পর্শ) বাজিতেছে না।

বৌদ্ধ সহজপন্থী এবং শৈব নাথপন্থীদের অপভ্রংশ ছড়া ও পদ সবই ধর্ম্মবিষয়ক। তবে আলোচ্য সময়ে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, অপভ্রংশে লৌকিক বিষয় লইয়াও কবিতা রচনা করা হইত। এইরূপ কবিতার সংখ্যা খুব বেশি নয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে সঙ্কলিত অপভ্রংশ ছন্দোনিবন্ধ 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল'[৬] নামক গ্রন্থে এইরূপ কতকগুলি কবিতা বা পদ পাওয়া গিয়াছে। প্রাকৃত-পৈঙ্গলের সঙ্কলন হইয়াছিল বোধ হয় বারাণসী অঞ্চলে। বাঙ্গালাদেশে এই বইটির বিশেষ আদর ছিল। বাঙ্গালায় লেখা প্রাকৃত-পৈঙ্গলের পুথি অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের পুথির পাঠই উৎকৃষ্টতর।[৭] কতকগুলি কবিতা বাঙ্গালী কবির লেখা। ইহার প্রমাণ পাই কবিতাগুলির বিষয় এবং ভাষা হইতে। শৌরসেনী অপভ্রংশে লেখা হইলেও এই কবিতাগুলিতে মাগধী অপভ্রংশের এবং পুরাতন বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব আছে। প্রাকৃত-পৈঙ্গলের সব কবিতা একই সময়ের লেখা নয়। যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন সেগুলি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বের নয়। তখন বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি নব্য আর্য্য ভাষা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনও নব্য আর্য্য ভাষার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাই চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পর্য্যন্ত অপভ্রংশে কবিতা রচনা হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও হইত, তাহার নিদর্শন বিদ্যাপতির 'কীর্ত্তিলতা'। মনে হয়, অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের ধারা মৈথিলের মধ্য দিয়া বাঙ্গালার ব্রজবুলি সাহিত্যে জের টানিয়া আসিয়াছে। শুভঙ্করের নামে প্রচলিত গণিত-আর্য্যায় অপভ্রংশ কাব্যরীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব রহিয়া গিয়াছে।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত চর্য্যাপদ ছাড়া কোন কবিতা আমাদের হস্তগত হয় নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লেখা বাঙ্গালা কবিতা একছত্রও বর্ত্তমান নাই। এই সময়ে বাঙ্গালার তথা পূর্ব্বভারতের প্রাদেশিক সাহিত্য কিভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার পরিচয় প্রকৃষ্টভাবে পাই প্রাকৃত-পৈঙ্গলে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রধানতঃ প্রাকৃত-পৈঙ্গল অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিচয় দিতেছি।

প্রাকৃত-পৈঙ্গলে উদ্ধৃত কবিতাগুলির ছন্দোমাধুর্য্য এবং বিষয়বৈচিত্র্য অসামান্য। মাঝে মাঝে এমন একআধটি কবিতা পাওয়া যাইতেছে যাহার সঙ্কীর্ণ দুইচারিটি ছত্রে পরিপূর্ণ রসসৃষ্টি হইয়াছে। যেমন,

সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেউ চলাএ॥

সেই মোর কান্ত (এখন) দূর দিগন্তে ; প্রাবৃষ আসে, চিত্ত হয় বিচলিত।

---

৬ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে চন্দ্রমোহন ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত (১৯০০-০২)।

৭ অত্র গৃহীত পাঠ সর্ব্বাংশে মুদ্রিত সংস্করণের সহিত মিলিবে না ; বর্ত্তমান আলোচনায় আমি বাঙ্গালাদেশের পুথির পাঠই উৎকৃষ্টতর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

আরও কয়েকটি কবিতার দৃঢ়পিনদ্ধ ক্ষুদ্র পরিসরে বিরহিণীর দীর্ঘশ্বাস ঘনীভূত হইয়াছে। যেমন,

কাঅ হউ দুব্বল তেজ্জি গরাস
খণে খণে জাণিঅ অচ্ছ নিসাস।
কুহূ-রব তার দুরন্ত বসন্ত
ণিদ্দঅ কাম কি ণিদ্দঅ কন্ত॥

কায় হইল দুর্বল, আহার (হইল) ত্যক্ত, ক্ষণে ক্ষণে নিঃশ্বাস জানাইতেছে; কুহুরব তীব্র, বসন্তও দুরন্ত;—কাম নির্দয় কি কান্ত নির্দয় (বুঝিতেছি না)।

গজ্জই মেহ কি অম্বর সামর
ফুল্লই ণীব কি বুল্লই ভামর।
এক্কল জীঅ পরাহিণ অম্মহ
কীলউ পাউস কীলউ বম্মহ॥

মেঘ গর্জ্জন করিতেছে এবং অম্বর শ্যামল (হইয়াছে), নীপ ফুটিয়াছে এবং ভ্রমর বুলিতেছে; একলা জীবন, আমি পরাধীন;—প্রাবৃষ ক্রীড়া করুক, মন্মথও ক্রীড়া করুক।

ণবি মঞ্জরি লিজ্জিঅ চূঅই গাচ্ছে
পরিফুল্লিঅ কেসুলআ বণ আচ্ছে।
জই ইত্থি দিগন্তর জাইহ কন্তা
কিণু বম্মহ ণত্থি কি ণত্থি বসন্তা॥

নব মঞ্জরী লইয়াছে চূত গাছ, (নিকটে) পরিফুল্লিত কিংশুক (পরিশোভিত) লতা বন আছে; যদি এতেও, হে কান্ত, দিগন্তর যাও তবে কি মন্মথ নাই, বসন্তও কি নাই!

তরুণ তবণি	তবই ধরণি	পবণ বহ খরা
লগ ণহি জল	বড় মরু-থল	জণ-জীবণ-হরা।
দিসই বলই	হিঅঅ দুলই	হমি একলি বহূ
ঘর ণহি পিঅ	সুণ হি পহিঅ	মণ ঈচ্ছই কহূ॥

তরুণ সূর্য্য ধরণীকে তপ্ত করিতেছে, পবন খর বহিতেছে, নিকটে নাই জল, (সম্মুখে) জনজীবনহর বড় মরুস্থল; দিগ্‌বলয়ে (আমার) মন দুলিতেছে; আমি একলা বধূ, ঘরে নাই প্রিয়; শুন হে পথিক, মন কেমন ইচ্ছা করে।

কবিতাটির ছন্দ অভিনব।

ফুল্লিঅ কেসু	চন্দ তহ পঅলিঅ	মঞ্জরি তেজ্জই চূআ
দক্খিন বাঅ	সীঅ ভই পবহই	কম্প বিওইণি-হীআ।
কেঅলি-ধূলি	সব্ব দিস পসরিঅ	পীঅর সব্বউ ভাসে
আই বসন্ত	কাই সহি করিহই	কন্ত ন থক্কই পাসে।

কিংশুক ফুটে, চন্দ্রও প্রবল, চূত (বৃক্ষ) মঞ্জরী প্রকাশ করে, দক্ষিণ বাত শীতল হইয়া প্রবাহিত হয়, বিয়োগিনী-হৃদয় কাঁপে, কেতকীর পরাগ সব দিকে প্রসারিত হইয়া সব কিছু পীতবর্ণে রঞ্জিত করে; বসন্ত আগত; সখি, কি করি, কান্ত যে পাশে থাকে না।

নব্য আর্য্য ভাষার প্রাচীন সাহিত্যে বীররসের প্রাচুর্য্য দেখা যায় না। সেখানে ভক্তি অথবা আদি রসেরই একাধিপত্য। কিন্তু প্রাকৃত-পৈঙ্গলে বীররসাত্মক কবিতার অভাব নাই। এইসব কবিতার অধিকাংশ যে বাঙ্গালী কবির লেখা এমন কথা অবশ্য বলা চলে না, তবে কয়েকটি কবিতায় বাঙ্গালীর বীরত্বের গৌণ প্রশংসা আছে। ক্বচিৎ ভনিতায় কবির নামও আছে। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

পিন্ধউ দিঢ় সন্নাহ বাহু উপ্পর পক্‌খর দেই
বন্ধু সমরি রণ ধসউ সামি হম্মীর বঅণ লেই।
উড্ডল ণহপহ ভমউ খগ্গ রিউ-সীসহি ডারউ
পক্‌খর পক্‌খর ঠেল্লি পেল্লি পব্বঅ উপ্‌ফারউ।
হম্মীর-কজ্জু জজ্জল ভণই
কোহাণল মুহ মহ জলউ।
সুলতান-সীস করবাল দেই
তেজ্জি কলেবঅ দিঅ চলউ।

দৃঢ় সন্নাহ পরে, বাহুর উপর ঢাল দেয়, বিষম সমরে (অথবা, সমর বাঁধিয়া) রণ দেয় প্রভু হম্মীরের বচন লইয়া; নভপথে (যেন) উড়িয়া চলে, খড়্গ রিপুশীর্ষে হানে, ঢালে ঢালে ঠেলিয়া ফেলিয়া পর্ব্বত উপড়ায়। হম্মীরের কাজে, (কবি-সেনাপতি) জজ্জল বলে, আমার মুখে ক্রোধানল জ্বলিতেছে, সুলতানের শীর্ষে করবাল দিয়া কলেবর ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিব।

আরও একটি কবিতায় সেনাপতি জজ্জলের উল্লেখ পাইতেছি। সেটি এই

ঢোল্ল মারিঅ ঢিল্লি মহ মুচ্ছিঅ মেচ্ছ-সরীর।
পুর জজ্জল মল্লবর চলিঅ বীর হম্বীর।
চলিঅ বীর হম্বীর পাঅ-ভর মেইণি কম্পই
দিগ-মগ ণহ অন্ধার ধুলি সুরহ রহ ঝম্পই।
দিগ-মগ ণহ অন্ধার আণু খুরসাণক ওল্লা
দলবলি দমসি বিপক্‌খ মারঅ ঢিল্লি মহ ঢোল্লা।

ঢোল মারিল দিল্লি মাঝে, ম্লেচ্ছশরীর মূর্চ্ছিত হইল; মল্লবর জজ্জলকে পুরঃসর করিয়া বীর হম্বীর চলিয়াছে। বীর হম্বীর চলিয়াছে, (তাহার) সেনার পদভরে মেদিনী কাঁপিতেছে, দিক্‌-মার্গ ও নভঃ অন্ধকার, ধুলায় সূর্য্যের রথ ঝাঁপিয়াছে। দিক্‌-মার্গ ও নভঃ অন্ধকার; খোরাসনের উল্লা আজ্ঞা দিল, দলবলে বিপক্ষ দমন কর, দিল্লি মাঝে ঢোল পিটাও। [অথবা—আজ্ঞা দিল, দিল্লি মাঝে দড়মসা, ধামসা ও ঢোল (পিটাইয়া), 'বিপক্ষ মার'।]

একটি কবিতার রচয়িতা হরিব্রহ্ম রাজমন্ত্রী চণ্ডেশ্বরের কীর্ত্তি বিবিধ চলিত উপমার সাহায্যে বর্ণনা করিয়া শেষে বলিতেছেন,

পিঅ পাঅ-পসাএ দিট্‌ঠি পুণি
ণিহুঅ হসই জহ তরুণি-জণ।
বরমন্তি চণ্ডেসর কিত্তি তুঅ
তথ দেক্‌খ হরিবম্ভ ভণ।

প্রিয়ের পাদপ্রসাদ দেখিয়া তরুণীজন যখন নিভৃতে হাসে তাহাতে, হে বরমন্ত্রী চণ্ডেশ্বর, তাহাতে তোমার কীর্ত্তির উপমা দেখিয়া হরিব্রহ্ম (এই কথা) বলিতেছে।

কাশীর রাজমন্ত্রী বিদ্যাধরের রচিত কবিতাটি এই,

ভঅ ভজ্জিত বঙ্গা　ভঙ্গু কলিঙ্গা　তেলঙ্গা রণ মুক্কি চলে
মরহট্‌ঠা ধিট্‌ঠা　লগ্‌গিঅ কট্‌ঠা　সোরট্‌ঠা ভঅ পাঅ পলে।
চম্পারণ কম্পা　পব্বঅ ঝম্পা　ওড্ডা ওড্ডি[৮] জীব হরে
কাসীসর রাণা　কিঅউ পআণা　বিজ্জাহর ভণ মন্তিবরে।

ভয়ে বঙ্গ (সৈন্য) ভাগিল, কলিঙ্গ (সেনাও) ভাগিল, তেলেঙ্গা (সেনা) রণ ছাড়িয়া চলিল, ধৃষ্ট মরাঠারা কষ্টে পড়িল, সৌরাষ্ট্র (সেনা) ভয়ে পায়ে পড়িল ; চম্পারণ (সেনা) কাঁপিয়া পর্ব্বতে লুকাইল। উড়িয়ারা উড়িয়া (পলাইয়া) জীবন রাখিল ;—(কেননা) কাশীশ্বর রাজা অভিযান করিয়াছেন। মন্ত্রিবর বিদ্যাধর (ইহা) কহিতেছে।

নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটিও বোধ হয় কাশীশ্বরের প্রশস্তি।

ভঞ্জিআ মালবা　গঞ্জিআ কাণড়া
জিন্নিআ গুজ্জরা　লুণ্ঠিআ কুঞ্জরা।
বঙ্গলা ভঙ্গলা　ওড্ডিআ মোড্ডিআ
মেচ্ছআ কম্পিআ　কিত্তিআ থপ্পিআ॥

মালব পরাজিত হইল, কর্ণাট গঞ্জিত হইল, গুর্জ্জর জিত হইল, কুঞ্জর লুণ্ঠিত হইল, বাঙ্গালা পর্য্যুদস্ত হইল, উড়িয়া বিধ্বস্ত হইল, ম্লেচ্ছেরা কম্পিত হইল, কীর্ত্তি স্থাপিত হইল।

রে গোড় থক্কন্তি তে হত্থি-জূহাই
পল্লট্টি জুজ্ঝাহি পাইক্ক-বূহাই।

রে গৌড়, তোর হস্তিযূথ থাকিতে পারে ; কিন্তু পালটিয়া (আমার) পাইক-ব্যূহের সঙ্গে যোঝ (দেখি)।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-কাহিনী বাঙ্গালাদেশে বহুকাল হইতেই চলিত আছে। প্রাকৃত-পৈঙ্গলের একটি কবিতায় আমরা শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস কাহিনীর প্রাচীনতম উল্লেখ পাইতেছি। কবিতাটি এই,

অরে রে বাহিহি কাহ্নু নাব
ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি।
তুহঁ এখণই সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি।

ওরে ও কৃষ্ণ, (তুমি) নৌকা বাহিতেছ, ডগমগ (অর্থাৎ নৌকার টলমলানি) ছাড়, (আমাদের) দুর্গতি দিও না। তুমি এখনই পার করিয়া দিয়া যা চাও তা লও।

কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই দেবতাসমাজে সম্মানের আসন পাইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাই একটি শ্লোকে। প্রাকৃত-পৈঙ্গলে কয়েকটি বিশিষ্ট মাত্রাসংস্থানের নামকরণ হইয়াছে বাঙ্গালা-দেশে (তথা পূর্ব্বভারতে) পূজিত দেবীর নাম অনুসারে। এখানে লক্ষ্মী, গৌরী, চুন্দা, মহামায়া প্রভৃতি দেবীর মধ্যে রাঈ অর্থাৎ রাধিকার উল্লেখ রহিয়াছে।

লচ্ছী রিদ্ধি বুদ্ধী লজ্জা বিজ্জা কৃথমা অ দেঈ।
গোরী রাঈ চুন্না ছাআ কান্তী মহামাঈ।

৮ প্রাপ্ত পাঠ 'ওথা ওথী' অর্থহীন।

নিম্নে উদ্ধৃত কৃষ্ণ-বন্দনা পদের ছন্দোবন্ধ ও রচনারীতি জয়দেবের ধরণের। পদটি প্রাকৃত-পৈঙ্গলের প্রথম পরিচ্ছেদের আশীর্ব্বাদী পুষ্পিকাশ্লোক।

জিণি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআসিঅ
মুট্ঠিঅরিট্ঠি বিণাস করে
গিরি হত্থ ধরে।
জমলজ্জুণ ভঞ্জিঅ পঅভর গঞ্জিঅ
কালিঅ-কুল সং- হার করে
জস ভুঅণ ভরে।
চানুর বিহণ্ডিঅ ণিঅ-কুল মণ্ডিঅ
রাহা-মুহমহু পাণ করে
জণি ভমরবরে।
সো তুম্হ ণারাঅণ বিপ্প-পরাঅণ
চিত্তহ চিন্তিঅ দেউ বরা
ভব-ভীই-হরা॥

যিনি কংশ বিনাশ করিয়া কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, মুষ্টিক অরিষ্টি বিনাশ করিয়াছিলেন, হস্তে গিরি ধরিয়াছিলেন, যমলার্জ্জুন ভঙ্গ করিয়াছিলেন, পদভরে নির্যাতন করিয়া কালিয়কুল সংহার করিয়াছিলেন, যশে ভুবন ভরিয়াছিলেন, চাণুর বিখণ্ডিত করিয়া নিজকুল মণ্ডিত করিয়াছিলেন, রাধা-মুখমধু পান করিয়াছিলেন ভ্রমরবরের মত, সেই বিপ্রপরায়ণ নারায়ণ তোমার চিত্তে চিন্তিত হইয়া ভবভীতিহর বর দান করুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আশীর্ব্বাদী পুষ্পিকা রাম-বন্দনা পদটি এই,

বপ্পঅ উক্তি সিরে জিণি লিজ্জিঅ
তেজ্জিঅ রজ্জ বণন্ত চলে বিণু
সোঅর সুন্দরি সঙ্গহি লগ্‌গিঅ
মারু বিরাধ কবন্ধ তহা হণু।
মারুই মিল্লিঅ বালি বহিল্লিঅ
রজ্জ সুগীবহ দিজ্জ অকণ্টঅ
বন্ধু সমুদ্দ বিণাসিঅ রাঅণ
সো তুহ রাহব দিজ্জউ নিব্‌ভঅ।

বিজ্ঞ যিনি বাপের উক্তি শিরে লইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনান্তে চলিয়াছিলেন, সোদর ও সুন্দরী (অর্থাৎ ভার্য্যা, যাঁহার) সঙ্গে লাগিয়াছিল, যিনি বিরাধকে মারিয়াছিলেন এবং কবন্ধকে হত্যা করিয়াছিলেন, মারুতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, বালিকে বধ করিয়াছিলেন, অকণ্টক রাজ্য সুগ্রীবকে দিয়াছিলেন, সমুদ্র বন্ধন করিয়াছিলেন, রাবণ বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই রাঘব তোমাকে নির্ভয় দিউন।

শিবগৃহিণীর গার্হস্থ্যদুঃখের বর্ণনা প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের একটি বিশিষ্ট বিষয়। সদুক্তিকর্ণামৃতের কয়েকটি শ্লোকে ইহার প্রথম আভাস পাওয়া যায়। প্রাকৃত-পৈঙ্গলের নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় ইহা স্পষ্টতর। কবিতাটি যে বাঙ্গালী কবির লেখা তাহা নিঃসন্দেহ।

বালো কুমারো ছঅ-মুণ্ডধারী
উবাঅহীণা মুই এক্ক ণারী।
অহংণিসং খাই বিসং ভিখারী
গঈ ভবিত্তী কিল কা হমারী॥

পুত্র বালক, (তাহাতে) ছয় মুণ্ডধারী (অর্থাৎ ছয় মুখে খায়), আমি একলা নারী উপায়হীনা, ভিখারী (স্বামী) অহর্নিশ বিষ খায়; আমার কি গতি হইবে (কে জানে)।

কয়েকটি কবিতায় সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সংক্ষিপ্ত বাস্তব বর্ণনা আছে। যেমন,

পুত্ত পবিত্ত বহুত্ত ধণা　　ভত্তি কুটুম্বিণি সুদ্ধমণা।
হাক্ক তরাসই ভিচ্চগণা　　কো কর বব্বর সগ্‌গমণা॥

পুত্র পবিত্র (অর্থাৎ শুদ্ধস্বভাব), বহুত ধন, কুটুম্বিনী (অর্থাৎ গৃহিণী) ভক্তিমতী ও শুদ্ধস্বভাবা, হাঁকে ত্রাসিত হয় ভৃত্যগণ; (এমন সংসারসুখ থাকিতে) কোন্ বর্ব্বর স্বর্গে মন করে।

নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটির সরসতা উপভোগ্য।

সের এক্ক জই পাঅই ঘিত্তা
মণ্ডা বীস পকাইল ণিত্তা।
টঙ্ক এক্ক জই সিন্ধব পাআ
জো হউ রঙ্ক সো হউ রাআ॥

এক সের ঘী যদি পাওয়া যায় তবে নিত্য বিশটা মণ্ডা পাকানো যায়; যদি এক টঙ্ক সৈন্ধব (অর্থাৎ লবণ) পাওয়া যায় তবে হোক সে নিঃস্ব তবুও সে রাজা।

সেকালের বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্যের একটি menu পাইতেছি এই কবিতায়,

ওগ্‌গর ভত্তা
রম্ভঅ পত্তা।
গাইক ঘিত্তা
দুদ্ধ সজুত্তা।
মোইলি মচ্ছা
নালিচ গচ্ছা।
দিজ্জই কন্তা
খা পুণবন্তা॥

ওগরা ভাত, রম্ভার পাত, গাওয়া ঘী, জুতসই দুধ (অথবা, দুগ্ধসংযুক্ত) মৌইলি (মৌরলা ?) মাছ, নালিতা গাছ (অর্থাৎ পাট শাক)—কান্তা দেয়, পুণ্যবান্ খায়।

এই তালিকায় কড়ায়ের ডাল বাদ যাওয়া উচিত হয় নাই।

চাণক্যশ্লোকের অনুরূপ নীতি-কবিতাও দুই একটি আছে। যেমন,

পাণ্ডব-বংসহি জম্ম ধরীজে
সম্পঅ অজ্জিঅ বিপ্‌পঅ দীজে।
সোই জুহিট্‌ঠির সঙ্কট পাআ
দেবঅ লিকৃখিঅ কেণ মেটাআ॥

পাণ্ডব-বংশে জন্মগ্রহণ করা হইল, সম্পদ অর্জ্জিয়া বিপ্রকে দান করা হইল ; সেই যুধিষ্ঠির সঙ্কট পাইল, (সুতরাং) দৈবের লিখিত কে খণ্ডন করিতে পারে।

অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠে রচিত কৃষ্ণলীলাগীতির প্রভাব যে সমসাময়িক সংস্কৃত সাহিত্যেও পড়িয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ জয়দেবের গীতগোবিন্দ। গীতগোবিন্দের পদগুলি যে আদৌ প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে লেখা হইয়াছিল এমন মনে করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই। বরং উল্‌টা প্রমাণ আছে। জয়দেবের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কবি ক্ষেমেন্দ্র জয়দেবের ধরণের একটি ছোট পদ লিখিয়াছিলেন সংস্কৃতে। এটিও কৃষ্ণলীলাবিষয়ক। ক্ষেমেন্দ্রের পদটি এই

ললিতবিলাসকলাসুখখেলন- ললনালোভনশোভনযৌবন-
মানিতনবমদনে,
অলিকুলকোকিলকুবলয়কজ্জল- কালকলিন্দসুতাবিবলজ্জল-
কালিয়কুলদমনে।
কেশিকিশোরমহাসুরমারণ- দারুণগোকুলদুরিতবিদারণ-
গোবর্দ্ধনধরণে,
কস্য ন নয়নযুগং রতিসঙ্গে[৯] মজ্জতি মনসিজ তরলতরঙ্গে
বররমণীরমণে ॥[১০]

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া গেলে বিরহিণী গোপীরা এই গান গাহিয়াছিল।

---

৯ মুদ্রিত পাঠ 'সজ্জে'। ১০ দশাবতারচরিত্র ৮-১৭৩।

[খাপছাড়া]
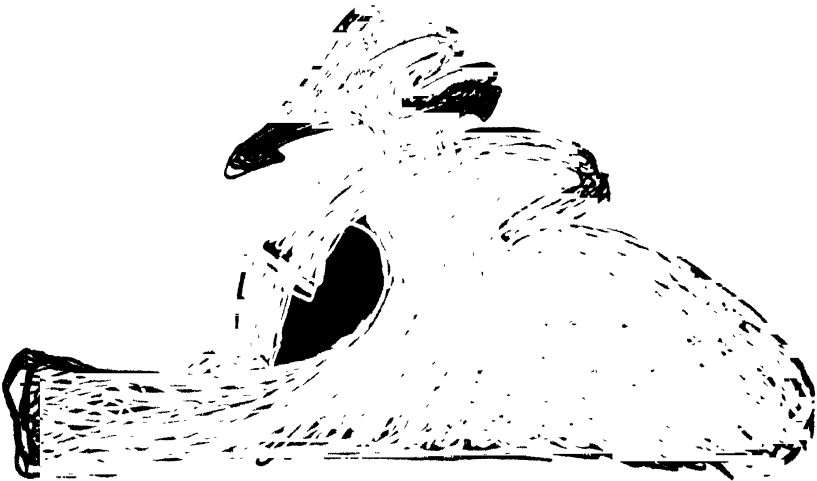
চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত

বিশ্বভারতী পত্রিকার গত সংখ্যায় (বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫১) চন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চিঠিপত্র ছাপা হইয়াছে। সম্প্রতি, চন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠির অনুলিপি ঠাকুর-পরিবারের 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি'তে পাওয়া গিয়াছে; নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল। এই প্রসঙ্গে গত সংখ্যায় প্রকাশিত চন্দ্রনাথ বসুর ১৭ই আষাঢ় ১২৯৮ ও ২রা ফাল্গুন ১২৯৮ তারিখের চিঠি দুইখানি দ্রষ্টব্য।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চন্দ্রনাথ বসুর আরও দুইখানি চিঠি ১৩২৫ আশ্বিনের সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২১ শ্রাবণ ১২৯৮

হিতবাদীতে অকালবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা পড়িয়া আপনি সন্তুষ্ট হন নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু বিষয়টা এমন যে তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বিরোধী মতাবলম্বীর পক্ষে সন্তোষজনক না হইবারই কথা। আপনার পত্রে প্রকাশ পাইল আপনি একটা ভারি ভুল বুঝিয়াছেন। যৌক্তিকতা এবং তার্কিকতা এক নহে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। চৈতন্য তার্কিককে পাষণ্ড বলিয়াছিলেন; তাহা বলিয়া তিনি যে পৃথিবী হইতে যুক্তি নির্ব্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা নহে। পূর্ব্বে আমি তার্কিকের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলাম বলিয়া যে আমার প্রকৃতি যুক্তিবিরোধী এবং অকালবিবাহ লেখায় তাহাই প্রমাণ করিতেছে এরূপ কথা সুযুক্তির পরিচায়ক নহে বরং কুতর্কের দৃষ্টান্তস্থল। অকালবিবাহ প্রবন্ধে আমি যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলাম আমার অদৃষ্টক্রমে তাহা যদি আপনার দৃষ্টিগোচর না হইয়া থাকে তবে পুনর্ব্বার দ্বিতীয় চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আপনার প্রশ্নের মর্ম্ম এই যে অকাল বিবাহে যদি সুসন্তান উৎপাদনের ব্যাঘাত করে তবে বাঙ্গলাদেশে চৈতন্য, রামমোহন রায় এবং ন্যায়শাস্ত্রের উদ্ভব হইল কি করিয়া?— উত্তর এই, প্রশ্নটি কিঞ্চিৎ অসঙ্গত হইয়াছে। বিচিত্র ভৌতিক আধ্যাত্মিক সামাজিক ঐতিহাসিক কারণে বড়লোকের আবির্ভাব হয় তাহার সমস্ত রহস্য কাহারো জানা নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে প্রশ্ন নিতান্তই নিষ্ফল। যে ব্যক্তি অকাল বিবাহের অনিষ্টকারিতা আলোচনা করিতেছে সে কেবল মানবরচনার একটিমাত্র কারণের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে তদতিরিক্ত সহস্র ব্যাপারের জন্য তাহার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা সঙ্গত নহে। প্রত্যেক মানবের উপর নানা অনুকূল এবং প্রতিকূল শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে; অনুকূল শক্তি সংখ্যায় অধিক হইয়া জয়ী হইল বলিয়া যে প্রতিকূল শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কোন বিশেষ মাতাল সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হইল বলিয়া যে মদের অনিষ্টকারিতা অপ্রমাণ হইয়া যাইবে তাহা নহে; কারণ মিতপায়িতাই স্বাস্থ্যরক্ষার একমাত্র কারণ নহে।

শত শত বর্ষপ্রবাহের মধ্যে লক্ষ কোটি লোকের জন্ম মৃত্যুর মধ্যে একটি রামমোহন রায় কিম্বা একটি চৈতন্য যে কি কি দুর্লক্ষ্য কারণপুঞ্জের সংঘটনে জন্মগ্রহণ করেন তাহা এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে নাই। বিজ্ঞান কেবল দেহতত্ত্ব বিচার করিয়া এই কথা বলে যে, অপরিণত জরায়ুতে অপরিণত

বীর্য্যোৎসেক, সন্তান হীনবীর্য্য হইবার অন্যতম কারণ। প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যদি কেহ তাহার প্রকৃত প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হন তবে নিশ্চয়ই তিনি বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীতে খ্যাতিলাভ করিতে পারিবেন এবং তাহার পর হইতে বঙ্গদেশীয় গৃহকোণযুদ্ধের একটি পালা অবিসম্বাদে সাঙ্গ হইয়া যাইবে।

অনেক সময়েই তর্কস্থলে সুযুক্তি কুযুক্তির মধ্যে প্রভেদ এই যে একটি আমার যুক্তি এবং অপরটি অন্যের যুক্তি। অতএব আপনি যেমন আমার উত্তরকে অযৌক্তিক স্থির করিয়াছেন আমি যদি আপনার প্রশ্নকে সেইরূপ অযৌক্তিক জ্ঞান করি দোষ লইবেন না।

আমি কাহাকে কীর্ত্তি বলি এবং না বলি সেকথা পূর্ব্বে আমার মুখে শুনিয়া তাহার পরে যদি আপনি স্বমত ব্যক্ত করিতেন তবে আমার আর কোন ক্ষোভ থাকিত না। কিন্তু এ কথা লইয়া আমার কোন লেখায় আমি কোন আলোচনা করি নাই। এই প্রথম আপনার প্রমুখাৎ শুনিলাম যে আমি কাব্য প্রভৃতি ভাবপ্রকাশকে কীর্ত্তি বলি না কর্ম্মকেই কীর্ত্তি বলি। এই কীর্ত্তি শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয় হইতেই যদি আপনার ধারণা দৃঢ় হইয়া থাকে যে আমার য়ুরোপীয় ছাঁচের প্রকৃতি, তবে শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন আপনার উক্ত ধারণা সমূলক নহে অনেকটা কাল্পনিক।

আমার লেখায় হিন্দু ছাঁচের প্রকৃতি দেখা দেয় কি য়ুরোপীয় ছাঁচের প্রকৃতি দেখা দেয় তাহার নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই। কারণ, আজকাল আমরা যেন একটি যুগপরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান আছি। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বল্লালসেন হইয়া উঠিয়া নিজ নিজ ঘরগড়া আদর্শ অনুসারে হিন্দু অহিন্দু শ্রেণী নির্ণয়পূর্ব্বক তাহাই কেবল গলার জোরে দেশের লোকের উপর জারি করিবার চেষ্টা করিতেছি। আশ্চর্য্য নাই কালক্রমে পরিবর্ত্তনবিপ্লব শান্ত হইয়া বুদ্ধি স্থির হইলে দেখা যাইবে যথার্থ হিন্দু প্রকৃতির সহিত য়ুরোপীয় প্রকৃতির তেমন বিরোধ নাই, কেবল বর্ত্তমানকালের হীনদশাগ্রস্ত ভারতের নির্জ্জীব গোঁড়ামি ও কিম্ভূতকিমাকার বিকৃত হিন্দুয়ানীই যথার্থ অহিন্দু। অতএব একথা লইয়া আপনি অধিক কষ্ট পাইবেন না। এ বিষয়ে আপনার মত আপনি লালন করুন এবং আমার মত লইয়া আমি থাকি— এ কথার সিদ্ধান্ত দূরে থাক্ তর্ক করিবারও সময় হয় নাই।

আপনি রামায়ণ হইতে প্রমাণ করিতেছেন যে ১৬ বৎসর বয়সে রামের বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন বিচার্য্য বিষয় তাহা নহে। রামের কোন্ বয়সে সন্তান জন্মিয়াছে তাহাই সন্ধান করা আবশ্যক। আমার প্রবন্ধের শেষ প্যারাগ্রাফে আমি এ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করি নাই। কেবল চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিবার পূর্ব্বে গুটিকতক আলোচ্য বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছি মাত্র।

মুদ্রণপ্রমাদ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৯	১৫	বৈশাখ	শ্রাবণ
১১১	২৮	"তিনি"[৫]	"তিনি"[১]
১১১	পাদটীকা	৫।	৪।

বেঙ্গল ওয়াটার-প্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

AKB/I কলিকাতা • নাগপুর • বোম্বাই
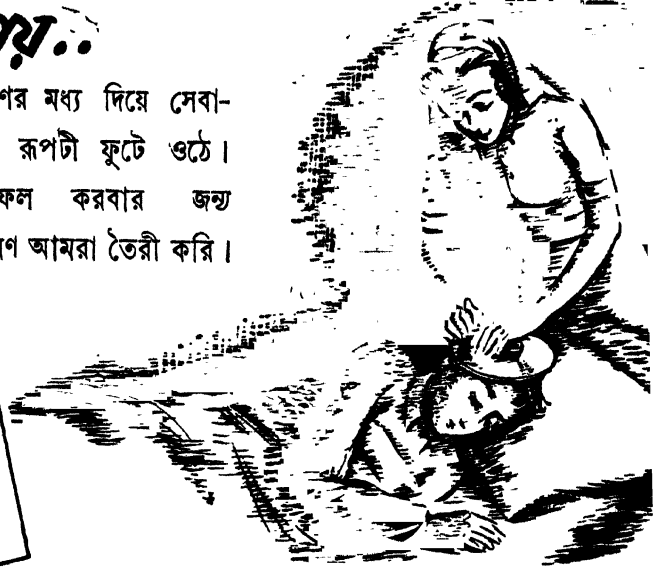
জীবন বীমাপত্র

বর্তমান যুদ্ধসঙ্কট ও আর্থিক বিপর্যয়ের দিনে ভবিষ্যতের জন্য সাধ্যমত সঞ্চয় করা সকলেরই কর্তব্য। একটী জীবন বীমাপত্র দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক আর তেমনই লাভজনক। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সকে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দিয়া আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন।

মিঃ জে, সি, দাশ, বি, এস্‌সি, (ইউ, এস, এ,) আর, এ,
চেয়ারম্যান

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"তুমি অলকে
কুসুম না দিও
শুধু
শিথিল কবরী
বাঁধিও"—
হিমকল্যাণের
কল্যাণ পরশ ফুটিয়ে
তোলে এর বাস্তব রূপ
HIMKALYAN HAIR OIL
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস··কলিকাতা

চা স্পৃহ চঞ্চল
চাতক দল চল
চল হে···
রবীন্দ্রনাথ
টসের চা
সর্ব্বত্র পাওয়া
যায়
এ টস এণ্ড সন্স
কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
প্রকাশক শ্রীবিনোদচন্দ্র চৌধুরী
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাঘ-চৈত্র ১৩৫১

আপনার কলম
চালু রাখুন

আপনি কি লিখতে স্বুরু করেছেন? মনে রাখবেন ভাষা প্রাঞ্জল করতে আপনাকে লেখার সময় বিরক্ত হলে চলবে না; বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় করতে আপনাকে নতুন ভাবের সমাবেশ করতে হবে; আর দৃষ্টিভঙ্গীর নতুনত্ব রাখতে আপনার দৃষ্টি জাগ্রত রাখতে হবে। শুধু ভাষার উপর দখল নিয়ে আর নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আপনি লেখনীর গতি দ্রুত করতে পারবেন না। কলমের উপর দখল রপ্ত হলেও ভালো কালির দরকার শেষ হয় না। তাই পি, এম, বাকচীর "আইডিয়াল" কালি আপনাদের প্রয়োজন মেটাতে বাজারে রয়েছে।

পি. এম. বাকচি এণ্ড কোং, কলিকাতা

S-J/15/B

কোথায় অন্ন, কোথায় বস্ত্র
কোথায় আনন্দ, কোথায় উৎসব আজ বাঙলা দেশে? দেশবাসীরা আজ নিরন্ন, বস্ত্রহীন! এই দুর্দ্দিনে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য যতদূর সম্ভব সকলকে সস্তায় কাপড় দেওয়া। আমাদের পৃষ্ঠ-পোষক ও বন্ধুদের পূজার সম্ভাষণ জানাবার সঙ্গে এই-কথাও জানাতে চাই যে সকল অবস্থাতেই আমরা দেশের বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত।
মহালক্ষ্মী
কটন মিল্‌স্‌ লিমিটেড
MCK 40
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌
এইচ্‌ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৫ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৫১

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

প্রতি সংখ্যা এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। বিশ্বভারতী পত্রিকা এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়স্বরূপ হইবে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হইবে।

সম্পাদনা-সমিতি

সম্পাদক : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সদস্যবর্গ :

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য — শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন — শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

শ্রাবণ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। বৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়—শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র ও বৈশাখ-আষাঢ়। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। বার্ষিক মূল্য রেজেস্ট্রী ডাকে ৫।০। বিশ্বভারতীর সদস্যগণ পক্ষে ৪।০। চিঠিপত্র, প্রবন্ধাদি ও টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণীয় :

কর্মাধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা
বিশ্বভারতী কার্যালয়
৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

টেলিফোন : বড়বাজার ৩২৯৫

প্রতিকৃতি
প্যাস্‌টেল্‌

শিল্পী শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৫১

সেদিন চৈত্রমাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রহরশেষের আলোয় রাঙা
    সেদিন চৈত্রমাস—
তোমার চোখে দেখেছিলাম
    আমার সর্বনাশ।
এ সংসারের নিত্য খেলায়
প্রতিদিনের প্রাণের মেলায়
বাটে ঘাটে হাজার লোকের
    হাস্য পরিহাস—
মাঝখানে তার তোমার চোখে
    আমার সর্বনাশ।

আমের বনে দোলা লাগে,
    মুকুল পড়ে ঝ'রে—
চিরকালের চেনা গন্ধ
    হাওয়ায় ওঠে ভ'রে।
মঞ্জরিত শাখায় শাখায়
মউমাছিদের পাখায় পাখায়
ক্ষণে ক্ষণে বসন্তদিন
    ফেলেছে নিশ্বাস—
মাঝখানে তার তোমার চোখে
    আমার সর্বনাশ।

রবীন্দ্রভবনস্থ পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। প্রথম চার ছত্র চার-অধ্যায় গ্রন্থে আছে।

স্ফুলিঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমারে হেরিয়া চোখে
মনে পড়ে শুধু, এই মুখ যেন
দেখেছি স্বপ্নলোকে।

২

কোন্ খ'সে-পড়া তারা
মোর প্রাণে এসে খুলে দিল আজি
সুরের অশ্রুধারা।

৩

এসেছিনু নিয়ে শুধু আশা।
চলে গেনু দিয়ে ভালোবাসা।

৪

অবোধ হিয়া বুঝে না বোঝে,
করে সে একি ভুল!
তারার মাঝে কাঁদিয়া খোঁজে
ঝরিয়া-পড়া ফুল।

৫

যখন গগনতলে
আঁধারের দ্বার গেল খুলি
সোনার সংগীতে উষা
চয়ন করিল তারাগুলি।

৬

ফুল কোথা থাকে গোপনে,
গন্ধ তাহারে প্রকাশে।
প্রাণ ঢাকা থাকে স্বপনে,
গান যে তাহারে প্রকাশে।

৭

বর্ষণগৌরব তার
গিয়েছে চুকি,
রিক্তমেঘ দিক্‌প্রান্তে
ভয়ে দেয় উঁকি।

৮

আয় রে বসন্ত, হেথা
কুসুমের সুষমা জাগা রে
শান্তি স্নিগ্ধ মুকুলের
হৃদয়ের গোপন আগারে।
ফলেরে আনিবে ডেকে
সেই লিপি যাস রেখে,
সুবর্ণের তুলিখানি
পর্ণে পর্ণে যতনে লাগা রে।

৯

বাতাসে শুধায়, "বলো তো, কমল,
তব রহস্য কী যে।"
কমল কহিল, "আমার মাঝারে
আমি রহস্য নিজে।"[১]

১০

বাতাসে তাহার প্রথম পাপড়ি
খসিয়া পড়িল যেই,
অমনি জানিয়ো, শাখায় গোলাপ
থেকেও আর যে নেই।

১১

মৃত্তিকা খোরাকি দিয়ে
বাঁধে বৃক্ষটারে।
আকাশ আলোক দিয়ে
মুক্ত রাখে তারে।[১]

১২

স্মৃতিকাপালিনী পূজারতা একমনা।
বর্তমানেরে বলি দিয়া করে
অতীতের অর্চনা।[১]

১৩

যুগে যুগে জলে রৌদ্রে বায়ুতে
গিরি হয়ে যায় ঢিবি।
মরণে মরণে নূতন আয়ুতে
তৃণ রহে চিরজীবী।

১৪

ধরণীর খেলা খুঁজে
শিশু শুকতারা
তিমিররজনীতীরে
এল পথহারা।
উষা তারে ডাক দিয়ে
ফিরে নিয়ে যায়,
আলোকের ধন বুঝি
আলোকে মিলায়।

১৫

তুমি যে তুমিই, ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।[১]

লেখন-এর সমসাময়িক বা তাহার পরবর্তী এরূপ বহু শ্লোক-কবিতা এ পর্যন্ত কবির কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। বিভিন্ন পত্রিকা ও পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলন করিয়া এগুলির একটি সংগ্রহ স্ফুলিঙ্গ নাম দিয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই এরূপ কবিতা যদি কাহারও সংগ্রহে থাকে ও জানান, উহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। বর্তমান সংখ্যার কবিতাগুলি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি হইতে শ্রীকানাই সামন্ত কর্তৃক সংকলিত হইয়াছে।

১ লেখন-এ ইহার ইংরেজি আছে।

ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিত

২

কটক [ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩]

একে ত ভারতবর্ষীয় ইংরেজগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে, তারা স্বভাবতই আমাদের বড় অবজ্ঞার ভাবে দেখে, আমাদের উপর তাদের কানাকড়ির সিম্প্যাথি নেই, তার উপরে আবার তাদের কাছে নিজেকে exhibit করা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। এমন কি, ওদের থিয়েটার প্রভৃতি আমোদের স্থলে এবং দোকানেও আমার পারৎপক্ষে ঢুকতে ইচ্ছে করে না— (কেবল থ্যাকারের দোকান ছাড়া)। ইংরেজের ঘরে যত বড় গোরুই জন্মাক না কেন সে যে আমাদের দেশের সকল লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে সেটা মনের ভিতর বড় আঘাত করে। আমাদের মধ্যে একটা কোন পদার্থ আছে এটা যতক্ষণে ওরা স্বীকার না করবে ততক্ষণ ওদের কাছে যেতে গেলে হয় অবনতি স্বীকার করে যেতে হবে, নয় অপমান অনুভব করতে হবে। এক এক সময় আমাদের দেশের লোকের উপর আমার এমন অসহ্য রাগ হয়! ইংরেজগুলোকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না বলে নয়, কিন্তু কোন বিষয়ে কিছু করচে না বলে—এমন একটা কিছুই নেই যাতে আপনার মর্য্যাদা দেখাতে পারচে। মনের মধ্যে সে লক্ষ্যমাত্র নেই—কেবল ইংরেজের কুড়োনো পেথম লেজে গুঁজে অদ্ভুত ভঙ্গীতে নেচে নেচে বেড়াতে একটুখানি লজ্জা কিম্বা হীনতা অনুভব করে না। এরা দেশের লোককে কিছু শেখাতে চায় না, দেশের ভাষাকে অবজ্ঞা করে, যে কোন বিষয়ে ইংরেজের চোখ পড়ে না সে সকল বিষয়ে উদাসীন— এরা মনে করে কন্‌গ্রেস করে সকলে মিলে দুই হাত তুলে গবর্মেণ্টের দোহাই পেড়ে এরা বড়লোক হবে। [আমি ত বলি যতদিন না আমরা একটা কিছু করে তুলতে পারব ততদিন আমাদের অজ্ঞাতবাস ভাল। কেননা আমরা যখন সত্যই অবমাননার যোগ্য তখন কিসের দোহাই দিয়ে পরের কাছে আত্মসম্মান রক্ষা করব? তাদের মত অবিকল পেথম নাড়তে শিখলেই কি হবে? পৃথিবীর মধ্যে যখন আমাদের একটা কোন প্রতিষ্ঠাভূমি হবে, পৃথিবীর কাজে যখন আমাদের একটা কোন হাত থাকবে তখন আমরা ওদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইতে পারব। ততদিন লুকিয়ে থেকে চুপ মেরে আপনার কাজ করে যাওয়াই ভাল। দেশের লোকের ঠিক এর উল্টো ধারণা— যা কিছু ভিতরকার কাজ, যা গোপনে থেকে করতে হবে, সে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে, যেটা নিতান্ত ক্ষণিক অস্থায়ী আস্ফালন এবং আড়ম্বর মাত্র, সেইটেতেই তাদের যত ঝোঁক। আমাদের এ বড় হতভাগা দেশ। এখানে মনের মধ্যে কাজ করবার বল রাখা বড় শক্ত। যথার্থ সাহায্য করবার লোক কেউ নেই। যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে একটুখানি প্রাণ সঞ্চয় করা যায় এমন মানুষ দশ বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি পাওয়া যায় না—কেউ চিন্তা করে না, অনুভব করে না, কাজ করে না; বৃহৎ কার্য্যের, যথার্থ জীবনের কোন অভিজ্ঞতা কারো নেই, বেশ একটি পরিণত মনুষ্যত্ব কোথাও পাওয়া যায় না। সমস্ত মানুষগুলো যেন উপছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাচ্চে দাচ্চে আপিস যাচ্চে ঘুমচ্চে, তামাক টানচে, আর নিতান্ত নির্ব্বোধের মত বক্ বক করে বকুচে। যখন ভাবের কথা বলে তখন সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ে আর যখন যুক্তির কথা

পাড়ে তখন ছেলেমানুষী করে। যথার্থ মানুষের একটা সংস্রব পাবার জন্যে মানুষের মনে ভারি একটা তৃষ্ণা থাকে, ইচ্ছা করে মানুষের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান দ্বন্দ্বপ্রতিদ্বন্দ্ব চলে—কিন্তু সত্যিকার রক্তমাংসের শক্তসমর্থ মানুষ ত নেই—সমস্ত উপছায়া, পৃথিবীর সঙ্গে অসংলগ্নভাবে বাষ্পের মত ভাসচে।][১] আমাদের দেশে যার মাথায় দুটো চারটে আইডিয়া আছে তার মত সঙ্গীহীন একক প্রাণী দুনিয়ায় আর নেই বোধহয়। কি কথা থেকে কি কথা উঠল তার ঠিক নেই,—কিন্তু এ আমার অন্তরের আক্ষেপ; জীবনের অনেকটা অবসাদ এই মানুষের অভাবে।

কটক। ১০ই ফেব্রুয়ারি [১৮৯৩]

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে। আমি একে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগুলোকে দেখতে পারি নে তার উপরে আবার কাল ডিনার টেবিলে তাদের রূঢ় স্বভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। এখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল একটা উৎকট ইংরেজ—প্রকাণ্ড নাক, ধূর্ত্ত চোখ, দেড় হাত চিবুক, গোঁপ দাড়ি কামানো, মোটা গলা, র-অক্ষরবিহীন জ্যাব্‌ড়ানো উচ্চারণ—সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা পূর্ণপরিণত জনবুষ। সে আমাদের দেশের লোকের উপর বড্ড লেগেছিল। জানিস বোধ হয় গবর্মেণ্ট আমাদের দেশের জুরি প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল বলে চারদিকে ভারি একটা আপত্তি উঠেচে। লোকটা জোর করে সেই বিষয়ে কথা তুলে বো-বাবুর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। বললে এ দেশের moral standard low—এখানকার লোকের lifeএর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হবার যোগ্য নয়।[২] আমার যে কি রকম করছিল সে তোকে কি বলব! আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত কথাই মনে এল কিন্তু তখন যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিলুম। ভেবে দেখ্ দেখি, একজন বাঙ্গালীর নিমন্ত্রণে এসে বাঙ্গালীর মধ্যে বসে যারা এ রকম করে বলতে কুণ্ঠিত হয় না তারা আমাদের কি চক্ষে দেখে! আর কেন! সিম্প্যাথি চুলোয় যাক্ গে, যারা আমাদের সঙ্গে ভদ্রতা করাও বাহুল্য বিবেচনা করে, তাদের কাছে আমরা হেসে হেসে ঘেঁষে ঘেঁষে যেচে মান কেঁদে সোহাগ কেন নিতে যাই? ওদের একটুখানি অনুগ্রহের করস্পর্শ পেলেই অমনি কেন আমাদের সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বান্তঃকরণ একতাল jelly পিণ্ডের মত আহ্লাদে টল্ টল্ থল্ থল্ করে দুলে ওঠে! উঃ, ওদের কি গর্ব, কি অবজ্ঞা! আর, আমাদের কি দৈন্য, কি হীনতা! অপমান চুপ করে সয়ে থাকাই যথেষ্ট হেয়, কিন্তু তার উপরে আবার ওদের কাছে গায়ে পড়ে আদর কাড়তে যাওয়া আমার বোধহয় অবনতির একশেষ! আমাদের এই দরিদ্র উপেক্ষিত অপমানিত ভারতবর্ষকে আমরা বুকের কাছে টেনে নিই, এর যত দোষ যত দুর্ব্বলতা যত মালিন্য আছে সমস্ত অন্তরের সঙ্গে মার্জ্জনা করতে এবং একান্ত যত্নে মার্জ্জন করতে চেষ্টা করি—এর সমস্ত ভাব সমস্ত ব্যবহার আমাদের মনের সঙ্গে ঠিক মিলচে না বলে একে যেন হৃদয় থেকে দূর না করি! আমাদের স্বদেশ যদি কোন ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ আমাদের দূরে রাখতে চেষ্টা করে তাহলে অম্‌নি তখনি বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা কেন সরে যাই, আর সাহেবরা প্রকাশ্যভাবে আমাদের সহস্রবার করে লাথি ঝাঁটা মারে তবু ত এই না-ছোড়বান্দার দলকে কিছুতেই তাদের চরণতল তাদের দ্বারপ্রান্ত থেকে নির্ম্মুক্ত করে

১ বন্ধনীবদ্ধ অংশ 'কটক, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩' চিহ্নিত হইয়া ছিন্নপত্র গ্রন্থে প্রকাশিত।

২ দ্রষ্টব্য "অপমানের প্রতিকার" (১৩০১), 'রাজা ও প্রজা'; "ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত" (১৩১০), 'স্বদেশ'।

ফেলতে পারে না। যেখানে জুতো পরে' যেতে দেয় না সেখানে জুতো খুলে যাই, যেখানে মাথা তুলে যেতে দেয় না সেখানে সেলাম করতে করতে ঢুকি, যেখানে আমাদের স্বজাতির প্রবেশ নিষেধ সেখানে সাহেবের ছদ্মবেশ পরে হাজির হই। ওরা চায় না ওদের সভায় গিয়ে আমরা বসি, ওদের আমোদে গিয়ে আমরা যোগ দিই—ওদের কাজের মধ্যে আমরা হস্তক্ষেপ করি, কিন্তু তবু আমরা চেষ্টা করে, ফিকির করে, সুযোগ বুঝে, খোষামোদ করে, আপনার লোককে দূরে রেখে, স্বজাতির নিন্দায় যোগ দিয়ে, স্বদেশের সমস্ত অবমাননা পরিপাক করে যে কোন প্রকারে হোক ওদের একটু সংস্রব পেলে বেঁচে যাই। আমি এক্সেপ্‌শন্ সাজ্‌তে চাইনে—যদি আমাদের জাতের প্রতি তোমাদের কোন শ্রদ্ধা না থাকে, তাহলে আমি সভ্যমি করে তোমাদের পুষ্যি হতে যেতে চাইনে। আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতির সঙ্গে আমার সেই স্বজাতির মধ্যে থেকে আমার যা কর্তব্য তা করব, সে তোমাদের চোখেও পড়বে না তোমাদের কানেও উঠবে না। তোমাদের উচ্ছিষ্ট তোমাদের আদরের টুক্‌রোর জন্যে আমার তিলমাত্র প্রত্যাশা নেই আমি তাতে পদাঘাত করি! মুসলমানের শূকর যেমন, তোমাদের আদর আমার পক্ষে তেমনি। তাতে আমার জাত যায়। সত্যি জাত যায়—যাতে আত্মাবমাননা করা হয় তাতেই যথার্থ জাত যায়—নিজের কৌলীন্য এক মুহূর্ত্তে নষ্ট হয়ে যায়, তারপরে আর আমার কিসের গৌরব! যে আপনার অন্তরের যথার্থ সম্মান নষ্ট করে' বাইরের জাঁকজমক কেনে তাকে যেন আমরা কিছুমাত্র সম্মান না করি। আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে জীর্ণতম কুটীরের মলিনতম চাষীকে আমি আমাদের আপনার লোক মনে করতে কুণ্ঠিত হব না, আর যারা ফিট্‌ফাট্ কাপড় পরে dogcart হাঁকায় আর আমাদের নিগার বলে তারা যতই সভ্য যতই উন্নত হোক আমি যদি কখনো তাদের সংস্রবের জন্যে লালায়িত হই তবে যেন আমার মাথার উপরে জুতো পড়ে। কাল আমার বুকের ভিতরে মাথার ভিতরে এমনি কষ্ট হচ্ছিল যে কিছুতেই সমস্ত রাত ঘুমতে পারিনি—কেবল এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্ করেছি। যখন ড্রয়িংরুমের এক কোণে এসে বসলুম আমার চোখে সমস্ত ছায়ার মত ঠেকছিল—আমি যেন আমার চোখের সামনে সমস্ত বৃহৎ ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছিলুম, আমাদের এই গৌরবহীন বিষণ্ণ হতভাগ্য জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসেছিলুম—এমন একটা বিপুল বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল সে আর কি বলব। অথচ চোখের সামনে ইভ্‌নিং ড্রেসপরা মেমসাহেব এবং কানের কাছে ইংরিজি হাস্যালাপের গুঞ্জনধ্বনি, সবসুদ্ধ এমনি অসঙ্গত! আমাদের চিরকালের ভারতবর্ষ আমার কাছে কতখানি সত্যি, আর এই ডিনার টেবিলের বিলিতি মিষ্টি হাসি ইংরিজি মিষ্টালাপ আমাদের পক্ষে কত ফাঁকা কত ফাঁকি কি সুগভীর মিথ্যে! মেয়েরা যখন মৃদুমিষ্টি সাধা গলায় কথা কচ্ছিল তখন আমার ভারতবর্ষের ধন তোদের আমি মনে করছিলুম। তোরা ত এই ভারতবর্ষের।[৩]

কটক। মঙ্গলবার [মার্চ, ১৮৯৩]

তুই যা বলেছিস্ আমার সঙ্গে তার মতের কোন অনৈক্য নেই। তোকে কি লিখেছিলুম কিছু মনে নেই, হয়ত মনের আক্ষেপে কিছু বেশি মাত্রায় বলে থাক্‌ব। কিন্তু আমার মত হচ্ছে এই যে, এখন বহুকাল আমাদের অজ্ঞাতবাস বিজনবাস আবশ্যক। এখন আমাদের প্রস্তুত হবার সময়, এই অসম্পূর্ণ

৩ এই চিঠির সার সংকলিত হইয়াছে ছিন্নপত্র গ্রন্থের 'কটক, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩' চিহ্নিত পত্রে।

অবস্থায় নিজেকে সকলের চোখের সাম্‌নে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবার কাল নয়। যে সময় গঠন হতে থাকে সেই সময়টা অত্যন্ত গোপনীয় সময়। নিতান্ত কিশোর বয়সের বালকবালিকাদের যেমন প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের আমোদপ্রমোদ এবং কার্য্যসভায় সর্ব্বদা আত্মপ্রকাশ করতে দিলে তাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়; দুটো একটা ক্লেভার কথা কয়ে, বয়োজ্যেষ্ঠদের কৌতুকজনক অনুকরণ করে', বাহবা এবং প্রশংসাহাস্য পেয়ে তারা মনে করে, আমরা সম্পূর্ণতা লাভ করেছি, আমরা আমাদের জ্যেষ্ঠতাতদেরই সমকক্ষ—তেমনি আমাদের জাতীয় কৈশোর বয়সে আমরাও যদি দুটো একটা বাহ্য চাকচিক্য, দুটো একটা ইংরিজি ধরণধারণ ভড়ং এবং চটুলতা দেখিয়ে ছোটখাট বাহবা এবং সভাপ্রান্তে একটু আধটু স্থান লাভ করি তাহলে আমাদের ভ্রম হবে যে, আমাদের সব হয়ে গেছে; যে সমস্ত আশু পুরস্কারহীন কঠিন কাজ, দুরূহ কর্ত্তব্য, একান্ত প্রাণসমর্পণ ব্যতীত জাতির চরিত্র গঠিত হয় না সেগুলোকে অনাবশ্যক এবং তুচ্ছতর মনে হবে। একটা উদাহরণ দেখ্‌না, যে সমস্ত পেট্রিয়ট ভাল ইংরিজি বক্তৃতা করে একবার বাহবা পেয়েছে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যকে সে কত উপেক্ষা করে। তার ইংরিজি বক্তৃতায় যে ক্ষণিক উপকারটুকু হয় সেই উপেক্ষার তুলনায় তা কত সামান্য। ইণ্ডিয়া অথবা বেঙ্গল কৌন্সিলে আসন পাবার সম্মান যে একবার পেয়েচে সে তার তুলনায় সমাজের ভিতরকার কাজ করাকে কত তুচ্ছ জ্ঞান করে! ইংরেজ সেজে যে ইংরেজের টেবিলের ধারে একটুখানি বস্‌তে পেয়েছে স্বজাতির হৃদয় পাবার জন্য তার ঔদাসীন্য কি সুগভীর! এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক বলেই আমাদের বেশি সতর্ক হওয়া উচিত। আমি জানি, গবর্ণর সাহেব যদি দুদিন আমার তেতালায় গিয়ে আমার সেই বড় কেদারায় হেলান দিয়ে আমাকে মাই ডিয়ার বলে' আধখানা চুরোট ফুঁকে আসে তা হলে আমি যে এই এহেন রবি আজ মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের মত অগ্নিচক্র হয়ে উঠেছি আমাকেও সেই ল্যান্স্‌ডাউনের ম্লেচ্ছাধরোৎক্ষিপ্ত একটিমাত্র ধূম্রকুণ্ডলীতে পূর্ণগ্রাস করে দিতে পারে। তখন আমার মুখমণ্ডল ব্যাপ্ত করে কি একটি পরিতৃপ্ত হাস্য এবং আমার সমস্ত ভাষার উপর মধুরতার দ্রবধারা চিটেগুড়ের মত লিপ্ত হয়ে যায়! সেই ত প্রধান আশঙ্কা! সেইজন্যেই ত তেতালার ছাত বন্ধ করে রাখা আবশ্যক (পাছে আমাদের গবর্ণর সাহেব তাঁর পরমবন্ধু ট্যাগোরের টিনের ছাতের নীচে চুরোট খেতে আসেন!)! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবার সময় পাণ্ডবরা এক বৎসর অজ্ঞাতবাস যাপন করেছিলেন—গুরুগোবিন্দ তাঁর গুরুপদ গ্রহণ করবার পূর্ব্বে বহুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জ্জনে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমাদের এখন সেই সময়। এখন যদি গা-ঢাকা দিয়ে নিজের কর্ম্মশালার মধ্যে বসে গভীর গম্ভীর নিবিষ্ট ভাবে নিজের লোক ও নিজের সমাজের কাজ না করি—যদি একবার আপনার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হতে দিই, সম্পূর্ণতা লাভ করবার পূর্ব্বেই ক্রমাগত নিজের অসমাপ্ত কাজ দেখিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহবা নেবার ইচ্ছে করি, তাহলে কিছুই হবে না। গাছ যেমন রৌদ্রে পুষ্ট হয় কিন্তু বীজ তাতে শুকিয়ে মৃতভাবে থাকে সেই রকম কর্ম্মের প্রথম আরম্ভ বাহিরের নিন্দা প্রশংসা ও আঘাতব্যাঘাতের যোগ্য নয়—খানিকটা পরিণত হলে তবে সে মাটির বাহিরে আসে, রৌদ্র বৃষ্টি গ্রহণ করে এবং সেই উপায়েই শক্ত হয়ে ওঠে। ইংরেজ আমাদের নিন্দা করুক প্রশংসা করুক্ যাই করুক্, আমাদের প্রতি বিমুখ হোক্ বা প্রসন্ন হোক্, সেদিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করে' আমাদের উপেক্ষিত দেশ আমাদের উপেক্ষিত ভাষা আমাদের অপমানিত লোকদের কাজে জীবন সমর্পণ করতে হবে। যেখানে কেবল অপমান, উপেক্ষা এবং অখ্যাতি সেই অন্ধকার নিম্নদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করা কি

সহজ কথা! খ্যাতিসম্মানের বিলাসে একবার অভ্যস্ত হলে কি আর দৈন্যের মধ্যে টেঁকা যায়! তখন ক্রমাগত মনে হয় কিসে আমার বইটা ইংরেজে পড়বে। কিসে আমার পৃষ্ঠদেশে ইংরেজে চাপড় মারবে। কিসে আমার ঘৃণিত দেশের লোক আমাকে তার স্বজাতীয় বলে' সন্দেহ না করে, এবং কিসে ইংরেজ আমাকে আমাদের দেশের মহৎ এক্সেপ্‌শন্ বলে' গ্রহণ করে। যারা ইংরেজ-সংসর্গসম্মানের স্বাদ একবার পেয়েচে তারা যে সেটাকে বহুমূল্য জ্ঞান করে সেজন্যে আমি তাদের দোষ দিইনে— এ আকর্ষণ এ প্রলোভন খুব গুরুতর সন্দেহ নেই কিন্তু সেই জন্যেই আমি নিজের কোটরে লুকোতে চাই। * * * রাজা যে স্বদেশে বসে রাজত্ব করার চেয়ে সিম্‌লায় গিয়ে সাহেবের সঙ্গে টেনিস্ খেল্‌তে এবং মেমের সঙ্গে নাচতে ভালবাসে—সাহেব মেমেরা তাকে দ্বারভাঙ্গার রাজার চেয়ে ঢের বেশি প্রশংসা করে, বলে যে একজন ইংরেজের সঙ্গে এর কোন প্রভেদ নেই—এখন তার পক্ষে * * * বসে রাজত্ব করা কি কম কঠিন! আমি হলেও হয়ত ঠিক ঐ রকম হতুম—আমিও বাঙ্গালী—আমারও স্বাধীন তেজ নেই। সেইজন্যেই সেটা গোপনে সঞ্চয় এবং বহুযত্নে পালন করতে হবে—সেটা যতক্ষণে না সবল ও আত্মরক্ষণক্ষম হয়ে উঠবে ততদিন তাকে অন্তরালে রেখে কাঠখড় যোগাতে হবে। তারপরে আর কাউকে ভয় করিনে, তারপরে আর নিজের জন্যে লজ্জা নেই—এখন নিজেকে বিশ্বাস নেই।

কটক। সোমবার। [মার্চ ১৮৯৩]

পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়িতে প্রশংসালাভ করে আমি খুসি হয়েছি কি-না তুই জিজ্ঞাসা করেছিস। তোকে সমস্ত কথা খুলে লিখিনি বলে তোর এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়েচে। তবে বিস্তারিত বিবরণটা দেওয়া যাক। প্রথমে যখন বিহারী বাবুরা[৪] পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর call করতে আমাকে অনুরোধ করলেন তখন আমি অনেক ইতস্তত করেছিলেম, কিন্তু তাঁরা আশ্বাস দেওয়াতে এবং ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমি অনিচ্ছাস্বত্বেও রাজি হলুম। দুখানি কার্ডে আমার নাম লিখে বিহারী বাবুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। তাঁদের সঙ্গে কার্ড ছিলনা— তাঁরা খবর পাঠিয়ে ছিলেন এবং আমার কার্ড দুটোও সেই সঙ্গে পাঠালেন। মিনিট পাঁচেক পরে খবর এল— তার পরদিন সকালে এলে সাহেবের সঙ্গে মুলাকাৎ হবে। বিহারী বাবু মিসেস গুপ্ত অবাক হয়ে গেলেন। আমরাও সুড় সুড় করে ম্যাজিষ্ট্রেটের দরজা থেকে বেরিয়ে চলে গেলুম। বিহারী বাবুরাও মহা বিরক্ত। হেনকালে সন্ধ্যের সময় চিঠি এল যে মিসেস ওয়াল্‌স্ (ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম ওয়াল্‌স্) ভারি দুঃখিত। জজসাহেব এবং তাঁর মেমসাহেব যে খবর পাঠিয়েছিলেন তাঁর চাপরাশি সে কথা তাঁকে জানায়নি। আমিও তাই মনে করেছিলুম। কিন্তু এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে এই যে, ম্যাজিষ্ট্রেট যদিও জজসাহেবকে অমান্য করতে চায় না— কিন্তু কোন "নেটিভ" ভদ্রলোক গেলে তাকে তার পরদিন সকালবেলা মুলাকাৎ করতে আসতে বলে।—বোধহয় মিসেস ম্যাজিষ্ট্রেটকে কার্ড পাঠানো স্পর্দ্ধা মনে করে। অবিশ্যি বলতে পারে সেদিন তার সময় নেই— কিন্তু তাঁর নির্দ্দিষ্ট সময়মত সময় করে আমি যে সেলাম করতে আসব তিনি এমনি কি নবাবের পুত্র! অবিশ্যি আমাদেরই দেশের লোকের দোষ— তারা পেটের দায়ে মানের দায়ে উমেদারী করতে সেলাম করতে যায়, সাহেবের আদিষ্ট সময়ে দ্বারদেশে অপেক্ষা করে থাকে— সুতরাং আমি বঙ্গনামধারী এক ব্যক্তি যে আস্ফালন করে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর সামাজিক কর্ত্তব্যরক্ষাস্বরূপ 'কল' করতে যাব এ তাদের মনেও উদয় হয়নি। সুতরাং এ নিয়ে

৪ বিহারীলাল গুপ্ত

সাহেবের উপর অভিমান করতে বসা আমার পক্ষে নিতান্ত বাড়াবাড়ি হয়। কিন্তু এ কথা মনে স্বতই উদয় হয়, ওদের কাছে সোহাগ করে লৌকিকতা করতে যাওয়া ঝকমারির একশেষ। আমি যতই ভদ্রলোক এবং সম্ভ্রান্ত লোক হই না কেন ওদের কাছে তার কোন মূল্য নেই। যতক্ষণ না আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব ঘুচিয়ে ফেলে ওদের প্রদত্ত একটা কৃত্রিম সম্মান পরিধান করব ততক্ষণ ওদের কাছে আমার কোন আমল নেই। এই দেখ্ না কেন, আমাদের দেশের ব্যারিষ্টারেরা যতই ইংরেজসোহাগপ্রিয় বিলিতি মেজাজী হোক না কেন তাঁরা ত এ দেশে এসে সাহেবদের সঙ্গে তেমন কুটুম্বিতে করে উঠতে পারেন না। তাঁরা ত বার লাইব্রেরীরও মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্করেখার মত একটি স্বতন্ত্র কৃষ্ণসীমার মধ্যে স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করেন। কাজ কি বাপু আমাদের এমনি কি দায় পড়েচে! আমাদের নিজের ঘরে এতই কি অতিষ্ঠ হয়েছি! আমাদের কৃষ্ণকুটুম্বরা যতই কৃষ্ণ হোক না কেন তাঁরা ত আর আমাদের চেয়ে কৃষ্ণতর নন। যতক্ষণ ইংরেজ আমাকে আমাদের জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্মান করে ততক্ষণ সে সম্মান আমার অপমান এবং অগ্রাহ্য।— পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট পরদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করলে আমি কি তাতে ভারি খুসি হয়েছিলুম? তা মনেও করিস নে। নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে বড় বেশি স্পষ্টরূপ অভিমান প্রকাশ করা হয় এবং তাতে যথার্থ অভিমানের খর্ব্বতা হয়— তাছাড়া বিহারী বাবুদের বিশেষ ক্ষুন্ন করা হয়। তাই খেতে গেলুম, ম্যাজিষ্ট্রেটের শ্যালীর পাণিগ্রহণ করে সহাস্য মুখে টেবিলে বসলুম— সমুদ্রতীরদৃশ্যের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে পাশ্ববর্তিনীর সঙ্গে একমত হলুম এবং পুরীতে সমুদ্রবায়ুপ্রবাহ জন্য গ্রীষ্মের অনাধিক্যবশতঃ আনন্দ প্রকাশ করলুম।[৫] তারপরে গান শুনলুম, গান শোনালুম, তালি দিলুম এবং তালি পেলুম। এই যে বাহবাটুকু পাওয়া যায় একি যথার্থ হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে? এ কি কতকটা কৌতূহলপরিতৃপ্তি নয়? আমাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জীবের মুখে আমাদের কোন খাবারটি একটু রুচিজনক মনে হয় তাই কি পরীক্ষা করে দেখা নয়? সত্যি কি আমার যা ভাল লাগে ওদের তাই ভাল লাগে? এবং ওদের যা ভাল লাগেনা তাই বাস্তবিক ভাল নয়? তাই যদি না হয় তবে শুভ্র করতলের তালিতে আমার এতই কি সুখ হবে? ইংরেজের তালিকে যদি আমরা অতিরিক্ত মূল্য দিতে আরম্ভ করি তাহলে আমাদের দেশের অনেক ভালকে ত্যাগ করতে এবং ওদের দেশের অনেক মন্দকে গ্রহণ করতে হয়। তাহলে পায়ের মোজাটি খুলে বেরতে আমাদের হয়ত লজ্জা হবে কিন্তু ওদের নাচের কাপড় পরতে লজ্জা হবে না। আমাদের দেশের শিষ্টাচার সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করতে কিছুই সঙ্কোচ হবে না এবং ওদের দেশের কোন প্রচলিত অশিষ্টাচারও অম্লানমুখে গ্রহণ করতে পারব। আমাদের দেশের আচকানকে সম্পূর্ণ মনের মত ভাল দেখতে নয় বলে ত্যাগ করব কিন্তু ওদের দেশের টুপিকে বদ দেখতে হলেও শিরোধার্য্য করব। শুভ্র হস্তের করস্পন্দন ও করতালি আমাদের পক্ষে বড় ভয়ানক— ওতে আমরা অতি সামান্য বাহ্য সম্মান পাই, কিন্তু আমাদের যথার্থ আত্মসম্মান তলে তলে নষ্ট করে ফেলে। আমরা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে ঐ করতালির নির্দ্দেশমত আপনার জীবনটা গঠিত করতে থাকি এবং তাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র করে ফেলি। আমি নিজেকে সম্বোধন করে বলি— "হে মৃৎপাত্র ঐ কাংস্য পাত্রের কাছ থেকে দূরে থেকো; ও যদি রাগ করে তোমাকে আঘাত করে তাতেও তুমি চূর্ণ হয়ে যাবে, আর ও যদি সোহাগ করে' তোমার পিঠে চাপড় মারে 'তাতেও তুমি ফুটো হয়ে অতলে মগ্ন হয়ে যাবে—

[৫] পরবর্তী অংশ 'কটক, মার্চ, ১৮৯৩' চিহ্নিত হইয়া ছিন্নপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব বৃদ্ধ ঈশপের উপদেশ শোন, তফাৎ থাকাই সার কথা। উনি থাকুন বড় ঘরে, আর আমার সামান্য ঘরে সামান্য পাত্রের হয়ত ছোটখাট কাজ আছে— কিন্তু সে যদি আপনাকে ভেঙ্গে ফেলে তবে তার বড় ঘরও নেই ছোট ঘরও নেই, তবে সে মাটির সমান হয়ে যাবে। তখন হয়ত আমাদের বড় ঘরওয়ালা ঐ খণ্ড জিনিষটিকে তাঁর ড্রয়িংরুমের ক্যাবিনেটের এক পার্শ্বে সাজিয়ে রাখতে পারেন— সে কিন্তু ক্যুরিয়সিটির স্বরূপে— তার চেয়ে ক্ষুদ্র গ্রামের কুলবধূর কক্ষে বিরাজ করেও গৌরব আছে।"

কটক। মঙ্গলবার [মার্চ, ১৮৯৩]

সুরি* বেচারা একজামিন পাস্ করবার জন্যে সৃষ্ট হয়নি। ওর উচিত ছিল আমার মত পাস্-কাটানো "লিটারেরি" হওয়া—কিন্তু তার পক্ষে একটা ব্যাঘাত হয়েচে এই যে, ও যেমন আপনার ইজিচেয়ারটির মধ্যে নিমগ্ন হয়ে দিব্যি আরামে আছে—ওর মনটিও তেমনি ওর অন্তঃকুহরটির মধ্যে দিব্যি গট্ হয়ে বসে আছে, তার অগাধ সন্তোষ কিছুতেই বিচলিত হয় না। আমরা কুনো অকর্ম্মণ্য এবং সংসারের সকল বিষয়ে অকৃতকার্য্য বটে কিন্তু আমাদের মনটা কুনো নয়—সে সর্ব্বদাই উড়ুউড়ু করচে, তাকে এক মুহূর্ত্ত বেঁধে রাখা দায়। ঐটেই হচ্চে ক্ষ্যাপামির প্রধান লক্ষণ। সুরির কোন ক্ষ্যাপামি নেই, ও ভারি স্নিগ্ধ। প্রকৃতির মুখশ্রীতে যেমন একটা গভীর নিশ্চিন্ত ত্বরাহীনতার ভাব আছে, ওর সেই রকম। আমার মত নিত্য-অস্থিরস্বভাবের লোকের পক্ষে নির্জ্জন প্রকৃতি এবং সুরির মত অচল সুস্থিরতার সংসর্গ ভারি আবশ্যক। ও যখন ওর স্বাভাবিক শান্ত স্নিগ্ধভাবে আমাকে ওর বাহুর দ্বারা বেষ্টন ক'রে ধরে, আমার সমস্ত ছট্‌ফটানির চারদিকে যেন একটি বাঁধ তুলে দেয়। এক একজন লোক আছে যারা কোন কিছু না করলেও যেন আশাতীত ফল দান করে— সুরি সেই দলের লোক। ও যে খুব পাস করবে, প্রাইজ পাবে, লিখবে, বড় কাজ কিম্বা ভাল চাকরি করবে, তা যেন তেমন আবশ্যকই মনে হয় না—মনে হয় যেন কিছু না করলেও ওর মধ্যে একটা চরিতার্থতা আছে। অধিকাংশ লোককেই অকর্ম্মণ্য হয়ে থাকা শোভা পায় না, তাতে তাদের অপদার্থতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু সুর কিচ্ছুই না করলেও ওকে কেউ অযোগ্য বলে ঘৃণা করতে পারবে না। কাজকর্ম্মের ব্যস্ততা মানুষের পক্ষে একটা আচ্ছাদনের মত। সমস্ত কমন্‌প্লেস্ লোকের সেটা ভারি আবশ্যক, তাতে তাদের দৈন্য তাদের শীর্ণতা ঢাকা পড়ে—কিন্তু যারা স্বভাবতই পরিপূর্ণ প্রকৃতির লোক তারা সমস্ত কর্ম্মাবরণমুক্ত হলেও একটি শোভা এবং সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারে। সুরির মতন অমন ষোল আনা শৈথিল্য আর কোন ছেলের দেখলে নিশ্চয় অসহ্য বোধ হত—কিন্তু সুরির কুঁড়েমিতে একটি মাধুর্য্য আছে। সে আমি ওকে ভালবাসি বলে নয়—তার প্রধান কারণ হচ্চে চুপচাপ বসে থেকেও ওর মনটি বেশ পরিণত হয়ে উঠ্‌চে এবং ওর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ওর কিছুমাত্র ঔদাসীন্য নেই। যে কুঁড়েমিতে মূঢ়তা এবং অন্যের প্রতি অবহেলা ক্রমাগত স্ফীত হয়ে গোলগাল তেলচুক্‌চুকে হয়ে উঠতে থাকে সেইটেই যথার্থ ঘৃণ্য। সুরি সাহেব একটি সহৃদয় এবং সুবুদ্ধি আলস্যের দ্বারা যেন মধুররসসিক্ত হয়ে আছে। যে গাছে সুগন্ধ ফুল ফোটে সে গাছে আহার্য্য ফল না ধরলেও চলে। আমি প্রায়ই মাঝে মাঝে এ কথা ভাবি যে, আমার যদি কবিত্ব প্রভৃতি দুই একটা স্বাভাবিক শক্তি না থাকত, তা হলে আমার মত অসহ্য কণ্টকময় নিষ্ফলতা পৃথিবীতে অল্পই পাওয়া যেত। আমিও জন্ম-অকর্ম্মণ্য, কিন্তু লেখবার শক্তি স্বাভাবিক থাকাতে আমি এ যাত্রা একরকম ক'রে ত'রে গেলুম। নইলে তোরা আমাকে কেউ কিচ্ছু ভালবাসতে পারতিস্ নে। সে

* সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি নিশ্চয় জানি। সুরিকে যে সকলে ভালবাসে সে ওর কোন কাজের দরুণ, ক্ষমতার দরুণ, চেষ্টার দরুণ নয়—ওর প্রকৃতির অন্তর্গত একটি সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্যের দরুণ। কিন্তু সংসার পুরুষমাত্রেরই কাছে স্বভাবনির্ব্বিচারে কাজ প্রত্যাশা করে—সেইজন্যে এক একবার ইচ্ছে করে সুরি যদি কোন একটা নাড়া খেয়ে আর একটু সচেতন সচেষ্ট হয়ে উঠতে পারে—আমাদের জন্যে নয়, বাইরের লোকের জন্যে। যখন বাইরের লোক জিজ্ঞাসা করবে "আপনি কি করেন?" তখন সুরেন কেন উত্তর দেবে "কিচ্ছু করিনে!" তারা তো ওর মর্য্যাদা বুঝতে পারবে না। ওর মধ্যে একটি সহজ সরল মহত্ত্ব আছে যে জন্যে ও ওর সমস্ত আত্মীয় এবং বন্ধুর কাছে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, যে জন্যে পরিচিতদের কাছে ও একটি দৃষ্টান্তস্বরূপে কাজ করে—কিন্তু পুরুষ মানুষ যতক্ষণ না সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে ততক্ষণ তার সম্পূর্ণ সার্থকতা নেই। তা বলে কি করা যাবে? সকলের ত সব হবার শক্তি নেই। সুরি যা আছে তাতেই আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তোদের যে আত্মীয়রূপে কাছে পেয়েছি এজন্যে আমি তোদের উপর যেন কৃতজ্ঞ আছি। তোরা যে আমার কত উপকার করেছিস্ তা আমিই জানি। যারা ভাল তাদের ভালবাসার যে কত মূল্য তা তারা নিজে জানে না। তুই আর সুরি আমাকে যে ভালবাসিস্, এ আমি যদিও আশাও করি তবু আমার কাছে যেন ভারি আশ্চর্য্যের মত মনে হয়। ভাল করে ভেবে দেখলে আপনাকে কোন ভাল জিনিষেরই যোগ্য মনে হয় না, সবগুলিই বিশেষ অনুগ্রহ—এত অনায়াসে এত পাই যে তারা যে কি অপরিমেয় অপরিসীম তা বুঝতে পারিনে, তবু যদি একটু কিছু কম পড়ে তবে সেটাকে ভারি একটা অন্যায় বঞ্চনা মনে হয়! মানুষের অযোগ্যতার সেই একটা প্রধান লক্ষণ—অকৃতজ্ঞতা।'

কলিকাতা। ১৬ই মার্চ্চ [১৮৯৩]

অনেকদিন পরে আজ একটুখানি রোদ্দুর দেখা দিয়েছে—বাঁচা গেছে—এতদিন মেঘ্‌লা দিনগুলো যেন কালো ভিজে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়েছিল, আজ বেশ একখানি বসন্তী রংয়ের কাপড় পরে প্রফুল্ল সুস্থ মুখে বেরিয়ে এসেছে। মনে কর্, চৈত্রমাস পড়েছে তবু এবার কিচ্ছু গরম পড়েনি—দিনের বেলায় মোটা চাপকান জোব্বা পরে থাকি এবং রাত্রিকালে শালকম্বল মুড়ি দিই—খোলা ছাতে নক্ষত্রালোকে দক্ষিণে বাতাসে সতরঞ্চ পেতে জটলা করা কল্পনাতেও উদয় হয় না। সকলেই বল্‌চে, এরকম অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার এদেশে কখনো ঘটেনি। বর্ষার সময় বর্ষা হল না, শীতের সময় যথেষ্ট শীত নেই, এমন শোনা গেছে, কিন্তু বাঙ্গলাদেশের গর্ম্মিকে ফাঁকি দেওয়া বড় আশ্চর্য্য কথা।

কলকাতা। ৬ই এপ্রিল [১৮৯৩]

মো[৮]—র সঙ্গে আজকাল আমার মাঝে মাঝে নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়, আমার বড় ভাল লাগে। এই রকম আলোচনা করবার জন্যে আমার মন অনুক্ষণ তৃষিত হয়ে থাকে। এই হতভাগা জনশূন্য দেশে মনটা যেন নিশিদিন উপবাসী হয়ে আছে—কেবল ভিতর থেকে আপনাকে আপনি আহার করচে। কে বা জীবন ধারণ করে, কে বা ভাবে, কে বা কথা কয়—কেই বা প্রতিবাদ করে, কেই বা উৎসাহ দেয়, কেই বা তোমার কথা শোনে, কেই বা তোমার ভাব বোঝে— কেই বা অন্তরের মধ্যে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা

---

৭ এই চিঠির একাংশ ছিন্নপত্রে মুদ্রিত আছে : কটক, মার্চ ১৮৯৩, "এক-একজন লোক আছে" ইত্যাদি।

৮ মোহিতচন্দ্র সেন?

করে। কেউ বা আমোদ করচে, কেউ বা আলস্য করচে, কেউ বা আপিসে যাচ্চে, মানুষের মন ব'লে যে একটি প্রাণী আছে সেটা যে শুকিয়ে শুকিয়ে আধমরা হয়ে যাচ্চে তার জন্যে কারো কানাকড়ির মাথাব্যথা নেই। আমি আজ সকালে প্রি[৯]—বাবুর ওখানে গিয়েছিলুম, অনেকটা যেন আহার পান করে আসা গেল।

কলকাতা। ২২শে জুন [১৮৯৩]

তুই আমাকে সেদিনকার চিঠিতে খোঁটা দিয়েছিস্, বিয়ে প্রভৃতি বিষয় আমরা কিছু বেশি থিওরেটিক্যালি দেখি—তোর সে কথাটা আমি ইতিমধ্যে অনেকবার ভেবে দেখেছি, এবং সবিশেষ পর্য্যালোচনা করে তার সত্যতা সম্বন্ধে আমার মনে আর কোন সন্দেহ নেই। বাস্তবিক, আমার মত লোক পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিষ কিছু দূর থেকে দেখে। স্বভাবত প্রত্যেক বিষয়টাই চিন্তা করে দেখতে চায়। মন জিনিষটা বুলস্-আই লণ্ঠনের মত। যে সময়ে যে পদার্থের উপর চিন্তার আলোক নিক্ষেপ করে তার পাশের জিনিষটাকে দেখতে পায় না। এমন কি সেটাকে আরো দ্বিগুণ অন্ধকার করে দিয়ে কেবল একটি জিনিষকেই অতিরিক্ত জাজ্বল্যমান করে তোলে। এরকম করে দেখার বিস্তর দোষ। আশপাশের সঙ্গে বেশ মিলিয়ে জুলিয়ে দেখলে সব জিনিষই চোখে এবং মনে একরকম সহ্য বোধ হয়—বৃহৎ সংসারের একটি অংশকে সমস্ত বৃহৎ সংসারের সঙ্গে যোগ করে দেখলে তাকে আর তেমন গুরুতর বলে বোধ হয় না। স্ব[১০]—র বিয়ের সম্বন্ধে আমি যে সব ফিলজফাইজ্ করেছিলুম সেটা কোন কাজেরই না। সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই আছে, কোনটা একেবারে অতিরিক্ত পরিমাণে নেই—মোটের উপরে দুটি নরনারী পরস্পরের জীবনে গ্রন্থি বদ্ধ করে মিলে মিশে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবারই কথা—পৃথিবীটা পৃথিবীর চেয়ে বেশি নয়, এই মনে রেখে সমস্ত মিলিয়ে দেখলে হিসেবে কিছু কমি দেখা যায় না। এই দেখ্ না স্ব—রা বেশ আনন্দেই আছে—অবশ্য এ উচ্ছ্বাস কিছুদিন বাদে কমে আসবে, তখন অভ্যাসবন্ধনে স্নেহবন্ধনে বদ্ধ হয়ে জীবনটি বিস্তৃত ব্যাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে থাকবে। আমাদের মত লক্ষ্মীছাড়া "চিন্তাশীল" লোকেরা এইটে ঠিক্‌টি বুঝতে পারে না। আমরা নিজের সম্বন্ধেও কেবল চিন্তা করে কল্পনা করে নিজেকে ব্যর্থ বিফল করে ফেলেছি—প্রত্যেক খণ্ড অবস্থাই আমাদের কাছে বড় বেশি প্রাধান্য ধারণ করে। সুখ অত্যন্ত অধিক সুখ হয় এবং দুঃখ একান্ত তীব্র হয়ে ওঠে কিন্তু জীবনের যে প্রধান সুখ প্রধান শান্তি আপনার আদ্যোপান্তের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য একটি ঐক্য সেটি নেই—তাই জন্যে অবিশ্রাম এই খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন সুখদুঃখের উপর দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে জীবন একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে—মনে হয় সুখ দুঃখ আর কিছুই চাইনে, এখন দীর্ঘকালের জন্যে যদি প্রশান্ত নিশ্চেষ্টভাবে এই উদার উন্মুক্ত সুন্দর শান্ত প্রকৃতির উপর পড়ে পড়ে রোদ্ পোহাতে পারি তাহলে বাঁচা যায়। কিন্তু যারা মন পদার্থের দ্বারা অতিমাত্র উৎপীড়িত নয়, পৃথিবীতে কোন অবস্থাতেই তাদের বিশেষ আশঙ্কা নেই—তারা সুখী হবেই, সুখী করবেই, এবং জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ। আমার এই জীর্ণ হৃদয়ের রুগ্ন চিন্তাগুলো প্রকাশ করে সংসারটা তোদের কাছে অমূলক বিভীষিকাপরিপূর্ণ করে তোলা ভয়ানক অন্যায়। তোদের জন্যে পৃথিবীতে অনেক সুখ, জীবনে অনেক নব নব দৃশ্য এবং নব নব পরিবর্ত্তন আছে—সে সমস্ত তোরা আনন্দমনে পূর্ণ হৃদয়ে ভোগ করতে পারবি।

---

৯ প্রিয়নাথ সেন ১০ স্বর্ণপ্রভা দেবী ?

প্রাচীন ভারতে নারীর আদর্শ ও অধিকার

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

২

মধ্যযুগের সাধক-সন্তদের মধ্যেও অনেক নারী ছিলেন। ক্ষেমা, পদ্মাবতী, দাদূর কন্যা নানীবাঈ ও মাতাবাই সাধনার রাজ্যে প্রখ্যাত। ভক্তিমতী করমা ও মীরাবাঈর কথা তো সর্বজনবিদিত। প্রেমের ও ভক্তির গানে মীরার সমতুল্য কেহ নাই। তারপর প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বেকার সহজোবাঈ দয়াবাই প্রভৃতি নারী আছেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে যোধপুরে তপস্বিনী অজনেশ্বরী, বীকানীরে গৌরাঁজী, জনাবাঈ, মহারাষ্ট্রদেশে কৃষ্ণানদীতটনিবাসিনী সখূবাঈ, পাণ্ঢরপুরের কানহূ পাত্রা, পুনাতে বাবাজান, মহিশূরে শান্তিবাঈ, মধ্যপ্রদেশে মায়াবাঈ, নামদেবের পরিচারিকা প্রভৃতি ছিলেন। কয়েক শতাব্দী পূর্বে সুফী সাধিকা বাউরী সাহিবা এক সাধকের ধারা প্রবর্তন করেন। বাল্যকালে আমরা কাশীতে বরুণাসঙ্গমে তপস্বিনী মাতাজীকে দেখিয়াছি। রাধাস্বামী সম্প্রদায়ে মহারাজ সাহেব পণ্ডিত ব্রহ্মাশঙ্কর মিশ্রের ভগ্নী মাহেশ্বরী দেবীকে সকলে তপস্বিনী মহারানী বূআজী (পিসিমা) বলিতেন। তিনি কাশীর কন্যা, কাজেই আমাদের দেখা শোনা ছিল। পরমহংস দেবের স্ত্রী সারদেশ্বরী দেবী বহুলোককে সাধনা দিয়াছেন। ভারতের বাহিরের বহু নারী ভক্ত আছেন, তাঁহাদের নাম আর করিলাম না। কাজেই দেখা যাইতেছে, ভারতে চিরদিনই নারীদের প্রতি সর্বসাধারণের চিত্তে একটি শ্রদ্ধার ভাব চলিয়া আসিতেছে। যদি কোনো ব্যবস্থাপক ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াও থাকেন তবু সাধারণের মধ্যে নারীমাহাত্ম্যের গৌরব তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সেই মহাভারতের যুগেও দেখি পরিবারে নারীর বিলক্ষণ সম্মান ছিল (বিরাট, ৩, ১৭)। তাই যদিও আদিপর্বে একবার দুহিতাকে "কৃচ্ছ্র" (আদি, ১৫৯, ১১) বলা হইয়াছে তবু পুত্রের চেয়ে কন্যাকে কেহ কম করিয়া দেখেন নাই। ভীষ্ম বলেন, পুত্র তো নিজেরই স্বরূপ, কন্যাও পুত্রেরই সমতুল্য, এই আত্মস্বরূপ ইহাঁরা থাকিতে কেন ধন অন্যে পাইবে?—

> যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
> তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ॥ মহা, অনুশাসন। ৪৫, ১১,

কন্যারা যে রীতিমতই উত্তরাধিকারিণী সে কথা ভীষ্ম স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গেলেন, কন্যা থাকিতে অন্যের কোনো অধিকারই নাই।

তাই পুত্রের মত কন্যাদেরও রীতিমত জাতকর্মাদি মহাভারতের যুগে অনুষ্ঠিত হইত (আদিপর্ব ১৩০, ১৮)। সাবিত্রীর জন্মের পরেও জাতক্রিয়াদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল (বনপর্ব, ২৯২, ২৩)। ভার্যারূপেও নারীরা সেই যুগে যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছেন।—

> অর্ধং ভার্যা মনুষ্যস্য ভার্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
> ভার্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥ আদি। ৭৪, ৪১

ইহার পরও ৪২-৪৭ শ্লোকে এবং ৫১ শ্লোকে ভার্যারই মাহাত্ম্য কীর্তিত। অনুশাসন পর্বে নারীদের

স্বাধীনতাসংকোচের কথা বলিয়াও নারীদের যে সৎকার করিতে হইবে ও সর্বক্ষেত্রে তাঁহারাই যে শ্রী, এই কথা বলিতে মহাভারত বাধ্য হইয়াছেন (৪৬, ১৫)। শান্তিপর্বের ১৪৩ তম অধ্যায়টি আগাগোড়াই ভার্যাপ্রশংসা।

রামায়ণেও দারাকে আত্মা বলা হইয়াছে (অযোধ্যা, ৩৭, ২৪)। অর্থাৎ, পত্নীকে পতি অপরজ্ঞানে হীন দৃষ্টিতে বা নীচভাবে দেখিতে পারিবেন না।

মহাভারতের যুগে নারীদের অধিকারের বিরুদ্ধে কেহ কেহ কিছু কিছু বলিলেও সামাজিক জীবনে নারীদের অনেক অধিকারই দেখা যায়। রাজকন্যাদের তখন প্রায়ই স্বয়ংবর প্রথায় বিবাহ হইত। সাবিত্রী, দময়ন্তী, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি অনেকেরই বিবাহে কন্যারা নিজেরাই বর বরণ করিয়াছেন। এই স্বয়ংবর প্রথায় নারীর অধিকার কিরূপ ছিল জানিতে হইলে বনপর্বে ২৯২ তম অধ্যায়ে সাবিত্রীর প্রতি তাঁহার পিতার প্রদত্ত উপদেশগুলি দেখা উচিত (৩২-৩৬ শ্লোক)। যম ও সাবিত্রীর মধ্যে যে কথাবার্তা তাহাও (বনপর্বের ২৯৬ তম অধ্যায়) পড়া উচিত।

স্বয়ংবর প্রথাতেই বুঝা যায়, তখন যুবতীবিবাহই সমধিক চলিত ছিল। বালিকাবিবাহ যে ছিল না তাহা নহে তবে যুবতীবিবাহই তখন বেশি প্রচলিত ছিল। তখনকার বৈদিক মন্ত্রাদিতেও ইহাই বুঝা যায়। মনু তো নারীদের বিষয়ে খুবই সাবধানে বিধান দিয়াছেন। তবু তিনি অপাত্রকে কন্যাদানের চেয়ে ঋতুমতী কন্যা যাবজ্জীবন ঘরে থাকাও ভাল বলিয়াছেন (৯, ৮৯)। এখানে টীকাকার মেধাতিথি বলিয়াছেন, ঋতুর পূর্বে কন্যাকে দিবে না, যাবৎ গুণবান বর না মেলে।—

প্রাগ্ ঋতোঃ কন্যায়া ন দানম্…
যাবদ্ গুণবান্ বরো ন প্রাপ্তঃ।

যুবতীদের বিবাহে অনেকসময় জাতিভেদ প্রভৃতি অনুশাসন পালিত হইত না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমার জাতিভেদ পুস্তকে এই বিষয়ে আমি বহু আলোচনা করিয়াছি। বৌদ্ধদের মধ্যে তো জাতিভেদের এত মানামানিই ছিল না। কোশলপতি পসেনাদি দাসীকন্যা মল্লিকাকে বিবাহ করেন। বণিককন্যা দেবীর গর্ভেই অশোকের পুত্র মহিন্দ ও সংঘামিত্তার জন্ম। শিকারীদের রাজকন্যার সহিত সাধু উপদের বিবাহ হয়। সর্দারপুত্র শার্দূলকর্ণের সহিত ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ ঘটিয়াছিল।

আবার মাঝে মাঝে আভিজাত্যগর্বিত রাজকুলে ভাইবোনে যে বিবাহ হইত বৌদ্ধদের কথায় তাহা দেখা যায়। রাজা ওক্কারের চারিপুত্র। তাঁহাদের সমান অভিজাতকন্যা কোথাও আর মিলিল না বলিয়া চারি ভাই চারিটি বোনকে বিবাহ করেন। লাঢ়রাজ সিংহবাহুও ভগ্নীকে বিবাহ করেন। অজাতশত্রুর স্ত্রী বজিরা ছিলেন তাঁর মামাতো বোন। আনন্দের স্ত্রী উৎপলবর্ণা ছিলেন তাঁর পিসতুত বোন। মগধের এক গৃহপতি আপন মামাতো বোন সুজাতাকে বিবাহ করেন। পুণ্ডকাভর পত্নী সুবন্নপালী ছিলেন তাঁহার মামাতো বোন। লঙ্কার রাজকন্যা চিত্তার বিবাহ হয় তাঁর মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে। বেদে যম-যমী ছিলেন ভাইবোন। কুন্তী ছিলেন বসুদেবের ভগ্নী—

স্বসারং বসুদেবস্য শত্রুসৈন্যবিমর্দিনঃ।
কুন্তিরাজসুতাং কুন্তীং সর্বলক্ষণপূজিতাম্। মহাভারত, আদি। ১৫১, ২৪

কাজেই বসুদেব হইলেন অর্জুনের মামা। সেই মাতুলের কন্যা সুভদ্রাকে দেখিয়াই অর্জুন কন্দর্পাহত হইলেন।

দৃষ্ট্বৈব তাম্ অর্জুনস্য কন্দর্পঃ সমজায়ত। আদি। ২১৯, ১৫

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অবস্থা দেখিয়া সুভদ্রার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "যদি তুমি ইহাকে চাও তবে আমি পিতাকে বলি।"—

যদি তে বর্ততে বুদ্ধির্বক্ষ্যামি পিতরং স্বয়ম্॥ ঐ। ১৭

অর্জুন বলিলেন, "যদি তোমার এই ভগ্নী আমার মহিষী হন তবে আমার পরম উপকার করা হয়।"—

কৃতমেব তু কল্যাণং সর্বং মম ভবেদ্ ধ্রুবম্।

যদি স্যান্ মম বার্ষ্ণেয়ী মহিষীয়ং স্বসা তব॥ ঐ। ১৯

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তবে স্বয়ম্বরে কাজ নাই, কারণ তাহাতে ফল সংশয়িত। বরং তুমি ইহাকে হরণ কর। ক্ষত্রিয়দের তাহাতে দোষ নাই।" (আদিপর্ব, ২১৯, ২১—২৩)। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সব কথা জানানো হইলে তিনিও ইহা সমর্থন করিলেন।—

শ্রুত্বৈব চ মহাবাহুরনুজজ্ঞে স পাণ্ডবঃ॥ ঐ। ২৫

এই মামাতো বোন সুভদ্রারই গর্ভে বীরকুলশিরোমণি অভিমন্যুর জন্ম।

মহাভারতের যুগে নারী যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিতেন তাহারও খবর মেলে দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবরের আয়োজনে। জানাইয়া দেওয়া হইল, "নল রাজা জীবিত আছেন কিনা জানা যাইতেছে না, অতএব সূর্যোদয়ে দময়ন্তী দ্বিতীয়বার ভর্তা বরণ করিবেন।"—

সূর্যোদয়ে দ্বিতীয়ং সা ভর্তারং বরয়িষ্যতি॥

নহি স জ্ঞায়তে বীরো নলো জীবতি বা ন বা। মহাভারত, বনপর্ব। ৭০, ২৬

ভীমকন্যা দময়ন্তী পুনরায় স্বয়ংবর করিবেন শুনিয়া রাজা ও রাজপুত্রগণ সেখানে যাইতে লাগিলেন। (ঐ, ৭০, ২৪)। বিবাহে নারীদের এইসব অধিকারের কথা তখনকার অন্যান্য বহু পুরাণেই পাওয়া যাইবে।

বিবাহের অধিকার বাদ দিলেও তখনকার দিনে নারীরা ধর্ষিতা হইলে এখনকার নারীদের মত সমাজে পরিত্যক্তা হইতেন না। ধর্ষণকারী পুরুষই অপরাধী বলিয়া গণিত হইত। ইহাই মহাভারতের যুক্তিসংগত মত।—

নাপরাধোঽস্তি নারীণাং নর এবাপরাধ্যতি। মহাভারত, শান্তিপর্ব। ২৬৫, ৪০

এইখানে চিরকারিকোপাখ্যানে পিতার মহত্ত্বও ঘোষিত,—

পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গ পিতা হি পরমং তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে সর্বাঃ প্রীয়ন্তি দেবতাঃ। ঐ। ২১

আবার মাতাই সর্বকুলের রক্ষয়িত্রী। কোন্ সন্তান কাহার ঔরসে জাত, কাহার কি গোত্র, কে কার সন্তান তাহার তত্ত্ব একমাত্র জানেন মাতা। সমাজ তাহার কি খবর রাখে ?—

মাতা জানাতি যদ্ গোত্রং মাতা জানাতি যস্য সঃ। ঐ। ৩৫

নারীদের যে শুধু সামাজিক অধিকারই তখন প্রশস্ত ছিল তাহা নয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাঁহাদের তখন সাধনারও বিলক্ষণ অধিকার ছিল। যযাতির কন্যা মাধবী ছিলেন "বহুগন্ধর্বদর্শনা" (মহাভারত উদ্যোগপর্ব, ১১৬, ৩)। এখানে নীলকণ্ঠ বলেন—

গন্ধর্বাণাং দর্শনং শাস্ত্রং গীতবিদ্যাদি যস্যাঃ।

কাদম্বরীতে মহাশ্বেতা সংগীতশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারগা। তপস্যার সঙ্গে সংগীতের বিরোধ নাই। নানাপুরাণে ও প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে তাহার পরিচয় মিলিবে। অযোধ্যাপতি অজের পত্নী ইন্দুমতী ছিলেন "ললিতে কলাবিধৌ প্রিয়শিষ্যা"। মালবিকাগ্নিমিত্রনাটকে নারীদের নৃত্যের কথা দেখি (তৃতীয় অঙ্ক)। মহাদেবের নৃত্যানুকারে ভবানী দণ্ডপাদনৃত্য যে করিয়াছেন তাহার খবর দিয়াছেন মম্মটভট্ট। পুরুষের নৃত্য হইল তাণ্ডব। নারীর নৃত্যের নাম লাস্য। জয়দেব ছিলেন নৃত্যকুশলা পদ্মাবতীর "চরণ-চারণচক্রবর্তী"। তবে পদ্মাবতীর কথা বলিতে সাহস হয় না, কারণ নৃত্যই তাঁর জীবনের সবখানি। কিন্তু সতী বেহুলার নৃত্যের কথা তো তেমন করিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। নৃত্য করিয়াই বেহুলা মৃত পতিকে জিয়াইলেন। বিক্রমোর্বশী নাটকের চতুর্থ অঙ্কের চিত্রলেখা নৃত্য করিয়াছেন এবং কঠিন কঠিন রাগরাগিণীতে গানও করিয়াছেন। সমাজব্যবস্থাপকেরা নারীদের জন্য নৃত্যগীতাদি শাস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃহস্পতি বলেন নারীদের জন্য প্রসাধন নৃত্যগীতসমাজোৎসবদর্শন বিহিত হইলেও স্বামী যখন বিদেশে থাকেন তখন তাহা স্থগিত রাখা উচিত।—

প্রসাধনং নৃত্যগীতসমাজোৎসবদর্শনম্।
মাংসমদ্যাভিযোগং চ ন কুর্যাৎ প্রোষিতে প্রভৌ॥
—স্মৃতিচন্দ্রিকাধৃত, ব্যবহার কাণ্ড, প্রোষিতভর্তৃকস্ত্রীধর্মাঃ। পৃঃ ৫৯৩

সেই অবস্থায় নারীগণ অগর্হিত শিল্পের দ্বারা সময়যাপন করিবেন—

প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ। ঐ। পৃঃ ৫৯২

বাৎস্যায়ন বলেন—

প্রাগ্‌যৌবনাৎ স্ত্রী কামসূত্রং তদঙ্গবিদ্যাশ্চাধীয়ীত পিতৃগৃহে এব।

দর্শন পুরাণ ইতিহাস ও নানাবিধ কলাবিদ্যার সঙ্গে নারীরা বিবাহের পূর্বে পিতৃগৃহে ও বিবাহের পরেও পতির অভিপ্রায়ানুসারে কামসূত্র এবং তদঙ্গবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে অধিকারী ছিলেন (বাৎস্যায়ন কামশাস্ত্র, ৩য় অধ্যায়)। টীকাকার যশোধরেন্দ্র এই বিষয় আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। কলাবিদ্যার হিসাবে নারীদের প্রতি আয়ুর্বেদশাস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। বাৎস্যায়ন ও যশোধর চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যার বিস্তৃত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (কামশাস্ত্র, ৩য় অধ্যায়)। নারীনৃত্যের সর্বাপেক্ষা বড় দৃষ্টান্ত হইল বৃহন্নলার কাছে বিরাটগৃহে রাজকন্যাদের নৃত্যশিক্ষার কথা।—

স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং
সুতাং বিরাটস্য ধনঞ্জয়ঃ প্রভুঃ। মহাভারত, বিরাট। ১১, ১২

বৌদ্ধযুগে দেখা যায়, সঙ্ঘমিত্তা হেমা ও অগ্‌গিমিত্তা ত্রিবিধবিজ্ঞানপারদর্শিনী (দীপবংশ, ১৫ পর্ব)। সীবলা ও মহারুহা বিনয় সুত্তপিটক ও অভিধম্ম পড়াইতেন (ঐ)। অঞ্জলি ছিলেন শাস্ত্রে ও দৈবশক্তিতে অধিকারিণী। থেরীগাথায় বহুনারীর নানা বিষয়ে গভীর সাধনার ও বিদ্যার পরিচয় মেলে।

খ্রীস্টীয় ১১৮৩ সালে কাকতীর রাজকন্যা রুদ্রদেবী বাংলাদেশ হইতে পরমশৈব বিশ্বেশ্বরকে দক্ষিণদেশে নিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। মালকপুরশাসনে দেখা যায়, এই কন্যা পুরুষের মত রাজা হইয়া প্রবলপ্রতাপে এবং জ্ঞান ও কলার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রাজ্যশাসন করেন। ইহার এক শতাব্দী পরে বিজয়নগরসম্রাট কম্পরায়ের মহিষী গঙ্গাদেবী ছিলেন জ্ঞানে ও কাব্যরচনায় প্রখ্যাত। তাঞ্জোরপতি রঘুনাথভূপের সভাকবি ছিলেন স্ত্রীকবি মধুরবাণী। মালাবারের প্রধান সপ্তকবির চারিজনই স্ত্রীলোক।

তাঁহাদের মধ্যে নারী কবি অব্যার অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। লীলাবতীর নাম সবাই জানেন। বাংলাদেশে খনার নাম ঘরে ঘরে। মণ্ডনমিশ্রের পত্নীর কথাও সুবিদিত। দর্শনশাস্ত্রে উভয়ভারতীর অসাধারণ অধিকার ছিল। মিথিলাধিপতি পদ্মসিংহের রাণী বিশ্বাসদেবী ছিলেন স্মৃতিশাস্ত্রের প্রখ্যাত আচার্য। বহু নারীকবির রচনার পরিচয় সংস্কৃতসাহিত্যে পাওয়া যায়। তাহা লিখিতে গেলে স্বতন্ত্র একখানি পুঁথি হইয়া উঠে এবং সে বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতও হইয়াছে। অধ্যাপক কানে-লিখিত ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে নারীদের রচিত বহু স্মৃতিগ্রন্থের পরিচয় মেলে।

বীরনারী হিসাবেও ভারতের বহু মহিলা প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদেও সেইরূপ নারীদের পরিচয় মেলে। আহমদনগরের রানী চাঁদবিবি মোঘল সেনাপতিকে যুদ্ধে বিস্মিত করিয়া দেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই স্যর হগ রোজকে সহজে ছাড়িয়া দেন নাই। ভীমসিংহপত্নী পদ্মিনীর বীরত্ব আর-এক রকমের। এই সব মহীয়সী মহিলারা যেভাবে প্রাণ দিয়াছেন তেমন করিয়া প্রাণ দিতে বীরপুরুষরাও পারেন নাই। স্বামীর সঙ্গে অনুমৃতা সতীদের আত্মত্যাগের মধ্যে যে শান্ত বীরত্ব আছে তাহার মহত্ত্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

বাংলাদেশে হঠী বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি নারী নানাশাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

কাশী যখন মোগলশাসনের শেষভাগে নিস্প্রভ ও অশক্ত হইয়া পড়িল তখন কাশীকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন দুই নারী। একজন রানী ভবানী আর একজন অহল্যাবাঈ। কাশীকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাঁহারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে নবজীবন দান করিলেন।

কাজেই নারীরা যে এ দেশে শুধু ঘরে ও সংসারেই রাজত্ব করিয়াছেন তাহা নহে। মহাভারতে দেখি, সেখানেও সকলের আহারে-বিহারে নারীরাই কর্তৃত্ব করিতেন। পত্নীরা স্বামীদের কাছে সম্মানও যথেষ্ট পাইয়াছেন। পথশ্রান্তা দ্রৌপদীর পথখেদ দূর করিতে নকুল ও সহদেব তাঁহার পাদসংবাহনও করিয়াছেন।—

তস্যা যমৌ রক্ততলৌ পাদৌ পূজিতলক্ষণৌ।
করাভ্যাং কিণজাতাভ্যাং শনকৈঃ সংববাহতুঃ॥ বনপর্ব। ১৪৪,২০

নারীদের ভাল দিকই দেখান হইল। তাঁহাদের মধ্যে মন্দও কিছু কিছু যে না ছিল তাহা নহে। মহাভারতের যুগেও দেখা যায়, নারীদের মধ্যে সুরাপানাদি দোষ বেশ ছিল। খাণ্ডবদাহপর্বে দেখা যায়, দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রভৃতি সহ বড় বড় ঘরের নারীরা তাহাতে ছিলেন। সেখানেও উৎসবের আনন্দে কোনো নারী হাসিতেছেন, কেহ হল্লা করিতেছেন, কেহ নাচিতেছেন, কেহ সুরাপান করিতেছেন।—

কাশ্চিৎ প্রহৃষ্টা ননৃতুশ্চুক্রুশুশ্চ তথাপরাঃ।
জহসুশ্চাপরা নার্যঃ পপুশ্চান্যা বরাসবম্॥ আদিপর্ব। ২২২,২৪

শিশুপালবধকাব্যেও রেবতী-বলরামের সুরাপান-উৎসব চমৎকার বর্ণিত দেখা যায়—

ঘূর্ণয়ন্ মদিরাস্বাদমদপাটলিতদ্যুতী।
রেবতীবদনোচ্ছিষ্টপরিপূতপুটে দৃশৌ॥ ২,১৬

তবে পাণিনির (৩,২,৮) বার্তিকে (২) নারীদের সুরাপান পাতক বলিয়াই উল্লিখিত। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও সমাজে নারীদের মধ্যে সুরার বিলক্ষণ প্রচলন ছিল।

সহমরণ প্রথার কথা পূর্বে হইয়াছে। এই প্রথা আর্যদের মধ্যে খুব প্রাচীন বৈদিক যুগে ছিল না। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বলেন, এই প্রথা প্রাচীনকালে য়ুরোপে ও পশ্চিম এশিয়ায় আর্যেতর জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। এদেশে আর্যদের মধ্যে এই প্রথা বিদেশী অনার্যদের কাছ হইতে আমদানি করা। পঞ্চনদ প্রদেশের তক্ষশিলাদি ভূভাগে তখন গ্রীকদের প্রভাব ছিল বেশি। খ্রীস্টের তিন চারিশত বৎসর পূর্বে সেই সব স্থানে সতীদাহ খুব বেশি রকম প্রচলিত ছিল (Oxford History of India. V. A. Smith. P.665.)। বেদের যে সব মন্ত্র এই প্রথার প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হয় তাহার অর্থ কিন্তু সতীদাহকে সমর্থন করে না। পরবর্তী স্মৃতি ও ব্যাখ্যানাদির রচয়িতারা বরং ইহার সমর্থন করেন। অথর্বের একটি মন্ত্র আছে—

ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা, ইত্যাদি। অথর্ব। ১৮, ৩, ১

ইহার ভাষ্যে স্বামীর চিতায় আরোহণ-সমর্থনে শঙ্করাচার্য শ্রুতিবাক্য না পাইয়া স্মৃতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

স্বর্গ্যোতে হি, ভর্তারম্ উদ্ধরেন্নারী প্রবিষ্টা সহ পাবকম্॥

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রেও এই একই মত দেখা যায়। ঋগ্বেদের যে মন্ত্রটি বাংলাদেশে সতীদাহের প্রধান সমর্থকরূপে ব্যবহৃত, রমেশ দত্ত মহাশয় দেখাইয়াছেন তাহার অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। মূলে আছে "আরোহন্তু জনয়ো যোনিরগ্রে" (ঋগ্বেদ ১০, ১৮, ৭) কিন্তু তাহা বদলাইয়া করা হইয়াছে" যোনিমগ্নে"।

ঋগ্বেদের মূল হইল এই—

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাংজনেন সর্পিষা সং বিশন্তু।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিরগ্রে। ঋগ্বেদ। ১০, ১৮, ৭

সায়নও ইহার ভাষ্যে বলেন, "এই সব অবিধবা শোভনপতিকা নারী স্নেহসিক্ত ও অঞ্জনে মণ্ডিত হইয়া আপন ঘরে প্রবেশ করুন। অশ্রুজলহীন ও নীরোগ হইয়া শোভন রত্নে মণ্ডিতা হইয়া এই সব ভার্যা প্রথমেই আপন ঘরে আসুন।"

ইহার পরে মন্ত্রটিতেও এই কথারই সমর্থন—

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ॥ ঐ। ১০, ১১, ১

সায়ন অর্থ করেন, "হে মৃতের পত্নি, পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত জীবলোকের উদ্দেশ্যে এই স্থান হইতে উঠিয়া এস। গতপ্রাণ পতির পাশে কেন এখন শুইয়া আছ, সেখান হইতে উঠিয়া এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ ও গর্ভাধান করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি পত্নীজনোচিত কাজ তুমি যথেষ্ট করিয়াছ, এখন উঠিয়া এস।"

এই মন্ত্রটি অথর্ববেদের অষ্টাদশ কাণ্ডের তৃতীয় সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র। আশ্বলায়নও এই মন্ত্রের সমর্থন করিয়াছেন (৪, ২, ৩ Mysore, G. O. L. S. No. 26. V. 1. 1. P. 327)। এইখানে ভট্টভাস্কর ভাষ্য করেন সেই নারীকে পতিস্থানীয় দেবর ধরিয়া উঠাইবেন। কারণ, প্রাচীন বিধি আছে—

তামুত্থাপয়েদ্ দেবরঃ পতিস্থানীয়োঽন্তেবাসী
জরদ্দাসো বোদীর্ষ্ব নার্যভিজীবলোকমিতি।

পতিস্থানীয় দেবর, স্বামীর ছাত্র বা বৃদ্ধদাস সেই নারীকে সেখান হইতে উঠাইতে গিয়া বলিবে,

"হে নারি, জীবলোকে ফিরিয়া এস (উদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোকম্)।" মহাভারতে দেখা যায় মাদ্রী পতিসহ চিতারোহণ করেন কিন্তু কুন্তী সংসারের ভার লইয়া রহিলেন। বাসুদেবপত্নী ও কৃষ্ণপত্নীগণ সহমৃতা হইলেও তখনকার বহু নারী সতী সহমৃতা হন নাই। দক্ষ প্রভৃতি স্মৃতিতে যদিও স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণের প্রশংসা আছে—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সা ভবেত্তু শুভাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৩০-১৯-২০

স্বামীর সহমৃতা হইলে নারী শুভাচারা হয়েন এবং স্বর্গলাভ করেন। বিধবার ব্রহ্মচর্যের প্রশংসা মনু বিশেষভাবেই করিয়াছেন—

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ ৫, ১৬০

কাজেই সহমরণ প্রথা যখন প্রচলিত হইল তখনও সকলে ইহা স্বীকার করেন নাই। মহানির্বাণতন্ত্র তো স্পষ্টভাবেই বলিলেন, "স্বামীর সঙ্গে কুলকামিনীকে কখনও দগ্ধ করিবে না।"—

ভর্ত্তাসহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্॥ ১০, ৭৯

মোট কথা, নারীদের তখন অধিকার স্বাধীনতা ছিল অনেক। তবে তাহা গেল কেন? নারীদের মধ্যে যে মাতৃত্ব ভগবান দিয়াছেন সেই দায়েই নারীরা স্বেচ্ছায় সেই অপরিমিত স্বাধীনতা নিজেরাই বিসর্জন দিলেন, নহিলে বাহিরের বিধানে এইরূপ হওয়া সম্ভব ছিল না। আজও সেই সামঞ্জস্যের কাজ চলিয়াছে, তাই আজও নারীদের দুইটি ধারা দেখা যায়। একদল নারী আনন্দরূপিণী উর্বশী। আর-একদল শান্ত সংযত স্নেহময়ী লক্ষ্মী। এই কথা প্রসঙ্গান্তরে আরও আলোচিত হইবে। মোট কথা, সামাজিক বিধি নারীদের অনুকূল হইলেই যে নারীরা অসংযত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবেন, এই কথা যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা নারীদের পুরাতন ঐতিহ্যের বিষয়ে অন্ধ।
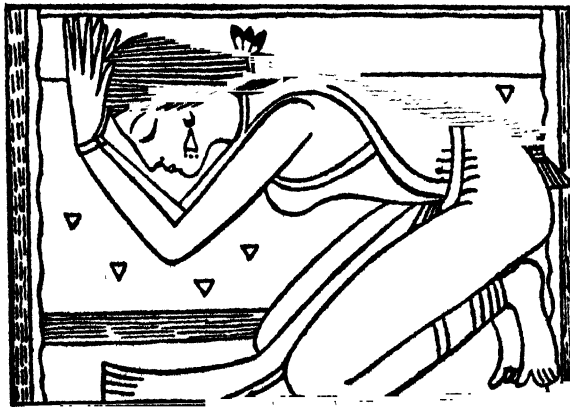
অবনীন্দ্রনাথের বাংলা রচনা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বহুমুখীপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির দুর্ভাগ্য এই যে, অনেক সময়েই এক দিকের খ্যাতির তলে তাঁহার অন্যদিকের কৃতিত্ব চাপা পড়িয়া যায়; সব দিকের কৃতিত্ব কদাচিৎ সমানভাবে স্বীকৃত হয়। তার কারণ, প্রতিভার বহুমুখিতার প্রতি সাধারণ মানুষের কেমন যেন একটা অবিশ্বাসের ভাব আছে। তাই সে একটা মাত্র কৃতিত্বকে আদরে বাছিয়া লইয়া অন্যগুলিকে অবহেলা করে। পাঠকেব রসাস্বাদের বহুমুখিতার অভাব প্রতিভার বহুমুখিতার অস্বীকৃতির অন্যতম কারণ।

রবীন্দ্রনাথের মতো বহুমুখী প্রতিভা বিরল। অলোকসাধারণ সাহিত্যিক বিরাটপুরুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে তাঁহার যে অপ্রত্যাশিত বিলম্ব ঘটিয়াছিল তার একটি প্রধান কারণ তাঁহার প্রতিভার বহুমুখিতা। এখন তিনি সর্বজনস্বীকৃত কবিগুরু— কিন্তু বহুমুখিতার স্বাভাবিক অভিশাপ হইতে সম্পূর্ণভাবে যে তিনি মুক্ত হইতে পারিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। লোকসমাজে কবিরূপেই তিনি অবিসম্বাদী। এই কবিখ্যতির ফলেই তাঁহার অন্যান্য খ্যাতি কিয়ংপরিমাণে দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি পঞ্চাশখানার বেশি নাটক লিখিয়াছেন; তাঁহার উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের সংখ্যা বিশোত্তীর্ণ; প্রবন্ধাদির সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু কবিকৃতিত্বের উচ্চতম শৃঙ্গটির আড়ালে এই সব উচ্চশৃঙ্গ কতক পরিমাণে প্রচ্ছন্ন। যে সৌভাগ্যবান্ পাঠক দুরূহ অধ্যবসায়ে তাঁহার কাব্যশিখরে আরোহণ করিয়াছেন, কেবল তিনিই অন্যান্য শৃঙ্গের উচ্চতা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন; ভূতলচারীদের কাছে প্রধানতঃ তিনি কবিই থাকিয়া যাইবেন। দুঃসাহসী পাঠক দেখিবেন, তাঁহার অপরাপর মহিমা কবিমহিমার চেয়ে কম নয়। সমগ্রকে অখণ্ডদৃষ্টিতে দর্শনই সমালোচনার মর্মরহস্য। সমালোচক বিরল।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই যদি বহুমুখিতার এই অভিশাপমুক্ত না হন তবে অন্যের আর আশা কোথায়? অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভাও কতক পরিমাণে এই অভিশাপের দ্বারা খণ্ডিত। তাঁহার প্রতিভাও বহুমুখী; বহুমুখী এবং ভিন্নমুখী— যার ফলে তাঁহার মহিমা সর্বতোভাবে, যথার্থভাবে, স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব তাঁহার চিত্রশিল্প, এবং ইহাই তাঁহার প্রথম কৃতিত্ব। আর এই প্রথম কৃতিত্বের আড়ালে তাঁহার সাহিত্যিক পরিচয় কেবল গৌণভাবেই প্রকাশিত। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী এবং শিল্পীগুরু। শিল্পের কৃতিত্বে এবং শিল্পের ইতিহাসে কোথায় তাঁহার আসন, সে আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের আসন নির্দেশের চেষ্টা এ পর্যন্ত হয় নাই। ইহা দুঃখের হইলেও বিস্ময়ের নহে; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, বহুমুখিতার স্বীকৃতিতে সাধারণের একটা কেমন যেন অনুত্তম আছে। অথচ বিচারে নামিলে দেখা যাইবে, সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের আসন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের নিচে নয়, আর বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বর্তী যুগের লেখকদের অধিকাংশের উপরে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে যে-কয়জন লেখক গদ্যরচনার দ্বারা খ্যাতি অর্জন

করিয়াছেন, গদ্যরচনাভঙ্গীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যাঁহাদের আছে, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সত্ত্বেও নিজেদের মনের ছাপ গদ্যভঙ্গীর উপরে যাঁহারা আঁকিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্ব একটি গদ্যরীতি আছে, কিন্তু তার উপরে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ কাহারও প্রভাব নাই। কিন্তু এ বিষয়ে তিনিই বোধ হয় একক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয় সরকার, দু'জনেরই নিজস্ব গদ্যরীতি আছে কিন্তু তাঁহাদের রচনার কাঠামো বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের গদ্য। শ্রীযোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির গদ্যরীতি বিচিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষা না পাইলে ইঁহাদের গদ্যরীতি সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। বীরবলী গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনে শিল্পদক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ণ রবীন্দ্রপ্রভাবের সময়েও শরৎচন্দ্র গদ্যরচনায় যে স্বকীয়তা দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনীষা প্রকাশ পায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গীর উপরেই তাঁহার স্টাইল প্রতিষ্ঠিত। ইঁহাদের সকলের মতোই এবং সকলের চেয়ে বেশি করিয়া অবনীন্দ্রনাথের গদ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির পরিণত প্রকাশ রাজকাহিনী, নালক প্রভৃতি গ্রন্থে এবং তাহার চরম ঘরোয়া এবং জোড়া-সাঁকোর ধারেতে। এই স্টাইলেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে, কিন্তু লেখকের স্বকীয়তা অতিশয় স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ একাধিক স্টাইল ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যান্য যাঁহাদের নাম করিলাম, তাঁহাদের স্টাইল একাধিক নয়। অবনীন্দ্রনাথও একটি মাত্র স্টাইল ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলার ব্রত ও বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলীতে যে প্রভেদ তাহা কেবল বিষয়বস্তুর পার্থক্যেই ঘটিয়াছে; সে প্রভেদ কেবল শাখাপ্রশাখায়, মূল কাণ্ডটা একই।

২

সাহিত্যের ছন্দ তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের নাম দেওয়া যাইতে পারে গীতিস্পন্দ, বাক্যস্পন্দ এবং লেখনীস্পন্দ। কাব্যে এই তিন স্পন্দই অত্যন্ত স্পষ্ট, এবং উদাহরণও প্রচুর মিলিবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতেই সমস্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতে পারে।

ক্ষণিকার অধিকাংশ কবিতা বাক্যস্পন্দের অন্তর্গত। মুখের বাক্যভঙ্গীকে সামান্য আয়াসে বাঁকাইয়া তাহার সঙ্গে ছন্দের জ্যা-যুক্ত করিয়া এই কাব্য গঠিত। গদ্যকবিতাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু তাহাকে পদ্যের কোঠায় না ফেলিয়া গদ্যের কোঠায় ফেলিয়া বিচার করাই উচিত।

লেখনীস্পন্দের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতা। ইহা বাক্যভঙ্গীও নয়, গীতি-ভঙ্গীও নয়; কলমের ডগা ছাড়া এ বস্তু লিখিত হইতে পারে না। মানুষ কথা বলে, মানুষ গান করে, আবার মানুষ লেখে। প্রাচীন কালে মানুষ কেবল কথাই বলিত এবং গান করিত; তখন লিখিত না। কিন্তু বহুকালের অভ্যাসে মানুষ মসীজীবী বা লেখক হইয়া পড়িয়াছে। এই লিখনশীলতা মানুষের স্বাভাবিক নয়, অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত। লিখনশীলতা মানুষের প্রকাশের সীমাকে অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছে। অনেক কথা যাহা না বাচ্য, না গেয়, তাহা লেখ্য। লেখনীর ঘটকালি না ঘটিলে তাহা কখনও প্রকাশ পাইত কি না সন্দেহ। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

গীতিস্পন্দের উদাহরণ অবিরল। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানেই গীতিস্পন্দ আছে; সুরযুক্ত

বলিয়াই যে আছে তাহা নয়, গীতিস্পন্দ আছে বলিয়াই সুরযুক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ বৈষ্ণবপদ গীতি-স্পন্দপ্রধান। সুরে গীত না হইলেও এগুলি গীতিকবিতা, ইউরোপীয় অলংকারশাস্ত্রমতে লিরিক।

এ যেমন পদ্যে, তেমনি গদ্যেও এই তিন স্পন্দের লীলা দেখা যায়। 'সীতার বনবাস'-এর স্পন্দ লেখনীস্পন্দ। ও জিনিস গীত হইবার নয়, উক্ত হইবার নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গদ্য, বীরবলী গদ্য, রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা বাক্‌স্পন্দপ্রধান। কমলাকান্তের দপ্তরও তাই। প্রত্যেকটারই আদর্শ মুখের ভাষা, কোনটাতে বেশি, কোনটাতে কম এই মাত্র। গীতিস্পন্দের উদাহরণ গদ্যে বিরল। লিপিকার কোনো কোনো অংশ, রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার কোনো কোনো কবিতা গীতিস্পন্দপ্রধান।

বাংলা গদ্যে গীতিস্পন্দের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল— অবনীন্দ্রনাথের গদ্য। অবনীন্দ্রনাথের স্টাইলে যে স্বকীয়তার উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহা এই জন্যই। এ দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যে একেবারে দ্বিতীয়রহিত না হইলেও নিঃসন্দেহ তিনি প্রধান।

এখন সাহিত্যের এই গীতিস্পন্দ, বাক্‌স্পন্দ ও লেখনীস্পন্দের মধ্যে গীতিস্পন্দ প্রাচীনতম; কারণ মানুষ কথা বলিবার আগে গান করিতে শিখিয়াছে, আর তাহার লিখিতে শেখা সে তো সেদিনের কথা। সে এত অল্পদিনের কথা যে কলমের সঙ্গে আজও তাহার সম্পূর্ণ বোঝাপড়া যেন হয় নাই; মনের অনেক কথাই আজও মানুষ কলমে প্রকাশ করিতে অর্ধক্ষম মাত্র। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, যাঁহারা লেখ্যভাষা ও মৌখিক ভাষা লইয়া বিতর্ক বাধাইয়া থাকেন, তাঁহাদের মনে করাইয়া দেওয়া আবশ্যক, সাহিত্যের ভাষা দুইটি মাত্র নয়, তিনটি; লেখ্য ভাষা ও মৌখিক ভাষার সঙ্গে গেয় ভাষাকে যোগ করিতে হইবে। আর, লেখ্য ও মৌখিক ভাষার মধ্যে প্রভেদ কেবল ক্রিয়াপদ-গঠনের মাত্র নয়; ছন্দের প্রভেদ রহিয়াছে, আর ছন্দের প্রভেদ যে আছে তার কারণ প্রকাশ্য ভাবের ও বিষয়ের প্রভেদ।

মানুষের প্রাচীনতম ভাবের বাহন গান, গদ্য পরবর্তী যুগের। আবার গদ্যের মধ্যে প্রাচীনতম গীতিস্পন্দযুক্ত গদ্য। মানুষের অধিকাংশ রূপকথা এই গীতিস্পন্দের গদ্যে কথিত। কিন্তু রূপকথা যখন হইতে লিখিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন গোলমাল বাধিল। যাহা গীতিস্পন্দে কথিত হইত লিখিবার সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই তাহা লেখ্য ও মৌখিক ভাষায় লিপিবদ্ধ হইল, কদাচিৎ কখনো গীতিস্পন্দযুক্ত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি রূপকথাকে রূপকথার ভাষায় অর্থাৎ গীতিস্পন্দের ভাষায় লিখিয়াছেন। তাঁহার পরিণত স্টাইলের মধ্যে বহুযুগের মায়ের কোলের দোল ও মাতামহীর মুখের সুর সঞ্চিত হইয়া আছে; তাঁহার রাজকাহিনী, নালক, ভূতপত্রীর গদ্য পঠিত হইবামাত্র এই সুর গুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়া মানুষের শৈশবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তখনই ব্যক্তির শৈশব আর মানুষের শৈশব এক সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়া নিবিড় রূপকথার অপরূপ রাজ্যের সৃষ্টি করিতে থাকে। রূপকথা-কথন কঠিন— আর রূপকথা-লিখন! অবনীন্দ্রনাথের রচনা না পাইলে অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত।

আজকাল গণচৈতন্য প্রসঙ্গে গণশিল্পের কথা শোনা যায়। কালীঘাটের পট নকল করিয়া ছবি আঁকা বা চাষার কাহিনী লইয়া গল্প-নাটক রচনা গণশিল্প নয়; কারণ, ঘটনার মধ্যে গণত্ব নাই; যে-মন রচনা করিতেছে তাহার উপরেই সব নির্ভর করিতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখকের মন সাম্প্রদায়িক মন; সে মনের যোগ্যবাহন লেখ্য ভাষা। লেখাতে মানুষে মানুষে তফাত; আবার অল্প লোক লিখিতে জানে, অধিকাংশই জানে না। অর্থাৎ লেখ্য ভাষা এমন একটা পথ যে-পথের সন্ধান 'গণ' জানে না আর

জানিলেও সে সংকীর্ণ পথে জনতার স্থান সংকুলান হইবে না। একমাত্র গানের প্রাচীনতম ও উদারতম জগন্নাথক্ষেত্রে সকল মানুষের স্থান আছে; যখন সমাজে শ্রেণীবিভাগ ঘটে নাই তখন হইতেই গানের সঙ্গে জাতিহিসাবে মানুষ পরিচিত, গানের মারফতে মানুষে মানুষে পরিচয়; সে পরিচয় আজিও সুপ্তভাবে মানুষের মনে সঞ্চিত আছে, গানের সুরে তাহা জাগিয়া ওঠে; জাগিয়া উঠিয়া শ্রেণীর, সম্প্রদায়ের বাঁধ ভাঙিয়া সব একাকার করিয়া দিয়া মানবসমাজকে এক করিয়া দেয়। চাষার বিষয়ে লিখিত নাটক গণ-সাহিত্য নয়, এমন কি খাঁটি চাষার লিখিত রচনাও গণসাহিত্য নয়। কারণ সে পথ 'জনগণমনের' পথ নয়। পরীক্ষা কঠিন নয়। গণনাটকের আসরে কোনো প্রকৃত 'গণ'কে বসাইয়া দিলে সে কিছুই বুঝিতে পারিবে না। আমাদের গণসাহিত্য নিতান্তই আমাদের জন্য লিখিত। রূপকথাই প্রকৃত গণসাহিত্য এবং অবনীন্দ্রনাথ সেই গণসাহিত্যের রাজা। অবনীন্দ্রনাথ সমাজের যে স্তরে এবং যে ঘরেই জন্মিয়া থাকুন না কেন প্রতিভার রহস্যে তিনি দেশের সেই উদার ক্ষেত্রে জন্মিয়াছেন যেখানে দেশের সর্বশ্রেণীর আসন; যেখানে দেশের মানুষ গল্পলিপ্সু, যেখানে গল্প শুনিবার লোভে সকল মানুষ বয়োভেদ ভুলিয়া চিরকালের শিশু। অভিজাত ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় গণসংগীত যে কি ভাবে গিয়া পৌছায় জানি না। হয়তো যে দাসীদের দ্বারা শৈশবে তিনি পালিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মুখের কাহিনীতে, গলার সুরে রূপকথার দীক্ষা তিনি পাইয়া থাকিবেন। হয়তো মাতৃস্তন্যের সঙ্গেই রূপকথার রসপান করিয়াছিলেন। হয়তো প্রতিভার দুর্ভেদ্য রহস্যের মধ্যে ইহার ইঙ্গিত ছিল। কিম্বা শ্রেণীতে শ্রেণীতে অভিজাতে দরিদ্রে যে দুস্তর বাধা আমরা কল্পনা করিয়া থাকি তাহা সত্য নয়; অন্তরঙ্গ কোনো মিল আছে, নতুবা কলিকাতার ধনীর ঘরে, সমাজছাড়া ঘরের ঘরকুণো একটি বালক কোন্ মন্ত্রে গণসাহিত্যের রাজা হইয়া উঠিল! ইহার পরীক্ষাও কঠিন নহে। ভূতপত্রী, বুড়ো আংলা, রাজকাহিনী পড়িয়া শোনাও। শ্রেণী-শিক্ষা-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলে বুঝিবে; বুঝিয়া আনন্দ পাইবে। অক্ষরপরিচয়ের উপরে ইহাদের রস নির্ভর করে না। অক্ষরগুলা ইহাদের ন্যূনতম অংশ। এমন কথা বাংলা সাহিত্যের ক'খানি পুস্তক সম্বন্ধে বলা যায়! শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে উচ্চতর আসনের অধিকারী হইতে পারেন। কিন্তু সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের গৌরব এই যে, সাহিত্যের আসরে তিনি নিম্নতম আসনে বসিয়াছেন, একেবারে মাটির উপরে, সম্রাট অশোকের মতো। মাটির উপরে বসিয়া তিনি মাটির মানুষের মন কাড়িয়া লইয়াছেন, যে মাটিতে চিরকালের ফসল ফলে, মানুষের শিশু নিত্য ভূমিষ্ঠ হয়।

৩

গীতিস্পন্দপ্রধান গদ্যের উপজীব্য কি? বাক্যস্পন্দপ্রধান গদ্যে তর্কবিতর্ক করা চলে; তাহা সামাজিক মনের বাহন। লিখনস্পন্দপ্রধান গদ্যে চিন্তা করা চলে। গীতিস্পন্দপ্রধান গদ্যে গল্প বলা চলে। সে গল্প রূপকথার গল্প। রূপকথার গল্পে এবং অন্য গল্পে মূলে একটা স্থূল প্রভেদ আছে। অন্য গল্পের মতো রূপকথায় রিয়ালিজ্‌মের স্থান নাই। আজ যাহা 'রিয়ালিজ্‌ম্' কাল তাহা 'রিয়ালিজ্‌ম্'-বর্জিত; সাহিত্যে নিত্যই একটা রিয়ালিজ্‌ম-বর্জনের প্রক্রিয়া চলিতেছে। কাহিনী হইতে রিয়ালিজ্‌মের বিষ ঝরিয়া গেলে তবেই তাহা রূপকথায় স্থান পাইবার যোগ্য হয়। এই রিয়ালিজম-বর্জনের জন্য কিছু সময় দরকার। ঠিক কতটা সময় লাগিবে তাহা ইতিহাসের গতির উপরে এবং লেখকের

শক্তির উপরে নির্ভর করে। সামান্য নিয়মের দ্বারা নির্দেশ করা চলে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। নেপোলিয়ানের জীবনী এবং ইতিহাস বাস্তব ব্যাপার। টলস্টয়ের 'সমর ও শান্তি' উপন্যাসে তাহা একদফা রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহা লিখনস্পন্দপ্রধান ভাষায় লিখিত। কারণ, এই গল্পের সূত্রে লেখক মানবজীবন সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তনীয় কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন। আবার নেপোলিয়ানের কাহিনী লইয়া ফরাসী কবি বেরেঞ্জার গান লিখিয়াছেন; তাহাতে অনুভূতির কথা আছে, চিন্তার কথা নাই। ইহা বাস্তব-ঘটনার আর-একরকম রূপান্তর। আবার এই একই কাহিনী হার্ডির হাতে 'দি ডাইনাস্ট্‌স্‌' কাব্যে জন্মান্তর পাইয়াছে। কিন্তু কোনোটাই রূপকথার পর্যায়ে পড়ে নাই। বরঞ্চ বেরেঞ্জারের কোনো কোনো গান রূপকথার সীমার মধ্যে যেন আসিয়া পড়িয়াছে। বেরেঞ্জারের একটি গানে আছে— একজন বৃদ্ধ সৈনিক, সে নেপোলিয়ানকে দেখিয়াছিল, ছোট ছেলেদের গল্পচ্ছলে বলিতেছে, আমি তাঁহাকে এই গ্রামের মধ্য দিয়া বহু রাজার দ্বারা অনুসৃত হইয়া যাইতে দেখিয়াছি। ইহা প্রায় রূপকথার পর্যায়ভুক্ত। নেপোলিয়ানের ইতিহাস বাস্তববিষবর্জিত হইয়া একটি ছত্রে সত্যতর হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ওই একটি ছত্রে ঘনীভূত। রিয়ালিজম সত্য; অতি-রিয়ালিজম বা 'সুপার-রিয়ালিজম' সত্যতর। রূপকথার কারবার এই সুপার-রিয়ালিজমের উপাদান লইয়া। কিন্তু নেপোলিয়ানের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের রিয়ালিজম এখনো সম্পূর্ণরূপে খসিয়া যায় নাই। ইউরোপের ইতিহাসে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রনীতি এখনো সক্রিয়। হয়তো পাঁচশ বছর পরে কিংবা হাজার বছর পরে নেপোলিয়ানের ব্যক্তিত্বের বিরাট ঈগলকে রূপকথার রুপার খাঁচায় ভরিবার সময় আসিবে। তখন নেপোলিয়ান আর সম্রাট থাকিবেন না; তিনি Jack the Giant-killer জাতীয় একটা রূপ-কাহিনীতে পর্যবসিত হইবেন; যে বামন জ্যাক একাকী ইউরোপীয় বহুরাজক অরাজকতার দৈত্যকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বস্তুতঃ জ্যাক ও জায়েন্টের কাহিনীর মূলে বহুযুগপূর্ববর্তী প্রচণ্ড একটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা আছে; এখন তাহা প্রমাণের পরপারবর্তী অনুমানের রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে। প্রমাণের কম্পাসে রিয়ালিজমের সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়; রূপকথার রাজ্যের জাদুমন্ত্র-পড়া বাতায়ন হইতে যে দুস্তর সমুদ্র দেখা যায় তাহার একমাত্র কম্পাস— অনুমান।

যে কথা প্রমাণযোগ্য নয়, অনুমান যার একমাত্র সম্বল, তাহা লইয়া তর্কবিতর্ক করা চলে না, চিন্তা করা চলে না; কেবল সুরের দ্বারাই তাহা প্রকাশযোগ্য। সেইজন্য রূপকথার প্রধান সম্বল গীতিস্পন্দপ্রধান ভাষা।

অবনীন্দ্রনাথের সব কথাই রূপকথা। তাঁহার প্রথমতম গ্রন্থ হইতে শেষতম (আশা করি ইহাই শেষ নহে) 'জোড়াসাঁকোর ধারে' অবধি সবই রূপকথা। তাঁহার সমস্ত রচনা যেন একখানা সুদীর্ঘ মসলিনের থান; ক্রমে ক্রমে অকুণ্ডলীকৃত হইয়া খুলিয়া চলিয়াছে। প্রথম দিকে তার সুতাগুলি মোটা, বুনানি তেমন জমাট নয়; কিন্তু কালক্রমে তাহা সূক্ষ্মতর, ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছে। আবার এই সাদা জমিনের উপর নানা রঙের ছাপ আছে। কোনখানে ক্ষীরের পুতুল, শকুন্তলার ছাপ; কোনখানে বা নালক, রাজকাহিনীর ছাপ; শেষের দিকে সুতা যেখানে অতিশয় সূক্ষ্ম সেখানে ভূতপত্রী, খাজাঞ্চির খাতা, বুড়ো আংলার ছাপ; শেষ দুইটি ছাপ দেখিতেছি ঘরোয়া এবং জোড়াসাঁকোর ধারের। এই মসলিনের থানের সবটাই একই হাতের বুনন বলিয়া ইহার যে-কোনো অংশ সমগ্রের স্বাদ দিতে সক্ষম। অবনীন্দ্রনাথের সব রচনার একই রস বলিয়া কোনো একখানা বই পড়িলে একরকম সব বই পড়ার কাজ হইয়া যায়।

ক্ষীরের পুতুল তো প্রকৃত রূপকথার বস্তু। কালিদাসের শকুন্তলা রূপকথা নয়। কিন্তু দীর্ঘ কালাতিপাতের ফলে শকুন্তলা-কাহিনী এখন রূপকথার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। রাজকাহিনীর কাহিনী ঐতিহাসিক। ইচ্ছা করিলে ঐতিহাসিকের অনুবীক্ষণ যোগে ইহা দেখা যাইতে পারে, তাহাতে ইতিহাসের রস পাওয়া যাইবে। কিন্তু লেখক ঐতিহাসিকের অনুবীক্ষণ ফেলিয়া রূপকথার দূরবীক্ষণ চোখে লাগাইয়াছেন; ফলে কাছের জিনিস তথ্য বর্জন করিতে করিতে দূরে সরিয়া গিয়া রূপকথার রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে (দূরবীক্ষণ দূরের জিনিস কাছে টানিয়া আনে; ওটা রিয়ালিজম-এর সত্য)। ভূতপত্রী, খাজাঞ্চির খাতার বুনানি এতই সূক্ষ্ম যে আছে কিনা সন্দেহ হয়; বৈদেশিক রূপকথার রাজার সেই নূতন পোশাকের কথা মনে করাইয়া দেয়। বুড়ো আংলার কাহিনী মূলতঃ বিদেশী হইলেও মনে রাখিতে হইবে রূপকথায় দেশ-বিদেশের রিয়ালিজমগত প্রভেদ নাই। সেখানে সব দেশই এক দেশ; সব মানুষই এক মানুষ, অর্থাৎ শিশু। রূপকথার রাজ্যই আন্তর্জাতিকতাবাদীদের পরিকল্পিত অখণ্ড পৃথিবী; রূপকথার শ্রোতা শিশুই আন্তর্জাতিকতাবাদীদের পরিকল্পিত জাতিসম্প্রদায়-ধর্ম-দেশ-বিমুক্ত মানব; রূপকথার সত্যযুগ ইতিহাসের বিস্মৃতির পরপারবর্তী অতীত কালে, কোনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতে নয়।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কৃতিত্ব— ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারের সমসাময়িক ইতিহাসকে তিনি রূপকথায় পরিণত করিয়াছেন। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? আগে বলিয়াছি যে, রূপকথায় পরিণত হইতে বাস্তবের কিছু সময় লাগে, কিন্তু ঠিক কতটা সময় লাগে তাহা বলি নাই, কারণ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। জোড়াসাঁকোর ইতিহাস সমসাময়িক হইলেও রূপকথায় রূপান্তরিত হইবার অনুকূলে কিছু কারণ আছে।

প্রথমতঃ, জোড়াসাঁকোর ইতিহাসের প্রথম অঙ্ক বাংলাদেশের একটা বিগত যুগের কথা। সে যুগ অল্পদিন গত হইলেও ইতিমধ্যেই যেন বহুযুগ আগে গিয়া পড়িয়াছে। সেদিনের পল্লী কলিকাতার সঙ্গে আজকার যান্ত্রিক কলিকাতার যে-প্রভেদ তাহা কেবল সময়ের নহে, দুই জীবনভঙ্গীর প্রভেদ। পল্লীর জীবনভঙ্গী হইতে আজ আমরা বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি; দুই-তিন পুরুষকালের মধ্যে বহুকালের তফাত ঘটিয়া গিয়াছে; প্রায় 'এক জনমে ঘটালে মোর জন্মজনমান্তর' গোছের। দুইয়ের রসই আলাদা হইয়া গিয়াছে। লেখক এই রসভেদের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সময়ের দূরত্বের উপরে ইতিহাসের ঘটনা ঘনীভূত হইয়া চাপিয়া বসিয়া তাহাকে নূতন অর্থ, নূতনতর দূরত্ব দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নামে একটি শিশুর জন্ম হইতে রবীন্দ্রনাথ নামে মহাকবির মৃত্যু সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে (রিয়ালিজম বলে, আশি বছর কয়েক মাস) এই বাড়িতে ঘটিয়া গিয়াছে। ইহা যে কত বড় পৃথিবী-নাড়া-দেওয়া ঘটনা তাহা [illegible] দেখিয়াছি বলিয়াই বিশ্বাস হইতেছে না, বিস্ময় বোধ হইতেছে না। চোখে না দেখিয়া ইতিহাসে [illegible]লে বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না। এই সামান্য আশি বছরের উপর অনেক শতাব্দীর ভার যেন [illegible]। সামান্য অঙ্গারের উপর ভূস্তরের দুর্বহ চাপ পড়িয়া হীরকের সৃষ্টি করে। সামান্য কয়েক বছ[illegible]উপর বহু শতাব্দীর নিহিতার্থ ঘনীভূত হইয়া একটা পারিবারিক কাহিনীকে রূপকথার অলৌকিকত্ব দান করিয়াছে। অঙ্গার প্রকৃতির রিয়ালিজম; প্রকৃতির রূপকথা হীরক।

তৃতীয়তঃ, লেখকের বিশেষ সাহিত্যিক গুণ।

৪

সাহিত্যিক হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ যে সাধনোচিত মর্যাদা পান নাই তার অন্যতম কারণ, পাঠকে তাঁহাকে শিশুসাহিত্যিক মাত্র মনে করে, যেন শিশুসাহিত্যিক সাহিত্যিক শিশু, নিতান্তই নাবালক। আর, একবার নাবালক বলিয়া ধরিয়া লইলে কিছুতেই তাহাকে সাবালকের আসনটি দিতে মন সরে না। কিন্তু মনে রাখা উচিত, পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্যিক রচনাই শিশুসাহিত্য, অধিকাংশ সার্থক রচনা তো বটেই। এমন যে হয় তার কারণ, মানুষমাত্রেই মূলতঃ শিশু ; গল্প -শোনার শৈশব তার কিছুতেই কাটে না। এ সেই সিন্দবাদের স্কন্ধারোহী বৃদ্ধের বিপরীত আখ্যান। মানুষমাত্রেই সিন্দবাদ, কেবল বার্ধক্যের বদলে প্রত্যেকে নিজের শিশু সত্তাকে বহন করিয়া জীবনের পথে চলিয়াছে। সাহিত্যের সংবেদন এই শিশুটার প্রতি। তা ছাড়া অপর সংবেদনও অবশ্য আছে। শিশুর বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপরে নানা রকম সংস্কারের স্তর জমিয়া উঠিতে থাকে এবং শেষে এমন এক সময় আসে যখন ভিতরের শিশুটি বাহিরের স্তরবাহুল্যে চাপা পড়িয়া যায়। পদ্মের পাপড়ি একটির পর একটি খসাইয়া লইলে ভিতরের বীজকোষটিকে অব্যাহত দেখা যাইবে। সেই বীজকোষটিই মানুষের অন্তর্নিহিত শিশুসত্তা। অবশ্য, অনেক সময়ে সংস্কারের চাপে শিশুর মৃত্যু ঘটে। তাহারা নিতান্ত দুর্ভাগা ; ভালো মন্দ কোন সাহিত্যের সংবেদনই তাহাদের প্রতি নাই। নিম্নশ্রেণীর সাহিত্যের সংবেদন কেবল সংস্কারের স্তরগুলির উপর। প্রচারসাহিত্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শাশ্বত শ্রেণীর সাহিত্যের সংবেদন স্তরগুলির উপরেও, আবার এই সব স্তরোত্তীর্ণ শিশুটির প্রতিও। আর, রূপকথা-সাহিত্যের প্রধান সংবেদন সরাসরি স্তরাতিক্রমী শিশুটির প্রতি। এ দিক দিয়া শাশ্বত সাহিত্যে (classics) ও রূপকথায় ঘনিষ্ঠ ঐক্য ; দুইয়ের মধ্যে সংবেদনের সাম্যে গোড়ায় একটা মিল আছে। সেইজন্যই দেখা যায় যে পৃথিবীর অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ বই শিশুসাহিত্য না হইয়াও শিশুদের চিরপ্রিয়। ডন-কুইক্‌সটের ইতিহাস, গালিভারের ভ্রমণ, রবিন্‌সন্ ক্রুশোর কাহিনী, লা ফঁতেন-এর উপকথা, পিক্‌উইকের কীর্তিকাহিনী, পঞ্চতন্ত্র ও কথাসরিৎসাগর এই জাতীয় গ্রন্থ। আবার অনেকগুলি বিখ্যাত বই যাহা প্রধানতঃ শিশুসাহিত্য নামে পরিচিত তাহা বয়স্কদেরও প্রিয়। দেশ-বিদেশে-প্রচলিত রূপকথার কথাই ভাবিতেছি। হ্যান্‌স্ অ্যাণ্ডার্‌সন কর্তৃক সংগৃহীত গ্রন্থ এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কোনো বই সত্যই শিশুসাহিত্য কিনা তাহার প্রধান পরীক্ষা তাহা বয়স্কদের পাঠ্য কিনা। কোনো বইয়ে যদি শিশুমনের প্রতি প্রকৃত সংবেদন থাকে তবে তাহার বয়স্কের সংস্কারের স্তর ভেদ করিবার সামর্থ্যও থাকে। তাহার সে ক্ষমতা না থাকিলে তাহা নিশ্চয় শিশুসাহিত্য নয় ; কোনো শিশুর ভালো লাগিলেও লাগিতে পারে, চিরশিশুর কখনোই ভালো লাগিবে না। এই মনের দ্বারা বিচার করিলে বলিতে হইবে, অবনীন্দ্রনাথের বই শ্রেষ্ঠ অর্থে শিশুসাহিত্য, অর্থাৎ তাহা একাধারে শিশুর ও বয়স্কের, অর্থাৎ মানুষের অন্তঃস্থ চিরশিশুর প্রিয়। তাঁহার রাজকাহিনী, নালক, ভূতপত্রী, কোন্ শিশুর না প্রিয় ? কোন্ বয়স্কের না প্রিয় ? এমন বয়স্ক যদি কেহ থাকে যে তাহার এ সব বই প্রিয় নয়, তবে বুঝিতে হইবে নানা সংস্কারের চাপে তাহার চিরশিশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের বাদশা এবং সেই কারণেই তিনি বয়স্কের সাহিত্যের রাজা।

৫

রূপকথার রূপ শব্দটির অর্থ কি? বিশেষ কোনো অর্থ আছে না উপকথার উচ্চারণ অপভ্রংশে এমনটি দাঁড়াইয়াছে? যেমনি হোক, রূপকথায় একটি-বিশেষ ইঙ্গিত আছে যাহা উপকথায় নাই। রূপ-কথা কাহিনীর পট মেলিবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সমুখে একটা রূপের সৃষ্টি করিতে থাকে। এই রূপসৃষ্টির সার্থকতার জন্য ইহার নাম রূপকথা। কিন্তু ইহা তো বিশেষ ভাবে রূপকথার লক্ষণ নয়। সাহিত্য মাত্রেরই কাজ রূপের সৃষ্টি, তবে রূপকথার জন্য এই সামান্য লক্ষণের দাবি করি কি ভাবে! কিন্তু তবু একটু প্রভেদ আছে। রূপকথা কেবল রূপেরই সৃষ্টি করে। অন্যান্য কাব্য সাহিত্য রূপেরও সৃষ্টি করে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য রসেরও সৃষ্টি করে; পাঠকের চিন্তার উদ্রেক করে, পাঠকের ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করে। রূপের বেসাতি তাহার একমাত্র কাজ নয়, তাহার কাজ অনেক জটিল। সেইজন্যই তাহা বিশেষ ভাবে রূপকথা নয়। রূপকথার ও শাশ্বত সাহিত্যের মিলের উল্লেখ করিয়াছি; সে মিলটা এইখানে— রূপসৃষ্টিতে। অমিলের উল্লেখও করিয়াছি— তাহাও এইখানে; রূপকথার লক্ষ্য মাত্র একটি, অন্য সাহিত্যের লক্ষ্য একাধিক, কেবল রূপসৃষ্টি করিলে তাহার চলে না। চলে যে না তার কারণ অন্য সাহিত্য বয়স্ক মানুষের জন্য সৃষ্টি; তাহার চাহিদা বিস্তর, কেবল রূপবিস্তার করিয়া তাহার চোখকে তৃপ্ত করিলে চলে না— তাহার চিৎশক্তিকে, তাহার ইচ্ছাশক্তিকে খোরাক জোগাইতে হয়; তাহার নানা সংস্কারকে পোষণ করিতে হয়। শিশুমনের চাহিদা অনেক সরল; কেবল রূপ সৃষ্টি করিয়া তাহার চোখ দুটিকে তৃপ্ত করিতে পারিলেই আর কিছু সে চাহে না। রূপকথার প্রধান লক্ষণ নিছক রূপসৃষ্টি।

রূপকথার দ্বিতীয় লক্ষণ উহাতে দেশ ও কালের কৈবল্য-সাধন। বিশিষ্টলক্ষণযুক্ত দেশহীনতা এবং কালহীনতা ইহার প্রধান সহায়। অর্থাৎ রূপকথায় ভূগোল ও ইতিহাস নাই। সব দেশের বাহিরে কোন দেশে রূপকথার লীলা। আর কালের স্রোত সেখানে স্তব্ধ। সেখানে বয়স হয় তো বাড়ে কিন্তু স্বভাব বদলায় না; বড়জোর শিশুর বয়স বাড়িয়া সেখানে চিরশিশুতে রূপান্তরিত হয়। ডন্‌কুইকসট্‌ ও পিক্‌উইক এই সময়হীন সময়ের অধিবাসী; তাহাদের বয়স হয়তো বাড়িয়াছে কিন্তু স্বভাবের পরিবর্তন হয় নাই।

রূপকথার জগৎ বিশিষ্টার্থে দেশহীন ও কালহীন বলিয়াই এখানে কিম্ভুত-রস বা আজগবি-রসের সৃষ্টি এমন সহজ। কিম্ভুতরস আর কিছুই নয়, জীবনের স্বাভাবিক তালপরিবর্তনই কিম্ভুতরস। যে তালে আমরা প্রাত্যহিক জগতে পা ফেলি কিম্ভুত জগতের পা-ফেলার তাল তাহা হইতে স্বতন্ত্র। প্রাত্যহিক 'দেশ' ও 'কাল'কে বিদায় করিয়া দিয়া এই স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করা হয়।

অবনীন্দ্রনাথের রচনা হইতে সবগুলি লক্ষণেরই দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। রাজস্থানের বীরপুরুষ ও রমণীরা ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ের লোক। কিন্তু 'রাজকাহিনী'র জগতে আসিয়া যখন তাঁহারা প্রবেশ করিতেছেন তখন তাঁহারা কালোত্তীর্ণ, দেশোত্তীর্ণ ব্যক্তি; তাঁহারা রূপকথার মানুষ। তখন আর তাঁহাদের বয়সের প্রশ্ন, স্বভাবের প্রশ্ন মনেই ওঠে না। সংসারে মানুষ 'জীবনযাপন' করে; যাপন শব্দের মধ্যে গতির ইঙ্গিত আছে। কিন্তু রূপকথার জগতে নরনারী লীলা করে মাত্র; লীলার মধ্যে 'চঞ্চলতা' আছে, কিন্তু 'গতি' নাই। গতি স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়; চঞ্চলতা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আবার পুরাতন স্থানেই লইয়া আসে— কিন্তু চঞ্চলতা আছে বলিয়াই পূর্বতন পুরাতন হয় না, তাহাকে

বলি আমরা 'নিত্য'। ইহার অপর নাম নৃত্য। রূপকথার জগৎ নৃত্যের জগৎ; প্রাত্যহিক জগৎ শতগজি দৌড়ের জগৎ; এই সংস্কারের আধুনিক নাম প্রগতি।

আবার কিম্ভূত-রসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ভূতপত্রীর দেশে, খাজাঞ্চির খাতায়, বুড়ো আংলাতে। ভূতপত্রীর দেশ উল্টা-ছায়ার দেশ; জীবনের সত্য তাহাতে আছে, কেবল উল্টাভাবে মাত্র আছে; এই উল্টাকে স্বাভাবিক করা হইয়াছে দেশ ও কালের স্বভাবকে গোড়া হইতেই বর্জনের দ্বারা। সেখানে পালকি চলে কিন্তু এগোয় না; সেখানে উপরে উঠিতে হইলে নিচে নামিতে হয়, সেখানে চোখ মেলিয়া ঘুমানো, আবার তাকাইয়া থাকিলে তবেই ঘুম পায়।

এমন কি 'পথে-বিপথে'র মতো বই, তাহার অধিকাংশ গল্পই গঙ্গায় স্টিমারে বেড়ানোর গল্পমাত্র, লেখকের কলমের জাদুকাঠিতে তাহাও রূপকথার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অতিশয় কঠিন কাজ। এক পা সত্যের নৌকায় আর-এক পা রূপকথার নৌকায় রাখিয়া চলার মতো কঠিন কাজ আর কিছু আছে বলিয়া জানি না। আনাড়ির যাহাতে পদে পদে পতনের আশঙ্কা অবনীন্দ্রনাথের তাহাতে ওস্তাদির অন্ত নাই। স্বপ্ন ও সত্যের মিশ্রণে তাঁহার যেমন কৃতিত্ব এমন আর কিছুতে নয়; এই বিষম ধাতুতে তৈয়ারি তাঁহার ভূতপত্রীর দেশ, বুড়ো আংলা, খাতাঞ্চির খাতা; এমন কি পথে-বিপথেও এই বিষমের রচনা। সত্য কথা বলিতে কি, অবনীন্দ্রনাথ সত্য ও স্বপ্নের সীমান্তপ্রদেশের লেখক; এই দুই জগতের খবর তাঁহার রচনায় যেমন পাই, এমন তো আর কোথাও দেখি না।

৬

সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা করিয়া সাহিত্যরস বুঝানো সম্ভব নয়। তবু সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ, রসবিচারই সাহিত্যের একমাত্র বিচার নয়। সাহিত্যক্ষেত্রে তত্ত্ববিচার গৌণ, রসবিচার মুখ্য। আবার রসবিচারের প্রকৃষ্টতম পন্থা রচনাপাঠ। রচনাপাঠ ছাড়া আর কোনো উপায়েই রচনার উপলব্ধি সম্ভব নয়। এবারে অবনীন্দ্রনাথের রচনা হইতেই কোনো কোনো অংশ উদ্ধার করিয়া তাঁহার যথার্থ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।—

পুষ্পবতী যত্ন কোরে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি, আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল, একগাছি সোনার তার, সরু হ'তেও সরু একটি সোনার [illegible] পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মতো পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোলতার হুলের মতো বিঁধে গেল! যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন, একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রূপোর চাদরে রাঙা এক টুক্‌রো মণির মতো ঝক্ ঝক্ করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্ম্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; ক্রমশ ক্রমশ বড় হ'য়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেল্লে।

… … …

হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে ডানার একটুখানি ঝটাপট্ সেই ঘুমন্ত শিক্‌রে পাখীর কানে পৌঁছল, সে ডানা ঝেড়ে ঘাড় ফুলিয়ে বাদশাহের হাতে সোজা হ'য়ে বস্‌লো। আলাউদ্দিন বুঝলেন, তাঁর শিকারী বাজ নিশ্চয়ই কোনো শিকারের সন্ধান পেয়েছে। তিনি আকাশে চেয়ে দেখ্‌লেন, মাথার উপর দিয়ে দু'খানি পান্নার টুক্‌রোর মতো এক-জোড়া শুক-শারী উড়ে চলেছে। বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন; তখন সেই প্রকাণ্ড পাখী বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দু'খানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো, তারপরে একেবারে তিনশ গজ আকাশের উপর থেকে, একটুক্‌রো পাথরের মতো, সেই দুটি শুক-শারীর মাঝে এসে পড়লো।

রূপকথার প্রধান দায়িত্ব রূপের বা ছবির সৃষ্টি। উদ্ধৃত অংশ দুটিতে ছবি কি নিখুঁত। আর সে ছবির রঙের ছায়াতপের কি সুষমা। শুকশারীর রঙ পান্নার চেয়ে গাঢ়, কিন্তু ঘননীল আকাশের পটে তাহাদের ফিকে দেখাইতেছে; তাহাদের রঙ তুলনায় লঘুতর হইয়া পান্নার স্বচ্ছতায় নামিয়া আসিয়াছে।

পদ্মিনী কাহিনীতে অর্ধরাত্রে চিতোরেশ্বরীর আবির্ভাব এবং সখীসহ পদ্মিনীর জৌহর ব্রতে আত্ম-বিসর্জন, পাঠককে আর একবার পড়িতে অনুরোধ করি। এ দুটিও রূপসৃষ্টি, কিন্তু একটি কি করুণ, আর একটি কি ভয়ঙ্কর— গা ছম্ ছম করিয়া ওঠে।

নালকের একটি বর্ণনা—

সন্ধ্যাবেলা। নীল আকাশে কোনোখানে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশগঙ্গা এক টুকরো আলোর জালের মতো উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত দেখা দিয়েছে। দেবল ঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন 'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়'; মায়ের কোলে ছেলে শুনছে 'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়'; ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন 'নমো নমো'; বুড়ি দিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনছেন 'নমো'; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বল্‌ছেন—ওরে নোমো কর্, নোমো কর্। গ্রামের ঠাকুর-বাড়ির শাঁখ-ঘণ্টা ঋষির গানের সঙ্গে এক তানে বেজে উঠছে— নমো নমো! রাত যখন ভোর হ'য়ে এসেছে, শিশিরে ধুয়ে পদ্ম যখন বলছে নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বল্‌ছেন নমো, সমস্ত সকালের আলো পৃথিবীর মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে যখন বল্‌ছেন, নমো, সেই সময়ে ঘুম ভেঙে নালক উঠে বসেছে আর অমনি ঋষি এসে দেখা দিয়েছেন।

আবার জোড়াসাঁকোর ধারের পোনর অধ্যায়ে গঙ্গার যে ছবি আছে তাহা পাঠককে বারংবার পড়িতে অনুরোধ করি। একবার এই ছবির মাধুর্যের জন্য, দ্বিতীয়বার অবনীন্দ্রনাথের মনের পরিচয় পাইবার জন্য। বার দুই পড়িলে আরও পড়িতে হইবে; এমনি মোহ আছে এই ছবিতে, এমনই মোহ আছে অবনীন্দ্রনাথের সব লেখায়। গঙ্গাকে এমন করিয়া আর কে দেখিয়াছে, গঙ্গাকে আর কে এমন ভালবাসিয়াছে। ভক্তরা শুধু মন দিয়া গঙ্গাকে দেখে; আর এই শিল্পীভক্ত সুরধুনীকে মন দিয়া, প্রাণ দিয়া, চোখ দিয়া দেখিয়াছেন। তাই তো অবনীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়াছেন, "তারা [আধুনিক ভারতীয় শিল্পী] ভারতকে দেখতে শেখেনি, দেখেনি। এ আমি অতি জোরের সঙ্গেই বলছি। আমি দেখেছি, নানারূপে মা গঙ্গাকে দেখেছি।"

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরীতিতে নানা দেশের প্রভাব থাকিতে পারে কিন্তু এমন ভারত-দেখা চোখ, ভারত-ঘেঁষা মন, দেশ-ভালবাসা প্রাণ আর কোথায়? তিনি একান্তভাবে ভারতীয় বলিয়াই নানা রীতির প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কারণ, মূলে এক জায়গায় সংকীর্ণ না হইলে বৃহৎকে গ্রহণ করা যায় না। মৌলিক সেই সংকীর্ণতার নামই ব্যক্তিত্ব। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার শেষতম দুইখানি বইয়ে আসিয়া পড়িয়াছি— ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারে। নানা কারণে এ দুখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

৭

অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইখানিতে তাঁহার রচনারীতি চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং এই দুইখানিতে একাধারে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ও সামাজিক মানুষ অবনীন্দ্রনাথের জীবনকথা লিপিবদ্ধ। জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, ঘরোয়া

ও জোড়াসাঁকোর ধারে— এই চারখানি বইয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যায়। যে আবহাওয়ার মধ্যে লোকোত্তর দুইজন মনীষী জন্মিয়াছেন, বাড়িয়া উঠিয়াছেন, যে আবহাওয়ায় তৎকালীন নব্যবঙ্গসংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, এই বই চারখানি তাহার ইতিহাস বুঝিতে যেমন সাহায্য করে এমন আর কোথায় ? যে যুগে ইঁহারা জন্মিয়াছিলেন সে যুগ এখন ইতিহাসের অঙ্কগত, সে ঘটনার পরিণাম প্রায় পঞ্চম অঙ্কের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে— যবনিকা পড়ি-পড়ি করিতেছে— বিদায়ঘণ্টার ধাতুফলক লক্ষ্য করিয়া ঘণ্টাবাদকের নির্মম হস্ত উদ্যতপ্রায়। সে যুগ ছিল ময়লা চাদরের, পাদুকাহীন কর্দম-অঙ্কিত পায়ের ! সে যুগ ছিল ঝাড়লণ্ঠনের, প্রশস্ত জাজিম-পাতা উদার ফরাশের। মৌচাকের মতো কক্ষবহুল বাড়িগুলি নিকট ও দূর আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে মৌচাকের মতোই গুঞ্জনমুখর থাকিত। মূল্যবান চেয়ারের অনমনীয় সংকীর্ণতা তখনো আহ্বানের উদারতাকে সংকুচিত করিয়া তোলে নাই। আধুনিক সভ্যতার সদাগরপুত্রের জাহাজখানা সবে ঘাটে আসিয়া ভিড়িয়াছে— সে তখনো ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়া আপনকে পর করিবার সর্বনাশা মন্ত্রে সকলকে স্বার্থপরতার দীক্ষাদান করিতে সমর্থ হয় নাই। শহর ও পল্লী তখনো শৈশবের ঐক্য ঘুচাইয়া এমন নিষ্ঠুর স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে নাই। কেবল রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ যে সেই সময়ের মানুষ এমন নয়, যে নব্যবঙ্গসংস্কৃতির গৌরব আমরা করিয়া থাকি তাহাও সেই যুগের স্তন্যে লালিত। এই যুগের সামাজিক মনের ও মনের প্রতিক্রিয়ার পরিচয় যেমন এই বইগুলিতে আছে বাংলা সাহিত্যে তেমন আর কোথাও দেখি নাই। এবং এই দিক দিয়া বিচার করিলে বই চারখানা বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের একটা সময়ের দলিলরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু দলিলহিসাবে যে মূল্য ইহাদের থাকুক, ইহাদের মুখ্য মূল্য সাহিত্যহিসাবে। এই মুখ্য ও গৌণ রূপ মিলাইয়া ইহাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

সেকালের জোড়াসাঁকোর বাড়ির যে ছবি জোড়াসাঁকোর ধারে ও ঘরোয়াতে পাই তাহার তুলনা নাই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বাংলাসাহিত্যের ক্ষুধিতপাষাণের প্রাসাদ। বাংলাদেশের প্রভাতের আশা এবং অপরাহ্নের ম্লানিমা এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিরাজমান! এই প্রাসাদ এককালে পুরাতন অভিজাত্যের বিবিক্ত উদারতা দেখিয়াছে, আবার নবজাগ্রত মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্থূল কর্মোদ্যমেরও ইহা সাক্ষী। গত দেড় শ বছরের কলিকাতার কোন্ ধনী, মানী, জ্ঞানী, কোন্ অভিজাত না এই বাড়িতে সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায়, সংকোচে, গৌরবে পদার্পণ করিয়াছেন— আবার নূতনক্ষমতাপুষ্ট মধ্যবিত্তসম্প্রদায় সেদিন শোকের শ্রাবণের অপরাহ্নে বাঁধভাঙা বন্যার উচ্ছ্বাসে প্রবেশ করিয়া সমগ্র জাতির সম্মিলিত অশ্রুর প্রবাহে কবিগুরুর মৃতদেহ ভাসাইয়া লইয়া গেল ; এই প্রাসাদ সেই যুগলক্ষণাক্রান্ত ঘটনারও সাক্ষী। প্রাচীন পল্লী-কলিকাতার কেন্দ্রশায়ী এই প্রাসাদ আধুনিক যন্ত্রগঠিত কলিকাতার একান্তশায়ী। ইহা আর কেবল ধনীপরিবার-মাত্রের বাস্তুভিটা নয় — ইহা দুই যুগের প্রত্যন্তসীমায় প্রহরীরূপী দুর্গপ্রাসাদ।

রূপকথার ওস্তাদ শিল্পীর কলম-তুলির স্পর্শে এই বাড়ির কর্তা মনিব, আত্মীয় আগন্তুক, চাকর দাসী, মায় গাছপালাগুলি পর্যন্ত জীবন্ত, রূপকথার অলৌকিকতায় সমৃদ্ধ। দক্ষিণের বারান্দায় পুরুষানুক্রমে চৌকি পাতিয়া বসা। একদিন বাড়ির ছোট ছেলেটি বয়স্কদের আনাচে কানাচে ঘুরিত ; কিছুকাল পরে সে আবার বয়সের গৌরবে চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল, তাহার পায়ের কাছে ছেলেরা আবার তেমনি করিয়া ঘোরা ফিরা করে। দক্ষিণের বারান্দার প্রবীণ শিল্পীর পায়ের কাছে ক্রমে ক্রমে নবীন

শিল্পীদের ভিড় জমিতে থাকে। ও-বাড়ির তেতলার ছাদে সন্ধ্যাবেলায় আসর জমে; কিশোর কবির নবীন গান; গভীর রাত্রে তেতলার ছাদে দীর্ঘছায়ানিক্ষেপী বাণীর ছায়াপ্রতীকের মতো যুবক কবির নিঃশব্দ পদচারণ; শরৎকালের প্রভাতে চাদরের প্রান্তে একমুঠা বেলফুল বাঁধিয়া দক্ষিণের বারান্দায় কবির নীরব বৈতালিক। দক্ষিণের বারান্দায় স্বপ্নপ্রয়াণ-পাঠরত কবির ও রসিক শ্রোতা রাজনারায়ণ বসুর উচ্চকিত অট্টহাস্য ও-বাড়ির বালক দূর হইতে শুনিতে পায়। ও-বাড়ির বালক শিল্পী উঁকি মারিয়া দেখিতে পায়, এ-বাড়ির বারান্দায় দ্বিপ্রহরের আহারান্তে কর্তা দাদামহাশয় আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন; কখনো দেখিতে পায়, শালের পাগড়ির তলে বঙ্কিমচন্দ্রের চাপা অধরোষ্ঠ। এ-বাড়ির বালক কবি দেখিতে পায়, ও-বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোময়; দেউড়িতে জুড়িগাড়ির ভিড়; নাচঘর হইতে উচ্ছ্বসিত গানের সঙ্গে হাসির শুভ্রফেনা; দক্ষিণের পুকুরপারে নানা প্রকৃতির স্নানার্থীর জনতা; পুরানো বটের প্রতিদিন নূতন ছায়া-নিক্ষেপ। দক্ষিণের বাগানে বিকালবেলা চৌকি পাতিয়া ও-বাড়ির কর্তাদের আসর জমিয়া ওঠে; ফোয়ারার জল পিচকারি ছোঁড়ে আর কৃত্রিম হাঁসের দল ভাসিয়া বেড়ায়।

যুগে যুগে কত-না আগন্তুক এই বাড়িতে! পালকি হইতে দেওয়ানজীর অবতরণ; চটি চাদরে বিদ্যাসাগর; ভাঙা গলায় টানা সুরে মাইকেলের মেঘনাদবধ-আবৃত্তি; আত্মনিমগ্ন বিহারীলালের সারদামঙ্গলের স্বগতভাষণ; তানপুরা-মাত্র-সঙ্গী শ্রীকণ্ঠ সিংহ ঘরে ঘরে গান গাহিয়া ফিরিতেছেন; দরজায় লাট-বেলাটের ছাপ-মারা গাড়ি! তারপরে কতকাল চলিয়া যায়— ক্রমে শিল্পী, সাধক, রসিকরা আসিতে থাকে। জাপানী পুতুলের মতো জাপানী সাধক ওকাকুরা; তপস্বিনী উমার সহোদরার মতো ভগিনী নিবেদিতা; চৌকাঠের কাছে ইতস্ততঃশীল ব্রহ্মবান্ধব। তারপরে আরও যুগ যায়। শিরা-বাহির-করা দৃঢ় মুষ্টিতে ধৃতযষ্টি গান্ধীর প্রবেশ; দ্রুতপদবিক্ষেপে কাঠের সিঁড়ি দিয়া বালকের উৎসাহে জহরলাল দোতলায় উঠিতেছেন! রামমোহন হইতে গান্ধী! ঊনবিংশ শতকের ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে বিংশ শতকের মধ্যাহ্ন! ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রারম্ভ হইতে ব্রিটিশ রাজত্বের উপান্ত! সদ্যজাগ্রত অভিজাত্যের আদি হইতে ক্লান্তপ্রায় মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের যুগান্ত। নব্যবঙ্গসংস্কৃতির সমগ্র স্বরসপ্তকের সঙ্গে পরিচিত এই প্রাসাদ। ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বনি ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতিধ্বনি এখানে বসিয়া শোনা যায়। জোড়াসাঁকোর এই বাড়ি বাংলাসাহিত্যের ক্ষুধিতপাষাণ।

এই ক্ষুধিতপাষাণের কথা আছে ঘরোয়া আর জোড়াসাঁকোর ধারে-তে। সবটাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে অপরাহ্ণিক বিষাদের একটা ছায়া, যুগাবসানের ক্লান্তি, জীবনাবসানের প্রশান্ত করুণতা। যে-আদর্শের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছিলেন সেই আদর্শের নিষ্ফল অভিসার জীবনের সায়াহ্নে আজ শিল্পীকে ভিতরে ভিতরে ব্যথাইয়া তুলিয়াছে। চারিদিক সেই আদর্শের কীর্তিচূড়ার স্খলনের শব্দে ধ্বনিত; তার তলে শিল্পীর হৃদয় চাপা পড়িয়া গুমরিয়া গুমরিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। কান পাতিয়া শুনিলে বই দুইখানিতে সেই চাপা আর্তনাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

"কত অভিনয় কত খেলা ক'রে, কত সুখদুঃখের দিন কাটিয়ে, সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ি মাড়োয়ারী ধনীকে বেচে বের হ'তে হ'ল যেদিন আমার নিজের ছেলেপিলে বউঝি নিয়ে…" এ একটি যুগ-লক্ষণাক্রান্ত বিশেষ ঘটনা। কেবল পরিবারবিশেষের বাস্তুভিটা-পরিত্যাগ নয়। দেউলে পুরাতন আদর্শের নূতনকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া পথে বাহির হওয়া। গৃহলালিত শিল্পের বাজারে আসিয়া দোকান-তোলা! নূতন যুগের নূতন হাওয়া!—

সেই শোকের শ্রাবণের অপরাহ্নে সমগ্র ভারতের সম্মিলিত অশ্রুপ্রবাহে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

শিল্পী শ্রী[illegible] কর   পৃ ১৩৪
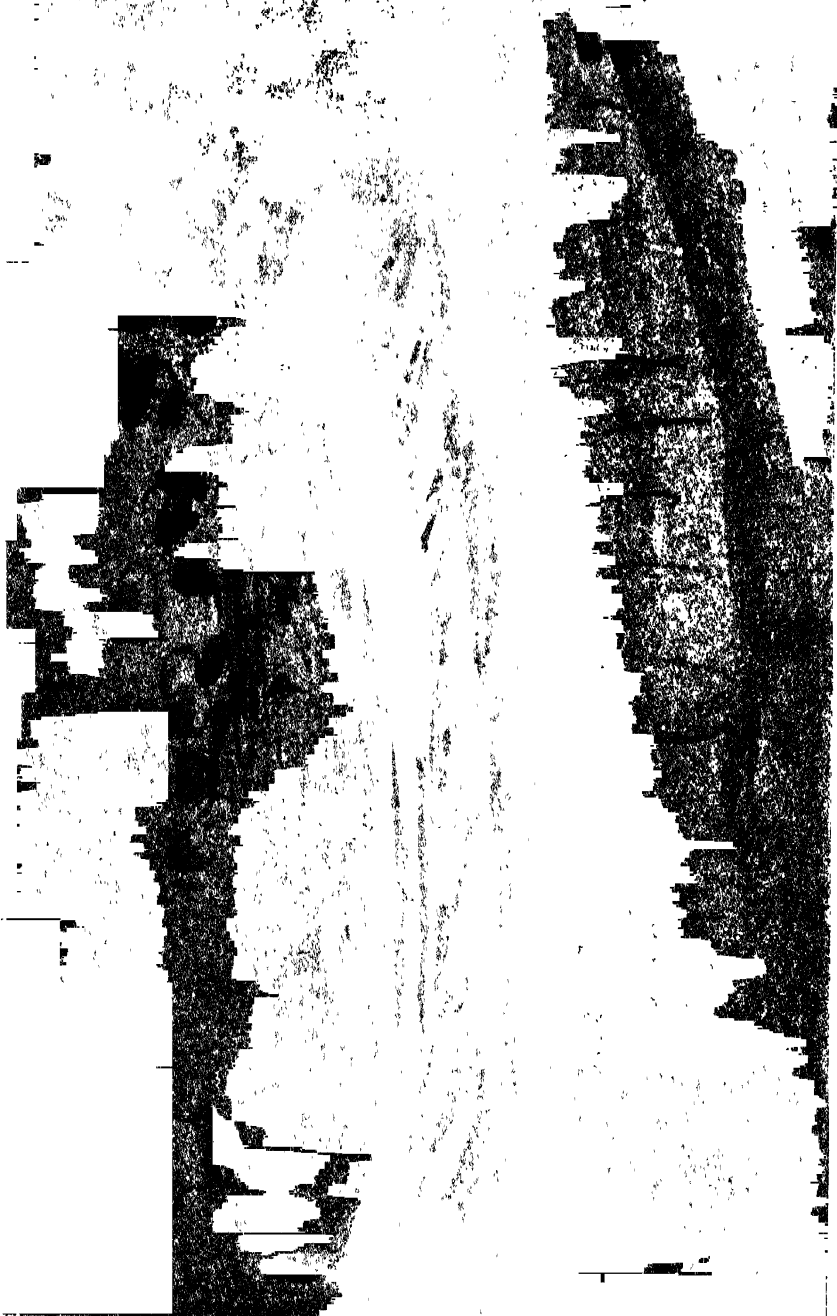
বরজ করজোড়ে কহিল, প্রভু, মোদের সভা হ'ল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ।

• এ আর শুধু বরজলালের গানভঙ্গ নয়, একেবারে তাহার গৃহভঙ্গ !

কথায় কথায় অবনীন্দ্রনাথের শেষ-জীবনে আসিয়া পড়িয়াছি। তিনি নিজেও তাঁহার জীবনান্তের সমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। জীবনকথালেখক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আর একবার শৈশবে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন আবার নূতন করিয়া তাঁহার ছেলেখেলা শুরু হইয়াছে। রঙ, কৌশল, শিল্পজটিলতা একে একে সব ঝরিয়া গিয়াছে— আছে কেবল তাঁহার শিশুদের পুতুলগুলি। একদিন শৈশবে পুতুল খেলিয়াছেন; আজ পরিণত শৈশবে তিনি পুতুল তৈরি করিয়া সময় যাপন করেন; সে পুতুল লইয়া তাঁহার অন্তরের চিরশিশু খেলা করে। এখন আর তিনি রাজকাহিনীর বর্ণাঢ্য রচনা লেখেন না; বর্ণবিরল, ঘটনাবিরল যাত্রা লেখেন— মারুতির পুঁথির কিষ্টুতের দেশে চিরশিশু যথেচ্ছ বিহার করিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার চিত্রও এখন বর্ণরূপ পারিপাট্য ত্যাগ করিয়া সরলতম রেখায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। "আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার।"—

অলকার রংছুট ময়ূরী এলো। সে-জগতে সে রঙের অপেক্ষা রাখে না। সেই যে কুঞ্জে নূপুর বাজে সেখানে রঙছুট ময়ূরী খেলা করে। বিরহের গভীর সুর বাজে। মন-ময়ূরী একলা।...... রংছুট ছবি। ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে এলো সবুজ রং।

অবনীন্দ্রনাথের পরিণত শিল্প, কি চিত্রে, কি সাহিত্যে, এই রংছুট ময়ূরী। শিল্পের চিত্রবর্ণ কলাপ ঝরিয়া গিয়া আজ সে শুভ্র ডানা বিস্তার করিয়াছে। এই শুভ্রতাই পূর্ণতা। যে খেলাঘরে শিল্পী আজ রংছুট ময়ূরীর সঙ্গে পুতুলখেলায় নিরত সেই খেলাঘর জীবন-তানের 'সম'; যে শিশু আজ তিনি পুনরায় হইয়াছেন সেই শিশুই চিরশিশু যাহার সন্ধান তিনি সারা জীবন করিয়া ফিরিয়াছেন, রূপকাহিনীর শিশুচরিত্র সৃষ্টি করিয়া যাহাকে পান নাই, আজ তাহাকে নিজের মধ্যেই পাইয়াছেন। শিল্পীর এমন 'সমে' প্রত্যাবর্তন শিল্পের ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা যায়।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত

বাংলা

শকুন্তলা। বাল্যগ্রন্থাবলী—১। শ্রাবণ ১৩০২ (ইং ১৮৯৫)। পৃ. ২৯।

"শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক চিত্রাঙ্কিত।"

ক্ষীরের পুতুল। (সচিত্র)। বাল্যগ্রন্থাবলী—৩। ফাল্গুন ১৩০২ সাল (১৮ মার্চ ১৮৯৬)। পৃ. ৪৫।

রাজকাহিনী (সচিত্র) প্রথম খণ্ড (মেবার)। ? (২৮ জুন ১৯০৯)। পৃ. ৮১।

সূচী: শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্‌পাদিত্য, পদ্মিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড। (সচিত্র)। ? (ইং ১৯৩১—বাং ১৩৩৭)। পৃ. ১৫০।

সূচী: হাম্বির, হাম্বির (রাজ্যলাভ), চণ্ড, রাণা কুম্ভ, সংগ্রাম সিংহ (ভায়ে-ভায়ে)।

ভারত শিল্প। ? (৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৯)। পৃ. ৮৮।

সূচী: স্পষ্ট কথা, কি ও কেন? পরিচয়, মানস চর্চা, শিল্পে ত্রিমূর্ত্তি, শিল্পের ত্রিধারা, আর্ট ও আর্টিষ্ট।

ভূতপত্‌রীর দেশ। (সচিত্র)। ? (ইং ১৯১৫)। পৃ. ৬৫।

নালক। (বৌদ্ধ জাতক অবলম্বনে)। ? (ইং ১৯১৬)। পৃ. ৮৭।

পথে-বিপথে। চৈত্র ১৩২৫ (ইং ১৯১৯)। পৃ. ১৪৩।

ইহা তিন অংশে বিভক্ত—নদী-নীরে, সিন্ধু-তীরে, গিরি-শিখরে।

সূচী: নদী-নীরে—মোহিনী, অস্থি, গুরুজী, টুপি, দোশালা, মাতু, শেমুখী, ইন্দু, অরোরা, পর্-ঈ-তাউস্, ছাই-ভস্ম, লুকি-বিন্তে। সিন্ধু-তীরে—গমনাগমন। গিরি-শিখরে—নিক্রমণ, আরোহণ, বিচরণ।

বাংলার ব্রত (সচিত্র)। ? (ইং ১৯১৯)। পৃ. ৬০+আল্‌পনা-চিত্র ১২০+২খানি ত্রিবর্ণ চিত্র।

১৩৫০ সালের শ্রাবণ মাসে বিশ্বভারতী কর্তৃক "বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে" সংক্ষিপ্ত আকারে পুনর্মুদ্রিত।

খাতাঞ্চির খাতা। ছেলেদের উপন্যাস (সচিত্র)। ? (ইং ১৯২১)। পৃ. ৭০।

প্রিয়দর্শিকা। (ইং ১৯২১)। পৃ. ১৪।

চিত্রাক্ষর। ? (বাং ১৩৩৬)।

লিথোয় মুদ্রিত। চিত্রের সাহায্যে বাংলা বর্ণমালা ও ১-৯ সংখ্যার পরিচয়।

বুড়ো-আংলা। (ছেলেদের উপন্যাস। সচিত্র)। শ্রাবণ ১৩৪৮ (ইং ১৯৪১)। পৃ. ১৮৮।

ঘরোয়া। (স্মৃতিকথা)। আশ্বিন ১৩৪৮ (ইং ১৯৪১)। পৃ. ১৭১+১।

অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিবৃত ও শ্রীরানী চন্দ কর্তৃক লিখিত।

বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী [১৯২১—১৯২৯]। ইং ১৯৪১। পৃ. ৩৯৫।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগীশ্বরী অধ্যাপকরূপে প্রদত্ত বক্তৃতামালা।

সূচী: শিল্পে অনধিকার; শিল্পে অধিকার; দৃষ্টি ও সৃষ্টি; শিল্প ও ভাষা; শিল্পের সচলতা ও অচলতা। সৌন্দর্যের সন্ধান; শিল্প ও দেহতত্ত্ব; অন্তর বাহির; মত ও মন্ত্র; সন্ধ্যার উৎসব; শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড; শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড; শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভালমন্দ; শিল্পবৃত্তি; সুন্দর; অসুন্দর; জাতি ও শিল্প; অরূপ না

রূপ; রূপবিদ্যা; রূপ দেখা; স্মৃতি ও শক্তি; আর্য ও অনার্য শিল্প; আর্যশিল্পের ক্রম; রূপ; খেলার পুতুল; রূপের মান ও পরিমাণ; ভাব; লাবণ্য; সাদৃশ্য।

জোড়াসাঁকোর ধারে। (স্মৃতিকথা)। কার্ত্তিক ১৩৫১ (ইং ১৯৪৪)। পৃ. ১৫১।

অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিবৃত ও শ্রীরানী চন্দ কর্তৃক লিখিত।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনা

সাময়িকপত্রে, বিশেষতঃ ছেলেদের কাগজে ও বার্ষিকীতে অবনীন্দ্রনাথের বহু রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ১৩০৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত তাঁহার "দেবীপ্রতিমা" গল্পটি এবং মাসিক 'বঙ্গবাণী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "আপন কথা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল রচনা সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

ইংরেজী

Some Notes on Indian Artistic Anatomy. March 1914. Plates 22. Pp. ii+15.

Sadanga or the Six Limbs of Painting. 16 June 1921. Pp. iii+25.

অঙ্কিত চিত্রের সংগ্রহ-গ্রন্থ ও চিত্রিত গ্রন্থ

বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির অবনীন্দ্র-সংখ্যায় (মে-অক্টোবর ১৯৪২) শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রাবলীর একটি সূচী প্রকাশ করিয়াছেন। এই তালিকার অন্তর্গত অনেকগুলি চিত্র বিভিন্ন সময়ে সাধনা, প্রবাসী, ভারতী, প্রাচী, বঙ্গবাণী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বঙ্গশ্রী, মৌচাক, চিত্রা, বঙ্গলক্ষ্মী, বসুমতী, মডার্ন রিভিউ, ক্যালকাটা রিভিউ, রূপম্, জর্নাল অব দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট, বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, স্টুডিয়ো, L'Art Decoratif প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই চিত্রগুলির উল্লেখযোগ্য কোনো সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে মুদ্রিত কতকগুলি চিত্র, প্রবাসী প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত 'চ্যাটার্জিস পিক্‌চার অ্যালবাম'-এর বিভিন্ন খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। কেবল অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের কোনো অ্যালবামের সন্ধান পাই নাই, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এ প্রাপ্তব্য নিম্নোল্লিখিত একখানি পোর্টফোলিও ছাড়া :

Art of Abanindronath Tagore.

চিত্রসূচী : The Gardener's Daughter ; The Daughter of the Soil ; The Boy Actor ; Nurjehan; Mahatma Gandhi, the Spinner of Nation's Destiny ; The Flower Offerings ; The Flute-player ; Zebunnisa ; Sindbad the Sailor ; The Javanese Dancer ; Basantasena; The Heroine of the Clay-cart.

উক্ত সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত অন্য কয়েকখানি অ্যালবামে অবনীন্দ্রনাথের কতকগুলি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত সোসাইটি, ও ইণ্ডিয়ান প্রেস, অবনীন্দ্রনাথের কতকগুলি চিত্রের সুমুদ্রিত প্রতিলিপি স্বতন্ত্রভাবেও প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্বোল্লিখিত বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির অবনীন্দ্র-সংখ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত পঞ্চাশোর্ধ একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। 'ফোর্ আর্ট্‌স্

অ্যানুয়্যাল'-এর ১৯৩৫ সালের সংখ্যাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ; ইহার Life of Abanindra Nath Tagore in Paintings বিভাগে অবনীন্দ্রনাথের বহু চিত্রের প্রতিলিপি আছে।

স্বরচিত কোনো কোনো পুস্তক ব্যতীত অপরের কোনো কোনো গ্রন্থও তিনি চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন ; তাহার কয়েকখানির পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল :

চিত্রাঙ্গদা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত। ২৮ ভাদ্র ১২৯৯। পরবর্তী সংস্করণ হইতে চিত্রগুলি পরিত্যক্ত হয়।

The Rubaiyat of Omar Khayyam. Translated by Edward Fitzgerald. With Coloured Plates from Drawings by Abanindro Nath Tagore. London.

ইহাতে সাতখানি বহুবর্ণ চিত্র আছে। ইহা প্রথমে (ইং ১৯১১ ?) পোর্টফোলিও আকারে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে বারখানি বহুবর্ণ চিত্র এবং স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত ফিট্‌জেরাল্ডের-এর অনুবাদ ছিল।

The Parrot's Training. By Rabindranath Tagore. With Eight Drawings by Abanindra Nath Tagore. 1918.

Bengal Fairy Tales. By F. B. Bradley-Birt. With Illustrations by Abanindranath Tagore. MCMXX.

চিত্রসূচী : The Man who was enriched by Accident; Padmalochan, the Weaver; Khoodeh, the Youngest Born; Kala Paree and Nidra Paree; The Burra Rani and the Sanyasi; The Man who was only a Finger and a Half in Stature.

The Charm of Kashmir. By Vincent C. O'Connor. 1920.

এই গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত ছয়খানি চিত্র আছে।

ইহা ছাড়া অন্য কোন কোন গ্রন্থে অন্যান্য চিত্রের সহিত অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রও স্থান পাইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকখানি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতেছি :

Myths of the Hindus and Buddhists. By the Sister Nivedita and Ananda K. Coomaraswamy. 1913.

এই গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত পাঁচখানি বুদ্ধজীবন-চিত্র আছে :

The Victory of Buddha, The Bodhisattva Tusks, Departure of Prince Siddhārtha, Buddha as Mendicant, The Final Release.

Footfalls of Indian History. By the Sister Nivedita. 1915.

এই গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত দুইখানি ছবি আছে।

Buddha and the Gospel of Buddhism. By Ananda K. Coomaraswamy. 1916.

এই গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত তিনখানি চিত্র আছে।

Gitanjali and Fruit-gathering. By Rabindranath Tagore. 1919.

এই পুস্তকের সচিত্র সংস্করণে অবনীন্দ্রনাথের অনেকগুলি একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র আছে।

এতদ্ব্যতীত ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত Cradle Tales of Hinduism, রবীন্দ্রনাথ প্রণীত বিচিত্রিতা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত Golden Book of Tagore, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রচিত সাত ভাই চম্পা, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত রজতজয়ন্তী প্রভৃতি বহু গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের এক বা একাধিক চিত্র স্থান পাইয়াছে।

বাংলার নদনদী

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাংলার অসংখ্য নদনদী। এই নদনদীগুলিই বাংলার প্রাণ; ইহারাই বাংলাকে গড়িয়াছে, বাংলার আকৃতিপ্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে যুগে যুগে, এখনও করিতেছে। এই নদনদীগুলিই বাংলার আশীর্বাদ; এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখনও কখনও বোধহয় বাংলার অভিশাপও। এই সব নদনদী উচ্চতর ভূমি হইতে প্রচুর পলি বহন করিয়া আনিয়া বঙ্গের বদ্বীপের নিম্নভূমিগুলি গড়িয়াছে, এখনও সমানে গড়িতেছে; সেই হেতু বদ্বীপ-বঙ্গের ভূমি কোমল, নরম ও নমনীয় এবং পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের কিয়দংশ ছাড়া বঙ্গের সবটাই ভূতত্ত্বের দিক হইতে নবসৃষ্ট ভূমি (new alluvium)। এই কোমল, নরম ও নমনীয় ভূমি লইয়া বাংলার নদনদীগুলি ঐতিহাসিক কালে কত খেলাই না খেলিয়াছে; উদ্দাম প্রাণলীলায় কতবার যে পুরাতন খাত ছাড়িয়া নূতন খাতে, নূতন খাত ছাড়িয়া আবার নূতনতর খাতে বর্ষা ও বন্যার বিপুল জলধারাকে দুরন্ত অশ্বের মত, মত্ত ঐরাবতের মত ছুটাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সহসা খাত-পরিবর্তনে নদনদীগুলি কত সুরম্য নগর, কত বাজার-বন্দর, কত বৃক্ষশ্যামল গ্রাম, শস্যশ্যামল প্রান্তর, কত মঠ ও মন্দির, মানুষের কত কীর্তি ধ্বংস করিয়াছে, আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, কত দেশখণ্ডের চেহারা ও সুখসমৃদ্ধি একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে তাহার হিসাবও ইতিহাস সর্বত্র রাখিতে পারে নাই। প্রকৃতির এই দুরন্ত লীলার সঙ্গে মানুষ সর্বদা আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, অনেক সময়ই হার মানিয়াছে; তাহার উপর আবার দূরদৃষ্টিহীন মানুষের দুর্বুদ্ধি, সাময়িক লোভ ও লাভের হিসাব বড় করিয়া দেখিতে গিয়া জল নিকাশের এবং প্রবাহের এইসব স্বাভাবিক পথগুলির সঙ্গে যথেচ্ছচারের ত্রুটি করে নাই; এখনও তাহার বিরাম নাই। তাহার ফলে এইসব নদনদীগুলি বন্যায় মহামারীতে দেশকে ক্ষণে ক্ষণে উজাড় করিয়া দিয়া, অথবা সুবিস্তৃত দেশখণ্ডকে শস্যহীন শ্মশানে পরিণত করিয়া মানুষের উপর প্রতিশোধ লইতে ত্রুটি করে না। প্রাচীনকালে এই নদনদীগুলির প্রবাহপথের এবং দুরন্ত প্রাণলীলার সঠিক এবং সুস্পষ্ট ইতিহাস আমাদের কাছে উপস্থিত নাই; পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক হইতে নদনদীগুলির ইতিহাস যতটা সুস্পষ্ট ধরিতে পারা যায় নানা দেশী বিদেশী বিবরণের এবং নকশার সাহায্যে, প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে নদীপ্রবাহপথের যে চেহারা, তাহাদের যে আকৃতিপ্রকৃতি এখন আমাদের দৃষ্টি ও বুদ্ধিগোচর, প্রাচীন বাংলায় সেই চেহারা সেই আকৃতি-প্রকৃতি ইহাদের ছিল না। অনেক পুরাতন পথ মজিয়া গিয়াছে, প্রশস্ত খরতোয়া নদী সংকীর্ণ ক্ষীণস্রোতা হইয়া পড়িয়াছে; অনেক নদী নূতন খাতে নূতনতর আকৃতিপ্রকৃতি লইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরাতন নামও হারাইয়া গিয়াছে, নদীও হারাইয়া গিয়াছে; নূতন নদীর, নূতন নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এইসব নদনদীর ইতিহাসই বাংলার ইতিহাস। ইহাদেরই তীরে তীরে মানুষ-সৃষ্ট সভ্যতার জয়যাত্রা; মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম-নগর, বাজার-বন্দর, সম্পদ-সমৃদ্ধি, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম-কর্ম সব কিছুর বিকাশ। বাংলার শস্যসম্পদ একান্তই এই নদীগুলির দান। উচ্ছলিত উচ্ছ্বসিত উদ্দাম বন্যায়

মানুষের ঘরবাড়ী ভাঙিয়া যায়, মানুষ গৃহহীন পশুহীন হয়; আবার এই বন্যাই তাহার মাঠে মাঠে সোনা ফলায় পলি ছড়াইয়া, এই পলিই সোনার সারমাটি। বাঙালী তাই এই নদীগুলিকে ভয়ভক্তি যেমন করিয়াছে, ভালোও তেমনি বাসিয়াছে; রাক্ষসী কীর্তিনাশা বলিয়া গাল যেমন দিয়াছে, তেমনি ভালোবাসিয়া নাম দিয়াছে, ইচ্ছামতী, ময়ূরাক্ষী, কবতাক্ষ (কপোতাক্ষ) চূর্ণী, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, মধুমতী, কৌশিকী, দামোদর, অজয়, করতোয়া, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, মেঘনা (মেঘনাদ বা মেঘানন্দ), সুরমা, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র)। বস্তুত, বাংলার, শুধু বাংলারই বা কেন, ভারতবর্ষের নদীগুলির নাম কি সুন্দর অর্থ ও ব্যঞ্জনাময়।

বাংলার এই নদীগুলি সমগ্র পূর্বভারতের দায় ও দায়িত্ব বহন করে। উত্তর-ভারতের প্রধানতম দুইটি নদীর— গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের— বিপুল নদীজলধারা, পলিপ্রবাহ, এবং পূর্ব-যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামের বৃষ্টিপাত-প্রবাহ বহন করিয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবার দায়িত্ব বহন করিতে হয় বাংলার নমনীয় মাটিকে। সেই মাটি সর্বত্র এই সুবিপুল জলপ্রবাহ বহন করিবার উপযুক্ত নয়। এই জলপ্রবাহ নূতন ভূমি যেমন গড়ে, মাঠে যেমন শস্য ফলায়, তেমনই ভূমি ভাঙেও, শস্য বিনাশও করে। বাঙালী ক্রোধভরে পদ্মাকে বলিয়াছে কীর্তিনাশা; পদ্মা বাঙালীর অনেক কীর্তিই নষ্ট করিয়াছে সত্য— করিবে নাই বা কেন? গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনার সুবিপুল জলধারা নিম্নতম প্রবাহে সে একা বহন করে; তাহাতে আসিয়া মেশে প্রচুর বৃষ্টিপ্রবাহ, নিম্নভূমির সাগরপ্রমাণ বিল-হাওড়ের অগাধ জলরাশি। দুর্দম মত্ততার অধিকার তাহার না থাকিলে থাকিবে কাহার? এবং সেই মত্ততা নরম নমনীয় নূতন মাটির উপর! ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে ও হইতেছে। অথচ এই মেঘনা-পদ্মাই তো আবার স্বর্ণশস্যের আকর; এই পদ্মার দুই তীরেই তো বাংলার ঘনতম মনুষ্যবসতি, সমৃদ্ধি-ঐশ্বর্যের লীলা। মানুষ যদি পদ্মা-মেঘনাকে বশে আনিতে না পারিয়া থাকে, সে যদি আপন দুর্বুদ্ধিবশে ইহাদের মত্ততাকে আরও নির্মম দুরন্ত করিয়া থাকে, তবে সেই দোষ পদ্মা-মেঘনার নয়। কিন্তু ইতিহাস আলোচনায় এ সব জল্পনা হয়তো অবান্তর।

বাংলার ভূমিপ্রকৃতিতে নদীর খাত যুগে যুগে পরিবর্তিত হওয়া, পুরাতন নদী মজিয়া মরিয়া যাওয়া, নূতন নদীর সৃষ্টি কিছুই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ষোড়শ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতকের শেষ— এই চারি শতাব্দীর মধ্যে বাংলার প্রধান-অপ্রধান ছোট-বড় কত নদনদী যে কতবার খাত বদলাইয়াছে, কত পুরাতন নদী মরিয়াছে, কত নূতন নদীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কিছু কিছু হিসাব পাওয়া যায় বাংলার সমসাময়িক ভূমি নক্‌শায়। বর্তমান বাংলায় নদীগুলির যে প্রবাহপথ, আকৃতিপ্রকৃতি এখন আমরা দেখিতেছি, একশত বছর পূর্বেও এই সব নদনদীর এই প্রবাহপথ, আকৃতিপ্রকৃতি ছিল না। ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যে Jao de Barros (1550), Gastaldi (1561), Hondivs (1614), Cantelli da Vignolla (1683), Van den Broucke (1660), G. Delisle (1720-1740), Izzak Tirion (1730), F. de Witt (1726), de l'Auville (1752), Thornton, Rennel (1764-1776) প্রভৃতি পর্তুগীজ, ডাচ্ ও ইংরেজ বণিক, রাজকর্মচারী ও পণ্ডিতেরা বাংলা ও ও ভারতবর্ষের অনেকগুলি নক্‌শা রচনা করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে বাংলার নদনদী ও জনপদগুলির ক্রমপরিবর্তমান আকৃতি, পুরাতন নদীর মৃত্যু, নূতন নদীর জন্ম সমস্তই এই নক্‌শাগুলিতে ধরিতে পারা যায়। আমাদের চোখের উপর এই পরিবর্তন এখনও চলিতেছে; যমুনার খাতে ব্রহ্মপুত্রের নূতনতর প্রবাহ,

ভৈরব, কুমার প্রভৃতি নদীর মৃত্যুসূচনা ইত্যাদি তো সেদিনকার স্মৃতি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক হইতে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া নদনদীগুলির, এবং সঙ্গে সঙ্গে জনপদগুলিরও, ক্রমপরিণতি এখন অনেকটা স্পষ্ট; শুধু নক্শাগুলিতেই নয়, ইবন্ বতুতা (1328-1354), বারণি (চতুর্দশ শতক), রাল্‌ফ ফিচ্ (Ralph Fitch, 1583-91), Fernandes (1598), Fonseca (1599) প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকের বিবরণী, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, ক্ষমানন্দ ও বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, গোবিন্দদাসের কড়চা, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল জাতীয় সাহিত্যগ্রন্থ এবং মুসলমান লেখকদের সমসাময়িক ইতিহাসেও এই পরিবর্তনের চেহারা ধরিতে পারা কঠিন নয়। সাম্প্রতিক কালে নদীমাতৃক বাংলার এই ক্রমপরিবর্তমান আকৃতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনাও যথেষ্ট হইয়াছে[১]। কাজেই এখানে সে সব কথার পুনরালোচনা করিয়া লাভ নাই। ষোড়শ শতকের পরেই শুধু নয়, আগেও বাংলার প্রধান প্রধান নদনদীগুলি যুগে যুগে এই ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছে, এমন অনুমান কিছুতেই অসংগত নয়; তাহার কিছু কিছু প্রমাণও আছে। কারণ, প্রাচীন সাহিত্যে, টলেমির নক্শায় ও প্রাচীন লিপিমালায় বাংলার দুইচারিটি নদনদীর প্রবাহপথ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা বর্তমান প্রবাহপথ তো নয়ই, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রবাহপথের সঙ্গেও তাহার মিল নাই। অষ্টাদশ শতকে রেনেলের, সপ্তদশ শতকে ফান্ ডেন্ ব্রোকের, এবং ষোড়শ শতকে জাও ডি বারোসের নক্শায় নদনদীগুলির গতিপথ অনেকটা পরিষ্কার দেখানো হইয়াছে। এই তিন নক্শার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া পশ্চাদ্‌ক্রম অনুসরণ করিলে হয়তো মধ্যযুগপূর্ব বাংলার নদনদীর চেহারা ধরিতে পারা খানিকটা সহজ হইবে। টলেমির নক্শা (দ্বিতীয় শতক) নানা দোষে দুষ্ট, ঐতিহাসিকদের কাছে তাহা অজ্ঞাত নয়। সুতরাং সেই নকশার উপর খুব বেশী নির্ভর করা চলে না; তবু কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া একেবারে অসম্ভব নাও হইতে পারে।[২]

গঙ্গা-ভাগীরথী

গঙ্গা-ভাগীরথী লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। রাজমহলের সোজা উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার তীর প্রায় ঘেঁষিয়া তেলিগড় ও সিক্রিগলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম বাংলার প্রবেশপথ। এই পথের মুখের নিকটেই কেন লক্ষ্মণাবতী-গৌড়, পাণ্ডুয়া, পণ্ডা, রাজমহল মধ্যযুগে বহুদিন একের পর এক বাংলার রাজধানী ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নয়; সামরিক ও রাষ্ট্রীয় কারণেই তাহা প্রয়োজন হইয়াছিল।

---

১ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Majumdar, R. C., "Physical Features of Ancient Bengal", in the "D. R. Bhandarkar Volume"; Mukherjee, R. K., "Changing Face of Bengal"; Hunter, W. W., "A Statistical Account of Bengal"; Berry, J. W. E., "The Waterways in East Bengal", "Antiquity of the Lower Ganges and Its Courses", in "Science and Culture", 1941, pp. 233-39; "Antiquity of the Lower Ganges and Its Courses", in Science and Culture", 1941, pp. 233-39; J. A. S. B., 1895, pp. 1—24; "History of Bengal", vol. i, pp. 2—7. "Changing Face of Bengal" গ্রন্থ সমস্ত নক্শাগুলি একসঙ্গে পাওয়া যাইবে।

২ টলেমি এবং ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শার জন্য দ্রষ্টব্য History of Bengal, D. U., maps facing pages 4 and 11; Bhattasali, N., "Antiquity of the Lower Ganges . . ." in "Science and Culture", 1941, map facing p. 238.

এই গিরিবর্ত্ম দুইটি ছাড়িয়া রাজমহলকে স্পর্শ করিয়া গঙ্গা বাংলার সমতল ভূমিতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ফান্ ডেন ব্রোকের (১৬৬০) নক্শায় দেখিতেছি, রাজমহলের কিঞ্চিত দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজারের মধ্যে গঙ্গার তিনটি দক্ষিণবাহিনী শাখার জল কাশিমবাজারের একটু উত্তর হইতে একত্র বাহিত হইয়া সোজা দক্ষিণবাহিনী হইয়া চলিয়া গিয়াছে সমুদ্রে, বর্তমান গঙ্গা-সাগরসংগমতীর্থে। কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী পর রেনেলের নক্শায় দেখিতেছি, রাজমহলের দক্ষিণ-পূর্বে তিনটি বিভিন্ন শাখা একটিমাত্র শাখার রূপান্তরিত এবং তাহাই (সুতি হইতে গঙ্গাসাগর) দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গা। যাহাই হউক, রেনেল কিন্তু এই দক্ষিণবাহিনী নদীটিকে গঙ্গা বলিতেছেন না; তিনি গঙ্গা বলিতেছেন আর একটি প্রবাহকে, যে প্রবাহটি অধিকতর প্রশস্ত, জীবন্ত এবং দুর্দাম, যেটি পূর্ব-দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া বর্তমান বাংলার হৃদয়দেশের উপর দিয়া তাহাকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে অবতরণ করিয়াছে, আমরা যাহাকে বলি পদ্মা। ফান্ ডেন ব্রোক্ এবং রেনেল দুজনের নক্শাতেই দেখিতেছি, গঙ্গার বিপুল জলধারা বহন করিতেছে পদ্মা; দক্ষিণবাহিনী নদীটি ক্ষীণতরা। ফান ডেন ব্রোক বা রেনেল যে-নামেই এই দুইটি নদীকে অভিহিত করুন না কেন, দেশের ঐতিহ্যে এই নদী দুইটির নাম কি ছিল দেখা যাইতে পারে। ফান্ ডেন ব্রোকের প্রায় আড়াইশত বৎসর আগে কবি কৃত্তিবাসের কাল (১৩২০ শক — ১৪১৫-১৬ খ্রী)। কৃত্তিবাসের পিতৃভূমি ছিল বঙ্গে (পূর্ববাংলায়) তাঁহার পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা বঙ্গ (ভাগ) ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন যে ফুলিয়ার "দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গাতরঙ্গিণী"।[৩] নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত দক্ষিণবাহিনী নদী, আমরা যাহাকে বলি ভাগীরথী (বর্তমান হুগলী নদী), তাহার কথাই কৃত্তিবাস বলিতেছেন। কিন্তু এই গঙ্গা ছোটগঙ্গা। কারণ, এগারো পার হইয়া যখন কৃত্তিবাস বারো বৎসরে প্রবেশ করিলেন তখন "পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গা পার" এবং সেখানে নানা বিদ্যা অর্জন করিয়া তদানীন্তন গৌড়েশ্বর রাজা কংস বা গণেশের সভায় রামায়ণ রচনা করিলেন। নিশ্চিত যে এই বড়গঙ্গাই পদ্মা। এই কথার আরও সমর্থন পাওয়া যায় কৃত্তিবাস-রামায়ণের অন্যতম একটি পুঁথিতে। কৃত্তিবাস নিজ বাল্যজীবনের কথা বলিতেছেন,

> পিতা বনমালী মাতা মাণিক [মেনকা] উদরে।
> জনম লভিল ওঝা ছয় সহোদরে ॥
> ছোটগঙ্গা বড়গঙ্গা বড় বলিন্দা [নিঃসন্দেহে বরেন্দ্র-বরেন্দ্রী] পার।
> যথা তথা কর্যা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার ॥
> রাঢ়ামধৈ [রাঢ় মধ্যে ?] বন্দিনু আচার্য্য চূড়ামণি।
> যার ঠাঁই কৃত্তিবাস পড়িলা আপনি ॥ [৪]

স্পষ্টতই গঙ্গার দক্ষিণ- ও দক্ষিণ-পূর্ব- বাহিনী দুই প্রবাহকেই কৃত্তিবাস যথাক্রমে ছোটগঙ্গা ও বড়-গঙ্গা বলিতেছেন; এবং বড়গঙ্গা পার হইয়াই যে বড় বলিন্দা বা বরেন্দ্রদেশ তাহারও ইঙ্গিত করিতেছেন। পঞ্চদশ শতকের শেষপাদে বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁহার মনসামঙ্গলে ভাগীরথীকে গঙ্গাই বলিতেছেন এবং তদানীন্তন ভাগীরথীপথের সুন্দর বিবরণ দিতেছেন; সে কথা পরে উল্লেখ করিতেছি।

---

৩ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ৮০—৮১

৪ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ৮৩; বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ৩—পৃ ২, ৪১

আপাতত এইটুকু পাওয়া গেল যে, পঞ্চদশ শতকের গোড়াতেই পদ্মা বৃহত্তরা নদী, উহাই বড়গঙ্গা। কিন্তু যত প্রশস্ততরা, যত দুর্দম দুর্দান্তই হউক না কেন, ঐতিহ্যমহিমায় কিংবা লোকের শ্রদ্ধাভক্তিতে বড়গঙ্গা ছোটগঙ্গার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। হিন্দুর স্মৃতি-ঐতিহ্যে গঙ্গার জলই পাপমোচন করে, পদ্মার নয়; পদ্মা কীর্তিনাশা, পদ্মা ভীষণা ভয়ংকরী উন্মত্তা।[৫]

পদ্মা বা বড়গঙ্গার কথা পরে বলার সুযোগ হইবে; ভাগীরথী বা ছোটগঙ্গার কাহিনী আগে শেষ করিয়া লই। যাহাই হউক, পঞ্চদশ শতকে ভাগীরথী সংকীর্ণতোয়া সন্দেহ নাই, কিন্তু তখন তাহার প্রবাহ আজিকার মত ক্ষীণ নয়। সাগরমুখ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে চম্পা-ভাগলপুর পর্যন্ত সমানে বড় বড় বাণিজ্যতরীর চলাচল তখনও অব্যাহত। ফান্ ডেন ব্রোকের নক্‌শায় এই পথের দুই ধারের নগর-বন্দরের এবং পূর্ব ও পশ্চিমাগত শাখাপ্রশাখা নদীগুলির সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। নক্‌শা খুলিলেই তাহাদের পরিচয় পাওয়া যাইবে, এবং ভাগীরথীই যে সংকীর্ণতর হওয়া সত্ত্বেও প্রধানতর প্রবাহ তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সাম্প্রতিক কালে বহু প্রমাণপ্রয়োগের সাহায্য এই প্রবাহের ইতিহাস আলোচিতও হইয়াছে; রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "Changing Face of Bengal" গ্রন্থে এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "Physical Features of Ancient Bengal" নিবন্ধে বিস্তৃত বিবরণও আছে। ফান্ ডেন ব্রোকের কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর আগে বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁহার মনসামঙ্গলে এই প্রবাহপথের যে বিবরণ দিতেছেন তাহা অপরিচিত নয়। কাজেই এখানে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিপ্রদাসের চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী রাজঘাট রামেশ্বর পার হইয়া সাগরমুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে; পথে পড়িতেছে অজয় নদ, উজানী, শিবা নদী (বর্তমান শিয়ালনালা), কাটোয়া, ইন্দ্রাণী নদী, ইন্দ্রঘাট, নদীয়া ফুলিয়া, গুপ্তিপাড়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম (সপ্তগ্রাম যে গঙ্গা-সরস্বতী-যমুনা-সংগমে বিপ্রদাস তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই), কুমারহাট, ডাহিনে হুগুলী, বামে ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোরো, পূর্বে কাকিনাড়া, তার পর মুলাজোড়া, গাড়ুলিয়া, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ডাহিনে চাঁপদানি, বামে ইছাপুর, বাকি-বাজার, নিমাইতীর্থ (বর্তমান বৈদ্যবাটী), চানক, মাহেশ, খড়দহ, শ্রীপাট, ডাহিনে রিসিড়া (রিষড়া), বামে সুকচর, পশ্চিমে কোন্নগর, ডাহিনে কোতরং, বামে কামারহাটি, পূর্বে আড়িয়াদহ (এড়েদহ), পশ্চিমে ঘুযুড়ি, তারপর পূর্বকূলে চিত্রপুর (চিৎপুর), কলিকাতা, (পশ্চিম কূলে) বেতড় (একাদশ শতক লিপির (বেতড্ড চতুরক), তারপর কালিঘাট, চূড়াঘাট, বারুইপুর, ছত্রভোগ, বদরিকাকুণ্ড, হাথিয়াগড়, চৌমুখী, শতমুখী

---

৫ গঙ্গা-ভাগীরথীই যে প্রাচীনতরা এবং পুণ্যতরা নদী, ইহাই যে হিন্দুর পরমতীর্থ জাহ্নবী এই সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য এবং লিপিমালা একমত। পদ্মাকে গঙ্গা কখনও কখনও বলা হইয়াছে, কিন্তু ভাগীরথী-জাহ্নবী একবারও বলা হয় নাই। বাংলাদেশের গ্রন্থ ও লিপিই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। ধোয়ীর পবনদূতে ত্রিবেণীসংগমের ভাগীরথীকেই বলা হইয়াছে গঙ্গা; লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর পট্টোলিতে বর্ধমানভুক্তির বেতড্ড্ চতুরকের (হাওড়া জেলার বেতড়) পূর্ববাহিনী নদীটির নাম জাহ্নবী; বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতে গঙ্গা-ভাগীরথীকেই বলা হইয়াছে "সুরসরিৎ" (স্বর্গনদী বা দেবনদী); রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে উত্তররাঢ় (পূর্বসীমায়) গঙ্গাতীরশায়ী, যে গঙ্গার সুগন্ধপুষ্পবাহী জল অসখ্য তীর্থঘাটে ঢেউ দিয়া দিয়া প্রবাহিত হইত ("the Ganges whose water bearing fragrant flowers dashed against the bathing places")। এই সব bathing-places তীর্থঘাট, এবং পুষ্প স্নানপূজার ফুল, সন্দেহ কি! এই পূজা ভাগীরথীর ভাগ্যেই জোটে, পদ্মার নয়।

(সাগরসংগমের নিকটে গঙ্গা তো সত্যই চারিমুখে শতমুখে কেন, অসংখ্য খালনালায় শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত)* এবং সর্বশেষে সাগরসংগমতীর্থ যেখানে

"তীর্থকার্য শ্রাদ্ধ কৈল পবিত্র তর্পণ।
তাহার মেলান ডিঙ্গা সঙ্গমে প্রবেশে।
তীর্থকার্য কৈল রাজা পর[ম] হরিষে।"

বিপ্রদাসের এই বর্ণনার সঙ্গে ফান ডেন ব্রোকের নক্শার বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই এক। নদীয়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী (Tripeni), সপ্তগ্রাম (Coatgam), হুগুলি (Oegli, পর্তুগীজ বণিকদের Ugulium), কলিকাতা (ফান ডেন ব্রোক Collecate এবং Calcutta নামে দুইটি প্রায় সংলগ্ন বন্দরের নাম করিতেছেন—একটি বিপ্রদাসের কলিকাতা এবং অপরটি কালিঘাট বলিয়া মনে হয়) প্রভৃতি নাম পাওয়া যাইতেছে। লক্ষণীয় এই, পঞ্চদশ শতকেই বিপ্রদাস হুগলী ও কলিকাতার উল্লেখ করিতেছেন, এবং ইহাই হুগলী ও কলিকাতার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ। তবে, সন্দেহ হয়, বিপ্রদাসের মূল তালিকায় পরবর্ত্তী কালের গায়েনেরা হুগলি, কলিকাতা প্রভৃতি নাম সংযোগ করেন নাই তো ? অসম্ভব না-ও হইতে পারে। পঞ্চদশ শতকে কলিকাতার উল্লেখ একটু সন্দেহজনক। ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দের (বিপ্রদাসের পূর্বে এবং ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে ফান্ ডেন্ ব্রোকের) আগে বরা[হ]নগর, চন্দননগর প্রভৃতি বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে ; শুধু যে ফান্ ডেন্ ব্রোকই ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও নয়, জাও ডি বারোসের নকশায়ও অগ্রপাড়া (Agrapara), বরাহনগর (Bernager) উল্লেখ পাইতেছি, সপ্তগ্রামের (Satigam) সঙ্গে। ইতিহাসের তথ্যও তাই। হুগলীও ব্রোকের সময় ফাঁপিয়া উঠিয়াছে।

আদিগঙ্গা

যাহাই হউক বিপ্রদাস ও ফান্ ডেন্ ব্রোকের নিকট হইতে কয়েকটি প্রধান তথ্য পাওয়া গেল। প্রথমতঃ, ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহই, অন্ততঃ কলিকাতা পর্যন্ত, পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতকের প্রধানতম প্রবাহ ; দ্বিতীয়তঃ ত্রিবেণী বা মুক্তবেণীতে সরস্বতী-ভাগীরথী-যমুনাসংগম ; তৃতীয়তঃ, বেতড় ও কলিকাতার দক্ষিণে বর্তমানে আমরা যাহাকে বলি আদিগঙ্গা সেই আদিগঙ্গার খাতেই ভাগীরথীর সমুদ্রযাত্রা, অন্ততঃ বিপ্রদাসের চাঁদসদাগর সেই পথেই যে গিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। সপ্তদশ শতকে ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শায় দেখা যায় তখনও আদিগঙ্গার খাত খুব প্রশস্ত কিন্তু সেই খাতে কোনও গ্রাম-নগর-বন্দরের উল্লেখ নাই। হইতে পারে, এই খাতে নৌকাচলাচল বিশেষ আর হইতেছে না। এই অনুমানের কারণ একশত বৎসর পরে রেনেলের নক্শায় দেখিতেছি, আদিগঙ্গার প্রায় কোন চিহ্নই নাই, অর্থাৎ এই এক শতকের মধ্যে আদিগঙ্গা তাহার বর্তমান আকৃতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহাই ইতিহাসগত। শোনা যায় নবাব আলীবর্দীর আমলে কলিকাতা-বেতড়ের দক্ষিণে বর্তমান ভাগীরথীপ্রবাহের প্রবর্তন হইয়াছিল। আদিগঙ্গা পলি পড়িয়া চলাচলের অযোগ্য হইলে আলীবর্দী নাকি

---

* মহাভারতে বনপর্বের তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যুধিষ্ঠির পঞ্চশতমুখী গঙ্গার রাজেন্দ্রসাগরসংগমে তীর্থস্নান করিয়াছিলেন : গঙ্গায়াস্তত্র রাজেন্দ্র সাগরস্ত চ সংগমে।

৭ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ১০৪—১১৯।

বর্তমান সোজা দক্ষিণবাহী প্রবাহটির মুখ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আলীবর্দী নূতন প্রবাহপথ কাটিয়া বাহির করেন নাই; এ পথ আদিগঙ্গা অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক অপেক্ষাও পুরাতন, এবং বোধ হয় সরস্বতীর প্রাচীনতর খাতের দক্ষিণতম অংশ।

সরস্বতী

পঞ্চদশ শতকের (বিপ্রদাসের) আগে ভাগীরথী অন্ততঃ আংশিক এই সরস্বতীর খাত দিয়াই সমুদ্রে প্রবাহিত হইত[৮] এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। পুরাণে, বিশেষতঃ মৎস্য ও বায়ু পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, তাম্রলিপ্ত দেশের ভিতর দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত; এবং সম্ভবতঃ সমুদ্রসন্নিকট গঙ্গার তীরেই ছিল তাম্রলিপ্তির সুবৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র[৯]। জাও ডি বারোসের যে নক্শা (১৫৫০) এবং ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শায় (১৬৬০) এই প্রবাহপথের ইঙ্গিত বর্তমান বলিয়া মনে হয়। এই দুই নক্শার তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, সপ্তদশ শতকে জাহানাবাদের নিকটে আসিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দামোদরের একটি প্রবাহ (ক্ষমানন্দ কথিত বাঁকা দামোদর) উত্তরপূর্ববাহিনী হইয়া নদীয়া-নিমতার দক্ষিণে গঙ্গায় এবং আর একটি প্রবাহ দক্ষিণবাহিনী হইয়া নারায়ণগড়ের নিকটে রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার সঙ্গে মিলিত হইয়া তম্বোলি বা তমলুকের পাশ দিয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। আর মধ্যভূখণ্ডে ত্রিবেণী-সপ্ত-

---

৮ অনুমানিক ১০২৫ খ্রীস্টাব্দে, কলিকাতার দক্ষিণে উলুবেড়িয়া-গঙ্গাসাগর খাতে ভাগীরথী প্রবাহিত হইত এমন লিপিপ্রমাণ পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য, Bhattasali, N. K., The Saktipur Grant of Lakshmana Sena and Geographical divisions of Ancient Bengal, in J R A S, 1935, p 85 ff; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

৯ এসম্বন্ধে মৎস্যপুরাণের উক্তিকে পৌরাণিক উক্তির প্রতিনিধি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। হিমালয়-উৎসারিত পূর্ব-দক্ষিণবাহী সাতটি প্রবাহকে এই পুরাণে গঙ্গা বলা হইয়াছে; এই সাতটির মধ্যবর্তী প্রবাহটি ভাগীরথী। ভাগীরথী নামকরণ সম্বন্ধে ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়নের সুবিদিত গল্পটিও এইখানে বিবৃত করা হইয়াছে। এই পুরাণে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, কুরু, ভরত, পঞ্চাল, কৌশিক ও মগধ দেশ পার হইয়া বিন্ধ্যশৈলশ্রেণী গাত্রে (রাজমহল-সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম শৈলমূলে) প্রতিহত হইয়া ব্রহ্মোত্তর, বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত দেশের ভিতর দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইত (মৎস্য, ১২১)। প্রাচীন বাংলায় ভাগীরথীর প্রবাহপথের ইহার চেয়ে সংক্ষিপ্ত সুন্দর সুস্পষ্ট বিবরণ আর কি হইতে পারে? একটু পরেই আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের ভিতর দিয়া রাজমহলের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়া রাজমহল-সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূমের শৈলমূলরেখা ধরিয়া যে অগভীর ঝিল ও নিম্নজলাভূমি সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সেই ভূমিরেখাই ভাগীরথীর সম্ভাব্য প্রাচীনতম খাত। যাহাই হউক, পুরাণ-বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এক্ষেত্রে ভাগীরথীপ্রবাহের কথাই ইঙ্গিত করা হইতেছে, এবং ইহাকেই বলা হইতেছে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ। এই প্রবাহ উত্তররাঢ়দেশের (ব্রহ্মোত্তর— সুহ্মোত্তর? — বজ্রভূমি— বজ্জভূমি?) ভিতর দিয়া দক্ষিণবাহী, এবং তাহার পূর্বে বঙ্গ, পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত, এই ইঙ্গিতও যেন মৎস্যপুরাণে পাওয়া যাইতেছে। ইহাই তো ইতিহাসসম্মত।

ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা-আনয়নের গল্প রামায়ণেও আছে, এবং সেখানেও গঙ্গা বলিতে রাজমহল-গঙ্গাসাগর প্রবাহকেই যেন বুঝাইতেছে। মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখ আছে, যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগরসংগমে তীর্থস্নান করিতে আসিয়াছিলেন, এবং সেখান হইতে গিয়াছিলেন কলিঙ্গদেশে। রাজমহল-গঙ্গাসাগর প্রবাহই যে যথার্থতঃ ভাগীরথী ইহাই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের ইঙ্গিত, এবং এই প্রবাহের সঙ্গেই সুদূর অতীতের সূর্যবংশীয় ভগীরথ রাজার স্মৃতি জড়িত।

উইলিসম উইলকক্স সাহেব এই ভগীরথ-ভাগীরথী কাহিনীর যে পৌর্তিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা ইতিহাস-সম্মত বলিয়া মনে হয় না। পদ্মাপ্রবাহ অপেক্ষা ভাগীরথীপ্রবাহ যে অনেক প্রাচীন এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই।

গ্রামের নিকট হইতে অপর একটি প্রবাহ (অর্থাৎ সরস্বতী) ভাগীরথী হইতে বিযুক্ত হইয়া পশ্চিম দিকে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া কলিকাতা-বেতড়ের দক্ষিণে পুনর্বার ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। এক শতাব্দী আগে ষোড়শ শতকে জাও ডি বারোসের নকশায় দেখিতেছি সরস্বতীর একেবারে ভিন্নতর প্রবাহপথ। সপ্তগ্রামের (Satigam) নিকটেই সরস্বতীর উৎপত্তি, কিন্তু সপ্তগ্রাম হইতে সরস্বতী সোজা পশ্চিমবাহিনী হইয়া যুক্ত হইতেছে দামোদরপ্রবাহের সঙ্গে, বাঁকা দামোদর সংগমের নিকটেই। এই বাঁকা দামোদরের কথা বলিয়াছেন সপ্তদশ শতকের (১৬৪৩) কবি ক্ষমানন্দ তাঁহার মনসামঙ্গল কাব্যে। সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। যাহাই হউক, বর্তমানের দক্ষিণে দামোদর যেখান হইতে দক্ষিণবাহী হইয়াছে সেইখানে সরস্বতীর সঙ্গে তাহার সংযোগ— ইহাই জাও ডি বারোসের নকশার ইঙ্গিত। আমার অনুমান এই প্রবাহপথই গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীনতর প্রবাহপথ, এবং সরস্বতীর পথ ইহার নিম্ন অংশ মাত্র। তাম্রলিপ্তি হইতে এইপথে উজান বাহিয়াই বাণিজ্যপোতগুলি পাটলিপুত্র-বারাণসী পর্যন্ত যাতায়াত করিত। এবং এই নদীতেই পশ্চিম দিকে ছোটনাগপুর-মানভূমের পাহাড় হইতে উৎসারিত হইয়া স্বতন্ত্র অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদ তাহাদের জলস্রোত ঢালিয়া দিত। ইহাই প্রাচীন বাংলার গঙ্গা-ভাগীরথীর নিম্নতর প্রবাহ।

অজয়-দামোদর-রূপনারায়ণ

এখনও ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ-শিলাই-দ্বারকেশ্বর প্রভৃতি নদনদী ভাগীরথীতে জলধারা মিশায় সত্য, কিন্তু ইহাদের ভাগীরথী সংগমস্থান ভাগীরথী-প্রবাহপথের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পূর্বদিকে সরিয়া আসিয়াছে ; এবং ইহাদের, বিশেষভাবে দামোদর এবং রূপনারায়ণের, প্রবাহপথও নিম্নপ্রবাহে ক্রমশ অধিকতর দক্ষিণবাহী হইয়াছে। যাহাই হউক, অষ্টম শতকের পরেই সরস্বতী-ভাগীরথীর এই প্রাচীনতর প্রবাহপথের মুখ এবং নিম্নতম প্রবাহ শুকাইয়া যায়, এবং তাহার ফলেই তাম্রলিপ্তি বন্দর পরিত্যক্ত হয়। অষ্টম হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে কোন সময় সরস্বতী তাহার প্রাচীনতর পথ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমানের খাত প্রবর্তন করিয়া থাকিবে এবং সেই খাতেও কিছুদিন ভাগীরথীর প্রবলতর স্রোত চলাচল করিয়া থাকিবে ; চতুর্দশ শতকের গোড়াতেই সপ্তগ্রামে মুসলমানদের অন্যতম রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এ তথ্য সুবিদিত। কিন্তু দশ শতক হইতে নিম্নপ্রবাহে কলিকাতা-বেতড় পর্যন্ত ভাগীরথীর বর্তমান পথই প্রধানতম পথ এবং আরও দক্ষিণে আদিগঙ্গার পথ।[১০] আলীবর্দীর সময়ে আদিগঙ্গা পরিত্যক্ত হইয়া মধ্যযুগের সরস্বতীর পরিত্যক্ত পথেই গঙ্গা-ভাগীরথীর পথ প্রবর্তিত হয়।

---

১০ বিপ্রদাসের চাঁদ সদাগর ত্রিবেণীর পরেই সরস্বতীতীরে সপ্তগ্রামের সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন। ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধিশালী বন্দর-নগর, তাঁহার বর্ণনাই তাহা প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া চাঁদ সদাগর সরস্বতীর পথে আর অগ্রসর হইতেছেন না, তিনি বর্তমান ভাগীরথীর প্রবাহে ফিরিয়া আসিতেছেন ; কারণ, সপ্তগ্রামের পরেই উল্লেখ পাইতেছি কুমার-হাট এবং হুগুলীর। মনে হয় ১৪৯৫খ্রীস্টাব্দেই সরস্বতীর পথে বেশীদূর আর অগ্রসর হওয়া যাইতেছে না, এবং সেই পথে বৃহৎ বাণিজ্যতরী চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে দেখিতেছি ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শায় Oegli বা হুগুলি খুব ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, তখনও Tripeni (ত্রিবেণী), Coatgam (সাতগাঁ) বিদ্যমান, কিন্তু উভয়েই মুমূর্ষু। ইহাই ইতিহাস গত। কারণ আগরপাড়া (Agrapara) বরাহনগর (Bernager) ইত্যাদির উল্লেখ বারোসের নক্শাতে দেখিতেছি (১৫৫০), তাঁহার নক্শায় কিন্তু হুগুলীর উল্লেখ নাই। ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে ফ্রেড্রিক সাহেব স্পষ্ট বলিতেছেন, বাতোর (Bator) বা বেতড়ের উত্তরে সরস্বতীর প্রবাহ অত্যন্ত অগভীর হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য ছোট ছোট জাহাজ ছাড়া বড় জাহাজ সপ্তগ্রামে যাওয়া আসা করিতে

যমুনা

ত্রিবেণীসংগমের অন্যতম নদী যমুনা, এ-কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। এই যমুনা এখন খুঁজিয়া বাহির করা আয়াসসাধ্য, কিন্তু পঞ্চদশ শতকে বিপ্রদাসের কালে "যমুনা বিশাল অতি"।[১১] রেনেলের নকশায় যমুনা অতি খর্ব ক্ষীণ একটি রেখা মাত্র।

গঙ্গা ভাগীরথীর দক্ষিণ বা নিম্ন প্রবাহ ছাড়িয়া এইবার উত্তর প্রবাহের কথা একটু বলা যাইতে পারে। এ-সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ অত্যন্ত কম; অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। প্রাচীন গৌড়ের প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে এখন ভাগীরথী ও পদ্মা দ্বিধা বিভক্ত হইতেছে, কিন্তু প্রাচীন বাংলায়, অন্ততঃ সপ্তদশ-শতকপূর্ব বাংলায়, গৌড়-লক্ষ্মণাবতী ছিল গঙ্গার পশ্চিমতীরে, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। বস্তুত, ডি বারোস (১৫৫০) এবং গ্যাস্টল্ডির (Gastaldi, 1561) নকশা দুটিতেই গৌড়ের (Gorij; গ্যাসটল্ডির নকশায় Gaur) অবস্থান গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে, এবং রাঢ় (বারোসের নকশার Rara) দেশের উত্তর বা স্বল্প উত্তর-পশ্চিমে। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণ হইতেও মনে হয় গৌড় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেই অবস্থিত ছিল। রাজমহল পার হইয়া গঙ্গা খুব সম্ভব তখন খানিকটা উত্তর ও পূর্ব বাহিনী হইয়া গৌড়কে পশ্চিম বা ডাহিনে রাখিয়া রাঢ় দেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণবাহিনী হইত। বর্তমান কালিন্দী ও মহানন্দা খুব সম্ভব এই উত্তর ও পূর্ব প্রবাহপথের প্রাচীন স্মৃতি বহন করে। যাহা হউক, ইহা হইতেছে আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতকের কথা; কিন্তু সপ্তদশ শতকেই গঙ্গা-ভাগীরথী এই পথ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান পথ প্রবর্তন করিয়াছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকেরও আগে গঙ্গা ও ভাগীরথীর উত্তরপ্রবাহের একটি প্রাচীনতর পথ বোধ হয় ছিল, এবং এ-পথটি বর্তমান প্রবাহ পথের পশ্চিমে। পূর্নিয়ার দক্ষিণসীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাজমহল-সাঁওতালপরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূমের নিম্নসমভূমি ঘেঁষিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত অগভীর ঝিল ও নিম্নজলাভূমিময় এক সুদীর্ঘ দক্ষিণবাহী রেখা চলিয়া গিয়াছে। এই রেখা এখনও বর্তমান। এই রেখাই গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীনতম প্রবাহপথের নির্দেশক বলিয়া আমার ধারণা। ইহারই নিম্নতর প্রবাহে আমি ইতিপূর্বে দামোদর-সরস্বতী-রূপনারায়ণের কিয়দংশের প্রবাহপথের ইঙ্গিত করিয়াছি। এই সমগ্র প্রবাহপথ সম্বন্ধে আমার ধারণা যে নিছক কল্পনামাত্র নয় তাহা মৎস্যপুরাণোক্ত গঙ্গার প্রবাহপথ বর্ণনা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়।[১২]

গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহপথের প্রাচীন ইতিহাস এখন এইভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে: (১) ঐতিহাসিক কালের সম্ভাব্য প্রাচীনতম পথ— পূর্ণিয়ার দক্ষিণে রাজমহল পার হইয়া গঙ্গা পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূমের তলদেশ দিয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িত; এই প্রবাহেই ছিল অজয়, দামোদর এবং রূপনারায়ণের সংগম। এই তিনটি নদীই

পারে না। নিশ্চয়ই এই কারণে পর্তুগীজেরা ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দে সপ্তগ্রামের পরিবর্তে হুগলীতেই তাহাদের বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ইহার পর ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে ফান্ ডেন ব্রোক Oegli খুব মোটা মোটা অক্ষরে উল্লেখ করিবেন, তাহা মোটেই আশ্চর্য নয়।

১১ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ১১৩। ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিপ্রদাস বলিতেছেন: "গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি অধিষ্ঠান উমামাহেশ্বরী।"

১২ এই নকশাগুলি সমস্তই Mukherjee, R. K., "Changing Face of Bengal" এ পাওয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টব্য History of Bengal, D. U., II—IV maps.

তখন নাতিদীর্ঘ। এই প্রবাহেরই দক্ষিণতম সীমায় ছিল তাম্রলিপ্তি বন্দর। (২) ইহার পরের পর্যায়েই গঙ্গার পূর্বদিক্ যাত্রা শুরু হইয়াছে। রাজমহল হইতে গঙ্গা-ভাগীরথী খুব সম্ভবত বর্তমান কালিন্দী ও মহানন্দার খাতে উত্তর ও পূর্ব বাহিনী হইয়া গৌড়কে ডাহিনে রাখিয়া পরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাহিনী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। কিন্তু তখন এই প্রবাহ ১নং খাতের আরও পূর্বদিকে সরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, তখনও দামোদর[১৩] এবং রূপনারায়ণ-পাত্রঘাটার জল ভাগীরথীতে পড়িতেছে এবং তাম্রলিপ্তি বন্দরও জীবন্ত। অর্থাৎ এই পর্যায় অষ্টম শতকের আগেই। (৩) তৃতীয় পর্যায়েও গৌড় গঙ্গার পশ্চিম তীরে। কিন্তু তাম্রলিপ্তি বন্দর পরিত্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ দামোদর-রূপনারায়ণ-পাত্রঘাটার এবং কিছুদিনের জন্য সরস্বতীরও জল লইয়া ভাগীরথীর যে পশ্চিমতর প্রবাহ তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে; এবং কলিকাতা-বেতড় পর্যন্ত ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহপথের এবং বেতড়ের দক্ষিণে আদি-গঙ্গাপথের প্রবর্তন হইয়াছে। এই পথেরই পরিচয় বিপ্রদাস (১৪৯৫) হইতে আরম্ভ করিয়া ফান্ ডেন্ ব্রোক্, (১৬৬০) দ্য ল'অভিল (de l' Auville, 1752), এফ, ডি, হ্বিট্ (F. de Witt, 1726), ইজাক্ টিরিয়ন্ (Izaak Tirion, 1730) থর্নটন (Thornton) প্রভৃতি সকলের নক্শায় পাওয়া যাইতেছে।[১৪] আলীবর্দীর সময়ে (অর্থাৎ মোটামুটি ১৭৫০) কি করিয়া আদিগঙ্গা পরিত্যক্ত হইয়া বেতড়ের দক্ষিণে পুরাতন সরস্বতীর খাতে ভাগীরথীকে প্রবাহিত করা হয় তাহা তো আগেই বলিয়াছি। তাই বোধ হয়, রেনেলের নক্শায় (১৭৬৪-৭০) আদিগঙ্গার কোনও চিহ্নই প্রায় নাই। কর্নেল টলি (Tolly) সাহেব এই খাতের খানিকটা অংশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৭৭৫); তাঁহার নামানুসারেই Tolly's Nullah এবং Tollygunje যথাক্রমে এই খাত এবং বাম তীরের পল্লীটির বর্তমান নামকরণ।[১৫]

পদ্মা

ভাগীরথী বা ছোটগঙ্গায় কথা বলা হইল; এইবার বড়গঙ্গা বা পদ্মার কথা বলা যাইতে পারে। রেনেল সাহেব তো ইহাকে গঙ্গাই বলিয়াছেন। আগেই বলিয়াছি পদ্মা অর্বাচীনা নদী; কিন্তু পদ্মাকে যতটা অর্বাচীনা পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকেন ততটা অর্বাচীনা হয়তো সে নয়। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তো মনে করেন ষোড়শ শতক হইতে তাহার পূর্বযাত্রার সূত্রপাত। ইহা যেন ইতিহাসবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। রেনেল, ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায় পদ্মা বেগবতী নদী।

---

১৩ District Gazetteer : 24-Parganas, 1914, O'Malley ed. ; Carey, "Good Old Days of Hon'ble John Company", vol. ii, p. 157.

১৪ মৎস্যপুরাণে আছে কৌশিক (উত্তর বিহার) ও মগধ (দক্ষিণ বিহার) পার হইয়া গঙ্গা বিন্ধ্যপর্বতের গাত্রে (রাজমহল-সাঁওতালভূম-ছোটনাগপুর-মালভূম-ধলভূম শৈলমূলে) প্রতিহত হইয়া ব্রহ্মোত্তর (সুহ্মোত্তর ?—বজ্রভূমি—বজ্জভূমি ?) অর্থাৎ উত্তর-রাঢ়, বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত দেশের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত। ভাগীরথীর পূর্বতীর বঙ্গ, পশ্চিম তীর তাম্রলিপ্ত, উত্তরতর প্রবাহে উত্তর রাঢ় বা য়ুয়ানচোয়াঙের কজঙ্গল, রামচরিতের কজঙ্গল, পবনদূতের কযঙ্গল। এই শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য মৎস্যপুরাণ, ১২১।

১৫ JASB., 1907, 424 p.

সিহাবুদ্দিন তালিস[১৬] (১৬৬৬) ও মির্জা নাথনের[১৭] (১৬২৪) বিবরণীতে দেখিতেছি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সংগমের উল্লেখ, ইচ্ছামতীসংগমে ইচ্ছামতীর তীরে যাত্রাপুর এবং তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে ডাকচর এবং ঢাকার দক্ষিণে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত প্রবাহের সমুদ্রযাত্রা— ভলুয়া এবং সন্দীপের পাশ দিয়া। যাত্রাপুর হইতে ইচ্ছামতী বাহিয়া পথই ছিল তখন ঢাকায় যাইবার সহজতম পথ, এবং এই পথেই টেভারনিয়ার (১৬৬৬) এবং হেজেস্ (১৬৮২) যাত্রাপুর হইয়া ঢাকা গিয়াছিলেন।[১৮] কিন্তু তখনও সর্বত্র গঙ্গার এই প্রবাহের 'পদ্মা' নামকরণ দেখিতেছি না। এই নামকরণ পাইতেছি আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে (১৫৯৬—৯৭)[১৯] মির্জা নাথনের 'বহারিস্তান-ই-ঘায়বি' গ্রন্থে,[২০], ত্রিপুরা রাজমালায় এবং চৈতন্যদেবের পূর্ববঙ্গভ্রমণ-প্রসঙ্গে[২১]। আবুল ফজলের মতে কাজিহাটার কাছে গঙ্গা দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে; একটি প্রবাহ পূর্ববাহিনী হইয়া পদ্মাবতী নাম লইয়া চট্টগ্রামের কাছে গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। মির্জা নাথন বলিতেছেন, করতোয়া বালিয়ার কাছে একটি বড় নদীতে আসিয়া পড়িতেছে; এই বড় নদীটির নাম অন্যত্র বলা হইয়াছে পদ্মাবতী।[২২] ত্রিপুরা-রাজ বিজয়মাণিক্য ১৫৫৯ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপুরা হইতে ঢাকায় আসিয়া ইচ্ছামতী বাহিয়া যাত্রাপুরে আসিয়া পদ্মাবতীতে তীর্থস্নান করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও (জন্ম ১৪৮৫) ২২ বৎসর বয়সে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে আসিয়া পদ্মাবতীতে তীর্থস্নান করিয়াছিলেন, কোন কোন চৈতন্যজীবনীতে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকেই পদ্মা (এবং ইচ্ছামতী) প্রসিদ্ধ নদী; তাহার কিছু তীর্থমহিমাও আছে, এবং ঢাকা পার হইয়া চট্টগ্রামের নিকটে তাহার সাগরমুখ, এ তথ্য নিঃসন্দেহ। ষোড়শ শতকের জাও ডি বারোসের এবং সপ্তদশ শতকে ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায়ও এই তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া কঠিন নয়। পঞ্চদশ

---

১৬ Bahāristān-i-Ghaybi, trs. M. I. Borah, Govt. of Assam, 2 vols. vi, 55 pp.

১৭ Bhattasali, N. K., Some Facts about Old Dacca, Bengal Past and Present, Jan.-March, 1936.

১৮ Ain-i-Akbari, trs. Jarrett, vol. ii, p. 120.

১৯ ত্রিপুরা রাজমালা, বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত, পৃ ৪৯

২০ গোবিন্দদাসের কড়চা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং

২১ বর্ধমানের দক্ষিণে দামোদরের প্রবাহপথের পরিবর্তন খুব বেশী হইয়াছে। ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শায় (১৬৬০) দেখা যায় বর্ধমানের দক্ষিণ-পূর্বে দামোদরের একটি শাখা সোজা উত্তর-পূর্ববাহী হইয়া আম্বোনা (Ambona)-কালনার কাছে ভাগীরথীতে পড়িতেছে। ক্ষমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ দাসের (কেতকাদাস) মনসামঙ্গলে (১৬৪০ আনুমানিক) এই শাখাটিকেই বুঝি বলা হইয়াছে "বাঁকা দামোদর"। এই বাঁকা নদীর তীরে তীরে যে-সব স্থানের নাম কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ করিয়াছেন তাহার তালিকা: কুঝাটি বা ওঝটি, গোবিন্দপুর, গাঙ্গপুর, দে-পুর, নেয়াদা বা নর্মদাঘাট, কেজুয়া, আদমপুর, গোদাঘাট, কুকুরঘাটা, হাসনহাটি, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর ও গহরপুর; গহরপুরের পরেই বাঁকাদামোদর "গঙ্গার জলে মিলি"য়া গেল (সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', পৃ ৫৭৭-৭৮)।

দামোদরের দক্ষিণবাহী প্রবাহপথেই যে এক সময় সরস্বতীর প্রবাহপথ ছিল, আমার এ অনুমান আগেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। জাও ডি বারোসের নক্শার ইঙ্গিত তাহাই। পরে সরস্বতী এই পথ পরিত্যাগ করিয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া রূপনারায়ণ-পাত্রঘাটার প্রবাহপথে কিছুদিন প্রবাহিত হইত। বস্তুতঃ রূপনারায়ণের নিম্নপ্রবাহ একদা সরস্বতীরই প্রবাহপথ বলিয়া মনে হয়।

২২ Bahāristān-i-Ghaybi, Borah, pp. 45—54, 56—64.

শতকের গোড়ায় কৃত্তিবাস যে এই পদ্মাবতীকেই বলিতেছেন বড়গঙ্গা তাহা তো আগেই দেখিয়াছি। চতুর্দশ শতকে ইব্‌ন্ বতুতা (১৩৪৫-৪৬) চীনদেশ যাইবার পথে সমুদ্রতীরবর্তী চট্টগ্রামে (Chhadkawan) নামিয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রামকে হিন্দুতীর্থ গঙ্গানদী এবং যমুনা (Jaun) নদীর সংগমস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যমুনা বা Jaun বলিতে বতুতা ব্রহ্মপুত্রই বুঝাইতেছেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।[২৩] তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অন্ততঃ চতুর্দশ শতকেও গঙ্গার পদ্মাবতী-প্রবাহ চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল, এবং তাহার অদূরে সেই প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হইত। তটভূমি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম এখন অনেক পূর্ব-দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে, ঢাকাও এখন আর গঙ্গা-পদ্মার উপরে অবস্থিত নয়; পদ্মা এখন অনেক দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে, ঢাকা এখন পুরাতন গঙ্গা-পদ্মার খাত অর্থাৎ বুড়ীগঙ্গার উপর অবস্থিত; আর পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের (যমুনা) সংগম এখন গোয়ালন্দের অদূরে; এই মিলিত প্রবাহ আরও পূর্ব-দক্ষিণে গিয়া চাঁদপুরের অদূরে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হইয়া সন্দ্বীপের (আমার অনুমান: সুবর্ণদ্বীপ – স্বর্ণদ্বীপ – সোনদ্বীপ – সন্দ্বীপ) নিকট গিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। বস্তুতঃ, সমতটীয় বাংলায়, বিশেষতঃ তাহার পূর্বাঞ্চলে খুলনা বরিশাল হইতে আরম্ভ করিয়া চাঁদপুর পর্যন্ত পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা যে কি পরিমাণ ভাঙাগড়া চালাইয়াছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, তাহা জাও ডি বারোস হইতে আরম্ভ করিয়া রেনেল পর্যন্ত নকশাগুলি বিশ্লেষণ করিলে খানিকটা ধারণাগত হয়। কিন্তু তাহা আলোচনার স্থান এখানে নয়। প্রাচীন বাংলায় গঙ্গার এই পূর্বপ্রবাহের অর্থাৎ পদ্মা বা পদ্মাবতীর আকৃতি-প্রকৃতি কি ছিল তাহাই আলোচ্য। পঞ্চদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতক পর্যন্ত পদ্মার প্রবাহপথের অদলবদল বহু আলোচিত; রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পূর্বোক্ত নিবন্ধে তাহার বিবরণী পাওয়া যাইবে।

কুমার-গড়াই-মধুমতী-শিলা(ই)দহ

চতুর্দশ শতকে ইব্‌ন্ বতুতার বিবরণের আগে বহুদিন এই প্রবাহের কোনও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। দশম শতকের শেষে একাদশ শতকের গোড়ায় চন্দ্রবংশীয় রাজারা বিক্রমপুর-চন্দ্রদ্বীপ-হরিকেল অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অনেকাংশ জুড়িয়া রাজত্ব করিতেন।[২৪] এই বংশের মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র তাঁহার ইদিলপুর পট্টোলিদ্বারা সতট-পদ্মাবতী বিষয়ের অন্তর্গত কুমারতালক মণ্ডলে একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন।[২৫] সতট-পদ্মাবতী বিষয় পদ্মানদীর দুইতীরবর্তী প্রদেশকে বুঝাইতেছে সন্দেহ নাই; পদ্মাবতীও নিঃসন্দেহে আবুল-ফজল ত্রিপুরা রাজমালা চৈতন্যজীবনী উল্লিখিত পদ্মাবতী তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই। কুমারতালক মণ্ডলের উল্লেখ আরও লক্ষণীয়। কুমারতালক এবং বর্তমান গড়াই নদীর অদূরে ফরিদপুর অন্তর্গত কুমারখালি দুইই কুমারনদীর ইঙ্গিত বহন করে তাহা নিঃসন্দেহ।

---

২৩ "The first town of Bengal, which we entered, was Chhadkawn (Chittagonj), *situated on the shore of the vast ocean.* The river Ganga, to which the Hindus go in pilgrimage, and the river Jaun (Jamuna) have united near it before falling into the sea."

২৪ History of Bengal, D. U., vol. i, pp. 192-96.

২৫ Edilpur copper-plate of Srichandra, Ep. Ind. XVII, pp. 189—90; Insc. of Beng., III, 166.

বর্তমান কুমার বা কুমারক নদী পদ্মা-উৎসারিত মাথাভাঙ্গা নদী হইতে বাহির হইয়া বর্তমান গড়াইর সঙ্গে মিলিত হইয়া বিভিন্ন অংশে গড়াই, মধুমতী, শিলা(ই)দহ, বালেশ্বর নাম লইয়া হরিণঘাটায় গিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। এ অনুমান যুক্তিসংগত যে, এই সমস্ত প্রবাহটারই যথার্থ নাম ছিল কুমার এবং কুমারই পরে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। তবে শিলা(ই)দহ নামটি পুরাতন বলিয়া যেন মনে হয়। ফরিদপুরে প্রাপ্ত ধর্মাদিত্যের একটি পট্টোলিতে শিলাকুণ্ড নামে একটি জলাশয়ের উল্লেখ আছে।[২৬] শিলাকুণ্ড ও শিলা(ই)দহ একই নাম হইতেও পারে। এই কুমার নদীর সাগর-মোহানা মুখ (হরিণঘাটা) বা কৌমারকই বোধ হয় (দ্বিতীয় শতকে) টলেমির গঙ্গার পঞ্চমুখের তৃতীয় মুখ কাম্বেরীখন (Kamberikhon)। যাহা হউক, "সতট-পদ্মাবতী বিষয়ে"র উল্লেখ হইতে বুঝা যাইতেছে যে দশম-একাদশ শতকেই পদ্মা বা পদ্মাবতীর প্রবাহ ইদিলপুর—বিক্রমপুর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং ঐদিক দিয়াই বোধ হয় সাগরে প্রবাহিত হইত। "কুমারতালকমণ্ডলের" (যে-মণ্ডল কুমারনদীর তল বা অববাহিকা, নদীর দুইধারের নিম্নভূমি) উল্লেখ হইতে অনুমান হয় কুমারনদীও তখন বর্তমান ছিল এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে তাহার যোগও ছিল। সাতশত বৎসর পর রেনেলের নকশায় তাহা লক্ষ্য করা যায় এবং গড়াই-মধুমতী-শিলা(ই)দহ-বালেশ্বর যদি কুমারের সঙ্গে অভিন্ন না হয় তাহা হইলে সে যোগ এখনও বর্তমান।

ইদিলপুর পট্টোলির প্রায় সমসাময়িক একটি সাহিত্য গ্রন্থে ও বোধ হয় গুহ্য রূপকছলে পদ্মানদীর উল্লেখ আছে। দশম-দ্বাদশ শতকের বজ্রযানী বৌদ্ধ ধর্মসাধনার গুহ্য আচার-আচরণ সম্বন্ধে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার যে-সমস্ত পদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কল্যাণে আজ সুপরিচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি পদের প্রথম চার লাইন এইরূপ:[২৭]

> বাজনাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
> অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ॥
> আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
> নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥ (৪৯ নং পদ, ভুসুকু সিদ্ধাচার্যের রচনা)

সিদ্ধাচার্য ভুসুকু একাদশ শতকের মধ্যভাগের লোক; ডক্টর শহীদুল্লাহ মনে করেন ভুসুকু তাঁহার গুরু দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞানের পঞ্চশিষ্যের অন্যতম এবং "এই বঙ্গাল দেশেরই এক প্রাচীন কবি।"[২৮] উদ্ধৃত লাইন চারিটির আপাত মর্ম এই: পদ্মা খালে বজ্রনৌকা পাড়ি বাহিতেছে। অদ্বয়-বঙ্গালে ক্লেশ লুটিয়া লইল। ভুসু, তুই আজ (যথার্থ) বঙ্গালী হইলি। চণ্ডালীকে তুই নিজ ঘরণী করিয়া লইয়াছিস্। এখানে পদ্মা খাল, বঙ্গাল, বঙ্গালী প্রভৃতি শব্দের এবং সমস্ত পদটির সহজিয়া মতানুগত গুহ্য অর্থ তো আছেই, তবে সেই গুহ্য অর্থ গড়িয়া উঠিয়াছে কয়েকটি বস্তুসম্পর্কগত শব্দকে অবলম্বন করিয়া। ভুসুকু বঙ্গালী অর্থাৎ

২৬ Ind. Antiq., 1910, p. 198, f.n.; Bhattasali, N. K., IBB/SDM, p. 2, f.n. 3.

২৭ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধগান ও দোঁহা, ভূমিকা এবং ৪৯নং পদের টীকা ও অর্থ; Bagchi, P. C., Materials for a critical addition of the Old Bengali Caryapadas, ১৯ নং পদ এবং অনুবাদ, ভূমিকা; মণীন্দ্রমোহন বসু, চর্যাপদ, ভূমিকা, ১৯নং পদের ব্যাখ্যা।

২৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, ১৩৪৮, পৃ ৪৬।

পূর্ব-দক্ষিণ-বঙ্গবাসী ছিলেন। ১০২১-২৫ খ্রীস্টাব্দে রাজেন্দ্রচোল দক্ষিণ-রাঢ়ের পরেই বঙ্গালদেশ জয় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বর্তমান দক্ষিণ-বঙ্গই বঙ্গালদেশ এবং এই বঙ্গালদেশ বিক্রমপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি যখন বঙ্গালী এবং বঙ্গালদেশের সঙ্গে পদ্মা খালের কথা বলিতেছেন, তখন পঁউআ খাল এবং পদ্মাবতী নদী যে এক এবং অভিন্ন এ কথা স্বীকার করিতে আপত্তি হইবার কারণ নাই। তাহা হইলে ইদিলপুর-লিপি এবং ভুসুকুর এই পদটিই পদ্মা বা পদ্মাবতী নদীর প্রাচীনতম নিঃসংশয় ঐতিহাসিক উল্লেখ। তবে পদ্মা তখনও হয়ত এত বড় নদী হইয়া উঠে নাই।

দশম-একাদশ শতকে পদ্মার উল্লেখ দেখা গেল। কিন্তু পদ্মা নদী ভাগীরথীর অন্যতম শাখা যে খুব প্রাচীন লোকস্মৃতির মধ্যে তাহা বিধৃত হইয়া আছে। দক্ষিণবাহী গঙ্গা-ভাগীরথী হইতে পদ্মার উৎপত্তি কাহিনী বৃহদ্ধর্মপুরাণ[২৯], দেবী ভাগবত[৩০], মহাভাগবত পুরাণ[৩১] এবং কৃত্তিবাস রামায়ণের[৩২] আদিকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের একটিও অবশ্য খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকের আগের রচিত গ্রন্থ নয়, কিন্তু কাহিনীগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বপ্রবাহযাত্রা দশম-একাদশ শতক হইতেও প্রাচীন। তবে, তখন বোধ হয় পদ্মা এত প্রশস্তা ও বেগবতী নদী ছিল না, হয়ত ক্ষীণতোয়া সংকীর্ণ ধারাই ছিল। তাহা না হইলে কামরূপ হইতে সমতট যাইবার পথে য়ুয়ান-চোয়াঙকে এই নদীটি পার হইতে হইত, এবং তাহার বিবরণীতে আমরা নদীটির উল্লেখও পাইতাম। এই অনুল্লেখ হইতে মনে হয় পদ্মা তখন উল্লেখযোগ্য নদী ছিল না। তাহা ছাড়া ষষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি হিমবচ্ছিখর হইতে দ্বাদশ শতকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; পদ্মা আজিকার মতন ভীষণা প্রশস্তা হইলে হয়তো একই ভুক্তি পদ্মার দুই তীরে বিস্তৃত হইত না।

জ্যোতির্বেত্তা ও ভৌগোলিক টলেমি (Ptolemy, 50 A.D.) তাঁহার আন্তর্গাঙ্গেয় (India Intra-Gangem) ভারতবর্ষের নক্শা ও বিবরণীতে তদানীন্তন গঙ্গাপ্রবাহের সাগরসংগমে পাঁচটি মুখের উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমির নক্শা ও বিবরণ নানা দোষে দুষ্ট এবং সর্বত্র সকল বিষয়ে খুব নির্ভরযোগ্যও নয়। তবু, তাঁহার সাক্ষ্য এবং পরবর্তী ঐতিহাসিক উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া কিছু কিছু অনুমান ঐতিহাসিকেরা করিয়াছেন, এবং এই সব মোহানা অবলম্বনে প্রাচীন ভাগীরথী-পদ্মার প্রবাহপথেরও কিছু আভাস দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা শক্ত; তবে মোটামুটি মতামত গুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে যথাক্রমে এই মোহানাগুলির নাম: (১) Kambyson; তারপর Poloura নামে নগর; (২) Mega (great;) (৩) Kamberikhon; তারপর Tilogrammon নামে এক নগর; (৪) Pseudostomon (false mouth) এবং সর্বশেষে পূর্বতম মোহানায় (৫) Antibole (thrown back).[৩৩] নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই মোহানাগুলিকে যথাক্রমে (১) তাম্রলিপ্তি-নিকটবর্তী গঙ্গাসাগরমুখ, (২) আদিগঙ্গা বা রায়মঙ্গল-হরিয়াভাঙ্গা মুখ, (৩) কুমার-হরিণঘাটা মুখ, (৪) দক্ষিণ-সাহাবাজপুরমুখ

---

২৯ McCrindle's Ptolemy. Ed. S. N. Majumdar, p. 72.

৩০ Bhattasali, N. K., Antiquity of the Lower Ganges and its courses, in 'Science and Culture', Nov., 1941, pp. 236—239.

৩১ History of Bengal, D. U., pp. 11-12.

৩২ বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, Bib. Ind. edn., p. 409.

এবং (৫) সন্দ্বীপ-চট্টগ্রাম মধ্যবর্তী আড়িয়ল খাঁ নদীর নিম্নতম প্রবাহ মুখ বলিয়া মনে করেন।[৩৪] হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় মনে করেন (১) কালিদাস-কথিত কপিশা বা বর্তমান কাসাইর মুখ (২) ভাগীরথীর সাগরমুখ (৩) কুমার-কুমারক-হরিণঘাটা মুখ, (৪) পদ্মা-মেঘনার সম্মিলিত প্রবাহমুখ, এবং (৫) বুড়ীগঙ্গা মুখই যথাক্রমে টলেমি-কথিত গঙ্গার পঞ্চমুখ।[৩৫] এই দুই মতের মধ্যে ১ ও ২নং ছাড়া আর কোথাও খুব মূলগত বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই ; ২নং মুখের পার্থক্যও খুব মূলগত নয়। ৩, ৪, ও ৫ নং মুখ সম্বন্ধে যদি সদ্য-উক্ত মত দুইটি সত্য হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হয় টলেমির সময়েই অন্ততঃ ঢাকা ফরিদপুর অঞ্চল পর্যন্ত গঙ্গার পূর্ব-দক্ষিণবাহী প্রবাহপথ অর্থাৎ পদ্মার প্রবাহপথের অস্তিত্ব ছিল। খুব অসম্ভব নাও হইতে পারে, তবে এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

ধলেশ্বরী-বুড়ীগঙ্গা

পদ্মার প্রাচীনতম প্রবাহপথের নিশানা সম্বন্ধেও নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। ফান্ ডেন ব্রোকের (১৬৬০) নক্শায় দেখা যাইতেছে পদ্মার প্রশস্ততর প্রবাহের গতি ফরিদপুর-বাখরগঞ্জের ভিতর দিয়া দক্ষিণ সাহাবাজপুরের দিকে; কিন্তু ঐ নক্শাতেই প্রাচীনতম পথটির কিছুটা ইঙ্গিতও আছে। এই পথটি রাজসাহীর রামপুর বোয়ালিয়ার পাশ দিয়া চলন বিলের ভিতর দিয়া ধলেশ্বরীর খাত দিয়া ঢাকার পাশ দিয়া মেঘনা-খাড়ীতে গিয়া সমুদ্রে মিশিত। ঢাকার পাশের নদীটিকে যে বুড়ীগঙ্গা বলা হয়, তাহা এই কারণেই; ঐ বুড়ীগঙ্গাই প্রাচীন গঙ্গা বা পদ্মার খাত। কিন্তু তাহারও আগে কোন্ পথে পদ্মা প্রবাহিত হইত এ সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন।

জলাঙ্গী-চন্দনা

পদ্মার প্রধান প্রবাহ ছাড়া পদ্মা হইতেই উৎসারিত আরও কয়েকটি নদীর প্রবাহপথে ভাগীরথী পদ্মার জল নিষ্কাশিত হয়। ইহাদের ভিতর জলাঙ্গী এবং চন্দনা নদী দুইটি পদ্মা হইতে ভাগীরথীতে প্রবাহিত; এবং দুইটি নদীই ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শায় দেখানো আছে। চন্দনা তদানীন্তন যশোহরের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। পদ্মা হইতে সমুদ্রে প্রবাহিত প্রাচীন নদীগুলির মধ্যে কুমারই প্রধান এবং বোধ হয় প্রাচীনতম। কিন্তু কুমার এখন মরণোন্মুখ। মধ্যযুগে এই নদীগুলির মধ্যে ভৈরবও ছিল অন্যতম; সেই ভৈরবও মরণোন্মুখ। বর্তমানে সাগরগামী পদ্মার শাখাগুলির মধ্যে মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁই প্রধান। ধলেশ্বরী-বুড়ীগঙ্গা যেমন পদ্মার উত্তরতম প্রবাহ পথের স্মারক, আড়িয়াল খাঁ (মির্জা নাথলের অগুল খাঁ) তেমনই দক্ষিণতম প্রবাহপথের দ্যোতক। যাহা হউক, মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁ এই দুটি নদীর অস্তিত্ব সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের নক্শাগুলিতেই দেখা যাইতেছে, যদিও বর্তমানে প্রবাহপথ অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছে।

---

৩৩ দেবীভাগবতম্, Bangabasi edn., p. 392.

৩৪ মহাভাগবত পুরাণ, Gujrati edn., Ch. 70, p. 175.

৩৫ কৃত্তিবাস রামায়ণ, আদিকাণ্ড, Bhattasali's edn., D.U., p. 99.

বাংলার খাড়ী ও ভাটি

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভাগীরথী ও পদ্মার বিভিন্ন প্রবাহপথের ভাঙাগড়ার ইতিহাস অনুসরণ করিলেই বুঝা যায় এই দুই নদীর মধ্যবর্তী সমতটীয় ভূভাগে, অর্থাৎ নদী দুইটির অসংখ্য খাড়ী খাড়িকাকে লইয়া কি তুমুল বিপ্লবই না চলিয়াছে যুগের পর যুগে। এই দুইটি নদী এবং তাহাদের অগণিত শাখাপ্রশাখাবাহিত সুবিপুল পলিমাটি ভাগীরথী-পদ্মামধ্যবর্তী খাড়ীময় ভূভাগকে বার বার তছনছ করিয়া বারবার তাহার রূপ পরিবর্তন করিয়াছে। পদ্মার খাড়ীতে ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর তীরে ডায়মণ্ড হারবার সাগরসংগম পর্যন্ত বাখরগঞ্জ, খুলনা এবং চব্বিশ পরগণার নিম্নভূমি ঐতিহাসিক কালেই কখনও সমৃদ্ধ জনপদ, কখনও গভীর অরণ্য, অথবা অনাবাসযোগ্য জলাভূমি, কখনও বা নদীগর্ভে বিলীন, আবার কখনও খাড়ী-খাড়িকা অন্তর্হিত হইয়া নূতন স্থলভূমির সৃষ্টি। ফরিদপুর জেলায় কোটালিপাড়া অঞ্চল ষষ্ঠ শতকের একাধিক তাম্রপট্টোলিতে নব্যাবকাশিকা বলিয়া কথিত হইয়াছে; নব্যাবকাশিকা সেই সেই ভূমি যে ভূমি (বা অবকাশ) নূতন সৃষ্ট হইয়াছে। ষষ্ঠ শতকে নব্যাবকাশিকা অঞ্চল সমৃদ্ধ জনপদ এবং নৌবাণিজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ কেন্দ্র, অথচ আজ এই অঞ্চল নিম্নজলাভূমি। পট্টোলীগুলি হইতে মনে হয়, নৌকা দ্বারাই এই সব অঞ্চলে যাওয়াআসা করিতে হইত। আশ্চর্যের বিষয় এই, ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে সেনরাজ বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্যপরিষৎ-লিপিতে বঙ্গের নাব্য অঞ্চলে রামসিদ্ধি পাটক নামে একটি গ্রামের উল্লেখ আছে। এই গ্রাম বাখরগঞ্জ জেলার গৌরনদী অঞ্চলে। এই নাব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বিনয়তিলক গ্রামের পূর্বসীমায় ছিল সমুদ্র। শ্রীচন্দ্রের (দশম-একাদশ শতক) রামপাল পট্টোলিতে নান্যমণ্ডলের উল্লেখ আছে; কেহ কেহ মনে করেন ইহার যথার্থ পাঠ নাব্যমণ্ডল, এবং ঐ পট্টোলির নান্য-মণ্ডলান্তর্গত নেহকাষ্ঠি গ্রাম বাখরগঞ্জ জেলার বর্তমান নৈকাঠি গ্রাম। এই অনুমান মিথ্যা নয় বলিয়াই মনে হয়। যাহাই হউক প্রাচীন বাংলায় নব্যাবকাশিকা নবসৃষ্ট ভূমি এবং ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ অঞ্চল নাব্য অর্থাৎ নৌ-যাতায়াতলভ্য এবং তাহার পূর্ব সীমায়ই সমুদ্র।[৩৬] খুলনার নিম্ন অঞ্চলে তো ভাঙাগড়া মধ্যযুগে এবং খুব সাম্প্রতিক কালেও চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে। মধ্যযুগে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা, তারনাথ প্রভৃতি লেখকেরা, ময়নামতীর গানে ভাগীরথীর পূর্বতীর হইতে সুবাবাংলার পূর্বে বেঙ্গলা (Bengala) পর্যন্ত ঢাকার বাঙ্গালা বাজার) বোধ হয় চট্টগ্রাম পর্যন্ত, সমস্ত নিম্নাঞ্চলটাকেই বাটি বা ভাটি নামে অভিহিত করিয়াছেন। আবুল ফজল বাটি বা ভাটি বলিতে সুবা বাংলার পূর্বাঞ্চল বুঝিয়াছেন। মানিকচন্দ্র রাজার গানেও "ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি"—এই ভাটিরও ইঙ্গিত সমুদ্রশায়ী এই সব খাড়ী-খাড়ীকাময় নিম্নভূমির দিকে। এই ভাটিরই কিয়দংশ প্রাচীন বাংলার সমতট, এইরূপ অনুমান বোধ হয় খুব অসংগত নয়।[৩৭]

সুন্দরবন

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলে চব্বিশ পরগণা খুলনা বাখরগঞ্জের নিম্নভূমিতে; এবং সমস্ত পবিবর্তনটাই ঘটিয়াছে মধ্যযুগে। কারণ এই অঞ্চলের পশ্চিম

---

৩৬ বিশ্বরূপ সেন এবং শ্রীচন্দ্রের পট্টোলি

৩৭ দ্রষ্টব্য, Ain-i-Akbari; মানিকচন্দ্র রাজার গান; Ges. der Budd. in Ind. Bangala বন্দরের জন্য পূর্বে উল্লিখিত নকসাগুলি দ্রষ্টব্য।

দিকটায় চব্বিশ পরগণা জেলার নিম্নাঞ্চলে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সমানে সমৃদ্ধ ঘনবসতিপূর্ণ জনপদের চিহ্ন প্রায়ই আবিষ্কৃত হইতেছে। জয়নগর থানায় কাশীপুর গ্রামের সূর্যমূর্তি (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক); ডায়মণ্ড হারবারের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে বকুলতলা গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের পট্টোলি (দ্বাদশ শতক), এবং ১৫ মাইল দক্ষিণ পূর্বে মলয় নামক স্থানে প্রাপ্ত জয়নাগের তাম্রপট্টোলি (সপ্তম শতক); রাক্ষসখালি দ্বীপে প্রাপ্ত ডোম্মনপালের পাট্টালি (দ্বাদশ শতক), ঐ দ্বীপেই প্রাপ্ত লিপি-উৎকীর্ণ এক ঝাঁক মাটির শীলমোহর (একাদশ শতক); খাড়ি পরগণায় প্রাপ্ত পাথরের মূর্তি, দুই-চারিটি ভগ্ন মন্দির; কালিঘাটে প্রাপ্ত গুপ্তমুদ্রা ইত্যাদি সমস্তই চব্বিশপরগণা জেলার নিম্ন-ভূমিতে প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধ জনপদের ইঙ্গিত করে। সেন রাজাদের আমলে, ডোম্মনপালের আমলে, খাড়িমণ্ডল ও খাড়িবিষয় পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ বিভাগই ছিল।[৩৮] অথচ আজ এই সব অঞ্চল প্রায় পরিত্যক্ত; কিছুদিন আগেও সমস্তটা জুড়িয়া গভীর অরণ্যই ছিল, এখন বহু অংশই অরণ্য, কিছু কিছু অংশমাত্র নূতন আবাদ ও বসতি হইতেছে। খুলনার দিকেও এবং বাখরগঞ্জের কিয়দংশে এখনও গভীর অরণ্য। রাল্ফ্ (Ralph Fitch, 1483-51) বলিতেছেন (Bengala দেশ ব্যাঘ্র, বন্য মহিষ ও বন্য মুরগী প্রভৃতি অধ্যুষিত বনময় জলাভূমি।[৩৯]

আকবরের আমলে ঈশা খাঁ আফগান ভাটি অঞ্চলের সামন্তপ্রভু ছিলেন; সেই সময়ে মহ্‌মুদাবাদ ও খলিফাতাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল বর্তমান ফরিদপুর, যশোর এবং নোয়াখালির জেলার কিয়দংশ, এবং দুই সরকারান্তর্গত বহুলাংশ গভীর অরণ্যময় ছিল। খান জাহান আলীর আমলে (ষোড়শ শতকে) যশোর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ গভীর অরণ্য; তিনি সুন্দরবনের অনেক অংশ নূতন আবাদ করাইয়াছিলেন। য়ুসুফ্‌সাহ্‌, সৈয়দ হোসেন সাহ্‌, নসরৎ সাহ (১৪৯৪, ১৪৯৪, ১৫২০) প্রভৃতি সুলতানেরাও এই সব অরণ্যের কিছু কিছু নূতন আবাদ করাইয়াছিলেন, প্রধানত ফরিদপুর ও যশোরে। এই দুই জেলার অনেক অংশ ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল; বিজয় গুপ্তের "মনসামঙ্গলে" ফতেহাবাদের উল্লেখ আছে (পঞ্চদশ শতক)। জেসুইট্‌ পাদ্রী ফারনান্‌ডিজ (Fernandus, 1598) হুগলী হইতে শ্রীপুর (খুলনা জেলায় ইছামতির তীরে, বর্তমান টাকীর উল্টাদিকে) হইয়া চট্টগ্রামের সমস্ত পথটাই ব্যাঘ্রসংকুল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক বৎসর পর ফন্‌সেকা (Fonseca, 1599) বাক্‌লা হইতে সপ্তগ্রামের (Chandeecan) পথ বানর ও হরিণ অধ্যুষিত বনময় ভূমি বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। পূর্বোক্ত ফিচ্‌ সাহেব (১৫৮৩-৯১) বলিতেছেন, বাক্‌লা বন্দরের পাশ ঘিরিয়া জঙ্গল। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে প্রতাপাদিত্য যশোরে সুন্দরবন অঞ্চলেই নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রয়োদশ শতকের পর কোনও সময় চব্বিশ পরগণা জেলার নিম্নভূমি কোনও অজ্ঞাত অনির্ধারিত কারণে পরিত্যক্ত হয়; এই কারণ কোন প্রাকৃতিক কারণ হইতে পারে, কোনও রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কারণও হইতে

---

৩৮ দ্রষ্টব্য, Ind. Hist. Quart. 1933, pp. 202; Insc. of Bengal, III, pp. 169-72; Ep. Ind. XVII; Ind. Hist. Quart., 1934, pp. 321 ff., 'Science and Culture', VII, No. 5, 238-39 pp.; Datta, K.—Ant. of Khāḍi, V. R. S. Monograph; Insc. of Bengal, III, 60-61 pp.

৩৯ ধর্মপালের খালিমপুর লিপি, দেবপালের নালন্দা লিপি এবং লক্ষ্মণ সেনের আনুলিয়া লিপিতে ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল নামে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অন্তর্গত একটি স্থানের উল্লেখ আছে। নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে (যে সমুদ্রতট ব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত) মনে হয় চব্বিশপরগণা-খুলনা-বাখরগঞ্জের সুন্দরবনের দিকেই তাহার ইঙ্গিত। ব্যাঘ্রতটী-বাগড়ী হইতেও পারে।

পারে। তাহার পর হইতেই এই অঞ্চল গভীর অরণ্যময়। যশোর-খুলনা ও ফরিদপুর-বাখরগঞ্জের কিছু কিছু নিম্নভূমি হিন্দু আমলেই ধীরে ধীরে ক্রমশঃ সমৃদ্ধ জনপদে গড়িয়া উঠিতেছিল, এবং নূতন নূতন আবাদ তথাকথিত পাঠান আমলেও নূতন জনপদ গড়িয়া তুলিতেছিল; কিন্তু প্রকৃতির তাণ্ডব এবং মানুষের ধ্বংসলীলা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকেই ইহার উপর যবনিকা টানিয়া দেয়। ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের প্রবল বন্যায় ফতেহাবাদ সরকারে অসংখ্য ঘরবাড়ী, নৌকা, এবং দুই লক্ষ লোক নষ্ট হইয়া যায়। ইহার উপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইল মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উন্মত্ত হত্যা ও লুণ্ঠনলীলা; এবং তাহার ফলে বাখরগঞ্জ এবং খুলনার নিম্নভূমি একেবারে জনমানবহীন গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়া গেল। রেণেলের নক্সায় (১৭৬১) দেখা যাইবে, বাখরগঞ্জ জেলার সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল জুড়িয়া লেখা আছে, 'মগদের অত্যাচারে পরিত্যক্ত জনমানবহীন' ("Country depopulated by the Maghs")।

লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র

পদ্মার পূর্ব-দক্ষিণতম প্রবাহে উত্তর হইতে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র অতি প্রাচীন নদ এবং তাহার তীর্থমহিমাও একান্ত অর্বাচীন নয়। ততটা না হউক, ব্রহ্মপুত্রও পদ্মা-ভাগীরথীর ন্যায় অন্ততঃ কয়েকবার খাত-পরিবর্তন করিয়া যমুনা-পদ্মার পথে বর্তমান খাত গ্রহণ করিয়াছে, এবং চাঁদপুরের দক্ষিণে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হইয়া সমুদ্রে অবতরণ করিয়াছে। গারো পাহাড়ের পশ্চিমের মোড় পর্যন্ত লৌহিত্যের উত্তর প্রবাহে খাত-পরিবর্তনের প্রমাণ বিশেষ কিছু নাই; পার্বত্য পথ, খাত পরিবর্তনের সুযোগও সুগম। কিন্তু গারো পাহাড়ের পশ্চিম-দক্ষিণ মোড় ঘুরিয়াই লৌহিত্য ঐ পাহাড়ের পূর্বদক্ষিণ তলভূমি ঘেঁষিয়া দেপয়ানগঞ্জের পাশ দিয়া, শেরপুর-জামালপুরের ভিতর দিয়া মধুপুর গড়ের পাশ দিয়া মৈমনসিং জেলাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বর্তমান ঢাকা জেলার পূর্বাঞ্চল ভেদ করিয়া সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁর দক্ষিণ-পশ্চিমে লাঙ্গলবন্দের পাশ দিয়া ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হইত। এই খাত এখনও বর্তমান, কিন্তু বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে প্রায় মৃত বলিলেই চলে। এই খাতই প্রাচীন, এবং ব্রহ্মপুত্রের যাহা কিছু তীর্থমহিমা তাহা এই খাতেরই; এখনও জামালপুর, মৈমনসিং, লাঙ্গলবন্দে অষ্টমীর স্নান উল্লেখযোগ্য। ফান্ ডেন ব্রোক (১৬৬০), ইজাক্ টিরিয়ন (১৭৩০) এবং থর্নটনের নক্শায় Salhet (Sylhet) বা শ্রীহট্টকে কেন যে এই প্রবাহপথের পশ্চিমে দেখানো হইয়াছে তাহা বলা শক্ত; শ্রীহট্ট সম্বন্ধে বোধ হয় ইহাদের সুস্পষ্ট ধারণা কিছু ছিল না। রেনেল (১৭৬৬-১৭৭৬) কিন্তু শ্রীহট্টের অবস্থিতি ঠিক দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, ঢাকা জেলার উত্তরে এই ব্রহ্মপুত্র-প্রবাহেরই ডানদিক হইতে একটি শাখা-প্রবাহ নির্গত হইয়াছে; ইহার নাম লক্ষ্যা (শীতললক্ষ্যা বা শীতলক্ষ্যা), বা ফান্ ডেন্ ব্রোকের Lecki-লক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিক দিয়া ব্রহ্মপুত্রেরই সমান্তরালে প্রবাহিত হইয়া বর্তমান ঢাকার দক্ষিণে (ব্রহ্মপুত্র-ধলেশ্বরীসংগমের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে) নারায়ণগঞ্জের নিকটে ধলেশ্বরীর সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইত। লক্ষ্যার এই প্রবাহ এখনও বর্তমান কিন্তু ধারা ক্ষীণ, অথচ ফান্ ডেন ব্রোকের আমলে এবং তারপরে ঊনবিংশ শতকের গোড়ায়ও লক্ষ্যা প্রশস্ত বেগবতী নদী। লক্ষ্যার কথা ছাড়িয়া ব্রহ্মপুত্রের মূল প্রবাহে ফিরিয়া আসা যাইতে পারে। ফান্ ডেন্ ব্রোক্, ইজাক্ টিরিয়ন, থর্ন্টন, রেনেল ইত্যাদি সকলের নক্শা আলেচনা করিলে নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে সপ্তদশ শতকে ফান্ ডেন ব্রোকের আগেই ব্রহ্মপুত্র এই

খাত পরিত্যাগ করিয়াছিল। কারণ, এই নক্শাগুলিতে দেখা যায় ব্রহ্মপুত্র আর ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হইতেছে না; বর্তমান ঢাকা জেলার সীমায় পৌছিবার অব্যবহিত পূর্বে মৈমনসিংহের ভিতর দিয়া আসিয়া পূর্ব-দক্ষিণতম কোণে ভৈরববাজার বন্দরের নিকট উত্তরাগত সুরমা-মেঘনার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের মিলন ঘটিতেছে, এবং উভয়ের সম্মিলিত ধারা চাঁদপুরের দক্ষিণে সন্দ্বীপের উত্তরে গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। ভৈরববাজারের নিকট হইতে সমুদ্র পর্যন্ত এই ধারা রেনেলের সময়েও মেঘনা (Megna) নামেই খ্যাত। ব্রহ্মপুত্রের সদ্যোক্ত প্রবাহই তাহার পূর্বতম প্রবাহ; কিন্তু ব্রহ্মপুত্র এই প্রবাহও পরিত্যাগ করে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কোনও সময়ে; জলপ্রবাহ এখনও বিদ্যমান কিন্তু ধারা ক্ষীণ এবং গ্রীষ্মে মৃতপ্রায়। মেঘনা প্রধানত তাহার নিজের জলরাশিই সমুদ্রে নিষ্কাষিত করে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি হইতে ব্রহ্মপুত্রের অন্যতম শাখা যমুনা প্রবলতরা হইয়া উঠে, এবং বর্তমান মৈমনসিংহের উত্তর-পশ্চিমতম কোণ ফুলছড়ির নিকট হইতে উৎসারিতা, বগুড়া-পাবনার পূর্বসীমা-বাহিতা এই যমুনাই ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি বহন করিয়া আনিয়া এখন গোয়ালন্দের কাছে পদ্মাপ্রবাহে ঢালিয়া দিতেছে।

সপ্তদশ শতক হইতে লৌহিত্য-ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহের ইতিহাস সুস্পষ্ট, তাহার আগেকার ইতিহাসও কতকটা ধরিতে পারা কঠিন নয়, এবং দেওয়ানগঞ্জ-জামালপুর-মৈমনসিং-লাঙ্গলবন্দ-ধলেশ্বরীর পথে সে-ইঙ্গিতও কিছু পাওয়া যাইতেছে। এ পথ চতুর্দশ-ষোড়শ শতকের হইতে পারে, প্রাচীনতরও হইতে পারে। কিন্তু তারও আগে এই পথের ইতিহাস কোথাও পাইতেছি না। লৌহিত্য-ব্রহ্মপুত্রের উল্লেখ পুরাণে, প্রাচীন সাহিত্যে (যথা মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে), এবং লিপিমালায় একেবারে অপ্রচুর নয়, এবং তাহা সুবিদিত। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন কামরূপরাজ্য ছিল এই লৌহিত্যের তীরে; গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত একবার লৌহিত্যতীরে কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মণের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন (ষষ্ঠ শতকের শেষাশেষি)। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই সব প্রাচীন উল্লেখ সাধারণতঃ লৌহিত্যের উত্তর-প্রবাহ সম্বন্ধে। দক্ষিণ-প্রবাহে যেখানে বারবার খাত-পরিবর্তন হইয়াছে সে-সম্বন্ধে কোনও প্রাচীন ঐতিহাসিক উল্লেখ এখনও পাওয়া যাইতেছে না।

সুরমা-মেঘনা

মেঘনা সম্বন্ধে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। খাসিয়া-জৈন্তিয়া শৈলমালা হইতে মেঘনার উদ্ভব কিন্তু, উত্তর-প্রবাহে মেঘনা সুরমা নামেই খ্যাত এবং এই নামটি প্রাচীন। সুরমা শ্রীহট্ট জেলার ভিতর দিয়া মৈমনসিংহ জেলার নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমার পূর্বসীমা স্পর্শ করিয়া আজমিরিগঞ্জ বন্দর ও অদূরবর্তী বানিয়াচঙ্গ গ্রাম বাম তীরে রাখিয়া ভৈরববাজারে এক সময় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইত। নিম্নতর প্রবাহের কথা ব্রহ্মপুত্র-প্রসঙ্গেই বলিয়াছি। সুরমা যেখান হইতে পশ্চিমা গতি ছাড়িয়া দক্ষিণা গতি লইয়াছে (বর্তমান মার্কুলি স্টীমার স্টেশনের নিকট) সেখান হইতে সুরমা মেঘনা নামও লইয়াছে। রেনেলের নক্শায় এই পথ সুস্পষ্ট দেখানো আছে; আজমিরিগঞ্জ-বানিয়াচঙ্গও বাদ পড়ে নাই। এই নদীপথের উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হইয়াছে, এমন ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই। মেঘনার নিম্নপ্রবাহের দুই তীরে সমৃদ্ধ জনপদের পরিচয় পঞ্চদশ শতকে ইব্‌ন বতুতার বিবরণেই

পাওয়া যায়—১৫ দিন ধরিয়া মেঘনার পথে তিনি গিয়াছিলেন; দুই ধারে ঘনবসতিময় গ্রাম, ফলের উদ্যান, মনে হইয়াছিল যেন বাজারের মধ্য দিয়া যাইতেছেন।[৪০] মেঘনা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি অনুমানের উল্লেখ এ-প্রসঙ্গে অবান্তর হইবে না। চলিত লোকবচনে ও স্মৃতিতে এই উৎপত্তি মেঘনাদ বা মেঘানন্দ শব্দ হইতে। টলেমি কিন্তু খ্রীস্টাব্দ প্রথম শতকে গঙ্গার পূর্বপ্রান্তম মুখটির নাম করিয়াছেন Mega বা great বলিয়া। এই Mega বা মেগা নদ হইতে মেঘনাদ = মেঘানন্দ = মেঘনা নামের উৎপত্তি একেবারে ইতিহাসবিরুদ্ধ হয়ত না-ও হইতে পারে। তবে অনুমানের অধিক মূল্য ইহার কিছু নাই।

করতোয়া

উত্তরবঙ্গের নদনদীগুলির কথা এইবার বলা যাইতে পারে। উত্তরবঙ্গের সর্বপ্রধান নদী করতোয়া। এই নদীর ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং ইহার তীর্থমহিমা বহুখ্যাত। পুরাণে বারবার করতোয়া-মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে[৪১]; তাহা ছাড়া "করতোয়া-মাহাত্ম্য" নামে একখানা সুপ্রাচীন পুঁথি এখনও করতোয়ার তীর্থমহিমা ঘোষণা করে। লঘুভারতে বলা হইয়াছে "বৃহৎপরিসরা পুণ্যা করতোয়া মহানদী"; মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা অধ্যায়েও করতোয়া পুণ্যতোয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং গঙ্গাসাগরসংগমতীর্থের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হইয়াছে।[৪২] পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী প্রাচীন পুন্দনগর (পুণ্ড্রনগর বর্তমান মহাস্থানগড়, বগুড়ার অদূরে) এই করতোয়ার উপরই অবস্থিত ছিল। খুব প্রাচীন কালেও যে করতোয়া বর্তমান বগুড়া জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত তাহা মহাস্থানের অবস্থিতি এবং "করতোয়া মাহাত্ম্য" হইতেই প্রমাণিত হয়। সপ্তম শতকে য়ুয়ান-চোয়াঙ পুণ্ড্রবর্ধন হইতে কামরূপ যাইবার পথে বৃহৎ একটি নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি এই নদীটির নাম করেন নাই, কিন্তু টাংসু (T'ang-Shu) গ্রন্থের মতে এই নদীর নাম কলোতু বা Ka-lo-tu।[৪৩] Ka-lo-tu স্পষ্টতই করতোয়া; এই নদীই সপ্তম শতকে পুণ্ড্রবর্ধন-কামরূপের মধ্যবর্তী সীমা, এ-খবরও টাং'-সুর গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতে"র কবি-প্রশস্তিতেও এই তথ্যের আংশিক সমর্থন পাওয়া যাইতেছে; সেখানে স্পষ্টতই বলা হইতেছে বরেন্দ্রী দেশ (লিপিমালার বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রীমণ্ডল) গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী দেশ। যাহা হউক, এই সব উল্লেখ এবং লিপিমালায় যে-সব গ্রাম ও নগর বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বলিয়া বলা হইয়াছে (যেমন, বায়ীগ্রাম = বৈগ্রাম, বর্তমান দিনাজপুর জেলায় হিলির নিকটে; কোলঞ্চ-ক্রোড়ঞ্চ, বোধ হয় দিনাজপুর জেলায়; কান্তাপুর = কান্তনগর, বর্তমান দিনাজপুর জেলায়; নাটারি = নাটোর, বর্তমান রাজসাহী জেলায়; পদুবন্ধা = পাবনা? ইত্যাদি) তাহাদের অবস্থিতি বিশ্লেষণ করিলে সন্দেহ করিবার কারণ নাই যে বরেন্দ্রীর পূর্বদিক ঘিরিয়া সপ্তম শতকে পৌণ্ড্রবর্ধনের পূর্বসীমায় দিয়া করতোয়া প্রবাহিত হইত।[৪৪] "করতোয়া-মাহাত্ম্য" পাঠে মনে হয় এক সময়ে করতোয়া স্বতন্ত্র নদী

---

৪০ Gibb, Ibn Batuta, pp. 267-77.

৪২ Mbh. Vanaparvan, Ch. 85, 2-4.

৪৩ Watters, Yuan Chwang, vol. ii, 186-87. Watters Ka-lo-tuকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। নিঃসন্দেহে ইহা ভুল।

৪৪ Bahāristan-i-Ghaybi, Borah's trans. D. U. pp. 46, 51, 53; D. R. Bhandarkar Volume p. 360.

হিসাবে সাগরে গিয়া পড়িত, কিন্তু তাহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। লোকস্মৃতি সাগর বলিতে বোধ হয় কোন বৃহৎ জলস্রোতকেই বুঝিয়া ও বুঝাইয়া থাকিবে। মধ্যযুগে দেখিতেছি করতোয়ার জল নিঃশেষিত হইতেছে প্রশস্ত পদ্মা-ধলেশ্বরীসংগমে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা পরে বলিতেছি।

করতোয়া ভোটানসীমান্তেরও উত্তরে হিমালয় হইতে উৎসারিত হইয়া দারজিলিং-জলপাইগুড়ি জেলার ভিতর দিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এই উত্তরতম প্রবাহে ইহার নাম করতোয়া নয়, দিস্তাং বা তিস্তা যাহার সংস্কৃতীকরণ হইয়াছে ত্রিস্রোতা। জলপাইগুড়ি হইতে তিস্তার (ফান্ ডেন ব্রোকের নক্সায় Tiesta) তিনটি স্রোত তিন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে : দক্ষিণবাহী পূর্বতম স্রোতের নাম করতোয়া ; দক্ষিণবাহী মধ্যবর্তী স্রোতধারার নাম আত্রাই ; দক্ষিণবাহী পশ্চিমতম স্রোতের নাম পুর্নভবা বা পুনর্ভবা।

তিস্তা-পুনর্ভবা-আত্রাই-মহানন্দা

উনবিংশ শতকে আয়িয়রগঞ্জের (Ayiyarganj) নিকটে তিস্তা মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হইত, এবং মহানন্দা রামপুর-বোয়ালিয়ার নিকটে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হইত। কিন্তু তাহার আগে একসময় মহানন্দা লক্ষ্মণাবতী-গৌড়ের ভিতর দিয়া আসিয়া করতোয়ায় পুনর্ভবা এবং নিজ প্রবাহের জল নিষ্কাশিত করিত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। রেনেলের নক্শায় সে পরিচয় পাওয়া যায় ; কিন্তু ফান্ ডেন ব্রোকের আমলে মহানন্দার গতি আরও পশ্চিমে। আত্রাই (তঙ্গন-আত্রাই) তিস্তা হইতে নির্গত হইয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া চলন বিলের ভিতর দিয়া জাফরগঞ্জের নিকটে করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হইত। ফান্ ডেন ব্রোক, ইজাক্ টিরিয়ন্, থর্নটন্ সকলের নক্শাতেই আত্রাই-করতোয়াসংগম সুস্পষ্ট দেখান আছে। এই নক্শাগুলিতেই দেখা যায় আত্রাইর ছোট একটি শাখা পশ্চিমবাহী হইয়া গিয়া পদ্মায় পড়িয়াছে, কিন্তু তঙ্গন-আত্রাই-পথই প্রধানপ্রবাহ পথ। দেখা যাইতেছে, তিস্তা হইতে নির্গত দুইটি স্রোতই উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়া প্লাবিত করিয়া তাহাদের জলরাশি শেষ পর্যন্ত ঢালিয়া দিত তৃতীয় স্রোতটিতে অর্থাৎ করতোয়ায় ; তাহা ছাড়া সে নিজের এবং উত্তরতম প্রবাহ তিস্তার সমস্ত জলধারা তো বহন করিতই। এই সব কারণেই ষোড়শ শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত করতোয়া ছিল অতিপ্রশস্তা ও বেগবতী নদী। সপ্তদশ শতকের গোড়াতে মির্জা নাথনের বিবরণী (১৬০৮) পড়িলে মনে হয় সাহাবাজপুরের (পাবনা) দক্ষিণে করতোয়া বক্র সংকীর্ণ ও ক্ষীণতোয়া হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ করতোয়া মৃতপ্রায় ; আত্রাই-পুনর্ভবার ও একই দশা ! কিন্তু সপ্তদশ শতকেও এত খারাপ হয় নাই। ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শায় (১৬৬০) আত্রাই ও করতোয়া দুয়েরই আকৃতি প্রশস্ত। টেভারনিয়ার ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে উত্তরাগত একটি বড় নদীর নাম করিতেছেন Chativor ; এই Chativor তো করতোয়া বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া, জাও ডি বারোস (১৫৫০) এবং ক্যাস্তেল্লী দ্য ভিনোলা (Cantelli da Vignola, ১৬৮৩) এই দুইজনই তাঁহাদের নক্শায় উত্তর হইতে সোজা দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান একটি নদী দেখাইতেছেন ; ইহার নাম কাওর (Caor)। কাওরকেও করতোয়া বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। ইহাদের নক্শা যথাযথ নয় এবং হয়তো সর্বত্র সর্বথা নির্ভরযোগ্যও নয়, তবু সমসাময়িক বাংলার নদনদী-বিন্যাসের আভাস এই সব নক্শায় খানিকটা নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। হয়তো ইহাদের কাছে মনে হইয়াছিল অথবা লোকস্মৃতিতে বা লোকমুখে ইহারা শুনিয়াছিলেন যে করতোয়া সাগরগামিনী

নদী।[৪৫] যাহাই হউক, বুঝা যাইতেছে সপ্তদশ শতকে করতোয়া (এবং আত্রাইও) উল্লেখযোগ্য নদী। অষ্টাদশ শতকে রেনেলের নক্‌শায়ও আত্রাই এবং করতোয়ার সেই মোটামুটি সম্বন্ধ রূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এবং করতোয়া তদানীন্তন রংপুর-দিনাজপুরের ভিতর দিয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া পুঁটিয়ার (Pootyah) কিঞ্চিৎ উত্তর হইতে পদ্মার সঙ্গে প্রায় সমান্তরালে পূর্ব-দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রায় পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের সংগমস্থানের নিকটে পদ্মায় গিয়া পড়িতেছে। কিন্তু ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের হিমালয়-সানুর বিরাট বন্যায় আত্রাই-করতোয়ার সমৃদ্ধি বিনষ্ট হইয়া গেল। উত্তর-প্রবাহে যে-তিস্তা এই নদী দুইটির সমৃদ্ধির মূলে সেই তিস্তা এই বিরাট বন্যার বিপুল জলরাশি বহন করিতে না পারিয়া পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটি প্রায়-অবলুপ্ত প্রাচীন সংকীর্ণ নদীর খাত ভাঙিয়া সবেগে ফুলছাড়িঘাটে ব্রহ্মপুত্রে গিয়া বিপুল জলরাশি ঢালিয়া দিল। সেই সময় হইতে তিস্তা ব্রহ্মপুত্রমুখী, সে আর পুনর্ভবা আত্রাই-করতোয়ায় হিমালয় নদীমালার জল প্রেরণ করে না। এবং আজ যে এই নদী তিনটি, বিশেষভাবে করতোয়া ক্ষীণা হইতে ক্ষীণতরা হইতেছে তাহার কারণও তাহাই। তবু, উনবিংশ শতকের গোড়ায়ও করতোয়ার কিছু খ্যাতি-সমৃদ্ধি ছিল বলিয়া মনে হয়; ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে জনৈক য়ুরোপীয় লেখক বলিতেছেন করতোয়া "was a very considerable river, of the greatest celebrity in Hindu fable"।

উত্তর-বঙ্গের আর একটি প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন নদী কৌশিকী (বা বর্তমান কোশী)। এই কোশী এখন উক্ত বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ভিতর দিয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া গঙ্গায় প্রবাহিত হয়। অথচ এই নদী একসময় ছিল পূর্ববাহী এবং ব্রহ্মপুত্রগামী; শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া সমস্ত উত্তর-বঙ্গ জুড়িয়া ধীরে ধীরে খাত-পরিবর্তন করিতে করিতে কোশী পূর্ব হইতে একেবারে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। কোশী প্রাচীন ও মধ্য যুগের বঙ্গের নদীবিন্যাসের ইতিহাসে এক বিরাট বিস্ময়। কোশী (এবং মহানন্দার) এইরূপ বিস্ময়কর খাত-পরিবর্তনের ফলেই গৌড়-লক্ষণাবতী-পাণ্ডুয়া অঞ্চল নিম্ন জলাভূমিতে পরিণত হইয়া অস্বাস্থ্যকর এবং অনাবাসযোগ্য হইয়া উঠে, বন্যার প্রকোপে বিধ্বস্ত হয়, এবং অবশেষে পরিত্যক্ত হয়। কোচবিহার হইতে রাল্‌ফ্ ফিচ্ (১৫৮৩-৯১) গৌড়ের ভিতর দিয়া হুগলী আসিয়াছিলেন; গৌড় জুড়িয়া "we found but few villages but almost all wilderness, and saw many buffes, swine, and deere, grasse longer than a man, and very many tigers." সমস্ত উত্তর-বাংলা জুড়িয়া অসংখ্য মরা নদীর খাত, নিম্নজলাভূমি এখনও দৃষ্টিগোচর হয়; স্থানীয় লোকেরা ইহাদের বলে বুড়ী কোশী বা মরা কোশী। মালদহের উত্তরে ও পূর্বে যে সব বিলঝিল ইত্যাদি এখনও দেখা যায় সেগুলি এই কোশী ও মহানন্দার মৃত খাত হওয়া অসম্ভব নয়।[৪৬]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার নদনদীগুলির যে পরিচয় পাওয়া গেল তাহার মধ্যে দেখিতেছি

---

৪৫ Caor যে করতোয়া তাহার একটু পরোক্ষ প্রমাণও ডি বারোস্ দিতেছেন। তাঁহার নক্‌সায় দেখিতেছি করতোয়া Reino de Comotah বা কামতা রাজ্যের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত। কামতা বর্তমান রঙপুর-কোচবিহার।

করতোয়া-আত্রাই'র সম্মিলিত প্রবাহ এক সময় হয়ত ব্রহ্মপুত্রে গিয়া মিশিত। এসম্বন্ধে ঐতিহাসিক কোনও প্রমাণ নাই, তবে হাণ্টার সাহেব করতোয়া তীরবাসীদের মুখে এক লোকস্মৃতি শুনিয়াছিলেন, তাহারা করতোয়াকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়াই জানিত। ফান্ ডেন ব্রোকের নক্‌সায় (১৬৬০) করতোয়া ব্রহ্মপুত্রে গিয়া পড়িতেছে বলিয়া মনে হয়।

Ind. Antiq., 1910, p. 198, f.n.; Bhattasali, N. K.—IBB/SDM, p. 2, f.n. 3.

৪৬ Martin—Eastern India, III, p. 15; J. A. S. B., 1896, p. 1 ff.

গঙ্গা-ভাগীরথী, পদ্মা-পদ্মাবতী, করতোয়া এবং লৌহিত্য-ব্রহ্মপুত্রই প্রধান। গঙ্গা-ভাগীরথীর ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত অজয়, দামোদর, সরস্বতী ও যমুনা প্রসিদ্ধা নদী; ইহাদের নাম প্রাচীন গ্রন্থ বা লিপি অথবা প্রাচীন ঐতিহ্য-স্মৃতির মধ্যেই পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিম হইতে সমুদ্রবাহিনী কপিশা বা কাসাইও প্রাচীনা নদী। পদ্মা-প্রবাহও যে কম প্রাচীন নয় তাহাও দেখা গিয়াছে, এবং তাহারই শাখা কুমার নদীর নিঃসংশয় উল্লেখ টলেমির বিবরণীতেই পাওয়া যাইতেছে। করতোয়াও সুপ্রাচীন প্রবাহ; কোশী-মহানন্দা-আত্রাই-পুনর্ভবার খুব প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু ইহারাও সুপ্রাচীন বলিয়াই মনে হয়— অন্তত কৌশিকী-মহানন্দার প্রাচীন প্রবাহপথের ইঙ্গিত মিলিতেছে। ত্রিস্রোতা নামটিও প্রাচীন ঐতিহ্যস্মৃতিবহ। লৌহিত্যের উল্লেখও খুব প্রাচীন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই সব নদনদী প্রবাহপথের কতকটা ইতিহাস এইখানে ধরিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস আলোচনাকালে এই কথা সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে মধ্যযুগে এই সব নদনদী বারবার যেমন প্রবাহপথ পরিবর্তন করিয়াছে, প্রাচীনকালেও সেইরূপই হইয়াছে। বিশেষতঃ পদ্মাও গঙ্গার নিম্নপ্রবাহে, নিম্নবঙ্গের সমস্তটি জুড়িয়া, এমনকি উত্তর ও পূর্ব বঙ্গেও। বর্তমানেও এই ভাঙাগড়া চলিতেছে।

একটি লুপ্তপ্রায় রবীন্দ্রগীত

১৩৫০ সালে প্রকাশিত 'গীতবিতান বার্ষিকী'তে "রবীন্দ্র-গীতজিজ্ঞাসা" প্রবন্ধে বর্তমান লেখক কয়েকটি লুপ্তপ্রায় রবীন্দ্রসংগীতের 'অনুসন্ধান সুরু' করার কথা আলোচনা করেছিলেন। প্রসঙ্গত ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের উদ্দেশে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি গানের সম্পূর্ণ পাঠ, সুর ও রচনাকাল সংগ্রহের অনুরোধ তিনি রবীন্দ্রগীতসন্ধানীদের জানিয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ সম্প্রতি দেখা গেল, উক্ত গানটির নিম্নমুদ্রিত সম্পূর্ণ পাঠ মহারাজার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১৩১৬ সালের বৈশাখের ভারতীতে (পৃষ্ঠা ২৫) শরৎকুমারী চৌধুরাণীর একটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছে। গানটি রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে আজ পর্যন্ত সংকলিত হয়নি।—

রাজ-অধিরাজ তব ভালে জয়মালা,
ত্রিপুরপুরলক্ষ্মী বহে তব বরণডালা।
দীনজনদুখহরণ অভয় তব বাণী,
ক্ষীণজনভয়তারণ নিপুণ তব পাণি,
তরুণ তব মুখচন্দ্র করুণরসঢালা।
গুণিরসিকসেবিত উদার তব দ্বারে—
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে—
গুণ-অরুণকিরণে তব সব ভুবন আলা।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকান নিগ্রো কবিতা

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার নিগ্রোদের আমরা জানি প্রধানত নৃত্যগীতকুশলী এক দাসজাতি বলে। অথচ বৈশ্য আমেরিকার রসহীন জমিতে প্রকৃত রসশিল্পের যা কিছু ফসল জন্মেছে, তার মূলে এই অবজ্ঞাত জাতিটির দান অপরিমেয়। আমাদের দেশে বিদেশীয় সংগীতে যাঁদের অল্পবিস্তর উৎসাহ আছে তাঁরা অনেকেই নিগ্রো 'স্পিরিচুয়্যাল্‌স্‌'-এর সুরের রহস্যময় গভীরতার সঙ্গে পরিচিত আছেন, কেক্‌ওআক্‌ স্টেপ্‌স্‌ এবং র‍্যাগ্‌টাইম্‌ বা জাজ্‌ সংগীতের নামও অনেকেই শুনে থাকবেন। সিনেমার বিদেশীয় পর্দায় হয়ত বা তাদের বিকৃত টুকরো পরিচয়ও পেয়ে থাকেন মাঝে মাঝে, কিন্তু নিগ্রোদের কাব্যসম্পদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের প্রায়ই ঘটে ওঠে না।

সুরবোধ এবং ছন্দজ্ঞান যে-জাতির মজ্জার জিনিস তারা সংগীত এবং কবিতা রচনায় সার্থকতার সুনিশ্চিত পরিচয় একদিন দেবেই— এ তো স্বতঃসিদ্ধ সত্য। তার উপর এ জাতিটির আশ্চর্য এক ক্ষমতা আছে সব দেশে সব অবস্থায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার— সমাজবিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন: **remarkable racial gift of adaptability**। কিন্তু এ খাপ খাওয়ানো তো কিছু গোঁজামিল দেওয়া বাইরের জিনিস নয়, এর গভীরে আছে সেই শক্তি যাতে করে এক জাতি নিজের সত্তার অনেকখানি গালিয়ে ঢেলে দিতে পারে আর-এক জাতির সত্তায়। একজন বিচক্ষণ নিগ্রো কবি যা বলেছেন তা খুবই ঠিক: it is more than adaptability, it is a transfusive quality। নিগ্রোদের এই আশ্চর্য শক্তির লীলা, শুধু আমেরিকা বলে নয়, য়ুরোপের নানা দেশেও দেখা গেছে।—

> And the Negro has exercised this transfusive quality not only here in America, where the race lives in large numbers, but in European countries, where the number has been almost infinitesimal.

অনেকেই হয়তো শুনে অবাক হবেন যে রুশ কবি পুশকিন্‌ অ্যালেক্‌জাণ্ডার্‌, ফরাসী ঔপন্যাসিক আলেসাঁদ্র্‌ দুমা এবং ইংরেজ গীতকার কোলরিজ্‌ টেলর্‌-এর জন্ম হয়েছিল আফ্রিকান্‌ বংশে। পুশকিন্‌-এর এই কালা-রক্তের আদি পরিচয় সাধারণে সুবিদিত নয়। তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন নিগ্রো— পিটার-দি-গ্রেট্‌ তাঁকে উপঢৌকনস্বরূপ লাভ করেন কোনো সামন্ত রাজার কাছ থেকে, এবং হ্যানিবল্‌ নামে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করে তাঁকে নিজের শরীররক্ষীর পদে নিয়োগ করেছিলেন।

আমেরিকান কাব্যসাহিত্যে নিগ্রো কবিদের দান সরকারী স্বীকৃতি লাভ না করে থাকলেও আপন রসের মূল্যে সে-দান বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবার দাবি রাখে। অত্যন্ত লজ্জা এবং আক্ষেপের বিষয় যে, বাইরের সাধারণ সাহিত্যামোদীরা পল্‌ ডান্‌বার্‌ (**Paul Laurence Dunbar: 1872-1906**) ছাড়া অন্য কোনো নিগ্রো কবির নাম পর্যন্ত ভালো করে জানেন না। আর-এক ভাগ্যবান কবি উইলিয়াম্‌ ব্রেথ্‌ওয়েট (**William Stanley Braithwaite: 1878**)। আমেরিকান আধুনিক কাব্যের নবজাগরণের প্রত্যুষলগ্নে এই নিগ্রো কবির দান কোনো শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান কবির চেয়ে যে কম নয়, এ কথা অনেকেই হয়ত জানেন না। সৌভাগ্যক্রমে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'তীর্থরেণু' কাব্যে 'কাফ্রি কবি' ডানবার্‌-এর সাতটি কবিতার প্রথম অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে

এই কবিটির তথা নিগ্রো কাব্যের সপ্তপদী ঘটিয়ে গিয়েছেন। চিন্তা ও ভাবের এক উদার ক্ষেত্রে উক্ত কবিটির পরিচয় নেওয়া যাক, সত্যেন্দ্রনাথের একটি অনুবাদের সাহায্যে।—

শাস্ত্রের প্রদীপ নহি, নহি আমি ধর্মের নিশান,
সিদ্ধ মহাপুরুষের সিদ্ধির অপূর্ব অবদান
তুচ্ছ মানি— সাধারণ দুঃখকাহিনীর তুলনায় ;
মানুষের অশ্রুজলে, মানুষের মৌন শোচনায়
আমারে আকুল করে— মানুষের প্রার্থনার চেয়ে।
পুণ্যাত্মা ! নালিশ রাখো, নীলাকাশ ফেলিও না ছেয়ে
নাকী সুরে। এই কি হে ভক্ত তুমি ? ঈশ্বরনির্ভব
এরি নাম ? এরি অহংকার কর ধার্মিকপ্রবব ?
মন্দিরকন্দর ছাড়ি এসো বন্ধু ! এসো বাহিরিয়া,
স্বর্গের কামনা ভোলো ! প্রব্যথিত মানবের হিয়া
তোমারে খুঁজিছে, ওগো ! এসো এসো মানুষের মাঝে,
নরলোকে আছে কাজ ; স্বর্গে তুমি লাগিবে কি কাজে ?
মমতার চক্ষে চাও, দুর্বলেরে তোলো হাত ধরে,
স্বর্গ পাবে মর্ত্যে বসি— পুণ্যফলে, দেবতার বরে।

—ধর্ম। তীর্থরেণু। পৃ. ১৭২-৭৩

২

ইতিহাসের বিচারে আমেরিকান নিগ্রো-কাব্যের যথার্থ আরম্ভ ধরতে হয় ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে, এবং আদি কবি হিসাবে নাম করতে হয় ফিলিস হ্বীট্‌লি (Phillis Wheatley : 1753-84) নামে ক্রীতদাসী একটি নিগ্রো নারী কবির। এঁর কাব্যরচনার আদর্শ ছিলেন সে যুগের নাম-করা ইংরেজ কবি পোপ এবং গ্রে। এই কবিটি থেকে ডান্‌বার পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি নিগ্রো কবির আবির্ভাব হয়, কিন্তু রচনার মৌলিকতা বা সাফল্যের চেয়ে তাঁদের চেষ্টাটারই মূল্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্মরণীয়। শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ সে যুগে কতটুকুই বা এঁদের হয়েছিল। অবাক হতে হয় শুনে যে, এঁদের মধ্যে জর্জ হর্টন্ (George M. Horton : 1787) নামে নর্থ-ক্যারোলিনার একটি কবি লিখতে শেখার আগেই কবিতা রচনা শুরু করেন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝাড়ুদারের কাজ করতে করতে অবশেষে তাঁর কিঞ্চিৎ অক্ষরপরিচয় ঘটে এবং ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি কবিতার বইও একটি প্রকাশ করেন। এঁর কবিতার মূল সুর হল দাসত্বের প্রতি ধিক্কার এবং মুক্তির জন্যে তীব্র করুণ এক আকুতি — কাব্যগ্রন্থটির 'মুক্তির আশা' (The Hope of Liberty) নামেই সে পরিচয় সুস্পষ্ট।

বহুআকাঙ্ক্ষিত এই মুক্তির অরুণোদয় হল আমেরিকান নিগ্রোদের শৃঙ্খলিত জীবনে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে, প্রেসিডেণ্ট-লিঙ্কন্-এর আমলে, তবে সে 'অরুণোদয়'ই মাত্র। ফলে এ বেদনার সুরের রেশ রয়েই গেল নিগ্রো কাব্যে, আজও সে সুর সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে বলা চলে না। মিসেস্ হার্পার (Frances E. Harper) ও হুইট্‌ম্যান (Alberry A. Whitman) যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো কাব্যের এই উষাযুগের

প্রখ্যাত অন্য দুটি কবি। হর্টনের করুণ কান্নাই যেন মহিলা কবি হার্পারের কাব্যে ন্যায়বিচারের দাবি জাগিয়েছে, হুইট্‌ম্যান সেই সুর নিখাদে চড়িয়েছেন আত্ম-প্রত্যয়ের বলিষ্ঠ প্রেরণায়।

নিগ্রো কাব্য রূপে-রসে তার প্রথম সার্থক আকার লাভ করল ডান্‌বার-এর হাতে। সে-হিসাবে এঁকে যুক্তরাষ্ট্রের আদি নিগ্রো কবি বললে অন্যায় হয় না। এঁর জন্ম হয় ওহিওর ডেটন শহরে, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে। সরকারী বিদ্যালয়ে কিছু লেখাপড়া শেখার পর ইনি 'লিফ্‌ট্ বয়'-এর চাকরি নেন। সেই অবস্থায় বালকবয়সেই তিনি তাঁর প্রথম কবিতা রচনা করেন। বয়স যখন মাত্র একুশ, প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ওক্ এবং আইভি' (Oak and Ivy : 1893)। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে 'হীনপ্রাণের গান' (Lyrics of Lowly Life) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ডানবারের কবিজীবনে জাতীয় প্রতিষ্ঠা ঘটল। গল্প উপন্যাসও ইনি রচনা করেছেন কিছু কিছু। নিজের কবিতা আবৃত্তির কণ্ঠ বা ক্ষমতা সব কবির থাকে না; ডানবার কিন্তু সেদিক থেকে সৌভাগ্যবান ছিলেন। আবৃত্তির অসাধারণ শক্তির বলে তিনি তাঁর কাব্যের সৌরভ দেশময় ছড়াতে পেরেছিলেন অতি সহজেই।

আমেরিকায় নিগ্রোদের মধ্যে বিকৃত ধরণের এক কথ্য ইংরেজী প্রচলিত আছে, সেই ডায়ালেক্টে লেখা কবিতার রস সম্পূর্ণ গ্রহণ করা আমাদের মতো বিদেশীয়দের পক্ষে সম্ভব নয়। অধিকন্তু প্রদেশ ভেদে এই ডায়ালেক্টেরও নানান সূক্ষ্ম প্রভেদ ঘটে; ফলে এমন কি—

> An ignorant Negro of the uplands of Georgia would have almost as much difficulty in understanding an ignorant sea island Negro as an Englishman would have.

ডানবারের শেষ জীবনের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতাই এই নিগ্রো ডায়ালেক্টে লেখা। এই লৌকিক ভাষায় কবিতা লেখার প্রেরণা অনেক নিগ্রো কবিই আজও অনুভব করেন প্রাণের এক সহজাত আকর্ষণে, ইংরেজী সাহিত্যে যেমন স্কচ্ ডায়ালেক্টে কবিতা লিখতে প্রেরণা অনুভব করেছিলেন স্কচ্ কবি বার্ন্‌স্। শেষ জীবনে ডান্‌বারের মুখের কথাই ছিল: I've got to write dialect poetry; it's the only way I can get them to listen to me। তাঁর অপেক্ষাকৃত সরল অথচ বিখ্যাত ডায়ালেক্ট্ কবিতার এক স্তবক উদ্ধৃত করা গেল কৌতূহলী পাঠকদের জন্যে—

> Summah night an' sighin' breeze,
>   'Long de lovah's lane.
> Frien'ly, shadder-mekin' trees,
>   'Long de lovah's lane.
> White folks' wo'k all done up gran'—
> Me an' 'Mandy han'-in-han'
> Struttin' lak we owned de lan',
>   'Long de lovah's lane.
>
> —Lover's Lane.

দিনের খাটুনি সারা হয়েছে। প্রেমিক প্রেমিকা হাত-ধরাধরি করে চলেছে ছায়াপথ বেয়ে। বসন্তরাত্রি, স্নিগ্ধ বাতাস বইছে। তাদের সুতৃপ্ত পদক্ষেপ দেখে মনে হয় এ মুহূর্তটিতে তারাই দুনিয়ার মালিক।

এ ধরনের কবিতার কাব্যানুবাদ দেবার চেষ্টা বৃথা; এমন কি ভাষার ঠিক উচ্চারণটি না জানা থাকলে মূল কবিতার যথার্থ ধ্বনিটি বা সুরটি পর্যন্ত পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ডান্‌বারের পূর্বেও নিগ্রো ডায়ালেক্টে কবিতা লিখেছেন অনেকেই— তাঁদের মধ্যে, আশ্চর্য ব্যাপার, অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ কবি। কিন্তু নিগ্রোদের নিজস্ব সত্তা, তাদের মনের নিগূঢ় বৈশিষ্ট্যটি, ডান্‌বারের হাতেই প্রথম কথা কয়ে উঠল এই ডায়ালেক্টের সুরে এবং ছন্দে—

Dunbar was the first to use it (Negro dialect) as a medium for the true interpretation of Negro character and psychology.

মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে ডান্‌বার মারা যান। তাঁর প্রতিভার চরম পরিণতিটিকে তিনি লেখায় রূপ দিয়ে যেতে পারেন নি সত্য, তাঁর জীবনের পাত্রটি ছিল কীট্‌স্ শেলী বা বার্নস্-এর মতো একান্তই ভঙ্গুর, তবু সাহিত্যের জহুরীরা তাঁর প্রতিভাকে খাঁটি সোনা বলেই চিনে নিয়েছেন—

Burns took the strong dialect of his people and made it classic; Dunbar took the humble speech of his people and in it wrought music.

এই গীতমাধুরীর বিচিত্র লীলা শুধু ডান্‌বার কেন, তাঁর সমসাময়িক অধিকাংশ কবির ডায়ালেক্ট্ কাব্যেরই প্রধান আকর্ষণ। জেম্‌স্ ক্যাম্‌বেল্ (James Edwin Campbell), ড্যানিয়েল ডেভিস্ (Daniel Webster Davis), জন্ হলওয়ে (John Wesley Holloway : 1865) প্রমুখ কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সনতারিখের হিসাবে ডায়ালেক্ট্-কাব্য রচনায় ক্যাম্‌বেল্ ডান্‌বারের পূর্বগামী হলেও শিল্পনৈপুণ্যে ডান্‌বার অতুলনীয়। বহুবিধ নিগ্রো ডায়ালেক্টের জটিলতা পরিষ্কার করে সাহিত্যগ্রাহ্য একটি সাধারণ মান নির্ণয় করা কোনো সহজ প্রতিভার কর্ম নয়। সে হিসাবে ভাষার রাজ্যেও ডান্‌বার অতি উঁচুদরের জাদুগীর ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ডান্‌বার-পত্নী অ্যালিস্ নেল্‌সন্‌ও (Alice Dunbar Nelson : 1875) একজন সুকবি ছিলেন; অবশ্য সম্পাদিকা ও সুবক্তা বলেই তাঁর অধিক খ্যাতি।

ডান্‌বারের মৃত্যুর পরে বছর দশেক নিগ্রো কাব্যে এক নিষ্ফলা যুগ কাটে। ব্রেথ্‌ওয়েট বা ডুবোয়া (W. E. Burghardt Du Bois : 1868), সে যুগের অন্যতম দুজন শ্রেষ্ঠ লেখক, মাঝে মাঝে পাকা হাতের কাব্য রচনা করে থাকলেও এঁরা মুখ্যত ছিলেন গদ্যলেখক। ব্রেথ্‌ওয়েইট নিগ্রো কাব্যে মিস্টিসিজ্‌ম্ প্রথম প্রবর্তন করেছেন বটে, তবুও সাহিত্যসমালোচক ও কবিবন্ধু বলেই আমেরিকায় তিনি অধিক পরিচিত। ডুবোয়া বহু বৎসর আট্‌লাণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরও প্রধান খ্যাতি এ যুগের একজন সেরা ঐতিহাসিক ও গদ্যলেখক বলে, তবে তাঁর গদ্যরচনার বিশেষ গুণই হল তাদের অন্তর্নিহিত ছন্দস্পন্দ, যার ফলে ভাষায় সহজেই ধরা পড়ে হৃদয়ের নিবিড়তম আবেগটি। এঁর একটি ছোট রচনা থেকে বিচ্ছিন্ন কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল ভাষার সঙ্গে ভাবের নিবিড় পরিণয়টুকু দেখাবার জন্যে—

O Silent God, Thou whose voice afar in mist and mystery hath left our ears an-hungered in these fearful days—

Hear us, Good Lord!

Is this Thy justice, O Father, that guile be easier than innocence, and the innocent crucified for the guilt of the untouched guilty?

Justice, O judge of men!

Bewildered we are, and passion-tost, mad with the madness of a mobbed and mocked and murdered people; straining at the armposts of Thy Throne, we raise our shackled hands and charge Thee, God, by the bones of our stolen fathers, by the tears of our dead mothers, by the very blood of Thy crucified Christ: *What meaneth this?* Tell us the Plan; give us the Sign!

Keep not Thou silence, O God!

Sit no longer blind, Lord God, deaf to our prayer and dumb to our dumb suffering. Surely Thou too art not white, O Lord, a pale, bloodless, heartless thing?

Ah! Christ of all the Pities!

Forgive the thought! Forgive these wild, blasphemous words. Thou art still the God of our black fathers, and in Thy soul's soul sit some soft darkenings of the evening, some shadowings of the velvet night.

But whisper—speak—call, great God, for Thy silence is white terror to our hearts! The way, O God, show us the way and point us the path.

... ...

In yonder East trembles a star.

Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord!

Thy will, O Lord, be done!

Kyrie Eleison!

—A Litany of Atlanta.

ডুবোয়ার রচিত মুমূর্ষু একটি নিগ্রোর এই শেষ প্রার্থনাটি নিগ্রোকাব্যে গদ্যছন্দের একটি অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

৩

নতুন যুগের নিগ্রো কবিরা আজকাল সাধারণত বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষা ও ছন্দে কাব্য-রচনারই অধিক পক্ষপাতী। এতে বৈচিত্র্য জাগাবার সুযোগ বেশী বলে তাঁদের সকলেরই বিশ্বাস। খুবই আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নেই, তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তাঁদের এ বিদ্রোহ নিগ্রো ডায়ালেক্টের প্রতি তত নয় যতটা সে-ভাষার অন্তর্নিহিত দীর্ঘকালের প্রয়োগপুষ্ট সংস্কারের সংকীর্ণতার প্রতি। দক্ষিণ-যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তৃত তুলোর আবাদে কাটানো নিগ্রো ক্রীতদাসদের যে 'ক্যাবিন'-জীবন, তা সুখের হলে নিতান্তই হাসি-হল্লার, দুঃখের হলে ষোলো-আনাই চোখের জলের। নিগ্রো ডায়ালেক্টের আদিতম এবং অন্তরঙ্গতম যোগ এই 'ক্যাবিন'-জীবনেরই সঙ্গে। ফলে এ ভাষার সহজাত গুণে ডায়ালেক্ট্‌-কাব্যের পরিধি হালকা হাস্যরস কিংবা বেদনার করুণরসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। কিন্তু ইতিমধ্যে শহরে শহরে গড়ে উঠেছে নিগ্রোদের আলাদা-করে-দেওয়া পল্লীতে (Harlem or Negro City) 'হার্লেম'-জীবন। সংকীর্ণ ভাড়াবাড়ির বা ফ্ল্যাটের সে-জীবনে 'ক্যাবিন'-জীবনের উল্লাস বা সৌন্দর্য, এমন কি, সে-কান্নাই বা কোথায়? নতুন যুগ নতুন সমস্যায় দেখা দিয়েছে সেখানে। তার উপর সংঘাত লাগল গত মহাযুদ্ধের। নিগ্রো মন তাই আজ মুক্তি খুঁজছে এমন ভাষায় যেখানে মানবমনের বিচিত্র সমস্যাসংকুল সহস্র গভীরতর বেদনা অবাধে বিকাশলাভ করে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলেও আজ তাই নিগ্রোকাব্যের অফুরন্ত বৈচিত্র্য। ওদিকে স্বপ্নের নেশাও তার কেটেছে, প্রতিবাদ এবং দাবি জানাবার ভাষা সে সন্ধান করছে বৃহত্তর বিশ্বের দরবারে।

ভাষার সমস্যা নিগ্রো কবিদের যে আজও সম্পূর্ণ মিটেছে তা নয়, তবু নতুন যুগের কবিরা তাঁদের বহুআয়াসে-অর্জিত নতুন সম্পদের ব্যাপক প্রয়োগে যে চিত্তচমৎকারী কাব্যোৎকর্ষের পরিচয় অজস্র ধারায় দিচ্ছেন তাতে তাঁদের প্রাণের প্রাচুর্যের এবং বেদনার গভীরতার প্রমাণ নিঃসংশয়ে পাওয়া যায়। বিশেষ করে মাতৃভূমিহারা নিপীড়িত ও চিরঅবমানিত এই শক্তিশালী সবল জাতির বলিষ্ঠ বুকের গভীরে বুকভাঙা যে-কান্না এবং নিরুদ্ধ যে-বিদ্রোহ মুহুর্মুহু গুমরে ওঠে, কাব্যে তারই অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় যে-প্রকাশ মাঝে মাঝে শুনতে পাই তার আকর্ষণ এড়ানো কঠিন। এদিক থেকে বিচার করলে জ্যামাইকা দ্বীপের কবি (Claude McKay : 1889) ম্যাকে-র 'The Lynching, If We Must Die, To the White Fiends, The Tired Worker প্রভৃতি কবিতার বিক্ষুব্ধ ছন্দের প্রতিধ্বনি ভোলা কঠিন হয়ে পড়ে। সে বেদনার সঙ্গে কোথায় যেন আমাদের জন্মান্তরের নাড়ির যোগ আছে, অতি সহজেই তাই এঁদের কাব্য আমাদের হৃদয়ের অতি নিকটে এসে পৌছয়। মনে হতে থাকে যে, বিদেশী অন্যান্য সাহিত্যামোদীদের চেয়ে হয়ত আমরা নিগ্রো কবিতার প্রাণের এই অন্তরঙ্গ সুরটি ধরবার সহজ অধিকার রাখি। ম্যাকে-র একটি সনেট উদাহরণ স্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করা যাক। শৃঙ্খলিত আফ্রিকার সিংহের উদাত্ত গর্জন যথার্থ শিল্পীর হাতে হিংসার অতীত এক দুর্লভ মহনীয়তা লাভ করেছে।—

Think you I am not fiend and savage too?
Think you I could not arm me with a gun
And shoot down ten of you for every one
Of my black brothers murdered, burnt by you?
Be not deceived, for every deed you do
I could match—out-match : am I not Africa's son,
Black of that black land where black deeds are done?

But the Almighty from the darkness drew
My soul and said : Even thou shalt be a light
Awhile to burn on the benighted earth,
Thy dusky face I set among the white
For thee to prove thyself of highest worth;
Before the world is swallowed up in night,
To show thy little lamp : go forth, go forth!

—To The White Fiends.

গত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে প্রতিবাদ এবং অভিযোগাত্মক কাব্যের যে-যুগ তার সব চেয়ে শক্তিমান কবি এই ক্লড্ ম্যাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসানের পূর্বোল্লিখিত কবি জর্জ্ হর্টনের করুণ কান্না থেকে ম্যাকের বলিষ্ঠ অভিযোগ পর্যন্ত নিগ্রোকাব্যের দীর্ঘ এই পথযাত্রা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। জোসেফ্ কটার্ (Joseph S. Cotter, Jr. : 1895-1919), ফেন্টন্ জন্সন্ (Fenton Johnson : 1888), রস্কো জ্যামিসন্ (Roscoe C. Jamison : 1888-1918), চার্লস্ জন্সন্ (Charles Bertram Johnson : 1880), জেম্স্ জন্সন্ (James Weldon Johnson : 1871) প্রমুখ কয়েকজন হলেন যুদ্ধোত্তর যুগের উল্লেখযোগ্য নিগ্রো কবি। তরুণ কবি কটারের কয়েকটি কবিতার বাংলা

অনুবাদ গত পূজাসংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করা গিয়েছে। তারই একটির মূল কবিতা এই সুযোগে উদ্ধৃত করা গেল।—

Brother, come!
And let us go unto our God.
And when we stand before him
I shall say—
"Lord, I do not hate,
I am hated.
I scourge no one,
I am scourged.
I covet no lands,
My lands are coveted.
I mock no peoples,
My people are mocked."
And, brother, what shall you say?

—And What Shall You Say.

অলংকারবাহুল্যবর্জিত কটারের এই ধরনের সরল ছন্দের কবিতাগুলির কোথাও ব্যথা পেয়ে অসহিষ্ণুর মতো ব্যথা ফিরিয়ে দেবার ক্ষুব্ধ প্রয়াস নেই। প্রতিবাদ যা করা হয়েছে তাতে ভাই জানাচ্ছে ভাইয়ের প্রতি নালিশ পরমপিতার দরবারে; সে ফরিয়াদী নয় কোনো পার্থিব শক্তির রাজ-আদালতে, তার নালিশে তাই ঝাঁঝ নেই তিলমাত্র। ছোট্ট একটি কবিতায় যে ক্ষমাসুন্দর স্নিগ্ধ প্রতিবাদের সুর শুনতে পাই তার গভীর ব্যঞ্জনা সহজেই মর্ম স্পর্শ করে। জাতিগত বিভেদবোধ যাদের মজ্জাগত সেই সব বধির কানে কটারের এই প্রশ্ন প্রবেশ করে কি না, এবং তাদের মৌনকণ্ঠে কোনো প্রত্যুত্তর জাগায় কি না জানি না, তবে পৃথিবীর অন্য-এক প্রান্তে আমাদের কালো চামড়ার তলাকার রাঙা রক্তে এর প্রতিধ্বনি নিঃশব্দছন্দে অনুরণিত হতে থাকে।

রস্‌কো জ্যামিসন্‌-এর মুখে যুদ্ধরত নিগ্রো সৈনিকের প্রাণের কথাটি শোনা যাক্‌। কি গম্ভীর তার সুর, এবং কত গভীর তার আবেদন। গত মহাযুদ্ধে উচ্চারিত এই বাণী নিগ্রোদের পক্ষে বর্তমান মহাযুদ্ধে আজও মিথ্যায় পরিণত হয় নি।—

These truly are the Brave,
These men who cast aside
Old memories, to walk the blood-stained pave
Of sacrifice, joining the solemn tide
That moves away, to suffer and to die
For Freedom—when their own is denied!
O Pride! O Prejudice! When they pass by,
Hail them, the Brave, for you now crucified!

—The Negro Soldiers.

যন্ত্রসভ্যতার যুগে অবসন্ন নিগ্রো শ্রমিকের কী-যে গভীর বেদনা ফেন্‌টন্ জন্‌সনের কবিতার গদ্যছন্দে তা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে—

I am tired of work; I am tired of building up somebody else's civilization.
Let us take a rest, M'Lissy Jane.
I will go down to the Last Chance Saloon, drink a gallon or two of gin, shoot a game or two of dice and sleep the rest of the night on one of Mike's barrels. . . . .
You will spend your days forgetting you married me and your nights hunting the warm gin Mike serves the ladies in the rear of the Last Chance Saloon.
Throw the children into the river; civilization has given us too many. It is better to die than it is to grow up and find out that you are colored.
Pluck the stars out of the heavens. The stars mark our destiny. The stars marked my destiny.
I am tired of civilization.

—Tired.

সভ্যতার সংকটময় নতুন যুগে কাব্যের এই পটপরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

একটা কথা এখানে মনে রাখা কর্তব্য যে, নালিশের বা অভিযোগের ঝাঁঝ কমেছে এ যুগের নিগ্রো কাব্যে প্রধানত তাদের হৃদয়ে জাতিগত নূতন এক আত্মপ্রত্যয় ক্রমশ দৃঢ় হবার ফলে। আজ সে পুরাতন কান্নার যুগ অতীত যে-যুগে আফ্রিকামুখী কবি সুদূর সাগরপারে তাঁদের আতুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন হৃদয়ের চির-আকাঙ্ক্ষিত রাজ্যের, নিগ্রো কবিদের ভাষায় 'প্রমিস্‌ড্ ল্যাণ্ড্'-এর অভিমুখে। মনে প্রাণে নিঃসংশয়ে আজ তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার তাঁরাও সন্তান, শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে তাঁদের দাবি কোনো অংশে হীন নয়। তাঁরা প্রবাসী নিগ্রো মাত্র নন, আফ্রামেরিকান (Aframericans) বললে তাঁদের সত্য পরিচয় দেওয়া হবে।—

This land is ours by right of birth,
　This land is ours by right of toil;
We helped to turn its virgin earth,
　Our sweat is in its fruitful soil.

…　…　…

Then should we speak but servile words,
　Or shall we hang our heads in shame?
Stand back of new-come foreign hordes,
　And fear our heritage to claim?
No! stand erect and without fear,
　And for our foes let this suffice—
We've bought a rightful sonship here,
　And we have more than paid the price.

—Fifty Years, J. W. JOHNSON

নিগ্রো কবিদের মধ্যে এই আত্মপ্রত্যয় উদয় হবার ফলে নিগ্রোকাব্যে যুদ্ধোত্তর প্রতিবাদের যে-যুগ বছর ছয়েকের মধ্যে তার সংকীর্ণতার বেড়া পড়ল খসে। জাতীয় সমস্যা সংক্রান্ত প্রপাগ্যাণ্ডার

গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে বৃহত্তর শিল্প ও সৌন্দর্যের মানসলোকে তরুণ নিগ্রো কবিরা আজ উত্তীর্ণ হয়েছেন। ইতিপূর্বে ম্যাকে প্রমুখ যে নিগ্রো কবিদের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরাও অনেকেই জাতীয় সমস্যা ছাড়া অন্যান্য বহু বিচিত্র বিষয়ে অসংখ্য উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা রচনা করেছেন। সে তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি নিম্নোল্লিখিত তিন জন মহিলাকবির নাম আমরা সেই প্রসঙ্গে না করি— অ্যান্ স্পেন্সর্ (Anne Spencer : 1882), জর্জিয়া জন্সন্ (Georgia Douglas Johnson : 1886), ও জেসি ফসেট্ (Jessie Redmon Fauset)। বয়সে বড়ো হলেও অ্যান্ স্পেন্সর্ এঁদের মধ্যে বিষয়নির্বাচনে এবং রচনাশৈলীর বিচারে সবচেয়ে প্রাগ্রসরপন্থী। পুরুষদের মধ্যে সে হিসাবে ফেন্টন্ জন্সন্ও একজন অতি-আধুনিক পর্যায়ের কবি।

এঁদের পরবর্তী নবীন কবিদের মধ্যে যে দুজন সবচেয়ে প্রতিভাবান তাঁরা ষোলো-আনাই বিংশ শতাব্দীর কবি। কাউন্টি কালিন্ (Countee Cullen : 1903) এবং ল্যাঙ্স্টন্ হিউজ্ (Langston Hughes : 1902) নিগ্রো জাতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় কাব্যের যে-আবাদ শুরু করেছেন তাতে, সমালোচকদের মতে, সত্যের এবং সুন্দরের সার্থক সমন্বয় ঘটাবার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট, পথ দুজনের যতই ভিন্ন হোক না কেন। কালিন্ চলেছেন প্রচলিত ইংরেজীর পরিচ্ছন্ন পথে জাতীয় বেদনার পসরা হাতে; হিউজ্ সমাজের নিম্নতর জীবন থেকে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করছেন, নতুন যুগের লোকগাথা রচনার আগ্রহে। এঁদের কোনো সম্পূর্ণ কাব্য আজও আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি, তাই এর চেয়ে বিস্তৃত পরিচয় সংগ্রহ করা দুষ্কর। কেবল তাঁদের দুখানা ক'রে কাব্যগ্রন্থের নাম মাত্র জেনেছি, তাই দিলাম।—কালিনের বই দুটির নাম ভারি কাব্যময় : The Ballad of the Brown Girl : ও Copper Sun বা তাম্রতপন। হিউজের বইয়ের নামে নূতনত্ব আছে : The Weary Blues ও Fine Clothes to the Jew। এর পরেও নিশ্চয়ই আরও নতুন বই এঁদের প্রকাশ হয়ে থাকবে।

৪

আফ্রামেরিকান কবিদের একটি সীমাবদ্ধ গোষ্ঠির কিঞ্চিৎ পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া গেল। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোরাই কিছু সমগ্র আমেরিকান নিগ্রোজাতির প্রতিনিধি নয়। দক্ষিণাঞ্চলে কিউবা, হেইটি, ব্রেজিল, মার্টিনীক্, প্রভৃতি দেশে লাটিন-আমেরিকার এমন বহু কবি আছেন যাঁদের প্রতিভার পাশে ডান্বারের কবি-দীপ্তিও ম্লান বোধ হয়— এ কথা যুক্তরাষ্ট্রের বিচক্ষণ নিগ্রোকাব্য-সমালোচকদেরই অভিমত। প্লাসিদো (Plácido : 1809-1844) প্রমুখ কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জনৈক বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন—

They are world figures in the literature of the Latin languages.

কিন্তু স্প্যানিশ্ বা পর্তুগীজ্ ভাষা না জানলে তাঁদের কাব্যে প্রবেশলাভের চেষ্টা করা বৃথা। লাটিন-আমেরিকার আবহাওয়া বর্ণসমস্যায় যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিষবাষ্পাকুল নয় বলে বিশ্বসাহিত্য-রচনার উদারতর প্রেরণা সে-দেশের কবিরা অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে লাভ করেছেন। কালা-গোরার দ্বন্দ্ব-

বিরোধের কণ্ঠরোধ-করা আবহাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের পক্ষে নিত্যমূল্যের কাব্যসৃষ্টি করা বস্তুতই কঠিন, কারণ—

He is always on the defensive or the offensive. The pressure upon him to be propagandic is well nigh irresistible.

ফলে, খ্যাতনামা নিগ্রো কবি-সমালোচক জেম্‌স্ ওয়েল্‌ডন্ জন্‌সন্ বিশেষ বিচার-বিবেচনার পর এমন সন্দেহও প্রকাশ করেছেন যে, বিশ্বের দরবারে আসন পাবার মতো প্রথম নিগ্রো কবির উদয় হয়তো যুক্তরাষ্ট্রে না হয়ে লাটিন-আমেরিকাতেই হবে।—

So I think it probable that the first world-acknowledged Aframerican poet will come out of Latin-America.

কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো কবিদের বিশ্বের দরবারে শ্রোতালাভের একটি বিশেষ সুযোগ আছে—পৃথিবীতে যে-ভাষার সবচেয়ে প্রসার তাঁরা সেই বিশ্ববিশ্রুত ইংরেজী ভাষায় কাব্যরচনা করেন। সে-সুযোগেরও মূল্য নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। আজও তাঁরা তাই ভবিষ্যতের ভরসা হারান নি। ডানবারের মৃত্যুর পর থেকে নিত্যনূতন কবির আবির্ভাবের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোরা আজও কী আগ্রহে তাঁদের সেই ভাবী কবির, বা Lyric Seer-এর পথ চেয়ে আছেন, নিম্নোদ্ধৃত কাব্যস্তবকে তার সুন্দর প্রকাশ দেখতে পাই।—

Here and there a growing note
Swells from a conscious throat;
Thrilled with a message fraught
The pregnant hour is near;
We wait our Lyric Seer,
By whom our wills are caught.

... ...

Blind Homer, Greek or Jew,
Of fame's immortal few
Would still be deathless born;
Frail Dunbar, black or white,
In Fame's eternal light,
Would shine a Star of Morn.

An unhorizoned range,
Our hour of doubt and change,
Gives song a nightless day,
Whose pen with pregnant mirth
Will give our longings birth,
And point our souls the way!

—Negro Poets, CHARLES B. JOHNSON

কবে সেই লীরিক্ সীআর যুক্তরাষ্ট্রের তথা সমগ্র আমেরিকার নিগ্রোসমাজে জন্মলাভ করবেন তা কে বলবে! কোনো একটি জাতির অন্তরের অন্তরতম বাণীটি পূর্ণতম জীবনের রসে রসায়িত হয়ে কবিকণ্ঠে মূর্তি পরিগ্রহ করুক — এই দুর্লভ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি পৃথিবীর অতি সৌভাগ্যবান জাতির জীবনেও সহসা সিদ্ধ হয় না, দেবতার আশীর্বাদের অপেক্ষা রাখে। আধুনিক নিগ্রো কবিদের ঐকান্তিক জীবনসাধনায় তাঁদের কাব্যের ইতিহাসে হয়ত সে শুভলগ্ন সুদূর নয়।

ফতেপুর সিক্রি

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

রাত্রাবনাবিষ্কৃতদীপভাসঃ কান্তামুখশ্রীবিযুতা দিবাপি।
তিরস্ক্রিয়স্তে ক্রিমিতন্তুজালৈ র্বিচ্ছিন্নধূপপ্রসরা গবাক্ষাঃ॥

"এখন রাত্রিকালে মদীয় গবাক্ষ দিয়া দীপপ্রভা বহির্গত হয় না, আর দিবাভাগে কামিনীগণের মুখশ্রীতে সুশোভিত হয় না। কালসহকারে অগুরুচন্দনসংযুক্ত পবিত্র ধূমনির্গম একেবারে রহিত হইয়াছে এবং অট্টালিকাসমূহ এখন কেবল লূতাকূলের তন্তুজালে আবৃত হইয়াছে।"—রঘুবংশ

ভাঙাগড়া খোদার মরজি, বাদশাহী খেয়াল। দিল্লির লোকেরা বলে, নও দেহ্লী, সাত বাদলী। ইন্দ্রপ্রস্থের শ্মশানের উপর বিলাতী দিল্লি নির্মিত হইবার পূর্বে দিল্লি শহর নয়বার স্থান-পরিবর্তন করিয়াছে; মারাঠা-আবদালী সংঘর্ষের সময় বাদলী গ্রাম (এন. ডব্লু. রেলওয়ের একটি স্টেশন, দিল্লির ৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে) সাতবার উজাড় হইয়া সাতবার পত্তন হইয়াছে। কিন্তু আকবর বাদশাহ নূতন দিল্লি নির্মাণ করেন নাই; পুরাতনকে নবরূপায়িত করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। ই. আই. রেলওয়ে যেখানে যমুনা পার হইয়া মোগল-দিল্লিতে প্রবেশ করিয়াছে ঐখানে একটি ছোট দুর্গ ছিল, নাম সেলিমগড় বা বাদলগড়। দিল্লি সফরের সময় তিনি ঐ দুর্গেই অবস্থান করিতেন। স্থাপত্যকলার বিশেষজ্ঞের দ্বারা এখন পর্যন্ত লাহোর, এলাহাবাদ এবং আগ্রাদুর্গের কোন্ অংশ আকবরী আমলের উহা চিনিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। আগ্রার ছয়-সাত মাইল দূরে আকবর নগর-চেইন্ (আরামনগর) শহর পত্তন করিয়া অর্ধসম্পূর্ণ অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছিলেন— সেখানে তাঁহার চেইন বা চিত্তের বিশ্রাম মিলিল না। এইজন্য তিনি স্বীয় রাজ্যাব্দের দ্বিতীয় দশকে আগ্রা জিলার বিয়ানা তহশীলের অধীন সিক্রি নামক স্থানে নূতন রাজধানী ফতেপুর সিক্রি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

লাল পাথরের গোটা ফতেপুর সিক্রি শহরটাই আকবরের এক অপূর্ব অখণ্ড স্বপ্ন। মোগল বিজয়লক্ষ্মীর আরক্তিম কপোলরাগ সার্ধ তিনশত বৎসরের অপমানে পাংশুল ধূসরতায় মিলাইয়া গিয়াছে। মিঞা তানসেনের মেঘমল্লার, বাজবাহাদুরের ধ্রুপদ জয়পুরে কাশ্মীরে নির্বাসিত; রাজা বীরবল এখনও হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসেন নাই; তোডরমলের বন্দোবস্ত বাতিল হইতে বসিয়াছে। আবুলফজলের মুন্‌শিয়ানার এক আনাও অবশিষ্ট নাই, তবে আবুলফতে জীলানী বাদশার জন্য যে গড়গড়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন, উহার নানাবিধ সংস্করণ এখনও শব্দায়মান; খানখানান আব্দুর রহিমের গল্পে হিন্দুস্থান এখনও মশগুল; কবি ফৈজী তাঁহার দৌলতখানায় লাল পাথরের যে তাকে নলদমন কাব্যের পাণ্ডুলিপি রাখিতেন তাহা এখনও অটুট আছে। ফতেপুর সিক্রির শিল্পীশ্রেষ্ঠ দসবন্তের ছবি কোনো কোনো ভাগ্যবান মাত্র জয়পুরে দেখিবার সুযোগ পায়; আকবর বাদশাহ নাকি প্রায় দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে মহাভারতের ফার্সি অনুবাদ রজ্‌ম-নামার এক খণ্ড ইন্দো-ইরানী চিত্রসজ্জায় সমৃদ্ধ করিয়া মির্জা রাজা মানসিংহকে উপহার দিয়াছিলেন, উহা জয়পুরে রক্ষিত আছে শুনিয়াছি। ইংরেজী আমলে আমরা সুবে পাঞ্জাব এবং সুবে বিহারের স্বল্পকালস্থায়ী সুবাদারি হিন্দুস্থানবাসীর চরম সম্মান জ্ঞান করিয়া অজ্ঞান হইয়াছি; কিন্তু

যে মানব-জমি চাষ করিয়া আকবর হিন্দুস্থানে নবরত্নের ফসল ফলাইয়াছেন সে জমি এখন অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে। কেরানি-খানসামার ছিটা-ধানের খেতে মানসিংহ আবদুর্ রহিম শাহবাজ ফলিবে কেন?

• দ্বাদশক্রোশবিস্তৃত একটি হ্রদের তটভূমি সংলগ্ন অনুচ্চ পাহাড়ের সারির উপর আকবর স্বীয় রাজত্বের দ্বিতীয় দশকে বাদশাহী মহল নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। জলাশয়ের চারিদিকে পাকা মজবুত বাঁধ এবং পাশেই পাহাড়ের নীচে একদিকে ছিল চৌগান খেলার ময়দান, হাতির লড়াইয়ের ফাঁকা মাঠ; অন্যদিকে অন্তর্দুর্গের হাতিপোল দরওয়াজার নীচে ছিল সুবিস্তৃত শানবাঁধানো চত্বর, উহার একপ্রান্তে আলোকসজ্জার জন্য নির্মিত একটি মিনার যাহা এখন হিরণ বা হরিণ-মিনার নামে পরিচিত। পরে এই অন্তর্দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া এই বহুবিস্তৃত নগর সৃষ্টি হইয়াছিল। শহরের চারিদিকে লাল পাথরের প্রাচীর; একাধিক তোরণদ্বারের দু-একটি মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে; প্রাচীরের বাহিরে ছিল বাদশাহী অন্নসত্র—একটির নাম ধরমপুরা, হিন্দু দীনদুঃখীর জন্য, দ্বিতীয়টি খায়েরপুরা সেখানে মুসলমান ফকির এবং গরিবেরা আহার্য পাইত। অন্যান্য বিষয়ে অতি উদার মতাবলম্বী হইলেও আকবর স্পর্শ এবং সংসর্গ-দোষ বিশ্বাস করিতেন। কসাই, ধানক (ব্যাধ), ধীবর, মেথর, ডোম, জল্লাদ প্রভৃতির বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল শহরের বাহিরে; সাধারণ নাগরিক উহাদের সহিত খানাপিনা কিংবা জলাচার করিলে কঠিন দণ্ডের বিধান ছিল। বারবনিতাগণ শহরের এক নির্দিষ্ট অংশে প্রাচীরবেষ্টিত মহল্লায় বাস করিতে পারিত; এই মহল্লার নাম ছিল শয়তানপুরা। ইহার ফটকে প্রহরী থাকিত; ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে সরকারী খাতায় নাম লিখিতে হইত। বাদশাহের হুকুম ছাড়া কেহ কোনো নটী রূপোপজীবিনীকে শয়তানপুরা হইতে শরীফমহল্লা বা ভদ্রপল্লীতে লইয়া যাইতে পারিত না। পাপব্যবসায় যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করাই ছিল উদ্দেশ্য। শহরের ভিতর পাহাড়ের উপর ছিল একটি মাদ্রাসা এবং সাধুসন্ন্যাসীদের জন্য যোগীপুরা নামক সরকারী আস্তানা। মোটের উপর নবনির্মিত ফতেপুর আকবর-কল্পিত একটি আদর্শ শহর। উহারই অনুকরণে পুরাতন শহরগুলিকে পুনর্নিমাণ করাই ছিল সম্রাটের অন্যতম পরিকল্পনা।

হিন্দুকুশ হইতে গোদাবরীতীর, হরিমদ (the Helmand) নদী হইতে গঙ্গার অববাহিকা জুড়িয়া বিশাল সাম্রাজ্য সৃষ্টির প্রয়াসে ভারতীয় সেনাবাহিনী অসংখ্য যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল বটে; কিন্তু আকবরের ফতেপুর (জয়শ্রীনিকেতন) এই বিজয়গৌরবের দ্যোতক নহে। আকবর অনেক লড়াই ফতে করিয়াছিলেন, হিন্দুস্থানের দৌলত লুট করিয়া ফতেপুরের বায়েত-উল-মাল-এ (কোষাগারে) জমা করিয়াছিলেন, ইহা সত্য; কিন্তু সোনা-জহরত অপেক্ষা বিজিত রাজ্যের গুণীজন এবং জ্ঞানসম্পদ আহরণের জন্য তিনি সমধিক উৎসুক ছিলেন। নানাস্থানের সমৃদ্ধ পুস্তকাগার তিনি বাদশাহী কিতাবখানায় একত্র করিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একখানা বই ফেরত না দেওয়ায় অস্থির হইয়া বাদশাহ মোল্লা বদায়ুনীর বাড়ীতে পেয়াদা পাঠাইয়াছিলেন। বোগদাদে খলিফা মনসুরের দার-উল-হিকমত এবং ব্রিটিশ মিউজিয়াম স্থাপিত হইবার মধ্যবর্তীকালে ফতেপুর সিক্রির বাদশাহী গ্রন্থাগার দার-উল-উলুম ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। গুজরাট-বিজয়ের পর তিনি বৈরাম খাঁর পুত্র মির্জা আবদুর রহিমের নিকট লুটের মালের হিসাবের পরিবর্তে দরবারে চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সে-দেশের ভাল সাজেন্দা (যন্ত্রী, বাজনায় ওস্তাদ) এবং গোয়েন্দা (নিপুণ কথক, আই. বি. পুলিশ নয়!)।

বাদশাহী দরবারে মনসবদারী কাঠামোর মধ্যে যোদ্ধা, পণ্ডিত, মৌলানা, কবি, হেকিম, চিত্রকর

পর্যন্ত সকলের জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট ছিল। আকবর ছিলেন মহাযোদ্ধা— সেনাপতি হিসাবে সিকেন্দার বাদশাহ্, সীজার, হানিবল বা মামুদ গজনভীর পাশে অবশ্য তাঁহার স্থান হয় না; কিন্তু তলোয়ারের যুদ্ধ অপেক্ষা কঠিনতর সংগ্রামে তিনি আজীবন ব্রতী ছিলেন। সেই যুদ্ধ সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতি, সমাজ এবং ধর্মে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নৈতিক সংগ্রাম; এই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আকবর নাম এবং রাজধানী ফতেপুর নামের সার্থকতা।

হাতিপোল দরজার সুনিপুণ ভাস্কর্যের নিদর্শন বিরাট হস্তিদ্বয়ের কুম্ভ ধর্মান্ধতার লগুড়াঘাতে বিদীর্ণ। তুর্কী স্থলতানা (সলিমা বেগম) এবং বিবিমরিয়ম-কোঠির দেওয়ালের অতুলনীয় অরণ্যদৃশ্যের সিংহ, ময়ূর, ময়না ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাণীচিত্র নির্মমভাবে মস্তকহীন করা হইয়াছে। জনশ্রুতি বাদশাহ্ আলমগীরকে এইজন্য দোষী করিয়া থাকে বটে; কিন্তু পুণ্যের লোভে ললিতকলার এই দুর্দশা কে করিয়াছে, ঠিক প্রমাণ নাই। ই. ডব্লু. স্মিথ কৃত গ্রন্থ [১] শিল্পসমালোচনামূলক অতি প্রামাণিক গ্রন্থ কিন্তু তাহাতে অনেকগুলি ইমারতের যে ঐতিহাসিক পরিচয় আছে তাহা গ্রহণযোগ্য নহে; যথা:

বিবিমরিয়ম-কোঠি: বিবিমরিয়ম কে ছিলেন? আধুনিক বিলাতী ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়াছেন, আকবরের মেরী নামক একজন খ্রীস্টান বিবি হয়ত ছিল, তিনি এই দালানে বাস করিতেন— নতুবা বাইবেলের কাহিনীমূলক প্রাচীরচিত্র এইখানে স্থান পাইবে কেন? কিন্তু এ শ্রেণীর সমালোচকেরা নানা স্থানে উৎকীর্ণ বুদ্ধদেবের চিত্র, স্বর্গ নরকের ছবি, হিন্দু চিত্রশিল্প, প্রত্যেকটির জন্য এক-একজাতীয় বেগম কল্পনা করিলেন না কেন? যাহা হউক জে. এস. মেসরুফ (আর্মানী) এই বিবি মরিয়মকে আর্মানী খ্রীস্টান মহিলা বলিয়া দাবি করিয়াছেন। তাঁহার অতি-বৃহৎ অতি-অপ্রামাণিক গ্রন্থে [২] মীরকাসিমের স্ত্রী দলনী বেগমের জীবনচরিত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাস হইতে সংকলন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতামতের মূল্য বিচার করিবার আদৌ প্রয়োজন নাই। সমসাময়িক কোনো ইতিহাসে কিংবা জেস্যুইট পাদ্রিগণের বিবরণে আকবর বাদশাহ্র বিলাতী বেগমের কোনো উল্লেখ নাই। আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের মতে বাদশাহ্র প্রধানা বেগম মরিয়ম-উজ্-জমানী (এ যুগের মেরী) এই কক্ষে বাস করিতেন। কিন্তু এই মরিয়ম-উজ্-জমানী উপাধি কোন্ বেগমের ছিল উহা তাঁহারা ঠিক করিতে পারেন নাই। সুলতানা সলিমা বেগম আকবরের তিনশত বেগমের মধ্যে ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠা—বাদশাহ্ অপেক্ষা বোধ হয় চার-পাঁচ বৎসরের বড়। তাঁহার কোনো সন্তান ছিল না; শাহজাদা সেলিমকে তিনি পোষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সলিমা বেগম ছিলেন প্রধানা মহিষী; সুতরাং মরিয়ম-উজ্-জমানী বলিতে তাঁহাকেই বুঝা উচিত। বিবিমরিয়ম-কোঠির অতি নিকটে সুলতান সলিমা বেগমের সুন্দর নাতিপরিসর দালান এখনও আছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, বিবি মরিয়মের কোঠি মহল-ই-খাস অংশে আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। আকবর-জননী হামিদাবানু দরবারী ইতিহাসে মরিয়ম-মকানী নামে পরিচিতা। তিনি এবং সলিমা বেগম স্থায়ীভাবে ফতেপুর সিক্রির মহলে বাস করিতেন। বৃদ্ধা সম্রাটজননী শেষশয্যায় শায়িতা বড়বৌ সলিমার বালিশের কাছে মুখ রাখিয়া ডাকিলেন "বেগম-জীউ"; কয়েকবার ডাকিয়াও সাড়া পাইলেন

---

১ *Architecture of Fatepur Sikri.*

২ *Armenians in India.*

না, একবারমাত্র শাশুড়ির দিকে শেষ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বেগমের চক্ষুদ্বয় চিরতরে মুদ্রিত হইল[৩] (সোমবার ৬ই রমজান ১০১১ হিঃ অর্থাৎ ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৬০৩)।

ফতেপুর সিক্রির এই মহলে একবৎসর আট মাস পর আকবর জননী হামিদার শেষশয্যাপার্শে মা মা ডাকিয়া আকুল হইয়াছিলেন। বিদ্রোহী পুত্র সেলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য মাতা হয়ত পীড়ার ভান করিতেছেন, এই ভাবিয়া তিনি ঠিক খবর লইবার জন্য যমুনাতীর হইতে চর পাঠাইয়াছিলেন। মা অভিমানে সাড়া না দিয়া চিরমৌন অবলম্বন করিলেন[৪] (সোমবার ২৯শে আগস্ট ১৬০৪)[৪]।

বিবি মরিয়ম আকবরের মা মরিয়ম মকানী; কোনো খ্রীস্টান স্ত্রী নহেন। আমার মনে হয়, ঐ কুঠিতে আকবরের মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। রাজা বীরবলের দৌলতখানা পনেরো-ষোলো বৎসর পূর্বে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট রাজা বীরবলের কন্যার আবাস বলিয়া পরিচিত ছিল। বোধ হয়, এতদিনে ভুল ভাঙিয়াছে। আকবর বীরবলের কোনো কন্যাকে বিবাহ করেন নাই; ঐ মহল বাদশাহের হুকুমে সরকারী খরচে বীরবলের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল। আকবর স্বয়ং বীরবল-মহলে রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন; ইহার সনতারিখ আকবরনামায় আছে। যোধাবাই-মহল একটি স্বতন্ত্র স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রাসাদ— মহল-ই-খাস অংশের সহিত অন্দরমহল রাস্তার দ্বারা পরে সংযুক্ত করা হইয়াছে, অন্তঃপুরবাসিনীদের ইহাই ছিল অভিসারপথ।

দিল্লি আগ্রা লাহোর প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান শহরের মোল্লাটে আবহাওয়া আকবরের নববিধান প্রবর্তনের অনুকূল ছিল না। এই জন্য তিনি তাঁহার স্বপ্নপুরী ফতেপুর নির্মাণ করিয়া কিছুকালের জন্য "দার-উল-খেলাফত" উপাধি হইতে দিল্লিকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর সম্রাট বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মুখ্যতঃ মুসলমান-স্বার্থরক্ষায় সচেতন মুসলমানসমাজশাসিত দিল্লির ইস্‌লামী খেলাফত হিন্দুস্থানে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী কিংবা মহম্মদ তোগলকের আসমুদ্রব্যাপী ভারতসাম্রাজ্য হিন্দু-মুসলমান কাহারও স্থায়ী কল্যাণ সাধন করিতে পারে নাই। জাগ্রত বিবেকবুদ্ধি তাঁহাকে শরিয়ৎ-নির্দিষ্ট পথ হইতে বিপথগামী করিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কখনো ফাঁদে পড়েন নাই। সম্রাট অশোকের পরেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে আকবরের স্থান। স্বার্থকে পরার্থে রূপায়িত করিতে না পারিলে ভারতের তথা বিশ্বমানবের কল্যাণ নাই। মনুসংরক্ষিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমাপ্তি হয় হিন্দু স্বাধীনতার অপঘাতমৃত্যুতে, এবং সর্ববিধ বৈষম্যমূলক সংরক্ষিত স্বার্থের উহাই চরম পরিণতি— এই সত্য আকবর স্বহস্তে শাসনরজ্জু গ্রহণ করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জিজিয়া কর, যাত্রীশুল্ক ইত্যাদি তুলিয়া দিয়া আকবর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নাগরিক অধিকারে বৈষম্য দূর করিলেন। গুণগ্রাহী সম্রাট উপযুক্ত হিন্দুদিগকে ইরান-তুরানের উচ্চবংশীয় আমীর অপেক্ষাও উচ্চতর মনসব প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাগণের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি এবং বিবদমান পক্ষদ্বয়ের প্রতি পর্যায়ক্রমে অনুগ্রহ-নিগ্রহ প্রয়োগ করিয়া হিন্দুস্থানে তৈমুরবংশের

---

৩ Beveridge, *Akbarnama*, vol. iii, p. 1226.

৪ *Ibid*, p. 1244-45.

যথেচ্ছাচার-শাসন নিষ্কণ্টক করিবেন বা দিল্লির মসনদে বসিয়া বানরের পিঠা ভাগ করিবার আনন্দ অনুভব করিবেন, এইরূপ কুমতলব থাকিলে আকবর এই পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া ক্ষান্ত হইতেন।

অসামান্যরাজন্যবৃত্তি আকবরের সাম্রাজ্যলিপ্সার পশ্চাতে ছিল এক মহান্ আদর্শবাদ। স্বপ্নের বাতিক না থাকিলেও ফতেপুর সিক্রিতে তিনি হিংসাদ্বেষজর্জরিত বাস্তবতার মধ্যে অহিংসা, মৈত্রী এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। গতানুগতিকের বিরুদ্ধে তাঁহার নৈতিক বিদ্রোহ অর্ধপথে নিবৃত্ত হইল না। এই বিদ্রোহাগ্নির ইন্ধন আহরণ করিবার জন্য তিনি বাদশাহী মহলের বাহিরেই পীর সেলিম চিশতীর সাধন-পীঠের উপর ইবাদতখানা বা উপাসনামন্দির নির্মাণ করিবার হুকুম দিয়াছিলেন (১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দ)। ইবাদতখানায় বিচারকের আসনে বসিয়া সম্রাট নানা ধর্মের প্রতিনিধিস্থানীয় পণ্ডিত, মৌলানা পাদ্রির স্ব স্ব মতের প্রাধান্য স্থাপক বক্তৃতা শুনিতেন, বাগ্‌বিতণ্ডা মীমাংসা করিতেন। এই উপাসনাগৃহে উপাসনা ব্যতীত প্রায় সমস্ত কাজই চলিত; গালাগালি, যষ্টি উত্তোলন;— কেবল রক্তারক্তিটা বাকি ছিল। মোল্লা বদায়ুনী এবং তদীয় শিষ্য স্মিথ সাহেব শুধু আকবরের ইবাদতখানার বাহিরের দিকটা দেখিয়া সম্রাটের নিন্দা করিয়াছেন। এই ইবাদতখানার মতবিরোধ এবং বিতর্কের মধ্যেই আকবরের দীন-ই-ইলাহীর জন্ম। সাহেব ইঙ্গিত করিয়াছেন এই অপরূপ নূতন ধর্ম বাদশাহী বেকুবির বুলন্দ-দরওয়াজা (স্মৃতিস্তম্ভ)। আমরাও পনেরো-ষোলো বৎসর পূর্বে ঐরূপ ভাবিতাম। ভুল এখন বুঝিতে পারিয়াছি। আধাআধি পরিচয় অজ্ঞতা অপেক্ষাও মারাত্মক এবং ভয়াবহ। এই শ্রেণীর লোকেরা মনে করে ইবাদতখানায় বসিয়া আকবর বাদশাহ্ লড়াইয়ের শখ মিটাইতেন; হাতি, হরিণ, মাকড়শার লড়াইয়ের মত পাদ্রী-মোল্লা পণ্ডিত-মৌলানা শিয়া-সুন্নীর লড়াই দেখিয়া বাদশাহ্ আমোদ পাইতেন। নমাজ সন্ধ্যা গায়ত্রী জপের জন্য আকবর ইবাদতখানা নির্মাণ করেন নাই; ঐখানে বসিয়া সম্রাট স্বয়ং উপাসনা করিতেন, তাঁহার উপাস্য দেবতা বিচারবুদ্ধির। পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যেই ধর্মপ্রাণ প্রাচীনপন্থী মুসলমানগণ সারা হিন্দুস্থানে "ইসলাম বিপন্ন" রব তুলিলেন। বাংলা হইতে গোরখপুর পর্যন্ত বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল; আকবরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জৌনপুরী মৌলানাগণ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা হাকিমকে হিন্দুস্থানের বাদশাহী প্রদান করিবার ফতোয়া জারি করিল। কাবুলবাহিনী সিন্ধু অতিক্রম করিল।

বিজয়ী আকবর ফতেপুর সিক্রিতে ফিরিয়া আসিয়া পুরাতনের কবরের উপর নূতনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। আকবরের নববিধানের স্বরূপ ঐতিহাসিক কল্পনাবলে ধ্যানেই মিলিবে, বাগ্‌বিতণ্ডায় নহে। আকবরশাহী খেলাফতের মূলসূত্র— দীন দুনিয়ার মালিক একজন মাত্র, তাহার তুলনা নাই, নাম নাই, কিন্তু যে নামেই মানুষ তাঁহাকে ডাকুক না কেন তিনি সাড়া দিয়া থাকেন; তাঁহারই খলিফা বা সর্বময় প্রতিনিধি দিল্লীশ্বর, তিনি শুধু শাসক নহেন, ইমামও বটে। প্রজার সর্ববিধ রাজনৈতিক সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন খলিফার বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য এবং ঐ কর্তব্য বিবেকবুদ্ধি অনুসারে পালন করাই খলিফার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবাদৎ বা উপাসনা। খোদাতালা যেমন সুখদুঃখ-শোকগ্লানির অতীত, সৃষ্টির আনন্দেই স্রষ্টার আনন্দ, তেমনি তাঁহার খলিফারও ব্যক্তিগত সুখদুঃখ নাই; তিনি জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রজাসাধারণের আনন্দ-উৎসবের সুখদুঃখের অংশভাগী। শেষজীবন পর্যন্ত আকবর কর্তব্যপালন করিয়াছেন। মাতৃবিয়োগের পর তিনি সম্পূর্ণ মুণ্ডন করিয়া মাতমী বা শোকের পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন; ঐদিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি বক্‌শীবেগীকে হুকুম দিলেন— আগামী কাল দশহরা

(বিজয়াদশমী, রামলীলার উৎসব); সকলকে জানাইয়া দাও, যেন মাতমী পোশাক ত্যাগ করে।[৫] হিন্দুস্থানে বহুত্বের মধ্যে একত্ব প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা খলিফার অন্যতম কর্তব্য। হিন্দুস্থানের খেলাফত শুধু মুসলমানের নহে, শুধু হিন্দুরও নহে। ব্যক্তিগত ধর্মের উর্ধ্বে থাকিবে একটি রাজধর্ম (সম্রাটের দীন-ই-ইলাহী নহে)— উহা ভারতের জাতীয়তা, যাহার দাবি ধর্মের দাবি অপেক্ষা অগ্রগণ্য। আকবরশাহী খেলাফতে হিন্দু-মুসলমান, শিয়া-সুন্নী, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ, ইরানী-তুরানী, রাঠোর-চৌহানের বিরোধের অবসান ঘটাইবার মুখ্য উপায় ছিল আকবর-প্রচারিত অহিংসা-নীতি। ফতেপুর সিক্রির দেওয়ান-ই-আম দরবারের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এখনও ধ্বনিত হইতেছে সম্রাটের উদার বাণী— সর্বমত-সহিষ্ণু হও।

ঐতিহাসিক ইতিহাস-স্রষ্টাগণের মনের সন্ধান কদাচিৎ পাইয়া থাকে; তবে আমাদের পূর্বোক্ত মতামতের স্বপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 'পাথুরে প্রমাণ' আছে। এই প্রমাণ পাষাণে উৎকীর্ণ কোনো প্রশস্তি নয়; সমগ্র ফতেপুর সিক্রির স্থাপত্যকলাই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। স্থাপত্যবিশারদগণ আকবর সম্বন্ধে এই নিগূঢ় সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ফতেপুর সিক্রি আকবরের মনের প্রতিচ্ছবি। এই কথার যথোচিত ঐতিহাসিক ভাষ্য লিখিতে হইলে একখানি পুস্তক লেখা প্রয়োজন। বর্ষাকালে হরিণমিনারে বসিয়া সিক্রির শীর্ণকায় সরোবরে জাঠ কৃষকের জোয়ালমুক্ত মহিষের জলক্রীড়া দেখিলেই কুশপরিত্যক্তা অযোধ্যার ছায়াময়ী রাজলক্ষ্মীর বিলাপ মনে পড়ে—

আস্ফালিতং যৎ প্রমদাকরাগ্রৈ মৃদঙ্গধীরধ্বনিমন্বগচ্ছৎ।
বন্যৈরিদানীং মহিষৈ স্তদম্ভঃ শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীর্ঘিকাণাম্।

"পূর্ব্বে বারিবিহারকালে যে দীর্ঘিকার স্বচ্ছ জল, প্রমদাগণের করাগ্রদ্বারা আস্ফালিত হইয়া, মৃদঙ্গের গম্ভীরধ্বনি অনুকরণ করিত, এখন সেই বিমল সলিল বন্যমহিষদিগের শৃঙ্গের দ্বারা আহত হইতেছে।"—রঘুবংশ

৫ *Akbarnama*, vol. iii, p. 1245.

নয়ী তালিম

শ্রীঅনাথনাথ বসু

সম্প্রতি ওয়ার্ধায় জাতীয় শিক্ষাসম্মেলন হইয়া গেল। সেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নূতন পারিভাষিক শব্দ আমরা শুনিতে পাইলাম "নয়ী তালিম" অর্থাৎ নূতন শিক্ষা। এতদিন আমরা বুনিয়াদি শিক্ষার কথাই শুনিয়া আসিয়াছি, এইবার নয়ী তালিমের কথা শুনিলাম। সম্মেলন-উদ্বোধন প্রসঙ্গে গান্ধীজী নয়ী তালিমের ব্যাখ্যা করিলেন; তাহাতে বুঝিতে পারা গেল নয়ী তালিম আর কিছুই নহে, বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বুনিয়াদি শিক্ষাতত্ত্বের প্রয়োগের ফলে রূপান্তরিত ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থা। বুনিয়াদি শিক্ষার মূলতত্ত্ব এইবার ব্যাপকভাবে শিক্ষার সকল স্তরে প্রয়োগ করা হইবে এবং সেই নূতন শিক্ষাপরিকল্পনা 'নয়ী তালিম' নামে পরিচিত হইবে। বুনিয়াদি শিক্ষা বলিতে এতদিন আমরা সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথাই বুঝিয়াছি। বুনিয়াদি শিক্ষাপরিকল্পনায় বয়স হিসাবে তাহার আগের বা পরের স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। সুতরাং জাতীয় শিক্ষাপরিকল্পনা হিসাবে সে পরিকল্পনা অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ ছিল। জাতীয় শিক্ষাপরিকল্পনার একটি প্রধান লক্ষণ তাহাতে জাতির সকল বয়সের ও সকল শ্রেণীর লোকের উপযোগী বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার আয়োজন থাকে। কিন্তু এতদিন ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় এরূপ কোন ব্যবস্থাই ছিল না, এতদিন সে পরিকল্পনায় শুধু প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার কথা বলা হইয়াছিল এবং সেই স্তরের উপযোগী শিক্ষা 'বুনিয়াদি শিক্ষা' নামে অভিহিত হইয়াছিল। এইবার শিক্ষাপ্রচেষ্টার ক্ষেত্র বিস্তৃততর ও ব্যাপকতর করিয়া তাহাকে প্রসারে সত্য সত্যই জাতীয় করিয়া তুলিবার কথা হইয়াছে। সেই বিস্তৃততর শিক্ষাপরিকল্পনাকে নয়ী তালিম নাম দেওয়া হইয়াছে।

বুনিয়াদি শিক্ষার মূল কথা কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা দান। সমগ্র নয়ী তালিম পরিকল্পনা সেই মূল সূত্রটি অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। "Education for life in all its stages through manual activity and handicrafts" অর্থাৎ হাতের কাজ ও শিল্পের ভিতর দিয়া মানুষের সকল বয়সের জীবনযাত্রার উপযোগী শিক্ষা। গান্ধীজীর এই অল্প কয়েকটি কথায় অনেক কথাই বলা হইয়াছে। ইহারই মধ্যে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলির এবং ভবিষ্যতের ব্যবস্থার প্রধান লক্ষণগুলির স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। সুতরাং কথাগুলি ভাল করিয়া আলোচনা করা যাক্, তাহা হইলেই আমরা নয়ী তালিম ব্যবস্থার প্রকৃত রূপটি বুঝিতে পারিব।

জীবনের অর্থাৎ জীবনযাত্রার উপযোগী করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে; বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যে আমাদের জীবনের উপযোগী করিয়া তোলে না, এ বিষয়ে কি নূতন করিয়া কোন কথা বলিতে হইবে! অতীতকালে একদিন একটি বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্য ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেইদিনই ইহার লক্ষ্য স্থির হইয়া গিয়াছিল। এতদিনেও সেই লক্ষ্য পরিবর্তিত হয় নাই। সে লক্ষ্য অত্যন্ত সংকীর্ণ; সেখানে বৈচিত্র্যের কোন স্থান নাই, জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিবার কোন চেষ্টা নাই। তাহার ফলে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা

অত্যন্ত একটি সংকীর্ণ খাত বাহিয়া চলিয়াছে, তাহার দুই কূলে যে সামান্য কয়জন আছে মাত্র তাহারাই তাহার ফলভোগ করিতেছে; কিন্তু সেই ক্ষীণ জলধারা সমগ্র জাতীয় জীবনকে রসসিক্ত বা উর্বর করিয়া তুলিতে পারিতেছে না। ফলে দেখিতেছি কি, যে এই শিক্ষা লাভ করিতেছে সে মাত্র একটি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে জীবনযাপনের উপযোগী হইতেছে। বিচিত্র জীবনের বিচিত্র প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষমতা বা আয়োজন সে-শিক্ষাব্যবস্থায় নাই। এইজন্যই চাষীর সন্তান এই শিক্ষা পাইয়া ভাল চাষী না হইয়া চাকরীর সন্ধানে ফেরে, ব্যবসায়ীর সন্তান ব্যবসা ছাড়িয়া চাকরিজীবী হয়। সারা জাতটা যদি চাকরিজীবী হইতে পারিত তাহা হইলে না হয় এ ব্যবস্থা মানিয়া লইতে পারা যাইত। কিন্তু তাহা হইলে তো চলে না। অথচ এই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের একান্তভাবে চাকরিনির্ভর করা ছাড়া আর কিছু করিতে পারে না। ব্যাবহারিক জগতে সে শিক্ষা তাই আজ অচল হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যাবহারিক জগতে যে শিক্ষা আমাদের অহরহ প্রয়োজন হয় তাহা লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় ব্যবহারের ভিতর দিয়া, কাজের ভিতর দিয়া। গান্ধীজী এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার শিক্ষাবিধানে কাজের উপর এত জোর দেওয়া হইয়াছে। আমাদের সাধারণ ধারণা যে পুঁথিই বুঝি জ্ঞানলাভের একমাত্র মাধ্যম। শিক্ষার যে অন্য কোন রকম মাধ্যম থাকিতে পারে তাহা আমরা ভাবিতেও পারি না। ফলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পুঁথির এত প্রাধান্য এবং সেই প্রাধান্যের জন্যই আমাদের শিক্ষা এত পুঁথিঘেষা ও অব্যাবহারিক। গান্ধীজী বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মূলগত এই ত্রুটিটি ধরিতে পারিয়াছেন, তাই তিনি কাজের ভিতর দিয়া শিখাইবার কথা বলিয়াছেন। সুনিয়ন্ত্রিত এবং ধারাবাহিক কর্মচেষ্টার ফলে মানুষের মন শিক্ষিত হইয়া ওঠে এবং সেরূপ কর্মচেষ্টার ভিতর দিয়া অনেক কিছু শেখানো যাইতে পারে। ইহা গান্ধীজীর নূতন আবিষ্কার নয়, আমেরিকায় অনেকদিন হইতেই এই ধরণের শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। এই চেষ্টার প্রবর্তক আধুনিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ ডিউই (Dewey) ও তাঁহার সহকারী কিলপ্যাট্রিক (Kilpatrick)। তাঁহাদের পরিকল্পিত শিক্ষারীতি "প্রজেক্ট"রীতি (project) নামে পরিচিত।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার যে প্রজেক্ট রীতির সহিত নয়ী তালিমের অনেকখানি মিল থাকিলেও নয়ী তালিমের মধ্যে কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যেগুলি প্রজেক্ট রীতির মধ্যে নাই। প্রজেক্ট রীতিতে কাজের কোন ধরাবাঁধা নাই, যেকোন কাজকেই আশ্রয় করিয়া শিক্ষা দেওয়া চলে এবং তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করিয়া তাহাদের একসূত্রে গাঁথিয়া তোলা যায়। কিন্তু গান্ধীজীর শিক্ষাবিধানে স্পষ্টই নির্দেশ আছে সে কাজ যতদূর সম্ভব সৃষ্টিধর্মী এবং সামাজিক হিসাবে প্রয়োজনীয় হওয়া চাই। সৃষ্টিধর্মী কাজ তাহাকেই বলিব যাহার ফলে নূতন কিছু সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু শুধু নূতন কিছু করিলেই চলিবে না, সেটা সামাজিক হিসাবে প্রয়োজনীয় হইতে হইবে। শিল্পকর্মে[১]

---

১ ইংরেজীতে যাহাকে craft বলে বাংলায় তাহাকে সাধারণভাবে শিল্প বলা চলে; কিন্তু বাংলায় কারু ও চারু, শিল্পের এই দুই প্রকার ভেদ করা হইয়াছে এবং ইংরেজী artএর প্রতিশব্দ করা হইয়াছে চারুশিল্প। তাহা না করিয়া আর্ট শব্দটিকে বাংলায় গ্রহণ করিলে চারু ও কারু এই বিশেষণ আর ব্যবহার করিতে হয় না। সুধীগণ এই কথাটি বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

এই দুইটি লক্ষণই আমরা দেখিতে পাই ; তাই গান্ধীজী বিধান দিয়াছেন কোন একটা শিল্পকে (craft) কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে। শিল্পকর্মে একদিকে যেমন সৃজনীশক্তির ভিতর দিয়া ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রচুর সুযোগ আছে, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক প্রয়োজন মিটাইয়া তাহা মানুষের মনে সামাজিকবোধ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করে। শিল্পমাত্রেই সামাজিক প্রয়োজন সাধন করে, এইখানেই নিছক আর্ট ও শিল্পের মধ্যে বড় একটা তফাত। শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষালাভ করিতে করিতে ছাত্র যেমন সৃষ্টি করিবে তেমনই সে-সৃষ্টি সামাজিক প্রয়োজন মিটাইবে। এই শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার বিধানই গান্ধীজীর শিক্ষাপরিকল্পনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা প্রয়োজন ; দেশসুদ্ধ লোককে কারিগর, ছুতার, কামার বা তাঁতী করাই গান্ধীজীর উদ্দেশ্য নহে ; দেশে অনেক ছুতার কামার আছে যাহাদের কাজ জোটে না। তাহাদের সংখ্যা বাড়াইবার যে প্রয়োজন নাই এ কথা গান্ধীজী ভালভাবেই জানেন। যে তাঁতের কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ করে সে সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁতী হইবার শিক্ষা পাইলেও পরোক্ষভাবে সে যেটা লাভ করে এখানে সেইটাই বড় কথা। তাঁত শিখিতে গিয়া সে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে-কুশলতা বা নৈপুণ্য লাভ করে সে-কুশলতা সে অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে শেখে ; সেখানে সে যেভাবে জ্ঞান ও কর্মের ঘনিষ্ঠ যোগ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে তাহার ফলে তাহার শিক্ষা ব্যাবহারিক হয়, সে শিক্ষা অন্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে তাহার কোন অসুবিধা হয় না, কারণ সে নিজেই হাতেকলমে সে বিদ্যা একটি ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছে। পুঁথিলব্ধ জ্ঞান সাধারণত বন্ধ্যা, কিন্তু ব্যবহারের ভিতর দিয়া আমরা যে জ্ঞান লাভ করি সে জ্ঞান সেরূপ নহে, তাহাকে আমরা সহজেই কাজে লাগাইতে পারি।

গান্ধীজীর শিক্ষাতত্ত্বের আর একটা বড় কথা জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে যোগস্থাপন। ইংরেজীতে ইহাকে correlation (সংযোজন) বলা হইয়াছে। জ্ঞান অখণ্ড, কিন্তু বিদ্যালয়ে ছাত্র যেভাবে বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে জ্ঞান লাভ করে তাহাতে জ্ঞানের অখণ্ডতা সব সময়ে তাহার চোখে ধরা পড়ে না। অথচ বিভিন্ন বিষয়গুলিকে যদি একসূত্রে গাঁথা না যায় তাহা হইলে জ্ঞান খণ্ডিত হয় এবং খণ্ডিত জ্ঞান আমাদের কোন কাজেই লাগে না। ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের মিল না ঘটাইলে যে-পটভূমিকায় ঘটনাবলী ঘটিতেছে তাহার প্রকৃত রূপটি চোখে পড়ে না, শুধু তাহাই নহে যে পরিপ্রেক্ষিত লইয়া ঘটনাবলীর বিচার করিব সেটিও ধরা দেয় না। এইজন্যই জ্ঞানের ঐক্যবিধান এত প্রয়োজন। ছোটবেলায় বিষয়গুলির পার্থক্যের উপর বেশী জোর দিলে সেই ঐক্যবিধানে বাধা ঘটে। তাহার উপর যদি ঐক্যবিধানের কোন যোগসূত্র না থাকে তাহা হইলে আরও অসুবিধা হয়। গান্ধীজীর পরিকল্পনায় শিল্পচেষ্টা সেই ঐক্যবিধানের যোগসূত্র জোগাইতেছে। তাহার জন্য ঐক্যবিধান সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে।

নয়ী তালিমের মূলতত্ত্বগুলি বলিয়াছি। এইবার জীবনের বিভিন্নস্তরে সেগুলি কিভাবে প্রয়োগ করা হইবে তাহাই সংক্ষেপে বলি। ওয়ার্ধা শিক্ষাসম্মেলনে শিক্ষার চারিটি স্তরের কথা বলা হইয়াছে। প্রাগ্-বুনিয়াদি (pre-basic), বুনিয়াদি (basic), উত্তর-বুনিয়াদি (post-basic) ও বয়স্ক (adult)। জীবনের প্রথম সাত বৎসর প্রাগ্-বুনিয়াদি স্তর, তাহার পর সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুনিয়াদি স্তর ; চৌদ্দ বৎসরের পর উত্তর-বুনিয়াদি স্তর শুরু হইবে। এখানে বিভিন্ন বৃত্তি ভেদে শিক্ষার কাল বিভিন্ন

হইবে। কোন বৃত্তির জন্য হয়তো চার বৎসরের শিক্ষার দরকার হইবে; আবার কোনটার জন্য তাহার চেয়ে কম বা বেশী সময় লাগিবে। বয়স্ক-শিক্ষার স্তরে স্বভাবতই বয়সের কোন নির্দেশ নাই। যেখানে আবশ্যিক শিক্ষা চৌদ্দ বৎসর বয়সে শেষ হইবে সেখানে তাহার পর হইতেই বয়স্ক-শিক্ষার কাল শুরু হইবে এবং ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী তাহার সাময়িক পরিমাণ নির্দিষ্ট হইবে। নয়ী তালিম পরিকল্পনায় শুধু বুনিয়াদি স্তর আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়াছে; বস্তুত তাহার বুনিয়াদি নামও কতকটা এই কারণে দেওয়া হইয়াছে। অন্তত এতটুকু শিক্ষা জাতির প্রত্যেককে আবশ্যিকভাবে দিতে হইবে, আর সেইটাই জাতির সংস্কৃতির বুনিয়াদ হইবে। এইখানে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে, এখানে শিক্ষার যে বিভিন্ন স্তরের কথা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উল্লেখই নাই। বোধ করি উত্তর-বুনিয়াদি শিক্ষাসম্বন্ধে যখন বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবে তখন তাহার মধ্যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ পাইব। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার। এখনও পর্যন্ত আমরা নয়ী তালিমের একটা রেখা চিত্র মাত্র পাইয়াছি, তাহার মধ্যে শুধু বুনিয়াদি স্তরেরই বিস্তৃত বিবরণ আছে; বাকি স্তরগুলিতে কোথায়, কেমন করিয়া এবং কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে, সেবিষয়ে বিস্তারিতভাবে কিছুই বলা হয় নাই, শুধু মোটামুটিভাবে মূলসূত্রগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং বুনিয়াদি স্তর বাদে বাকি স্তরগুলির শিক্ষাব্যবস্থার মাত্র একটা কাঠামো আজ আমাদের সম্মুখে আছে। হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ আপাতত সেই কাঠামোকে রূপদান করিতে রত আছেন। আশা করি অনতিবিলম্বে নয়ী তালিমের পূর্ণ পরিকল্পনা আমরা দেখিতে পাইব।

শিক্ষার চারিটি স্তরেই কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। প্রাগ্-বুনিয়াদিস্তরে শিশুদের জন্য কাজ বলিতে খেলারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহার মনস্তত্ত্বসম্মত একটা কারণ আছে। শিশুর কাছে খেলা ও কাজের মধ্যে কোন ভেদ নাই। আমরা যেটাকে খেলা ভাবি শিশুরা সেটাকে কাজ হিসাবেই গ্রহণ করে; খেলারত নিবিষ্টচিত্ত শিশুকে দেখিলেই এই কথাটি বোঝা যাইবে। সুতরাং শিশুকে খেলার ভিতর দিয়া শিক্ষা দিবার বিধান নয়ী তালিম ব্যবস্থায় দেওয়া হইয়াছে। এ ব্যবস্থাও নূতন নহে; পেস্টালৎজি (Pestalozzi) ফ্রয়বেল (Froebel), প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্ মনীষীরা এই সত্য অনেক বৎসর আগেই আবিষ্কার করেন। ফ্রয়বেলের 'কিণ্ডারগার্টেন' (শিশু-উদ্যান) নামেই তাহার ইঙ্গিত আছে। এমন কি মাদাম মণ্টেসরি (Montessori) যে শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতেও খেলাচ্ছলে শিক্ষাদানের বিধান রহিয়াছে।

বুনিয়াদি স্তরের কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনা না করিলেও চলে; সেখানে কি ভাবে শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান চলিবে তাহার উল্লেখ ইতিপূর্বে করিয়াছি। উত্তর-বুনিয়াদি স্তর তো খোলাখুলি-ভাবে বৃত্তিশিক্ষার স্তর; সেখানে যে বৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার আয়োজন করা হইবে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা হইলে যে-বিদ্যাগুলি বৃত্তিধর্মী নহে সেগুলির চর্চা কোন্ স্তরে, কোথায় হইবে? যেমন ধরা যাক, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য ইত্যাদি। নয়ী তালিম পরিকল্পনায় এখনও এ ব্যাপারটা স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। আশা করি যখন এই পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে তখন এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে।

বয়স্ক-শিক্ষার যে পরিকল্পনা আমরা নয়ী তালিমের মধ্যে পাই সেখানেও হাতের কাজ ও শিল্পকে কেন্দ্র

করিয়া শিক্ষা দিবার কথা বলা হইয়াছে। যে-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বয়স্ক ছাত্রের জীবিকা নির্বাহ হইতেছে সেই বৃত্তিকে তাহার শিক্ষার কেন্দ্র করিতে হইবে; তাহা করিতে পারিলে একদিকে যেমন তাহার শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যোগ ঘটিবে অন্যদিকে তেমনই সে-শিক্ষা জীবনোপযোগী হইয়া উঠিবে, তাহার বৃত্তিপালন সার্থকতর, উন্নততর হইবে। এই ধরণের বয়স্ক শিক্ষা সাক্ষাৎভাবে চাষীকে ভাল চাষী করিবে, তাঁতীকে ভাল তাঁতী করিবে, তাহাদের শুধু কতকগুলি তথ্য শিখাইয়া মনোজগতের ভাববিলাসী করিয়া তুলিবে না।

নয়ী তালিমের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইল তাহাতে ইহার বৈশিষ্ট্য ও বিপ্লবী-রূপ স্পষ্ট হইবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা এক নূতন বিপ্লবের সূচনা করিতেছে। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে কোন স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করা হয় নাই; তাই বর্তমান সমাজব্যবস্থায় আজ বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে একটা ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে; পুঁথিপ্রধান শিক্ষাপদ্ধতির ফলে সে-ভেদ আরও বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। গান্ধীজী যে নূতন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করিতে চাহিতেছেন তাঁহার পরিকল্পিত এই শিক্ষাব্যবস্থা সেখানে একদিকে যেমন এই ভেদ দূর করিয়া জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে যোগ স্থাপন করিবে, অন্যদিকে তেমনই মানুষের সামাজিক ও সৃষ্টিধর্মী বৃত্তিগুলিকে প্রাধান্য দিয়া, তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিয়া তাহা সেই নূতন সমাজব্যবস্থার পত্তন সহজ ও সম্ভব করিয়া তুলিবে। নয়ী তালিম পরিকল্পনা গান্ধীজীর সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শনের একটি অঙ্গমাত্র; গান্ধীজীর সমগ্র জীবন ও কর্মচেষ্টার সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠযোগ রহিয়াছে। ইহাকে শুধু শিক্ষাসংস্কারের একটা পরিকল্পনা হিসাবে দেখিলে ইহার সমগ্র তাৎপর্য বোঝা যাইবে না, গান্ধীজীর জীবনদর্শনের সহিত ইহাকে মিলাইয়া বুঝিতে হইবে; তবেই ইহার স্বরূপ স্পষ্ট হইয়া দেখা দিবে।

মুদ্রণপ্রমাদ

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০১	২১	১৩২২	১৩১২
১৩৬	১	গত সংখ্যায় (বৈশাখ-আষাঢ়)	গত (বৈশাখ-আষাঢ়) সংখ্যার
	৩	গত	উক্ত
১৪১	১৩	বাতাসে	বাতাস

একই হাতে সর্বদক্ষতা...
লে-আউট
ডিজাইনিং
ব্লক মেকিং
আর্ট প্রিন্টিং
★ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিল্পীর-তত্ত্বাবধানে হাফটোন ও লাইন-ব্লক এবং বহুবর্ণ চিত্রের উৎকৃষ্ট মুদ্রণ নিখুঁতরূপে করা হয়।
Phone: B. B. 3793
Gram:
বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানী
প্রসেস এনগ্রেভারস
আর্ট প্রিন্টারস
এবং ডিজাইনারস
২১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট · কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় মুদ্রণ
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেনগুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০ জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শ্রীশচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর শ্রীসর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যেকটি আট আনা ॥ ৪।৫।৮।১০।১১।১৩।১৬।২৮।২৯।৩২ সংখ্যক গ্রন্থগুলি সচিত্র

৫, ৭, ৯, ও ১১ সংখ্যক গ্রন্থের নূতন সংস্করণ এবং ৩০ সংখ্যক গ্রন্থ যন্ত্রস্থ ॥

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
প্রকাশক শ্রীবিনোদচন্দ্র চৌধুরী
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২

গ্রাহকগণের প্রতি

বিশ্বভারতী পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হইল। চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২) আগামী ২২ শ্রাবণ ১৩৫২ প্রকাশিত হইবে। আমরা আশা করি বর্তমান বর্ষে যাঁহারা গ্রাহক আছেন তাঁহারা আগামী বর্ষেও গ্রাহক থাকিবেন। বার্ষিক চাঁদা (৫।০) মনি অর্ডারে পাঠানোই সুবিধা। যাঁহাদের মনি-অর্ডার বা নিষেধাজ্ঞা যথাসময়ে আমাদের নিকট পৌঁছিবে না, চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা তাঁহাদের নিকট ভি.পি.-তে প্রেরিত হইবে।

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাইবার ঠিকানা

কর্মাধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা
৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা

ডিজাইনের
সৌষ্ঠব
MBS
অলঙ্কার নির্ম্মাণে — ডিজাইনের সৌষ্ঠব, মনোরম কাজ এবং স্বর্ণের বিশুদ্ধতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দোকানে নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ হাল ফ্যাসনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার দিলে অল্প সময়ে পছন্দ মত জিনিষ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। মফঃস্বলের অর্ডার ভি. পি. ডাকে পাঠান হয়। পুরাতন স্বর্ণের পরিবর্ত্তে নূতন অলঙ্কার পাওয়া যায়। কাজের তুলনায় মজুরী সুলভ এবং প্রত্যেকটি অলঙ্কারের জন্ত গ্যারান্টি থাকে।
এম বি সরকার এণ্ড সন্স
সন এণ্ড গ্রাণ্ডসন্স অব লেট বি. সরকার
একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা
১২৪ ১২৪-১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

প্রতি সংখ্যা এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২

কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

নূতন জন্মদিনে
পুরাতনের অন্তরেতে
নূতনে লও চিনে।

২

জন্মদিন আসে বারে বারে
মনে করাবারে—
এ জীবন নিত্যই নূতন
প্রতি প্রাতে আলোকিত
পুলকিত
দিনের মতন।

৩

চলার পথের যত বাধা
পথবিপথের যত ধাঁধা
পদে পদে ফিরে ফিরে মারে,
পথের বীণার তারে তারে
তারি টানে সুর হয় বাঁধা।
রচে যদি দুঃখের ছন্দ
দুঃখের-অতীত আনন্দ
তবেই রাগিণী হবে সাধা।

৪

ক্ষণিক ধ্বনির স্বত-উচ্ছ্বাসে
সহসা নির্ঝরিণী
আপনারে লয় চিনি।
চকিত ভাবের ক্বচিৎ বিকাশে
বিস্মিত মোর প্রাণ
পায় নিজ সন্ধান।[১]

৫

তুমি বসন্তের পাখি বনের ছায়ারে
করো ভাষা দান।
আকাশ তোমার কণ্ঠে চাহে গাহিবারে
আপনারি গান।

৬

"এসো মোর কাছে"
শুকতারা গাহে গান।
প্রদীপের শিখা নিবে চলে গেল,
মানিল সে আহ্বান।[১]

৭

কালো মেঘ আকাশের তারাদের ঢেকে
মনে ভাবে, জিত হল তার।
মেঘ কোথা মিলে যায় চিহ্ন নাহি রেখে,
তারাগুলি রহে নির্বিকার।

৮

শিকড় ভাবে, "সেয়ানা আমি,
অবোধ যত শাখা।
ধূলি ও মাটি সেই তো খাঁটি,
আলোকলোক ফাঁকা।"

৯

কাছের রাতি দেখিতে পাই
মানা।
দূরের চাঁদ চিরদিনের
জানা।

১০

পরিচিত সীমানার
বেড়াঘেরা থাকি ছোটো বিশ্বে ;
বিপুল অপরিচিত
নিকটেই রয়েছে অদৃশ্যে।
সেথাকার বাঁশিরবে
অনামা ফুলের মৃদুগন্ধে
জানা না-জানার মাঝে
বাণী ফিরে ছায়াময় ছন্দে।

১১

অনেক মালা গেঁথেছি মোর
কুঞ্জতলে,
সকালবেলার অতিথিরা
পরল গলে।
সন্ধেবেলা কে এল আজ
নিয়ে ডালা।
গাঁথব কি হায় ঝরা পাতায়
শুকনো মালা।

১২

ফুলের অক্ষরে প্রেম
লিখে রাখে নাম আপনার—
ঝ'রে যায়, ফেরে সে আবার

পাথরে পাথরে লেখা
কঠিন স্বাক্ষর দুরাশার
ভেঙে যায়, নাহি ফেরে আর।[১]

১৩

রাতের বাদল মাতে
তমালের শাখে ;
পাখির বাসায় এসে
"জাগো জাগো" ডাকে।

১৪

বিমল আলোকে আকাশ সাজিবে,
শিশিরে ঝলিবে ক্ষিতি,
হে শেফালি, তব বীণায় বাজিবে
শুভ্রপ্রাণের গীতি।

১৫

বাহিরে বস্তুর বোঝা,
ধন বলে তায়।
কল্যাণ সে অন্তরের
পরিপূর্ণতায়।[১]

১৬

শূন্য ঝুলি নিয়ে হায়
ভিক্ষু মিছে ফেরে,
আপনারে দেয় যদি
পায় সকলেরে।

১৭

দুঃখশিখার প্রদীপ জ্বেলে
খোঁজো আপন মন,
হয়তো সেথা হঠাৎ পাবে
চিরকালের ধন।

১৮

বেদনা দিবে যত
অবিরত
দিয়ো গো।
তবু এ ম্লান হিয়া
কুড়াইয়া
নিয়ো গো।
যে ফুল আনমনে
উপবনে
তুলিলে
কেন গো হেলাভরে
ধুলা-'পরে
ভুলিলে।
বিঁধিয়া তব হারে
গেঁথো তারে
প্রিয় গো।

১৯

যে যায় তাহারে আর
ফিরে ডাকা বৃথা।
অশ্রুজলে স্মৃতি তার
হোক পল্লবিতা।

---

১ লেখন কাব্যে ইংরেজী পাঠ আছে।
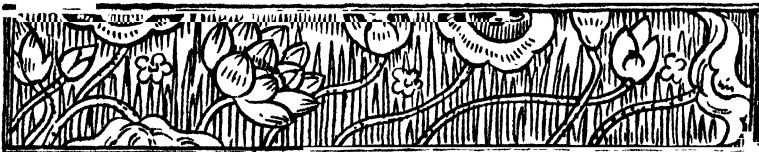
ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিত

৩

পতিসর। ২১শে মার্চ্চ। [১৮৯৪]

এখানকার প্রজাদের উপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে— এদের কোনরকম কষ্ট দিতে আদবে ইচ্ছে করে না— এদের সরল ছেলেমানুষের মত অকৃত্রিম স্নেহের আবদার শুনলে বাস্তবিক মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। যখন তুমি বলতে বলতে তুই বলে ওঠে, যখন আমাকে ধমকায় তখন ভারি মিষ্টি লাগে। এক এক সময় আমি ওদের কথা শুনে হাসি, তাই দেখে ওরাও হাসে। সেদিন আমি সন্ধের সময় বেড়াচ্ছিলুম একজন প্রজা এসে বল্লে, একটু খাড়া হও তুমি— আমি কিছু আশ্চয্য হয়ে চুপ করে দাঁড়ালুম। সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বুকে মাথায় মেখে বল্লে আমার জনম সার্থক হল! সে বল্লে তার কাশি এবং জ্বর হয়েছিল তিন দিন লঙ্ঘন দিয়ে (অর্থাৎ উপবাস করে) ছিল, আজ অন্ন পথ্য করে আমার পদধূলি নিতে এসেছে। তার সরল ভক্তির গুণে আমার পায়ের ধুলোর যদি কোন ফল ফলে বল্‌তে পারি নে। ভক্তি ভালবাসা স্নেহ অযথা পরিমাণে এবং অযোগ্য পাত্রে পড়লেও তার এমন একটি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য আছে— আমার এখানকার প্রজারা সেই পরিপূর্ণ ভক্তির সরলতায় সুন্দর। তাদের রেখাঙ্কিত বৃদ্ধ মুখের মধ্যেও একটি শৈশবের সৌকুমার্য্য আছে। কিন্তু এসব কথা তোকে পূর্ব্বের চিঠিতে অনেকবার বলেছি— অতএব দূর থেকে তোর কাছে এ সমস্তই পুরাতন পুনরুক্তি মনে হতে পারে কিন্তু আমার কাছে প্রতিদিন প্রতিবার নতুন করে ঠেকে। এই প্রাচীন পৃথিবীতে কেবল সৌন্দর্য্য এবং মানুষের হৃদয়ের জিনিষগুলো কোন কালেই কিছুতেই পুরোনো হয় না তাই এই পৃথিবীটা তাজা রয়েছে এবং কবির কবিতা কোন কালেই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

শিলাইদহ। [জুন, ১৮৯৪]

তবু আমার চিঠির কোনরকম গোলমাল হলে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বোধহয় ওর ভিতরেও খানিকটা নিজের সুখ আছে··· নিয়মিত সময়ে আমার বকুনিগুলো তোদের কাছে গিয়ে পৌঁচচ্ছে এইটে কল্পনা করার একটা সুখ আছে। হঠাৎ সেই প্রবাহটা ভেঙ্গে গেলে মনটা ছট্‌ফট্ করে ওঠে। আমার বোধহয় দুঃখ মাত্রেই ঐ একই কারণে। জীবনের সমস্ত প্রবাহ যে অভিমুখে সহজে ধাবিত হচ্চে সেখানে বাধা পেলেই আহত হয়ে ফেনিল হয়ে নিজের মধ্যে বিভক্ত হয়ে ক্রন্দন করে ওঠে। নদী যেমন চলতে চলতে আপনার রাস্তা সুগম এবং সুগভীর করে খনন করে ফেলে আমাদের জীবনের শত সহস্র অভ্যাস সেইরকম বারম্বার চল্‌তে চল্‌তে আপনার পথ প্রস্তুত করে রাখে, সেই পথে হঠাৎ বাধা পেলে সে পীড়িত হয়ে পড়ে। আমার বাড়ি আমার বন্ধু আমার প্রিয়জন প্রত্যেকেই আমার জীবনপ্রবাহের চিরপরিচিত সহজ পথ। আমার ইচ্ছা আমার কল্পনা আমার কাজ তাদের উপর দিয়ে শতসহস্র ধারায়

প্রবাহিত হচ্চে। জীবনপ্রবাহের প্রত্যেক পথই যে আমার অভ্যাসরচিত পথ তা না হতেও পারে, স্বাভাবিক পথও আছে। নির্ঝর যেমন উপত্যকার দিকে যায়— উপত্যকা তার নিজের রচিত নয়। তেমনি প্রত্যেক মানুষেরই জীবননির্ঝরের এক একটা বিশেষ উপত্যকা আছে— তার সমস্ত শক্তি সমস্ত গতি সেইদিকে ধাবমান হয়— তা যদি না হতে পায়, কোথাও যদি রুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে তার সমস্ত গতি তার শক্তি তার প্রাণ ব্যর্থ হয়ে পড়ে। তোর গেল চিঠিতে সুখদুঃখের প্রশ্ন তুলেছিস তাই প্রসঙ্গক্রমে কথাটা বেশি ফলাও হয়ে পড়চে। জীবনের সমস্ত শক্তির বিকাশ সমস্ত অংশের গতিকেই বলে সুখ এবং চরিতার্থতা। ভালবাসা বল্, ঈশ্বরে ভক্তি বল্, পৃথিবীর উপকার বল্, নানা লোকে নানা উপায়ে আপনার জীবনকে গতি দেয়, যার যেটা নিকটবর্ত্তী, যার যেটা সহজসাধ্য, যার যেটাতে অধিকাংশ জীবনের পরিতৃপ্তি সে সেইটেই অবলম্বন করতে চেষ্টা করে— এ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া বৃথা। সুখের উপায় পৃথিবীতে অনেক থাকতে পারে কিন্তু সব উপায় সকলের কাছে নেই। যে দুর্ভাগ্য কোন উপায়েই আপনার রুদ্ধ জীবনকে উন্মুক্ত করতে পারলে না তার কানের কাছে নীতিশাস্ত্র আউড়ে কি করব! হিমালয়ের শিখরে গঙ্গোত্রী আছে বলে আমাদের কালিগ্রামের রক্তদহর বিলকে গতি দিতে পারিনে। পৃথিবীতে চিরদুঃখী অনেক আছে, সে কথা অস্বীকার করবার যো নেই। কর্ত্তব্যপালন করলেই সুখ হয় এ কথা নীতিশাস্ত্রের প্রতারণা— যেমন শিশুশিক্ষায় পড়লুম,

লেখাপড়া করে যেই,
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।—

এখন জানি, লেখাপড়া করেও ট্রাম গাড়ি চড়বার পয়সা অনেককে চেয়ে চিন্তে নিতে হয়— তেমনি অনেক হতভাগ্যকে সুখ না পেয়েও এমনকি দুঃখ পেয়েও কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যেতে হয়। তারপরে অভ্যাসের দ্বারা পথ ক্ষয়ে আসে; দুঃখের পথেও ক্রমশঃ অভ্যাসে কিয়ৎপরিমাণে জীবনের সুগম রাস্তা কেটে আসে— প্রতিকূলতার পথেও খানিকটা অভ্যাসের রেখা পড়ে আসে, তারপরে হয়ত সমুদ্রের মধ্যে চরিতার্থতা লাভ না করে সমস্ত জীবন অর্দ্ধপথে মরুভূমির মধ্যে শোষিত হয়ে যেতে পারে। এমন ঢের হয়ে থাকে, এগুলো হচ্চে fact, এর উপরে মাথা খুঁড়ে মলেও একে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায় না এবং বেদ পুরাণ কোরাণ বাইবেল থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখালেও দুঃখ দুঃখই থেকে যাবে। পৃথিবীতে শতশত ফুল কুঁড়ি অবস্থা থেকে আরম্ভ করে কীটের দংশনে জর্জ্জরীভূত হয়ে কোন ফল প্রসব না করেই ঝরে পড়ে মাটি হয়ে যায়— কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেওয়া যায় না বলে ঘটনাটা অস্বীকার করবার দরকার দেখিনে। পৃথিবীতে শত শত অকৃতার্থ জীবন পরম দুঃখে নষ্ট হয়ে যাচ্চে কোথায় তাদের কি সান্ত্বনা আছে জানিনে। মানুষরা আদিমকাল থেকে নানাবিধ সান্ত্বনা রচনা করে আস্‌চে— কতরকম অনুমান কতরকম কল্পনা স্তূপাকার করে তুল্‌চে তার আর সংখ্যা নেই। আমি একদিন বোটে বসে ভাবছিলুম, মানুষ ভারাক্রান্ত জীব; তার সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিষেরই ভার আছে; এমন কি মনের ভাব প্রকাশ করে বই লিখেছে তাও পার্শ্বেল পোষ্টে পাঠাতে মাশুল দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়,— কাপড়চোপড় বাসস্থান আহার প্রভৃতি তার সমস্ত জিনিষ শত শত মুটের বোঝা। এইজন্যে এই সকল ভার রক্ষা করেও কি উপায়ে ভার লাঘব করা যেতে পারে মানুষের এই এক প্রধান চেষ্টা। গাড়ির চাকা একটা মস্ত উপায়— অনেক ভার চাকার উপরে ফেলে সহজে নিয়ে যেতে পারে। জলের উপরে নৌকো এক মস্ত উপায় বেরিয়েছে—

বিস্তর ভার অনায়াসে স্রোতের উপর সমর্পণ করে দেশ বিদেশে নিয়ে যাওয়া যাচ্চে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র সমাজ সেইরকম ভারলাঘবের উপায়। অভাব বিচ্ছেদ মৃত্যু মানুষকে দুঃখভারে আক্রান্ত করবেই, এইজন্যে মানুষ আপনার ধর্ম্মমত আপনার সমাজকে এমন করে গড়বার চেষ্টা করচে যাতে সেই ভারকে যথাসম্ভব হাল্কা করে ভাসিয়ে দেওয়া যায়। ভারগুলো যদি নিজের উপর স্থাপন করি তাহলে দুঃসহ হয়, যদি ধর্ম্মের উপর সামাজিক কর্ত্তব্যের উপর স্থাপন করি তাহলে অনেকটা আরাম পাওয়া যায়। কোন একটা বৃহৎ Idea-র গুণ হচ্চে, বড় নদীর মত তার একটা ভারবহনের এবং ভারচালনের শক্তি আছে, আমরা তার মধ্যে আপনাদের নিক্ষেপ করবামাত্র অনেকটা হাল্কা হয়ে যাই, আমাদের নিজের দুঃখকষ্টকে আর নিজের স্কন্ধে বহন করতে হয় না।— যে বিষয়ের অবতারণা করা গেছে এর আর শেষ নেই। অথচ রাত্রি অনেক হয়ে আসচে এবং চিঠিও বাড়চে। আর, আমার মনে হচ্চে যে সব কথার ভাল মীমাংসা নেই সে সব কথা মানুষ চেপে রাখতেই ভালবাসে— বেশি খোলসা করে বল্‌তে গেলে শ্রোতার বিরক্তি বোধ হতে পারে।

শিলাইদহ। ৫ই জুলাই। [১৮৯৪]

নতুনের মত এমন স্বল্পস্থায়ী জিনিষ আর কিছুই নেই। মানুষের হৃদয়টা সৌভাগ্যক্রমে এমন তরল যে প্রায় প্রত্যেক পাত্রেই অল্পকালের মধ্যেই সে আপনাকে মাপে মিলিয়ে নিতে পারে—কেবল কখনো কখনো ছোট পাত্রে তাকে ধরে না এবং বড় পাত্রে তার ঢিলে বোধ হয়। এবং দৈবাৎ দুচারটে হৃদয় পাওয়া যায় যারা পুরাতনের মধ্যে জমে শক্ত হয়ে যায়—তাদের নূতন পাত্রে পূরতে গেলে ভেঙ্গে ফেলতে হয়।

শিলাইদহ। বৃহস্পতিবার, ৬ই জুলাই। [১৮৯৪]

কাল দুপুরবেলা সবেমাত্র একটুখানি জমিয়ে লিখতে বসেছি, পাঁচ লাইন লিখেছি কি না, এমন সময় মৌলবী এসে উপস্থিত। সে আমাকে লিখতে দেখে প্রথমে আশ্বাস দিলে যে কেবল "দোঠো কথা" বলে সে চলে যাবে—তার পরে সেই "দোঠো কথা" বলতে ঠিক দোঠো ঘণ্টা কাটিয়ে সে যেমন চলে যাচ্চে অম্‌নি ডাঙ্গা থেকে এক চীৎকারধ্বনি শোনা গেল—"মহারাজ, আজ এক সপ্তাহকাল দর্শনপ্রার্থী হয়ে আছি কিন্তু দৌবারিকগণ নিষেধ করচে।" ভাষা শুনেই বোঝা গেল লোকটি যে-সে নন্। "দৌবারিক"কে নিষেধ করতে নিষেধ করলুম। তখন একটি গেরুয়াবসন ও তিলকধারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিরলকেশ উচ্চললাট প্রসন্ন প্রশান্ত মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে এক মস্ত কাগজ বের করলে। ভাবলুম দরখাস্ত। তারপরে দেখি স্বয়ং সেটি উচ্চস্বরে পড়তে আরম্ভ করে দিলে। প্রথম ছত্র পড়বামাত্রই বোঝা গেল সেটি কবিতা। তাতে ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠনিবাসী হরির গুণগান করচেন। আমি গম্ভীর হয়ে বসে শুনতে লাগলুম। যতক্ষণ হরি বৈকুণ্ঠে ছিলেন ততক্ষণ কবিতা ত্রিপদীতে চল্‌ছিল, তারপরে দেখি হরি হঠাৎ "জগৎসংসারে খ্যাতা, রাজধানী কলিকাতা"য় ঠাকুর উপাধি রক্ষাপূর্ব্বক দ্বারকানাথ হয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন—কবিতাও ত্রিপদী থেকে ক্রমে পয়ারে নেমে এল। পয়ার ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের স্তব সমাধা করে যখন রবীন্দ্রনাথে এসে দাঁড়াল তখন আমি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলুম। আমার কবিত্ব আমার বদান্যতা যে বিশ্বজগতে রবিকিরণের মত বিকীর্ণ হচ্চে এবং তাতে করে অজ্ঞান এবং দারিদ্র্যঅন্ধকার দূরীভূত হচ্চে, এ তুলনাটা যতই সুন্দর হোক্ এ সংবাদটা আমার কাছে নূতন বলে ঠেক্‌ল। আর যাই হোক্, বদান্যতার খ্যাতিটা

প্রচার হওয়া কিছু না। আমি তাঁকে বলে দিলুম কাছারিতে যাও, আমার অন্য কাজ আছে। সে লোকটি বল্লে, আপনার কাজ আপনি করে যান আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ আপনার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি—বলে বিস্ময়ের ভঙ্গী ধারণ করে আমার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে অত্যন্ত অবোধ জন্তুর মত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল— আমার সঙ্কুচিত অন্তরাত্মা সমস্ত শরীরের ভিতর যেন সুড়সুড় করতে লাগল। তাকে বারম্বার যেতে বল্লুম। তখন সে বল্লে, কি দিতে ইচ্ছে করেন এই কাগজে লিখে দিন আমি নায়েব মশায়ের কাছে নিয়ে যাই এবং তাঁকেও শুনিয়ে আসি। আমি মনে মনে ভাবলুম আমারও এই ব্যবসা, আমি কবিতা শুনিয়ে পয়সা পেয়ে থাকি, কিন্তু আমাকেও অনেক দ্বার থেকে রিক্ত হস্তে ফিরে আসতে হয়, ব্রাহ্মণকেও ফিরতে হল। শ্রীহরির চারি হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আছে। শ্রীহরির এই অবতারটি, যে হস্তে গদা, কেবল সেই হস্তটা ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে বিদায় করে দিলেন। সে বোটের বার হতে না হতে দ্বারী মজুমদার বলে এই বিরাহিমপুরের একটি সুবিখ্যাত বক্তা এসে উপস্থিত। আমি বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করে চৌকিতে হেলান দিয়ে কঠিন প্রস্তরমূর্ত্তির মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। সে প্রথমে আরম্ভ করে দিলে—মহারাজ, পুরাকালে যুধিষ্ঠিরের হিষ্টিরিয়া (হিষ্টি) পাঠ করে অনেকেই অবিশ্বাস করে থাকেন, তাঁরা বলেন, এতদূর কি কখনো সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এতকাল পরে আপনাকে চাক্ষুষ দেখে যুধিষ্ঠিরের কীর্তিকলাপের প্রতি তাঁদের সন্দেহভঞ্জন হয়েছে।— এই রকম ভাবে চল্ল। আমি যখন তাকে বল্লুম, এইবার তুমি কাছারিতে বিশ্রাম করগে, সে বল্লে, আজ আর আমার বিশ্রাম কিসের! আজ কতদিন পরে হুজুরের দর্শন পেয়েছি, আজ প্রায় সাত আট ন মাস অপেক্ষা করে অবশেষে শ্রীচরণ দেখতে পেলুম—দেখতে যে পাব সে কি আর আশা ছিল। বল্‌তে বল্‌তে তার কণ্ঠস্বর কম্পিত এবং রুদ্ধ হয়ে এল, বার বার শুষ্ক চক্ষু চাদরে মুছতে লাগল— ক্রমে, তার প্রতি তার পূর্ব্ব প্রভু জ্যোতিদাদার যে অসীম স্নেহ এবং বিশ্বাস ছিল তাই মনে পড়ে তার চিত্ত উত্তরোত্তর অধিকতর উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগল। ... ... সে কি কি কাজ করেছিল, কি কি ঘটনা ঘটেছিল, তার মনিবরা কি কি কথা বলেছিল এবং সে তার কি কি উত্তর দিয়েছিল তার কোনটাই বাদ না দিয়ে সমস্তই আনুপূর্ব্বিক বলে যেতে লাগল। সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হল, পাখীরা নীড়ে, গাভীরা গোষ্ঠে, চাষারা কুটীরে ফিরে গেল, দ্বারী মজুমদার বোট থেকে নড়ে না। এমন সময় কুষ্টিয়া থেকে আর একটি দর্শনপ্রার্থী যখন এল তখন সে "কাল প্রাতঃকালে" বাকি কথাগুলো বলতে আসবে বলে আমাকে সান্ত্বনা করে চলে গেল। এখনো সে আসেনি কিন্তু তারই সমান বক্তা একজন এসে আমার পার্শ্ববর্ত্তী বেঞ্চিতে ব'সে বক্তৃতার অবসর প্রতীক্ষায় আছেন।

কলিকাতা পথে। ১৩ই জুলাই (?) [১৮৯৪]

ইছামতীর ভিতরে ঢোকা গেল। কি সুন্দর উজ্জ্বল দিনটি হয়েছিল! ছোট নদীটির দুই ধারের দৃশ্য দেখে চোখ ফেরানো যায় না। আকাশে মেঘ প্রায় নেই— নদীর ধারের বনগুলি এবং গাঢ় সবুজ শস্যক্ষেত্র রৌদ্রে প্রফুল্ল হয়ে রয়েছে—বাতাসটি বেশ মিষ্টি লাগ্‌চে— বিছানার উপরে জান্‌লার কাছে গোটা পাঁচ ছয় বালিস উঁচু করে রাজার মত আরামে বসে রইলুম—চোখের উপরে কে যেন স্বপ্ন মাখিয়ে দিয়েছে—জেলেরা মাছ ধরচে, মেয়েরা কাপড় কাচচে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়ে তোলপাড় করচে, গরুগুলো চরচে, জলমগ্ন ধানের ক্ষেতে বক বসে রয়েছে, সমস্ত ছবির মত দেখাচ্চে। কেন যে এমন অত্যন্ত

ভাল লাগছিল তা বর্ণনা করে বোঝাবার যো নেই। সুন্দর জিনিষকে যে কারণে স্বপ্নের মত বলি ঠিক সেই কারণে তাকে ছবির মত বলি। নইলে কথাটা আসলে একটু অদ্ভুত— জিনিষের মত ছবি বল্লে অন্যায় হয় না কিন্তু ছবির মত জিনিষ বল্লে এক হিসাবে কথাটা উল্টো হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থ টা হচ্ছে এই যে, ছবিতে জিনিষের কেবল একটি মাত্র অংশ আমাদের চোখের সামনে ধরে দেওয়াতে শুদ্ধমাত্র দৃশ্যসৌন্দর্য্যের উপভোগটাই আমাদের মনে তীব্র হয়ে ওঠে। আমার বোধ হয় আর্ট মাত্রেরই কাজ হচ্চে, বিশ্বের যেটুকু আমাদের মনোহরণ করে সেইটুকুকে সযত্নে তার অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের কাছে অবিমিশ্র উজ্জ্বল করে ধরা। সত্যের উপরিভাগ থেকে সেইটুকু ছেঁকে নেওয়া সাজিয়ে তোলা আর্টিষ্টের কাজ। সেই জন্যে আমার মনে হয় বিশুদ্ধ আর্ট হচ্চে ছবি এবং গান— সাহিত্য নয়। মানুষের ভাষা, মানুষের তুলি এবং কণ্ঠের চেয়ে ঢের বেশি মুখর বলে সাহিত্যে আমরা অনেক জিনিষ মিশিয়ে ফেলি— সৌন্দর্য্য প্রকাশের উপলক্ষে খবর দিই উপদেশ দিই নানা কথা বলে নিই।— যাই হোক্, আমরা, ছবির মত গানের মত স্বপ্নের মত, কথা বার বার ব্যবহার করে থাকি; কিন্তু ওটা কথার কথা নয়। আমরা সত্যের চেয়ে সৌন্দর্য্য, জ্ঞানের চেয়ে আনন্দ বেশি স্বর্গীয় বলে বোধ করি।— কিন্তু এদিকে আমার বোট এগোচ্ছে না। যে বাতাস যমুনায় আমাদের বাধা দিচ্ছিল সেই বাতাস ইছামতীতে আমাদের অনুকূল হতে পারত, সেই ভরসায় এপথে প্রবেশ করেছিলুম। কিন্তু বাতাসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা সুবুদ্ধির কাজ নয়। পাগলামি উনপঞ্চাশ শ্রেণীতে বিভক্ত করে লোকে তাকে উনপঞ্চাশ বায়ু নাম দিয়েছে। বাস্তবিক পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ুতে যে পরিমাণে পাগলামি আছে এমন আর কোনটাতে নেই।

কলকাতা। ১৫ই জুলাই। [১৮৯৪]

ষ্টীমার যখন ইছামতী থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পদ্মার মধ্যে এসে পড়ল তখন যে কি সুন্দর শোভা দেখেছিলুম সে আর কি বলব। কোথাও কোন কূল কিনারা দেখা যাচ্চে না— ঢেউ নেই, সমস্ত প্রশান্ত গম্ভীর পরিপূর্ণ। ইচ্ছা করলে যে এখনই প্রলয় করে দিতে পারে সে যখন সুন্দর প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে, সে যখন তার প্রকাণ্ড প্রবল ক্ষমতাকে সৌম্য মাধুর্য্যে প্রচ্ছন্ন করে রেখে দেয় তখন তার সৌন্দর্য্য এবং মহিমা একত্র মিশে একটি চমৎকার উদার সম্পূর্ণতা ধারণ করে। ক্রমে যখন গোধূলি ঘনীভূত হয়ে চন্দ্র উঠ্‌ল, তখন আমার মুগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত তারগুলো যেন বেজে উঠতে লাগল।

কলকাতা। ১৬ই জুলাই। [১৮৯৪]

সদ্যনিদ্রোত্থিত তেতালার ঘরে গিয়ে দেখি, আমার কনিষ্ঠ শাবকটি[১] শয়নগৃহের মেজের মাদুরের উপরে পড়ে পড়ে কলরব করবার চেষ্টায় আছে। সেটা প্রায় ঠিক পূর্ব্ববৎই আছে, গাল দুটো সেইরকম ফুলো ফুলো, চোখ দুটো সেইরকম অবুঝভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করচে—ঘাড়ের উপর মাথাটা সেইরকম সর্ব্বদাই টল্‌টল্ ঢল্‌ঢল্ করচে। সবসুদ্ধ ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি নলিনীদলগত শিশিরবিন্দুর মত বৃহৎ পৃথিবীটার উপর টলমল করচে। তাকে কোলে তুলে নেওয়া গেল। প্রথমটা খানিকক্ষণ যেন পূর্ব্বপরিচয়ের স্মৃতি মনে আনবার চেষ্টা করছিল— অল্প একটুখানি থম্‌থমে ভাবে আমাকে কপোলনিমগ্ন দুই চক্ষুর দ্বারা পর্য্যালোচনা করতে

১। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমীরা দেবী

লাগ্‌ল। মাঝে মাঝে, কোন বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও একটু একটু করে স্মিতহাস্য চলছিল। ক্রমে অনতিকাল মধ্যেই থরনখরসুদ্ধ মোটা মোটা নরম নরম করতল দিয়ে নাক মুখ চোখ চুল গোঁপ দাড়ি যা সম্মুখে পড়তে লাগ্‌ল তাতেই হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে দিলে, কেবল তাই নয়, হুঙ্কার শব্দপূর্ব্বক আগ্রহসহকারে নাক চোখ ধরে মুখের মধ্যে পূরে দিতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে টল্‌টলে মাথা এবং মোটা মোটা হাত পা দিয়ে খানিকক্ষণ সানন্দে সন্তরণও হল। পরিবর্ত্তনের মধ্যে মনে হল যেন, প বর্গের দুটো একটা অক্ষর বহুকষ্টে আজকাল উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং চক্ষুতারকায় একটুখানি বুদ্ধিজ্যোতি পরিস্ফুট হয়েছে। নিজের নামের শব্দটা চিনেছে এবং আত্মীয়স্বজনদেরও কতক কতক পরিচয় লাভ করতে পেরেছে। তার গায়ের গন্ধটিও সেইরকম কাঁচা কাঁচা আছে। কলকাতায় এসে অবধি আমার অধিকাংশ সময় তারই সঙ্গে হাস্যালাপে কেটে যাচ্চে।

কলকাতা। ১৯শে জুলাই। [১৮৯৪]

মীরার জন্যে আমার কোন কাজ হবার যো নেই। ... ... সেই ছোট ব্যক্তিটি বিছানার উপরে চিৎ হয়ে পড়ে আপনার পা দুখানিকে দুর্লভ সামগ্রীর মত একবার আকাশে তুলে দিয়ে তার পরে নিজের মুখের মধ্যে পূরে দিয়ে যখন উচ্চকলস্বরে আঃ বাঃ বাঃ বাঃ শব্দে চীৎকার আরম্ভ করে দেন তখন আমার পক্ষে লেখাপড়া কিম্বা কোন কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার পাশে এক জায়গায় উপুড় হয়ে পড়ি, সে বিবিধ চঞ্চল ভঙ্গীতে তার বাহু দুটি বিক্ষেপ করে আমার গোঁফ দাড়ি চুল নাক কান চষমা, ঘড়ির চেন নিয়ে মহা উপদ্রব করতে থাকে, এবং ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে গর্জ্জন করতে আরম্ভ করে। এমনি ভাবে আমার সময় চলে যায়। এক একদিন রাত্রে শুন্‌তে পাই, সে বিছানায় জেগে উঠে কলরব করতে আরম্ভ করেছে—কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেই একটুখানি হাসি হয়, ভাবটা এই যে, একজন খেলবার সঙ্গী পাওয়া গেল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে আর কিছুতেই ঘুম নেই, উপুড় হয়ে পড়ে বিছানায় সাঁৎরে বেড়াতে থাকে।

কলকাতা। ২১শে জুলাই। [১৮৯৪]

আমার ভারি ইচ্ছে, আমার ঘরের কাছে একজন কেউ গান বাজনা করবার লোক থাকে। বে[২] যদি দিশী এবং ইংরাজি সঙ্গীতে বেশ ওস্তাদ হয়ে ওঠে তাহলে আমার অনেকটা সাধ মিট্‌বে। কিন্তু ওস্তাদও হয়ে উঠবে আর আমার ঘর থেকেও অমনি চলে যাবে। সেদিন অ[৩] যখন গান করছিল আমি ভাবছিলুম মানুষের সুখের উপকরণগুলি, যে, খুব দুর্লভ তা নয়—পৃথিবীতে মিষ্টিগলার গান নিতান্ত অসম্ভব আইডিয়ালের মধ্যে নয় অথচ ওতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত গভীর—কিন্তু, জিনিষটি যতই সুলভ হোক্ ওর জন্যে যথোপযুক্ত অবকাশ করে নেওয়া ভারি শক্ত। যে ইচ্ছাপূর্ব্বক গান গাবে এবং যে ইচ্ছাপূর্ব্বক গান শুনবে পৃথিবীতে কেবল এই দুটি মাত্র লোক নেই, চতুর্দ্দিকে অধিকাংশ লোক আছে যারা গান গাবেও না গান শুনবেও না। তাই সবসুদ্ধ মিশিয়ে ও আর হয়েই ওঠে না, দিনের পর দিন চলে যায়, অন্তঃকরণটা

২। জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা বা বেলা দেবী

৩। ভ্রাতুষ্পুত্রী অভিজ্ঞা দেবী। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা।

তৃষিত হয়ে উঠতে থাকে, সংসারটা যেন জীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার হয়ে আসে। আমি অনেক সময় ভাবি যে, আমাদের বড় বড় ইচ্ছাগুলো সফল হয় না বলে আমরা দুঃখ পাই সত্য, কিন্তু আমাদের ছোট ছোট ক্ষুধাতৃষ্ণাগুলি দিনে দিনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অতৃপ্ত থেকে যায় বলে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের প্রকৃতি ক্রমশঃ শীর্ণ শুষ্ক হয়ে আসতে থাকে—আমরা সেটাকে সব সময় গণ্য করিনে কিন্তু পরিমাণে সে জিনিষটি সামান্য নয়। অন্তঃকরণ যখন তার নানা খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে উপবাসী হয়ে থাকে তখন দুঃখভার বহন করা তার পক্ষে বড় বেশি দুঃসহ হয়ে পড়ে। আমি জানি, আমার প্রকৃতি সঙ্গীত চায় শিল্প চায় সৌন্দর্য্য চায় ভাবুক মানুষের সঙ্গ চায় সাহিত্যের আলোচনা চায়— কিন্তু এদেশে আমার বৃথা আকাঙ্ক্ষা বৃথা চেষ্টা— এখানকার লোকেরা বিশ্বাসও করতে পারে না, যে, এ জিনিষগুলো কারো পক্ষে অত্যাবশ্যক— আমিও ক্রমে ভুলে যেতে আরম্ভ করি যে, আমার প্রকৃতির প্রায় কোন শিকড়ই কোন খাদ্য পাচ্চে না। শেষকালে হঠাৎ যেদিন কোন একটা খাদ্য কিছু পরিমাণে জোটে তখন হৃদয়ের তীব্র আগ্রহ দেখে মনে পড়ে যে এতদিন আমি উপবাস করে ছিলুম ; এ জিনিষটা আমার প্রকৃতির জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যক।

কলকাতা। ১লা অগষ্ট। [১৮৯৪]

* * বলে একজন কে দেখা করতে এসেছিল আমি দেখা করলুম না। বাঙ্গালীর ছেলেকে একবার ঘরের মধ্যে ঢোকালে বের করে দেওয়া দায় হয়ে ওঠে। কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ে মীরাটিও বড় কম নন—তিনিও একবার কলরব সহকারে আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে আর শীঘ্র বের হন না। আমাকে থাব্ড়ে থুব্ড়ে আমার বুকের উপর নৃত্য করে' আমার দাড়ি গোঁফ, চুলের সিঁথে, লেখবার খাতা, গল্পের প্লট, ভাবের অনুবৃত্তি সমস্ত দুই ক্ষুদ্র হাতে ঘেঁটে নাস্তানাবুদ করে দিয়ে তবে তিনি আমার গৃহ হতে নিঃসৃত হন। আবার মুস্কিল এই যে, সে না এলে আমাকে তার কাছে যেতে হয়—পাশের ঘর থেকে সে চেঁচাতে আরম্ভ করে, নিকটবর্ত্তী যার কানে সেই চীৎকারধ্বনি প্রবেশ করতে থাকে সেই উতলা হয়ে কাজকর্ম্ম সমস্ত ফেলে শব্দ অভিমুখে ছুটতে থাকে—গিয়ে দেখে একটি মোটাসোটা গোলাকার উপুড়মূর্তি প্রকাণ্ড বিছানাটার মাঝখানে পড়ে বালিশ চাপড়াচ্চে এবং অকারণ আনন্দভরে কল্লোল করচে—অভ্যাগতকে দেখাবামাত্রই তৎক্ষণাৎ মুখখানি হাস্যবিকশিত হয়ে ওঠে— কখনো বা যথাসাধ্য হাঁ করে' কি একটা অব্যক্ত ভাবকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করে' নিরস্ত হয়। অবশেষে তার ক্ষুদ্র দেহটির পাশে আপনার বিপুল দেহটি প্রসারিত করে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে নিতান্তই অর্থহীন অসম্বদ্ধ মিষ্টালাপ করে তবে আপনার কর্ত্তব্যকার্য্যে মনোযোগ দিতে পারি। বড়লোকের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে ক্রমে আলাপের বিষয় ফুরিয়ে যায় সুতরাং শীঘ্র ছুটি পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু যে স্থলে কোন বিষয়মাত্র নেই অথচ আলাপ আছে, সেখানে কোথায় থামতে হবে কিছুই ভেবে ঠিক করা যায় না—মীরাতে আমাতে সদাসর্ব্বদা যে সকল টেট্-আ-টেট্ হয়ে থাকে তার কোন জায়গায় ভাবের বিরাম পাওয়া যায় না—সুতরাং থামতে গেলে নিতান্তই গায়ের জোরে থামতে হয়।

কলকাতা। ২রা অগষ্ট। [১৮৯৪]

প্রি[৪]—বাবুর সঙ্গে দেখা করে এলে আমার একটা মহৎ উপকার এই হয়, যে, সাহিত্যটাকে পৃথিবীর মানবইতিহাসের একটা মস্ত জিনিষ বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই এবং তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির

৪। প্রিয়নাথ সেন

ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেকখানি যোগ আছে তা অনুভব করতে পারি। তখন আপনার জীবনটাকে রক্ষা করবার এবং আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবার যোগ্য বলে মনে হয়—তখন আমি কল্পনায় আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপূর্ব্ব ছবি দেখতে পাই—দেখি যেন আমার দৈনিক জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত শোকদুঃখের মধ্যস্থলে একটি অত্যন্ত নির্জ্জন নিস্তব্ধ জায়গা আছে সেইখানে আমি নিমগ্নভাবে বসে সমস্ত বিস্মৃত হয়ে আপনার সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত আছি—সুখে আছি। সমস্ত বড় চিন্তার মধ্যেই একটি উদার বৈরাগ্য আছে। যখন অ্যাষ্ট্রনমি পড়ে' নক্ষত্রজগতের সৃষ্টির রহস্যশালার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান যায় তখন জীবনের ছোট ছোট ভারগুলো কতই লঘু হয়ে যায়! তেমনি আপনাকে যদি একটা বৃহৎ ত্যাগস্বীকার কিম্বা পৃথিবীর একটা বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে আবদ্ধ করে দেওয়া যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ আপনার অস্তিত্বভার অনায়াসে বহনযোগ্য বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ভাবের সমীরণ চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত সমীরিত নয়, জীবনের সঙ্গে ভাবের সংস্রব নিতান্তই অল্প, সাহিত্য যে মানবলোকে একটা প্রধান শক্তি তা আমাদের দেশের লোকের সংসর্গে কিছুতেই অনুভব করা যায় না, নিজের মনের আদর্শ অন্য লোকের মধ্যে উপলব্ধি করবার একটা ক্ষুধা চিরদিন থেকে যায়।

শিলাইদহ। ৪ঠা অগষ্ট। [১৮৯৪]

দৃশ্য পরিবর্ত্তন হয়েছে। কোথায় সেই কলকাতা, সেই তেতালার ছাত, সেই বিশৃঙ্খল খাট পালং চৌকির নিবিড়তার মধ্যে নিয়মিত জীবনযাত্রা, সেই পাশের ঘরে পিয়ানোর স্কেল প্র্যাকটিস—সেই মীরা, যিনি অতি ক্ষুদ্র হয়েও আমার পক্ষে জগতে অত্যন্ত বৃহৎ স্থান অধিকার করে আছেন! হঠাৎ স্বপ্নের মত চারদিকের অভ্রভেদী অট্টালিকাগুলি বায়ুতরঙ্গিত শ্যামল ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, চিৎপুরের বড় রাস্তাটি প্রশস্ত প্রসারিত তরল কলগীতিময় তরঙ্গিণীরূপে প্রবাহিত, ধূলিপূর্ণ ঘন বাতাস নির্ম্মল স্বচ্ছ হয়ে অবাধ মুক্ত আকাশময় প্রাণহিল্লোল সঞ্চার করে দিচ্চে—একটি উন্মুক্তবাতায়ন তরণীর মধ্যে একটি ক্যাম্প-টেবিলের শীর্ষদেশে বেত্রাসনে প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ প্রভাতে পত্রলিখনে নিযুক্ত এবং তাঁহার সম্মুখভাগে অপর বেত্রাসনে তদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত— সাধনার জন্যে গল্পরচনায় একাগ্রমনে প্রবৃত্ত। আজকের দিনের দৃশ্য ত এমনি ভাবে আরম্ভ হয়েছে। এখনি অনতিবিলম্বে নায়েব এবং পেস্কারের খাতা এবং বাণ্ডিলবদ্ধ কাগজপত্র হস্তে প্রবেশ হবে, তার পরে যে ভাবে ডায়ালগ্ আরম্ভ হবে কোন মানব নাট্যকারের হাতে ভার থাকলে এমন দৃশ্যে এমন কালে সেরকম ডায়ালগ্ রচিত হত না, এবং হলেও সমালোচকবৃন্দের দ্বারা নিন্দিত হত। কিন্তু যে অদৃষ্ট কবি আমাদের জীবননাট্যকে প্রতিদিন নব নব গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করে পঞ্চম অঙ্কের পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্চেন, তিনি দেশকালপাত্রের সুসঙ্গতি, রচনাকৌশল, ঘটনাসংস্থানের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র করেন না, তিনি পদ্মাতরঙ্গচঞ্চল সাধের তরণীর মধ্যে আম্‌লার সমাবেশ করেন, নায়কনায়িকার আলাপের মধ্যে পদে পদে ব্যাকরণ এবং অলঙ্কারদোষ ঘটিয়ে থাকেন এবং যদি বা শুভাদৃষ্টক্রমে নায়কের ভাগ্যে অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত কবিত্বপূর্ণ প্রেমপত্রিকা জোটে, তার লেখক পুরুষ হয়ে দাঁড়ায়।—

আজ সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর আলো এবং সুন্দর বাতাস। ইচ্ছা করচে বেশ মধুরভাবে মগ্ন হয়ে একটা কিছু লিখি, বা গুন্ গুন্ করে গান তৈরি করি, কিম্বা বেশ একটি সরল সুন্দর অতিশয় বৈচিত্র্যবিহীন এবং বিশ্লেষণশূন্য গল্পের বই পড়ি—আরামে চৌকিতে হেলান দিয়ে জগৎসংসার বিস্মৃত হয়ে যাই, পড়তে পড়তে

চোখের কোনে তীরের শ্যামল রেখা একটু একটু পড়বে এবং কানে জলের তরল কলশব্দ অবিরল প্রবেশ করতে থাকবে। কিন্তু এই সমস্ত অপেক্ষাকৃত সুলভ সাধও আপাতত পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখ্‌চিনে। কারণ চিঠি লিখ্‌তে লিখ্‌তে ইতিমধ্যেই নায়েব ও মৌলবী এসে প্রবেশ করেচেন। নায়েব আমাদের জমিদারী-প্রচলিত হিসাবপত্রের পদ্ধতি শ্রী— বাবুকে বোঝাতে আরম্ভ করেছে—তাই নিয়ে যে জামিদারিক ভাষার আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার কণামাত্র যদি এই পত্রপ্রান্তে নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করে দিই তাহলে বোধ হয় ইহজন্মে তুই আর আমাকে মার্জ্জনা করবিনে— সেই জন্যে বিরত হলুম।

শিলাইদহ, ১২ই অগষ্ট। [১৮৯৪]

গেটের জীবনীটা তোর ভাল লাগ্‌চে? একটা তুই লক্ষ্য করে দেখে থাক্‌বি, গেটে যদিও এক হিসাবে খুব নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক ছিল, তবু সে মানুষের সংস্রব পেত, মানুষের মধ্যে মগ্ন ছিল। সে যে রাজসভায় থাক্‌ত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল— জর্ম্মণীতে তখন খুব একটা ভাবের মন্থন আরম্ভ হয়েছিল— হের্ডের, শ্লেগেল্, হুম্বোল্ট্, শিলার, কাণ্ট্ প্রভৃতি বড় বড় চিন্তাশীল এবং ভাবুকগণ দেশের চারিদিকে জেগে উঠ্‌ছিল— তখনকার মানুষের সংসর্গ এবং দেশব্যাপী ভাবের আন্দোলন খুব প্রাণপরিপূর্ণ ছিল। আমরা হতভাগ্য বাঙ্গালী লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একান্ত মনে অনুভব করি— আমরা আমাদের কল্পনাকে সর্ব্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারিনে— নিজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয়না বলে আমাদের রচনাকার্য্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়। আমাদের দেশের লোক এক যে ইংরাজি সাহিত্য পড়ছে কিন্তু তাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে ভাবের প্রভাব প্রবেশ করতে পারেনি—তাদের ভাবের ক্ষুধাই জন্মায়নি—তাদের জড়-শরীরের ভিতরে একটা মানস-শরীর এখনো গঠিত হয়ে ওঠেনি, সেইজন্যে তাদের মানসিক আবশ্যক বলে' একটা আবশ্যকবোধ নিতান্তই কম— অথচ মুখের কথায় সেটা বোঝবার যো নেই— কেন না বোলচাল সমস্তই ইংরাজি থেকে শিখে নিয়েছে। এরা খুব অল্প অনুভব করে, অল্প চিন্তা করে এবং অল্পই কাজ করে—সেইজন্যে এদের সংসর্গে মনের কোন সুখ নেই। গেটের পক্ষেও যদি শিলারের বন্ধুত্ব আবশ্যক ছিল তাহলে আমাদের মত লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ যে কত অত্যাবশ্যক তা আর কি করে বোঝাব। আমাদের সমস্ত জীবনের সফলতাটা যে জায়গায় সেইখানে একটা প্রেমের স্পর্শ, একটা মনুষ্যসঙ্গের উত্তাপ সর্ব্বদা পাওয়া আবশ্যক—নইলে তার ফুলফলে যথেষ্ট বর্ণ গন্ধ এবং রস সঞ্চারিত হয় না।

কলকাতা। ২৯শে অগষ্ট। [১৮৯৪]

আজ সকালে বসে বসে আমার একটা নতুন গানে সুর দিচ্ছিলুম— সুরটা যে খুব নতুন তা নয়, একরকম কীর্ত্তনের ধরণের ভৈরবী—কিন্তু তবু ছন্দে ছন্দে গাইতে গাইতে শরীরের সমস্ত রক্তের মধ্যে একটা সঙ্গীতের মাদকতা প্রবেশ করতে থাকে— সমস্ত শরীর এবং সমস্ত মন আগাগোড়া একটা বাজনার যন্ত্রের মত কম্পিত এবং গুঞ্জরিত হয়ে উঠ্‌তে থাকে এবং সেই সুরের স্পন্দন আমার শরীর মন থেকে সমস্ত বাইরের জগতে সঞ্চারিত এবং ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার সঙ্গে একটা স্বরসম্মিলন স্থাপিত হয়ে যায়। বীণার তার যখন বাজতে থাকে তখন সেটা যেমন আব্‌ছায়া দেখ্‌তে হয়— গানের সুরে সমস্ত জগৎটা সেইরকম বাষ্পময়

এবং ঝঙ্কারপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু এইরকম করে গাইতে গাইতে কাজকর্মের সময় অতিবাহিত হয়ে গেল— প্রুফগুলো পড়ে রইল, দুপুর বেজে গেল— রৌদ্রের আলোক এবং তাপ ক্রমেই তীব্র হয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগ্‌ল— আজ আর কিছু হল না। ওদিকে রেণু[৫] এবং খোকা[৬] একটা শব্দওয়ালা খেলনা কিনে পশ্চিমের বারান্দায় চড়বড় শব্দ করে খেলা করচে শুন্‌তে পাচ্চি, কাক চড়ুই প্রভৃতি অনেকগুলি পাখীর শব্দ মিশ্রিত হয়ে আকাশে একটা অনির্দ্দিষ্ট শব্দ হচ্চে, মদনবাবুর গলি দিয়ে ফেরিওয়ালা করুণস্বরে ডেকে যাচ্চে— পিঠের দিক থেকে অল্প অল্প দক্ষিণে বাতাস এসে লাগ্‌চে— কলিকাতার বিচিত্র রকমের স্বর এবং শব্দ মধ্যাহ্নের রৌদ্রে একটা গভীর ঔদাস্য এবং শ্রান্তি প্রকাশ করচে। এখনো আমার ভাত কেন এলনা জানিনে, বামুনটাও সকালে ভাতের কাঠি ফেলে স্বর বাঁধতে বসেছিল কিনা কে জানে, কিন্তু কারো কোন সাড়া শব্দ শুনতে পাচ্ছিনে— মনে হচ্চে যেন চাকর মনিব জগৎসংসার সমস্তই আজ ছুটি নিয়েছে।

সাজাদপুর। ৭ই সেপ্টেম্বর। [১৮৯৪]

আমি চিঠি পাই সন্ধের সময়, আর আমি চিঠি লিখি দুপুর বেলায়। রোজ একই কথা লিখ্‌তে ইচ্ছা করে— এখানকার এই দুপুর বেলাকার কথা—কেন না আমি এর মোহ থেকে কিছুতেই আপনাকে ছাড়াতে পারিনে— এই আলো এই বাতাস এই স্তব্ধতা আমার রোমকূপের মধ্যে প্রবেশ করে আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে— এ আমার প্রতিদিনকার নতুন নেশা, এর ব্যাকুলতা আমি নিঃশেষ করে বলে উঠ্‌তে পারিনে।

প্রতিদিনের শরৎকালের দুপুর বেলা আমার কাছে রোজ একই ভাবে উদয় হয়— পুরাতন প্রতিদিনই নতুন করে আসে, এবং আমার ঠিক সেই কালকের মনোভাব আজ আবার তেমনি করে জেগে ওঠে। প্রকৃতি প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না— আমাদেরই সঙ্কোচ বোধ হয়— মনে হয় আমাদের ভাষার মধ্যে সেই অনন্ত উদারতা নেই যাতে রোজ এক ভাবকে নতুন করে দেখাতে পারে। অথচ সকল কবিই চিরকাল উল্টে পাল্টে প্রায় একই কথা বলে আস্‌চে এবং সেই এক কথাই সহস্র আকার ধারণ করচে। কোন কোন ক্ষুদ্র কবি কিছু জবরদস্তি করে নূতনত্ব আনবার চেষ্টা করে— তাতে এই প্রমাণ হয় যে, পুরাতনের মধ্যে যে চিরনূতনত্ব আছে তার ক্ষুদ্র কল্পনায় সেটা আর অনুভব করতে পারে না, সেইজন্যে সৃষ্টিছাড়া নূতনত্বের জন্যে ঘুরে বেড়ায়। অনেক বোধশক্তিবিহীন পাঠক আছে যারা নূতনকে কেবলমাত্র তার নূতনত্বের জন্যই পছন্দ করে। কিন্তু আসল ভাবুকরা এই সমস্ত নূতনত্বের ফাঁকিকে তুচ্ছ প্রবঞ্চনা বলে ঘৃণা করে। তারা এ নিশ্চয় জানে যে, যা আমরা যথার্থ অনুভব করি তা কোন কালেই পুরোনো হতে পারে না। কিন্তু যখনি একটা জিনিষ আমাদের অনুভব থেকে বিচ্যুত হয়ে কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানে এসে দাঁড়ায় তখনি তার জরা উপস্থিত হয়। তখন তাকে মৃত্যুর হস্ত থেকে রক্ষা করা কারো সাধ্য নয়। সেইজন্যে যারা জ্ঞানের দ্বারা একটা জিনিষকে সুন্দর বলে জানে অথচ সম্পূর্ণ অনুভব করে না, তারা সে সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করে, খুব একটা প্রবল কিম্বা খুব একটা নতুন কথা বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু যথার্থ প্রবল কথা এবং যথার্থ নতুন কথা তাদের মুখ দিয়ে বেরোয় না। আমি ছোট কবি কি বড় কবি সেবিষয়ে আলোচনা করবার কোন দরকার দেখিনে— কিন্তু এটা আমি বারম্বার দেখেছি, পৃথিবীর কোন

৫। মধ্যমা কন্যা রেণুকা

৬। জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ

জিনিষকেই যেন আমি শেষ করতে পারিনি— যা আমার একবার মনে লেগেছে তা আমার চিরকালই মনে লাগে, এবং প্রত্যেক দিনই তার নূতনত্বে আমাকে নিবিড় বিস্ময়ে পূর্ণ করতে থাকে। আমার পুনঃ পুনঃ স্পর্শ লেগে কোন জিনিষ জীর্ণ হয় না ; বরঞ্চ প্রতিবারেই তার উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে অথচ সে উজ্জ্বলতার মধ্যে অমূলক বা কাল্পনিক কিছু নেই— মিথ্যা কাল্পনিকতাকে আমি ভারি ঘৃণা করি। আমি সমস্ত জিনিষের বাস্তবিকতাটুকু স্পষ্ট দেখ্তে পাই, অথচ তারই ভিতরে, তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যেও আমি একটা অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় রহস্যের আভাস পাই। আমার বয়স এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সেই রহস্যের বিস্ময় এবং আনন্দ যেন বাড়চে বই কমচে না— তার থেকেই আমি প্রতিদিন বুঝ্তে পারচি, যারা আমাকে আনন্দ দিচ্চে তারা কোন অংশে ফাঁকি নয়, তারা কিছুমাত্র সামান্য নয়, তাদের মধ্যে অনন্ত সত্য অনন্ত আনন্দ আছে— একথা পরিষ্কার করে বল্লে অধিকাংশ লোক অবাক হয়, কিন্তু যারা নিজের জীবন দিয়ে এসব কথা অনুভব করেনি তাদের শুধু মুখের কথায় আমি কি করে অনুভব করাব ? তারা ছোট ছোট বাঁধি গতের বেড়া বেঁধে সেই বেড়ার মধ্যেকার জমিটুকুকেই জগৎসংসার মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, অনন্তের আলোক তাদের সেই ক্ষুদ্র দম্ভের উপর কোনদিন আঘাত করেনি— তারা সুখে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি আত্মা বলে কিছু থাকে তবে নিশ্চয়ই সে সুখ প্রার্থনীয় নয়— এবং যখন সেই সাংসারিক বাঁধি সুখকে ক্ষুদ্র বলে মনে হয় এবং দুঃখের মধ্যে একটা আন্তরিক বন্ধনমুক্তি দেখা যায়, তখনি বুঝতে পারি— আত্মা বলে একটা জিনিষ আছে— সে জিনিষ এক জিনিষই স্বতন্ত্র।

সাজাদপুর। ৭ই সেপ্টেম্বর। [১৮৯৪]

যখন এইরকম লিখ্তে লিখ্তে লেখা বেড়ে যায়, এবং প্রতিদিন সকালে বিছানা থেকে উঠেই মনে হয় কাল সেই লেখাটা কোথায় ছেড়ে দিয়েছিলুম এবং আজ কোথা থেকে আরম্ভ করতে হবে তখন ভারি ভাল লাগে— দিনগুলিকে বেশ লেখায় পরিপূর্ণ করে ভরা কলসীর মত সন্ধেবেলায় ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলি— এবং সেই সব লেখার ধ্বনি প্রতিধ্বনির রেস্ সমস্ত শরীর মনের মধ্যে বাজ্তে থাকে। আজকাল এই ছড়ার রাজ্যে ভ্রমণ করতে করতে আমি কতরকমের ছবি এবং কতরকমের সুখ দুঃখ ও হৃদয়বৃত্তির ভিতর দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্চি তার আর ঠিকানা নেই। এমন কি লিখ্তে লিখ্তে এক এক সময় চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে আবার এক এক সময় মুখে হাসিও দেখা দেয়। আজ বেড়াতে বেড়াতে ভাব্ছিলুম এতে আমার এত আনন্দ কিসের ? আসল কথা হচ্চে, "অনুভব করাতেই আমাদের হৃদয়ের ক্ষমতা প্রকাশ হয়—আমি যখন একটা প্রাচীন স্মৃতির জন্য হৃদয়ের মধ্যে ব্যথা পাই, তখন সেই ব্যথার মধ্যে আনন্দ এইটুকু যে, স্মৃতিটুকুকে আমি উপলব্ধি করতে পারচি, সেটা আমার কাছে আস্চে, প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষ অবধি, বর্ত্তমান থেকে অতীত পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ের বোধশক্তি প্রসারিত হয়ে যাচ্চে। বরঞ্চ সুখের চেয়ে দুঃখে সেই বোধশক্তি আমরা বেশি করে অনুভব করি—যে কল্পনা আমাদের ব্যথা দেয় সে আমাদের কাছে গভীরতর এবং স্পষ্টতররূপে প্রতীয়মান হয়"— এইজন্যে আর্টের এলাকায় দুঃখের ব্যাপ্তিই কিছু বেশি। দয়া, সৌন্দর্য্যবোধ, ভালবাসা, এ সমস্ত হৃদয়বৃত্তিতে আমরা নিজের দ্বারা অন্যকে লাভ করি এইজন্যে এদের ভিতরকার দুঃখকষ্টেও একটা আনন্দের অভাব নেই—কিন্তু বীভৎস কল্পনাজনিত ঘৃণা কিম্বা নিষ্ঠুর কল্পনাজনিত পীড়ায় আমাদের বিমুখ করে দেয়, আমাদের হৃদয়ের স্বাধীনগতিকে বাধা দিতে থাকে, এইজন্যে সে সকল বৃত্তিতে আমাদের কোন আনন্দ নেই। ওথেলোর মধ্যে যেটুকু করুণা আছে সেটুকু আমাদের

আকর্ষণ করে কিন্তু ওর শেষ অংশে যেটা বর্ব্বর নিষ্ঠুরতা সেটা আমাকে ওথেলো থেকে বিমুখ করে দেয়—মনে হয় যেন সেটা আর্টের সীমার বাইরে। কিন্তু বড় সঙ্গীতের হার্ম্মনীতে অনেক সময় সুরটাকে বিচিত্র এবং জাজ্জ্বল্যমান করবার জন্যে বেসুরো মিশিয়ে দেয় তেমনি বড় বড় কাব্যে খানিকটা পরিমাণে অকাব্যও মেশানো থাকে তাতে মোটের উপরে হয়ত কাব্যাংশটা বেশি স্ফূর্ত্তি পায়—সেইজন্যে ওরকম একটা অংশ ধরে কিছু বলা যায় না কিন্তু তবু আমি নিজের কথা বল্‌তে পারি উঁচুদরের সাহিত্যের মধ্যে ওথেলো এবং কেনিলওয়ার্থ্ আমার দ্বিতীয়বার পড়তে কিছুতেই মন ওঠে না।— এর মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে এই যে, বাস্তব জগতের সুখদুঃখ এবং কাব্যজগতের সুখদুঃখে আনন্দের অনেক প্রভেদ আছে তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে— বাস্তব জগতের সুখদুঃখ ভারি জটিল এবং মিশ্রিত। তার সঙ্গে আমাদের স্বার্থ আমাদের শরীরের চেষ্টা প্রভৃতি অনেক জিনিষ জড়িত। কাব্যজগতের সুখদুঃখ বিশুদ্ধরূপে মানসিক তার সঙ্গে আমাদের অন্য কোন দায় নেই স্বার্থ নেই জড় জগতের বাধা নেই, শারীরিক তৃপ্তি বা শ্রান্তি নেই। আমাদের হৃদয় স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণভাবে অমিশ্রভাবে অনুভব করবার অবসর পায়—কাব্যে আমাদের আনন্দ একেবারে অব্যবহিত, কোন প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে কোন ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে তার সাক্ষাৎকার লাভ করতে হয় না— আমরা দেহবদ্ধ অধীন মানুষ হয়েও কেবলমাত্র আমাদের হৃদয় দিয়ে একটা মানসিক জগতে অবাধে বিচরণ করতে পারি। এই জন্যে কাব্যের আনন্দে আমাদের আনন্দের সীমায় নিয়ে গিয়ে ঠোকর খাইয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে না, প্রত্যেক আনন্দের সঙ্গে একটা অশ্রান্তি অতৃপ্তি এবং অসীমতার আস্বাদ দেয়।...... নিজের মনের কথাও আমাদের নিজের কাছে ভারি দুরূহ—আমরা ঠিক কি ভাব্‌চি তা আমরা সম্পূর্ণ জানতে পারিনে— তার অর্দ্ধেক কথা কেবলমাত্র অন্তর্য্যামীই জানেন। আমি নিজের কথা প্রকাশ করে বল্‌তে গিয়ে নিজের কাছ থেকে নিজে শিক্ষা লাভ করি— আমার অধিকাংশ শিক্ষাই এমনি করে হয়েছে— আমার মুখ বন্ধ করে দিলেই আমার বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। সেইজন্যে এবং নিজের মনের ঝোঁকে তোর কাছে বসে বসে আমার প্রতিদিনের বকুনি বকে যাই।

বোয়ালিয়া। ২৪শে সেপ্টেম্বর। [১৮৯৪।

আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে, এবং ভেবে দেখতে দুঃখ বোধ হয়— সাধারণতঃ মানুষের সংসর্গ আমাকে বড় বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়, আমাকে ভিতরে ভিতরে পীড়ন করতে থাকে— সকলের মত হয়ে সকল মানুষের সঙ্গে বেশ সহজভাবে মিলেমিশে, সহজ আমোদপ্রমোদে আনন্দ লাভ করবার জন্যে আমার মনকে আমি প্রতিদিন দীর্ঘ উপদেশ দিয়ে থাকি— কিন্তু আমার চারিদিকেই এমন একটি গণ্ডী আছে আমি কিছুতেই সে লঙ্ঘন করতে পারি নে। লোকের মধ্যে আমি নতুন প্রাণী, কিছুতেই তাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না— আমার যারা বহুকালের বন্ধু তাদের কাছ থেকেও আমি বহু দূরে। যখন আমি স্বভাবতই দূরে, তখন সামাজিকতার খাতিরে জোর করে নিকটে থাকা মনের পক্ষে বড়ই শ্রান্তিজনক। অথচ মানুষের সঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাও যে আমার পক্ষে স্বাভাবিক, তাও নয়—থেকে থেকে সকলের মাঝখানে গিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে—কোথায় কি কাজকর্ম্ম হচ্চে, কি আন্দোলন চল্‌চে তাতে আমারও যোগ দিতে সাহায্য করতে ইচ্ছে হয়—মানুষের সঙ্গের যে জীবনোত্তাপ সেও যেন মনের প্রাণধারণের পক্ষে আবশ্যক। এই দুই বিরোধের সামঞ্জস্য হচ্চে, এমন নিতান্ত আত্মীয় লোকের সহবাস, যারা

সংঘর্ষের দ্বারা মনকে শ্রান্ত করে দেয় না, এমন কি, যারা আনন্দদান করে মনের সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিকে সহজে এবং উৎসাহের সহিত পরিচালিত করবার সহায়তা করে।

কলকাতা। ২৯শে সেপ্টেম্বর। [১৮৯৪]

আশ্চর্য্য এই যে, আজকাল আমার কবিতার প্রশংসা শুন্‌লে আমার মনে সেরকম একটা পুলক সঞ্চার হয় না। আসল, তার কারণ, যে-আমাকে লোকে প্রশংসা করচে, সেই আমিই যে কবিতা লিখে থাকে এ আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমি জানি, যে সমস্ত ভাল কবিতা আমি লিখেছি, সে আমি ইচ্ছে করলেই লিখতে পারিনে, — তার একটা লাইন হারিয়ে গেলেও বহু চেষ্টায় সে লাইন গড়তে পারি কিনা সন্দেহ। প্রশংসা শুন্‌লেই মনে হয় এ প্রশংসার যোগ্য আমি হতে পারব কিনা— ভাল লেখা যা কিছু লিখেছি হয়ত সেরকম আর কখনো লিখতে পারব না। কারণ, যে শক্তি আমাকে লেখায় সে আমার ক্ষমতার বাইরে। তোকে, একখানা কাগজ থেকে আমার একটা সমালোচনা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ লোকটা কিছু ওরিজিনাল চাল চেলেছে। এ আমার কবিতাগুলোকে গাল দিয়ে আমার গল্পগুলোকে আকাশে তুলে দিয়েছে। আবার এক সম্প্রদায়ের লোক আছে যারা ঠিক এর উল্টো দিক দিয়ে যায়। মধ্যখানে আমি বিস্ময়ান্বিত হয়ে সকৌতুকভাবে বসে থাকি। লেখকজীবন যতদিন থাকবে ততদিন কত রকম-বেরকম কথাই যে শুন্‌তে হবে তার আর ঠিক নেই। আবার, একদল লোক আছে, যারা বলে, আমার অন্য সব রচনা ক্ষনস্থায়ী কেবল একমাত্র গানই আমাকে লোকসমাজে অমর করে' রেখে দেবে। আমি ভাবি, যদি খ্যাতিলাভ মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষার শেষ লক্ষ্য হয় তবে আমার আর ভাবনা নেই, অন্ধকার অমরতাকে লক্ষ্য করে আমি অনেকগুলো ঢিল ছুঁড়তে বসেছি, যেটা হোক্ একটা লেগে যেতেও পারে। কিন্তু একবার দৈবাৎ লাগা এক, আর চিরকাল লেগে থাকা এক। চিরকাল কোন্ জিনিষটা থাক্‌বে না থাক্‌বে তা কেউ বলতে পারে না এবং আমিও সে সম্বন্ধে কোনরকম তর্কবিতর্ক করতে চাইনে— নিজের মনের ভিতর যখন একটা সফলতার আনন্দ অনুভব করা যায় সেইটেই লেখকের পক্ষে যথার্থ অমরতা। দুর্ভাগ্যক্রমে সে আনন্দ খুব ভাল লেখক থেকে খুব খারাপ লেখক পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুভব করে থাকে।

কলকাতা। ৯ই অক্টোবর। [১৮৯৪]

শাস্ত্রে আছে অনেকগুলি আবরণের দ্বারা আমরা নির্ম্মিত। যথা, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। আমি যখন কলকাতায় থাকি তখন অন্নময় প্রাণময় কোষটাই প্রবল হয়ে উঠে অন্য সমস্ত সূক্ষ্ম কোষগুলিকে অভিভূত করে ফেলে। বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ লোকের মত খাই দাই ঘুমোই বেড়াই গল্প করি, নিত্যনিয়মিত জড় অভ্যাসের জালে প্রতিদিন জড়ীভূত হয়ে পড়ি,—ভাববার, অনুভব করবার, কল্পনা করবার, মনের ভাব প্রকাশ করবার অবসর এবং উত্তেজনা অল্পে অল্পে চলে যায়—সমস্ত যেন ভাতচাপা পড়ে যায়। অবশ্য ভিতরে ভিতরে দিন রাত্তির একটা অবিশ্রাম খুঁৎ খুঁৎ চল্‌তে থাকে—জড়ত্বের ভার প্রতি মুহূর্ত্তেই দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে। সাদাশিধা রকমের খাওয়াপরা এবং উচ্চরকমের ভাবাচিন্তা এইটেই বাস্তবিক আমার মনের আদর্শ। আরাম এবং

সাজসরঞ্জাম এবং ছোটখাট নিয়মিত অভ্যাস আমাকে যেন গরম রাত্রে পালকভরা লেপের মত হাঁপ ধরিয়ে দিতে থাকে। চতুর্দিকটা বেশ সাদাসিধা ফাঁকা হলে মনের জন্যে অনেকখানি জায়গা পাওয়া যায়, নইলে, যতই জিনিষপত্র চাকরবাকর উদ্যোগ আয়োজন বাড়তে থাকে ততই মানসিক দৃষ্টির পার্সপেক্‌টিভ্ আবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং আনন্দের চেয়ে আরামটাই প্রচুর হয়ে ওঠে। জাপানীদের গৃহসজ্জা যেরকম শোনা যায়—ধব্‌ধবে পরিষ্কার একটিমাত্র মাদুর, দেয়ালের একটি ফুলদানীতে একটিমাত্র পুষ্পমঞ্জরী আর কোন কিছু আসবাবের ভিড় নেই সে আমার মনে করতে বেশ লাগে। যদি চোখের সুখ দিতে চাও তবে এমন বন্দোবস্ত কর যাতে জান্‌লাটি খুলে আকাশটি অবারিত এবং চারিদিকটি গাছপালায় মনোরম দেখতে পাওয়া যায়, নিজের শরীরের চারিদিকেই অর্থহীন জিনিষপত্রের ঘেঁষাঘেঁষিটা বড় শ্রান্তিজনক—কারণ জিনিষপত্র কর্ত্তা হয়ে উঠলে মনের পক্ষে সেটা বড়ই অসহ্য। আমি ত এখান থেকে পালাই পালাই করচি। শীঘ্রই বোলপুরে যাব সংকল্প করেচি। আমি বেশ বুঝতে পারচি সেখানে যখন সেই গাড়িবারান্দার ছাতের উপর বড় কেদারা পেতে একলাটি শরতের সন্ধ্যালোকে বোলপুরের দিগন্তপ্রসারিত সবুজ মাঠের উপর আমার অন্তঃকরণের সমস্ত ভাঁজগুলি খুলে দিয়ে তাকে বিস্তৃত করে দিতে পারব তখন অগাধ শান্তিরসে আমার সমস্ত জীবন অভিষিক্ত হয়ে উঠবে।

বুধবার। কলকাতা। ১১ই অক্টোবর। [১৮৯৪]

আজ শরৎকালের সুন্দর সকালবেলাটা চুপচাপ করে কৌচে পড়ে কাটিয়েছি—আমার টবের গাছপালাগুলোকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সুন্দর বাতাস এসে গায়ে লাগ্‌ছিল। আমার ভারি ইচ্ছা করছিল আমি এইরকম করে শুয়ে থাকি আর পাশের ঘর থেকে কেউ আপন ইচ্ছামত পিয়ানোতে একটার পর একটা বাজনা বাজিয়ে যায়। তার মধ্যে আমার সেই Chopinটাও থাকে। মনের ভিতর এইরকম যে একটা ইচ্ছা জন্মায়, সেই ইচ্ছাটা অপরিতৃপ্ত থাকলেও তার ভিতরে একরকম সুখ আছে। সব চেয়ে কষ্টের অবস্থা, যখন মনেতে ইচ্ছাও জন্মায় না। মনটা যখন অসাড় জড়বৎ হয়ে যায়। প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বদা যে একটি বাজনা বাজ্‌চে আমাদের মনের ভিতরে সেইটেই বিচিত্র ব্যাকুল ইচ্ছা আকারে সঙ্গীত রচনা করে— সেই ইচ্ছাগুলির একটি সুন্দর রাগিণী আছে— খুব কোমল সুরওয়ালা সকালবেলাকার গানের মত— সেই রাগিণীর দ্বারা সেই অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলির বিষাদটিও সান্ত্বনাময় লাবণ্যময় হয়ে ওঠে। যখন বিশ্বপ্রকৃতির সেই বীণাধ্বনি মনের অত্যন্ত ছায়াময় দূর দূরান্তর পর্য্যন্ত সকরুণ হা হা স্বরে প্রতিধ্বনিত হয়ে না ওঠে তখনি মনটা যথার্থ নিরানন্দ নিশ্চেষ্ট নির্জ্জীব হয়ে পড়ে। তখন মনের বিশেষ কোন বেদনা না থাক্‌তে পারে কিন্তু তার ভারটা জগদ্দল পাথরের মত চেপে থাকে।…

বীণটা ভারি চমৎকার বাজিয়েছিল। অনেকটা সেই বহ্নির মত— মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে নিংড়ে নিংড়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে সুর বের করতে লাগ্‌ল— এক একবার সরু মোটা সব কটা তারের প্রবল ঝঙ্কারে মনের একদিক থেকে আর একটা দিক পর্য্যন্ত দ্রুতপদে অনেকগুলো ঢেউ তুলে দিয়ে চলে গেল--- আবার খানিক বাদে অত্যন্ত মৃদু করুণ মিলিতপ্রায় মর্ম্মরধ্বনিতে দুখানি সুকোমল করতল দিয়ে মনের সর্ব্বশেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ঢেউগুলিকে যেন সমান মসৃণ করে দিয়ে গেল। যন্ত্রটা যে কতরকমের কথা কইতে লাগ্‌ল তার সব কথা কে বুঝ্‌তে পারবে— একেবারে যেন বুকের ভিতরে মুখ দিয়ে তার যা কিছু বলবার ছিল সমস্ত বলে গেল—

এক একবার যখন মোটা তারটার পুরুষকণ্ঠোচিত গাম্ভীর্য্যের ভিতর থেকে একটা উদার করুণা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে লাগ্‌ল তখন মনে হতে লাগল সংসারের সমস্তই সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মিথ্যা বলেই এমন অনন্ত বেদনাময় এবং এমন অসীম সুন্দর, তাই তার মধ্যে এত রাগিণী এবং এত মূর্চ্ছনা। ... ... কাল রাত জেগে আজ সকাল বেলায় সর্ব্বাঙ্গে একটি ক্লান্তি নিয়ে কৌচে পড়ে ছিলুম— তাই অর্দ্ধনিমীলিত চোখে রোদ্দুর এবং গাছের কম্পন এবং শ্রান্ত শরীরে বাতাসটি খুব মিষ্টি লাগ্‌ছিল— আজ শরতের সকালটি প্রতিমাবিসর্জ্জন এবং উৎসবের স্মৃতিদ্বারা পূর্ণ হয়ে যেন ছল্ ছল্ করছিল; যেন, যে সমস্ত নহবতের বাজনা থেমে গেছে তারা আজ নীরবভাবে সমস্ত নির্ম্মল আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, এবং উৎসবআনন্দের অবসানে যে একটি দীর্ঘনিশ্বাস-জড়িত কর্ম্মবিহীন ক্লান্তি এবং অবসাদ উপস্থিত হয় তাই আজ শরতের রৌদ্রে মিশ্রিত বিস্তৃত হয়ে সমস্ত জলস্থল আকাশকে একটি নিস্তব্ধ বিষাদে মণ্ডিত করে রেখেছে।

কলকাতা। ১৭ই অক্টোবর। [১৮৯৪]

কাল ব— র সঙ্গে "মেয়েলি ছড়া" প্রবন্ধ নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, অমন একটা তুচ্ছ উদ্দেশ্যবিহীন বিষয় নিয়ে আমি কেন সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে গেলুম তিনি বুঝতে পারেন নি। আমি বল্লুম কালিদাস শকুন্তলা কেন লিখেছিলেন এবং সেটা আজ পর্য্যন্ত কেন টিঁকে আছে? আমাদের চারদিকে যে সমস্ত ছোট বড় জিনিষ আছে এবং প্রতিমুহূর্ত্তে এসে পড়চে তাদের কতরকম ভাবে দেখা যেতে পারে, তাদের ভিতর থেকে কতরকম সুখ আবিষ্কার করা যেতে পারে এইটেই হচ্চে মানুষের সর্ব্বপ্রধান চর্চ্চার বিষয়। যে শিক্ষায় মানুষের মনকে সচেতন করে দেয়, বিশ্বসংসারকে নানাভাবে অনুভব করবার শক্তি-সঞ্চার করে সেইটেই হচ্চে মানুষের পক্ষে খুব একটা মূল্যবান শিক্ষা। সাহিত্যে আর কোন প্রত্যক্ষ ফল নেই কিন্তু সে মানুষের প্রকৃতিকে সবদিকে সচেতন করে তোলে—তার অর্থ, সে মানুষের প্রকৃতিকে বৃহৎ করে দেয়, পূর্ব্বে যেখানে তার কোন অধিকার ছিল না সেখানেও তার অধিকার বিস্তার হতে থাকে। প্রাপ্ত ফলের অপেক্ষা পাবার শক্তিটা ঢের বড়—সেই জন্যে সাহিত্যে অবলম্ব্য বিষয়ের দিকে ততটা বেশি মনোযোগ দেয় না, যেমন তার রচনার দিকে, কল্পনার দিকে, প্রকাশের দিকে। কিন্তু এ সমস্ত কথা ব— ঠিক বুঝতে পারলেন কিনা ঠিক বল্‌তে পারি নে।

বোলপুর। ১৮ই অক্টোবর। [১৮৯৪]

কাল সন্ধের সময় বোলপুরে এসে উপস্থিত হয়েছি। আজ ভোরে উঠে স্নান করে দক্ষিণের ঘরে এসে বসেচি, আমার মনের সমস্ত গ্লানি যেন দূর হয়ে গেছে। সকাল বেলাটি এম্‌নি গভীর নিস্তব্ধ এবং সুন্দর এবং উজ্জ্বল যে, আমার মনে হচ্চে আমার মনটা যেন একটি স্বচ্ছ এবং শীতল আলোকের মধ্যে সুগভীর ভাবে অবগাহন করে নির্ম্মল নিরাময় হয়ে উঠ্‌চে। আমার পাশে একটি প্লেটের উপর শৈশবের মত নবীন এবং যৌবনের মত পরিস্ফুট রাশীকৃত শিউলিফুল রেখে দিয়েছে— বারান্দার উপর শরতের রৌদ্র এসে পড়েছে— বিছানার চাদরটি শাদা ধব্‌ধব্ করছে— সমস্ত পরিষ্কার এবং ফাঁকা— লোকজনের ভিড় নেই— নিত্যনৈমিত্তিক কাজ নেই— পাখীর ডাক শোনা যাচ্চে— সামনে তরুশ্রেণীর অবকাশপথে অনেকখানি সবুজ মাঠ চোখে পড়চে। সিম্‌লের সেই রৌদ্রতপ্ত বারান্দাটিতে গিয়ে দাঁড়ালে পল্লবভূষণা নীলাম্বরী প্রকৃতি ঠিক যেমন একেবারে

চোখের বুকের কোলের সাম্‌নে এসে দেখা দিত, এখানকার এই দক্ষিণের ঘরটিতে বসেও ঠিক সেইরকমটি মনে হচ্চে। সমস্তটা ঠিক সেই রকমটি নয় কিন্তু মনের মধ্যে সেই শান্তি এবং সৌন্দর্য্যের ভাবটি অবতীর্ণ হচ্চে। মনে হচ্চে তোরা যেন সেইরকম পাশের ঘরে রয়েছিস্, তোদের স্নেহ এবং তোদের সেবা আমার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। আমার পক্ষে তোদের সেই স্নেহ এখন প্রকৃতির মধ্যে মিশে গেছে— এই শরৎ-প্রভাতের মৃদুশীতল বাতাসের মধ্যে তোদের সেই সেবাপূর্ণ স্নেহকরস্পর্শ রয়ে গেছে।— চারিদিকে কি গভীর নিস্তব্ধতা। অনন্ত নির্ম্মল স্নিগ্ধ নীলাকাশ যেন কেবল একলা আমার অন্তরাত্মাকে নীরবে আলিঙ্গন করে রয়েছে। আর এই শিউলি ফুলগুলির সুকোমল সরস শুভ্রতা আমার দুই চোখের উপর স্নেহ বর্ষণ করচে। আমাকে যদি আমার দেবতা আমার সমস্ত কর্ম্মশৃঙ্খল থেকে বিচ্ছিন্ন করে এইখানে নির্ব্বাসিত করে দেন, তাহলে বেশ ধীর শান্তভাবে বাহিরের আকাশ এবং আপন অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে আপনার কাজ করে যেতে পারি। ... ... ঘরের জাজিমের উপর লুটিয়ে পড়ে একটা পেন্সিল এবং খাতা হাতে একটা কোন রচনার মধ্যে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করচে। সকাল বেলাটি বেশ স্নিগ্ধ এবং নবীন আছে— এই বেলা আরম্ভ করে দেওয়াই ভাল। ... ... মন এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে তাকে যেন স্পর্শ দ্বারা অনুভব করতে পারচি, তার ধ্বনি খুব নিকটে শোনা যাচ্চে।

বোলপুর। শনিবার, ২০শে অক্টোবর। [১৮৯৪]

কাল রাত্তির থেকে অল্প অল্প মেঘ করে আসচে। কিন্তু রোদ্দুরও আছে। আকাশের ধারে ধারে স্তূপাকার কালো মেঘ জমেছে এবং সূর্য্যালোকে তাদের পাড়গুলো শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেছে। মাঠের চারিদিক নতুন আমন ধানে গাঢ় এবং সরস সবুজবর্ণ ধারণ করেছে, তার উপরে স্নিগ্ধ মেঘের আভা দেখাচ্ছে ভাল। মনে পড়চে, আমি যখন প্রথম বাবামশায়ের সঙ্গে বোলপুরে আসি, তখন আমার বয়স ন দশ বৎসর হবে— তখন মাঠে ধান কি রকম দেখ্‌তে হয় কখনো চক্ষে দেখিনি। সেটা দেখবার জন্যে ভারি একটা কৌতূহল ছিল। রাত্তিরে বোলপুরে এসে পৌঁছলুম, পাল্কী করে আসবার সময় দুদিকে ভাল করে চেয়ে দেখ্‌লুম না পাছে সেই অস্পষ্ট আলোতেই কৌতূহলের খানিকটা নিবৃত্তি হয়। ভোরের বেলা উঠেই বাইরে এসে দেখ্‌লুম, চারিদিকেই মাঠ, কোথাও ধানের চিহ্ন নেই। জায়গায় জায়গায় মাটি খোঁড়া, শুন্‌লুম সেই সব জায়গায় চাষ হয়েছে। তখন মনের মধ্যে রাশীকৃত কৌতূহল ছিপিআঁটা শ্যাম্পেনের মত চাপা ছিল— এখন ত পৃথিবীর মোটামুটি সবই একরকম দেখে নিয়েছি, কিন্তু তবু আনন্দের হ্রাস হয়নি বরঞ্চ তার গাঢ়তা ঢের বেশি বেড়েছে। সেই প্রথম বোলপুর দর্শনের কত কথাই মনে পড়ে। তখনো কবিতা লিখ্‌তুম। মনে ধারণা ছিল খোলা আকাশে গাছের তলায় বসে কবিতা লিখ্‌লে ঠিক দস্তুরমত কবিত্ব করা হয়; তাই ভোরে উঠেই একখানা পুরোনো Letts' Diary এবং পেন্সিল হাতে বাগানের প্রান্তে একটি ছোট নারকোল গাছের তলায় বসে "পৃথ্বিরাজের পরাজয়" বলে একটা বীররসাত্মক কবিতা লিখেছিলুম। সেটা লিখ্‌তে দিন সাতেক লেগেছিল। কোথায় সে খাতা এবং সে কবিতা! তার একটা লাইনও মনে নেই। কেবল মনে আছে বড়দাদা সেই কবিতাটা পছন্দ করেছিলেন। কবির যেরকমটি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তখন আমার বিশেষ দৃষ্টি ছিল— দুপুর বেলায় মাঠের ভিতর খোয়াইয়ের মধ্যে একটা গুহার ছায়ায় পা ছড়িয়ে দিয়ে বস্‌তুম, সাম্‌নে দিয়ে ক্ষীণ জলস্রোত বালির উপর দিয়ে বয়ে যেত, আপনাকে রীতিমত কবি বলে

মনে হত। বুনো খেজুর গাছে ছোট ছোট খেজুর ফলে থাকৃত, সেগুলো খেতে আদবেই ভাল লাগ্‌ত না কিন্তু তবু মরুপ্রান্তরের মধ্যে বুনো গাছ থেকে বুনো ফল স্বহস্তে পেড়ে খাচ্চি এই মনে করে একটা বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করতুম। এই খোয়াইয়ের মধ্যে আমানি ডোবা বলে একটি ছোট্ট ডোবা ছিল তার মধ্যে খুব ছোট্ট মাছ থাকৃত, কাপড়চোপড় খুলে সেই ডোবার মধ্যে গিয়ে পড়তুম, মনে হত নির্ঝরের জলে স্নান করচি। কোন লোকজন কেউ কোথাও নেই, কোন বন্ধন নেই শাসন নেই, মাঠের ভিতরকার সেই গুহাগুলোর মধ্যে সমস্ত দিন একলা আপন মনে কবিত্ব খেলা করতুম— এক একদিন ডাকাতের ভয় হত, কিন্তু সেই ভয়ের মধ্যেও কবিত্ব ছিল। এখনো কবিতা লিখি বটে কিন্তু নিজেকে উপন্যাসে ইতিহাসে বর্ণনযোগ্য কবি বলে আর অনুভব করিনে-- বরঞ্চ নিজের কবিতা পড়ে মনে হয় যেন সে কবিতা আমি নিজে লিখিনি— যেন আমি দৈবাৎ ভাল কবিতা লিখি কিন্তু ইচ্ছা করলে ভাল কবিতা লিখতে পারিনে। আর কিছু না হোক্, এখন গাছের তলায় বসে কবিতা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব, মন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। যাই হোক্ সেই Letts' Diaryটা যদি খুঁজে পাই তাহলে আবার একবার ভোরের বেলায় সেই নারকেল তলায় বসে সেই পৃথ্বিরাজের পরাজয়টা পড়ে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।

শান্তিনিকেতন। মঙ্গলবার, ২০শে অক্টোবর। [১৮৯৪]

পর্শু থেকে খুব অল্প অল্প শীত পড়ে চারিদিক আরো যেন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। বাতাসের ভিতর থেকে সেই ক্লান্তির ভাবটা চলে গেছে। সকালবেলায় স্নান করে সাফ কাপড়টি পরে এসে বসে যখন গায়ে এই প্রভাতের ঠাণ্ডা বাতাসটি লাগ্‌তে থাকে তখন সর্ব্বাঙ্গে আরো যেন খানিকটা নির্ম্মলতার সঞ্চার হয়— চোখের উপরে যে আলোটি এসে পড়ে মনে হয় স্নিগ্ধ শিশিরে অভিষিক্ত এবং শিউলি ফুলের সুশীতল গন্ধে পরিপূর্ণ। আকাশ নীল, গাছপালাগুলি ঝল্‌মল্ করচে, মাঠের মাঝে মাঝে সবুজ ধানের ক্ষেত রৌদ্রে কোমল পাণ্ডু আভায় মণ্ডিত হয়েছে, বাতাস কতদূর থেকে অবারিত বেগে শিশিরসিক্ত তৃণাগ্রভাগ চুম্বন করে চলে আস্‌চে তার সন্ধান নেই—শূন্য মাঠের মাঝখানে জনহীন রাঙা বাঁকা রাস্তাখানি কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেছে তার শেষ দেখা যাচ্চে না—আমি এরি মাঝখানে হেমন্তের তুষার-নির্ম্মল আলোক-প্লাবনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে, শিশিরস্নিগ্ধ বাতাসের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গমনে অভিনন্দিত হয়ে সম্মুখে একটি প্লেটে স্তূপাকার শিউলি ফুল নিয়ে পুলকিত হয়ে বসে আছি— আমাকে কেউ বিরক্ত করবার নেই, দোতলার তিনটি ঘর সম্পূর্ণ আমার, এবং দিবসের অষ্টপ্রহর আমার স্বাধীন অধিকারের মধ্যে। মাঝের বড় ঘরের বিস্তীর্ণ ধব্‌ধবে বিছানাটি তাকিয়া বালিশ নিয়ে আমার আরামের জন্যে অপেক্ষা করে আছে— আমার নিজেকে নবাব বলে বোধ হচ্চে। মনে আছে স— আমাকে বলেছিল, মুসলমান নবাবদের মত তোমার মধ্যে একটা বিলাসের ভাব আছে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়; অর্থাৎ আমার নবাবী মানসিক নবাবী— সেখানে আমি আপনার রাজত্বে কোনরকম বাধা রাখ্‌তে চাইনে— সেখানে আমার অপ্রতিহত অধিকার চাই। কিন্তু নবাবরা যেরকম নবাবী করত তাতে সেই মানসিক নবাবীর ব্যাঘাত হত;— তাতে এত জিনিষপত্র লোকলস্কর সাজসরঞ্জামের আবশ্যক হত, যে বস্তুরাশিতে মনকে নিশ্বাস রোধ করে বিনাশ করে ফেলত। আমি বস্তুর উপদ্রব এড়াবার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই— প্রমোদের উত্তেজনার মধ্যে থাকলে আমার অন্তঃকরণ ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে

ওঠে— আমার মনের অন্তঃপুরের ভিতরে যেন কে একজন আছে, যে আমাকে বাইরের সংশ্রবে আসতে দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে।

বুধবার। ২৪শে অক্টোবর। [১৮৯৪]

সত্যি কথা বল্‌তে কি, যখন একবার বিষয়কার্য্যের মধ্যে ভাল করে মনোনিবেশ করা যায়, তখন তার একটা নেশা ক্রমে মনটাকে অধিকার করে নেয়। বহুবিধ পরামর্শ, উপায়চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ ভাবনায় বেশ একরকম ভোর হয়ে যেতে হয়। যখন নারকেল-কুঞ্জে বসে ছেঁড়া Letts' Diary নিয়ে পৃথ্বিরাজের পরাজয় লিখ্‌তুম তখন বোধ হয় এমন একটা অকবিজনোচিত কথা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ হত। কিন্তু ভাবপ্রকাশই কি আর বিষয়কর্ম্মই কি, দুয়ের ভিতরে একটা ঐক্য আছে এবং সেইখানেই আনন্দটা পাওয়া যায়। অব্যক্ত থেকে ব্যক্তি, অসমাপ্ত থেকে সমাপ্তি, chaos থেকে সৃষ্টি শৃঙ্খলা উদ্ভাবনা করার একটা মস্ত সুখ আছে। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে মনের ভাবকে সুসমাপ্ত ভাষায় বিন্যাস করতে পারলে একটা সৃষ্টিসুখ পাওয়া যায়— সুবৃহৎ জমিদারী কার্য্যটাকেও ক্রমশঃ নিয়মে বদ্ধ এবং শৃঙ্খলায় পরিণত করতে পারলে সেইরকম সৃষ্টিসুখ লাভ করা যায়। আয় বাড়চে বলে ত একটা সুখ থাকতেই পারে কিন্তু তার চেয়ে বেশি সুখ একটা কার্য্য সম্পন্ন হচ্চে বলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যদি ব্যারিষ্টার কিম্বা সিভিলিয়ান হয়ে আস্‌তুম তাহলে আমি আমার নির্দ্দিষ্ট কাজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেতুম— সাহিত্যচর্চ্চায় মন দেবার কোন আবশ্যক অনুভব করতুম না। আইনের কূটমর্ম্ম উদ্ভাবন, বিপক্ষ পক্ষের যুক্তি খণ্ডন, বিশৃঙ্খল সাক্ষ্যের মধ্যে থেকে একটা সুসংগত ইতিহাস এবং মত রচনা করে তোলা এতেই আমার সমস্ত মন অহর্নিশি নিবিষ্ট থেকে একটা বিশেষ আনন্দ এবং আত্মবিস্মৃতি লাভ করত। ভাগ্যি আমি ব্যারিষ্টর হয়ে আসিনি!

বোলপুর। ২৫শে অক্টোবর। [১৮৯৪]

কাল রাত্তির থেকে খুব ঘন বর্ষা করে এসেছে— কাল সমস্ত রাত্তির সবেগে বাতাস দিয়ে সশব্দে বৃষ্টি হয়ে গেছে— আজ সকাল বেলায় বাতাস নেই কিন্তু সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে বৃষ্টি হচ্চে। একে ত বোলপুর নির্জ্জন, তাতে চতুর্দ্দিকের আকাশমণ্ডপে কালো মেঘের পর্দ্দা টেনে দিয়ে আরো গভীর নিভৃত বলে বোধ হচ্চে। গাছের পাতার উপর বৃষ্টির ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ শোনা যাচ্চে। এমন দিনে কি হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা নিয়ে পোলিটিকাল্‌ প্রবন্ধ লিখ্‌তে ইচ্ছা করে। মনের ভিতরে একটা উতলা উন্মনা ভাব নিয়ে আজ প্রাতঃকাল থেকে পদরত্নাবলীর পাত ওল্টাচ্চি—বৃন্দাবন নামক বিরহমিলনের একটা মানসরাজ্যে দেখ্‌তে পাচ্চি—

গগন হি নিমগন দিনমনিকাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥
চৌদিকে অথির পবন তরু দোল।
জগভরি শীকরনিকরহিলোল॥
চলইতে গোরি নগরপুরবাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥

বর্ষার দিনে ঘরে ঘরে দ্বার বন্ধ, মেঘছায়াচ্ছন্ন বৃন্দাবনের জনশূন্য পথ দিয়ে গৌরী চলেছেন— অস্থির পবনে গাছপালা দুলচে, এবং সমস্ত জগৎ ভরে' বৃষ্টির ছাঁট উড়ে চলেছে—সূর্য্য কোথায় ডুবে আছে তার সন্ধান নেই—দিনে রাত্রে যেন একাকার হয়ে আছে। —এই বৈষ্ণবপদগুলির মোহমন্ত্রটি যে কি সেইটি ব্যাখ্যা করে একটি প্রবন্ধ লেখবার ইচ্ছা আছে— কিন্তু সে আজ থাক্—আজ একটি অর্দ্ধ সমাপ্ত পোলিটিকাল্ প্রবন্ধ শেষ করতে হবে। ··· ··· লিখে যে কি ফল হবে তা অন্তর্য্যামীই জানেন। ভগবদ্গীতায় আছে, কর্ম্মেই আমাদের অধিকার আছে, ফলে অধিকার নেই— অর্থাৎ ফল পাব কি না পাব সে কথা না ভেবে কাজ করতে হবে। ফল পাব না মনে করেই আমাদের দেশে কাজ করতে হয়। —বেলা যত বাড়চে বৃষ্টিও তত চেপে আস্‌চে—বাদ্‌লার অন্ধকারে বেলা এগচ্চে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্চে না—সময় যেন আজ সমস্ত দিনের মত ছুটি নিয়েছে। ছেলেবেলায় যখন নর্ম্মাল ইস্কুলে পড়তুম এইরকম বাদলার দিনে ঘর অন্ধকার হয়ে যেত বলে পণ্ডিতমশায় পড়া বন্ধ করতেন— যদিও ক্লাশের বাইরে যেতে পারতুম না, তবু বই বন্ধ করে বৃষ্টির শব্দ এবং মেঘের অন্ধকার পুলকিতমনে উপভোগ করতুম— বোধ হয় তখনকার সেই অভ্যাসবশতঃ আজও এমন বাদ্‌লার দিনে কর্ত্তব্য নামক কঠিন ইস্কুলমাষ্টারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সমস্ত পুঁথিপত্র বন্ধ করে দিয়ে আপনার মনে আপনার খেয়ালে থাক্‌তে ইচ্ছা করে। কিন্তু সাধনা ছাপাখানায় দেবার সময় হয়ে এসেছে— এবং পোলিটিকাল প্রবন্ধটা আজ যেমন করেই হোক্ শেষ করতেই হবে।

শুক্রবার, ২৬শে [অক্টোবর ?] ১৩০১। বোলপুর।

তুই দূর থেকে যে মনে করেছিস, আমি আজকাল সাধারণের সঙ্গে মিলে মিশে আলাপ আতিথ্য করে খুব একজন দিগ্‌গজ্ পাব্লিক ম্যান্ হয়ে উঠেছি সেটা অত্যন্ত ভুল। হাঁস এবং মাছ দুই ভিন্নজাতীয় জীব— যদিও হাঁস মাঝে মাঝে জলে ডুব মারে এবং মাছ মাঝে মাঝে আকাশে লাফিয়ে উঠে এক গ্রাস হাওয়া খেয়ে নেয়। দূর থেকে অনেক সময় মনে করি এবার আমি খুব লোকজনের সঙ্গে মিশে তাদের সমস্ত কাজের এবং আন্দোলনের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে বেড়াব কিন্তু সে কেবল কল্পনাতেই থেকে যায়। অনেক সময় যেমন কল্পনা করতে বেশ লাগে, যে, খুব তরঙ্গিত সমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করে আমি পালের জাহাজে বায়ুভরে চলেছি—অথচ তরঙ্গিত সমুদ্রে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে— তেমনি লোকসমুদ্রের আন্দোলনে মুহূর্ত্তকাল থাকলেই আমার অন্তরাত্মা পীড়িত হয়ে ওঠে—তারপর আবার দ্বিগুণ আগ্রহের সঙ্গে আপন নির্জ্জনতার মধ্যে ফিরে আস্‌তে হয়। ···তুই লিখেছিস্ লোকের সঙ্গে মিশ্‌লে আমার পার্সোনাল্ ইন্‌ফ্লুয়েন্সের দ্বারা অনেকটা উপকার সাধন করতে পারি। কিন্তু পার্সোনাল্ ইন্‌ফ্লুয়েন্স্ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন উপায়ে বিকীরিত হয়ে থাকে—কেউবা সম্মুখে বর্ত্তমান থেকে মুখের কথায় এবং চরিত্রের বলে লোককে অভিপ্রেত পথে নিয়ে যেতে পারে কেউবা অপ্রত্যক্ষ থেকে কেবল আপনার প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অংশকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করে লোকের হৃদয় গ্রহণ করতে পারে। যাদের মনের উপরে সকলরকম শক্তিই কার্য্য করে— যাদের স্নায়ুতন্ত্রী ছোট বড় সকলপ্রকার আঘাতেই ঝন্‌ঝন্ করে বেজে ওঠে, তারা লোকসমাজের মাঝখানে থেকে কখনই আপনার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, বরঞ্চ তারা অনেক ক্ষতি করে এবং আপনার প্রভাব নষ্ট করতে থাকে— লোকসমাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে তাদের নিজের সুখদুঃখ বেদনা নিজের ভিতরে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করে রেখে নিরাপদে নির্জ্জনে প্রশান্তভাবে

ইহজীবন কাজ করে গেলে তবে তাদের কাজের গৌরব রক্ষিত হতে পারে। নইলে তাদের জীবনের সহস্র বিরোধপূর্ণ সমস্যার সমন্বয় করে তাদের প্রকৃতির যথার্থ অর্থটুকু বুঝে নেবার জন্যে কার এত মাথাব্যথা! যারা অনেকটা পরিমাণে নির্লিপ্ত নিশ্চেতন হয়ে লোকের মাঝখানে থাকে তারাই লোকের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারে। —মায়ার খেলার সে গানটা এ স্থলেও খাটে—"তারে কেমনে ধরিবে সখি, যদি ধরা দিলে!"

বোলপুর। শনিবার ২৬শে [?] অক্টোবর। [১৮৯৪]

একে আমরা ভারতবর্ষীয় হিন্দু, তাতে আবার যদি মোটা হয়ে উঠি তাহলে একেবার সশরীরে নির্ব্বাণমুক্তি। আমি দেখেছি মনের ভিতর থেকে বৈরাগ্য এবং ঔদাসীন্যকে খেদিয়ে রাখ্‌তে সর্ব্বদাই চেষ্টা করতে হয়। প্রায়ই এক একবার ধ্যানের অবস্থা এসে কর্ম্মের উৎসাহকে ম্লান করে দিয়ে যায়। আবার মুস্কিল হয়েছে এই যে, জগৎসংসারে বৈরাগ্যটা খুব যুক্তিসঙ্গত। সত্যই সমস্ত অনিত্য— মৃত্যু মানুষের জীবনের চেষ্টাকে প্রশান্ত হাস্যে পরিহাস করচে— একটা জাতি নিজের বংশপরম্পরাগত প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কোন একটা বৃহৎ দুঃসাধ্য চেষ্টাকে সফল করে তুল্‌তে পারে কিনা সন্দেহ। এই সমস্ত ফিলজফি মনের মধ্যে আপনি উদয় হয়।

বোলপুর। ৩০শে অক্টোবর। [১৮৯৪]

বোলপুরের মত এমন সুগভীর শান্তি এবং বিরাম আর কোথাও পাওয়া যেত না। দার্জ্জিলিঙের স্যানিটেরিয়মে বিপরীত ভিড়— পরগনাতেও কাজ এবং লোক এসে পড়ে— বোলপুরে কোন কর্ত্তব্যও নেই লোকের উপদ্রবও নেই, অবিশ্রাম পাখীর গান ছাড়া শব্দটি নেই এবং কাঠবিড়ালী ছাড়া আমার দোতলায় আর কোন প্রাণীই আসে না। দুপুরবেলায় ভ্রমরগুঞ্জনের মত একটি গুঞ্জনধ্বনি শুন্‌তে পাই— মনে হয় আমার জীবনের সমস্ত সুখস্মৃতি অত্যন্ত দূর থেকে তাদের বিচিত্র মিশ্রিত মর্ম্মরধ্বনি বহন করে নিয়ে আস্‌চে। দুপুর বেলাটি এমন সুগভীর নিস্তব্ধ নির্জ্জন এবং পরিপূর্ণ, যে, আমার সমস্ত অন্তঃকরণটিকে একেবারে আবিষ্ট করে রেখে দেয়— লিখি পড়ি ভাবি যাই করি এই সুবিস্তীর্ণ সুবৃহৎ সকরুণ মধ্যাহ্ন আমাকে নীরবে সস্নেহে বেষ্টন করে থাকে। আজকাল শীত পড়াতে হাত পা একটু ঠাণ্ডা হয়ে আস্‌লেই দক্ষিণের বারান্দাটিতে গিয়ে বসি এবং মাতৃক্রোড়ের মত প্রকৃতির একটি আতপ্ত স্পর্শে আমাকে আবৃত করে ফেলে; পায়ের কাছে রোদ্দুরটি এসে পড়ে, সবুজ মাঠের অতি দূর নীলাভ প্রান্তটি পর্য্যন্ত দেখা যায়, চারিদিকের গাছপালা থেকে পতঙ্গদের একটি অশ্রান্ত গুন্‌গুন্ শব্দ আস্‌তে থাকে, মনে হয় যেন সকলের স্নেহ এবং সেবা চারদিক থেকে এসে আমার শরীরের মধ্যে জীবন সঞ্চার করে দিচ্চে।

কবিপ্রিয়া

শ্রীউর্মিলা দেবী

জীবনতরণী যখন পারঘাটায় লাগো-লাগো তখন পেয়ে বসল শৈশবের স্বপ্নে! কত ভুলে-যাওয়া ঘটনা, কত হারিয়ে-যাওয়া মানুষ আবার এসে মনটাকে দখল করে বসল। শৈশব ও কৈশোরের কত বন্ধু আজ কোথায় চলে গিয়েছে! তখন যাদের জন্ম হয় নি তারাই এখন জীবনের খুব কাছে এসেছে। কেউ রেখে গেছে সুখস্মৃতির সৌরভ, কেউ রেখে গেছে দুঃসহ ব্যথা, কিন্তু এখন যেন সব একাকার হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আর যাঁরা খুব কাছে না এসেও একটা ছাপ রেখে গেছেন মনের উপর, তাঁদের কথাও মনে পড়ে বারবার।

সেদিন বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত কবির চিঠিতে রথী ও বেলা দুই ভাইবোনের মিষ্টি ঝগড়াটুকুর কথা পড়ে হঠাৎ ভেসে উঠল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কয়টি সাংসারিক চিত্র, আর উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মধ্যে দুখানি মুখ।

এক সময়ে কবির পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। আমি তখন বেশ ছোট। আমার মেজদিদি সুগায়িকা অমলা দেবী তাঁর সুকণ্ঠের জোরেই বোধ হয় কবির খুব স্নেহ আকর্ষণ করেছিলেন। কবির পরিবারে তিনি মেয়ের মতই হয়ে গিয়েছিলেন। আমার দাদা[১] ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, তিনিও সাহিত্যসেবীদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন। মনে আছে, মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়িতে সাহিত্যিকদের মিলন হত। বড় ফরাশের উপর ধবধবে চাদর পেতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে মুসলমানী কায়দায় বসে শ্বেতপাথরের থালাবাটিতে রীতিমত হিন্দু খানা তাঁরা খেতেন। তারপর রাত্রি একটা-দুটো পর্যন্ত চলত তাঁদের সাহিত্যচর্চা। অনেক সময়ে কবিবর একাও নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। আহারাদির পর তাঁর খাতা থেকে নতুন-নতুন লেখা কবিতা পড়ে শোনাতেন। সাহিত্যিকদের সভায় আমাদের স্থান ছিল না, কিন্তু যখন তিনি একা আসতেন তখন সাহস সঞ্চয় করে কুণ্ঠিত চরণে ঘরে ঢুকে একটা কিছুর আড়ালে নিজের স্থান করে নিতাম। আমি তো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে থাকতাম—সে তাঁর কবিতা শুনে না চেহারা দেখে তা আজও ঠিক বলতে পারব না। তবে দুটি কবিতার কথা মনে আছে, শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। 'দেবতার গ্রাস' পড়া যেদিন শুনি সেদিন শুনতে শুনতে কখনও যেন রাখাল হয়ে যাচ্ছি, কখনও মোক্ষদা হচ্ছি—আবার শেষ যখন হয়ে এল তখন দাদাঠাকুর ব'নে গেলুম। 'পরশপাথর' শোনার পর অনেক দিন পর্যন্ত চোখ বুজলেই দেখতে পেতাম, ধু-ধু করছে একটা মাঠ, তার মাঝ দিয়ে এক দীর্ঘদেহ কিন্তু নুয়ে-পড়া জটাধারী পিঙ্গলবাস বৃদ্ধ চলেই চলেছে—সে-মাঠেরও যেমন শেষ নেই তার আশারও যেন অন্ত নেই।

আমার দিদি প্রায়ই জোড়াসাঁকোয় যেতেন, কখনও একসঙ্গে দু-তিন মাসও থেকেছেন। আমার ভারি হিংসে হত, কিন্তু কিছু বলার সাহস ছিল না। তাই তিনি যেদিন বললেন "যাবি আমার সঙ্গে

---

১ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

জোড়াসাঁকোয় ?” সেদিন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলুম। কতকালের অভীপ্সিত দিন আজ। আমি যাব ঠাকুরবাড়ি! যে-বাড়ির কত কথা কত গল্প যে শুনেছি তার ঠিক নেই। সে-বাড়ির মেয়ে-বউরা অপ্সরার মত দেখতে, তাঁরা দুধ দিয়ে স্নান করেন, ক্ষীর সর ছানা বেঁটে রূপটান মাখেন—কত গয়না, কত কাপড় যে আটপৌরে পরেন তার ঠিক নেই! সে-বাড়ি যাব, তাঁদের-সব দেখব, আবার সঙ্গিনীদের কাছে গল্প করব! আর চাই কি! সবচেয়ে বড় কথা কবিপ্রিয়াকে দেখব। সেদিনের কথাটি এখনও বেশ মনে আছে, দিদি যাঁর কাছে আমায় নিয়ে গিয়ে বললেন “কাকিমা, এটি আমার ছোটবোন”, যিনি আদর করে আমায় কাছে টেনে নিয়ে বললেন “তোমার নাম কি ?”, তিনি নিতান্তই সাদাসিধে একখানা শাড়ি পরে বসেছিলেন। গায়ে গয়নাও তেমন দেখলুম না। সাহস করে মুখের দিকে চাইলাম--এই কবিপ্রিয়া! রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী, সেরকম তো ভালো দেখতে নন। আবার ভালো করে চেয়ে দেখলাম। তখন দেখি এক অপরূপ লাবণ্যে সমস্ত মুখখানা যেন ঢলঢল করছে, আর একটা মাতৃত্বের আভায় যেন মুখখানা উজ্জ্বল। একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে হয়। সেই প্রথম দিন থেকেই আমি তাঁর অনুগত হয়ে পড়লাম। তারপর প্রায়ই সে-বাড়ি গিয়েছি, দিদির সঙ্গে থেকেছিও কখনও কখনও। ক্রমেই বুঝতে লাগলাম তিনি খুবই অসাধারণ নারী। যে মাতৃত্বের আভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাই দিয়ে যেন শুধু নিজের ছেলেমেয়ে নয়—আত্মীয়-স্বজন দাসী-চাকর সকলকেই আপন করে রেখেছিলেন। সাজগোজ বেশি কখনও করতেন না। কবিবর মহর্ষিদেবের কনিষ্ঠতম সন্তান—ভাইপো-ভাইঝিরা কেউ সমবয়সী, কেউ-বা অল্পই ছোট; কিন্তু কবিপ্রিয়া এই সম্বন্ধের গুরুত্বটা যেন বেশ বুঝতেন। তিনি ‘কাকিমা’, ‘মামিমা’, বড় বড় ছেলে-মেয়ে-বউদের সামনে আবার সাজগোজ করবেন কি—এমনি যেন ভাবটা। রান্না করে মানুষ খাইয়ে বড় তৃপ্তি পেতেন। আমার দাদা যখনই যেতেন, সিঁড়ি থেকেই বলতে-বলতে উঠতেন “কাকিমা, আজ কিন্তু এটা খাব”, “আজ কিন্তু ওটা খাব”; তক্ষুনি রান্নাঘরে গিয়ে সেটা তৈরি করতে বসতেন। কবির একটা অভ্যাস ছিল, সিঁড়ি থেকে সু-উচ্চ কণ্ঠে “ছোটবউ—ছোটবউ” করে ডাকতে ডাকতে উঠতেন। আমার ভারি মজা লাগত শুনে, তাই বোধ হয় আজও মনে আছে।

কবি অত্যন্ত ভোজনরসিক ছিলেন। খাওয়াটা যে শুধু পেট ভরাবার জন্য নয়, তাতেও যে শিল্পীমনের যথেষ্ট খোরাক আছে, তা তাঁর খাওয়া দেখলেই বোঝা যেত। তিনি ভোজনপ্রিয় ছিলেন না, ভোজনরসিক ছিলেন। আমার মেজদিদিও রন্ধনপটু ছিলেন, কবিকে তিনি অনেকরকম খাবার করে খাওয়াতেন। একদিন তিনি একরকম মিষ্টি করেছিলেন, আমাদের বাঙাল দেশে তাকে বলে এলোঝেলো। কবি সেটা খেয়ে খুব খুশি হলেন ও তার নাম জানতে চাইলেন। নাম শুনে তিনি নাক সিঁটকে বললেন, “এই সুন্দর জিনিসের এই নাম ? আমি এর নাম দিলাম ‘পরিবন্ধ’।” সেই থেকে ঐ নাম আমাদের বাড়িতে চলে এসেছে।

তখনকার দিনে তিনি গান রচনা করতেন একেবারে সুর-কথা একসঙ্গে। বড় বারান্দায় পায়চারি করতে করতে যেই শেষ হল অমনি চিৎকার আরম্ভ করলেন, “অমলা, ও অমলা, শীগগির এসে শিখে নাও, এক্ষুনি ভুলে যাব কিন্তু।” কবিপ্রিয়া হাসতেন খুব, “এমন মানুষ আর কখনও দেখেছ, অমলা, নিজের দেওয়া সুর নিজে ভুলে যায় ?” কবি অমনি বলতেন, “অসাধারণ মানুষদের সবই অসাধারণ হয়, ছোটবউ, চিনলে না তো!” আমার দিদির সঙ্গে কবিপ্রিয়ার খুব ভাব

ছিল। দুজনে গল্প আরম্ভ করলে আর শেষ হত না। কবি নিজে এ নিয়ে খুব কৌতুক করতেন। একদিন হয়েছে কি, কবি তাঁর ঘরে টেবিলে বসে লেখাপড়া করছেন আর শোবার ঘরে তাঁদের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কবিপ্রিয়া আর আমার দিদি খুব গল্প করছেন। এমন তন্ময় হয়ে গেছেন যে, কবি কখন যে এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছেন কেউ টের পান নি। হঠাৎ মাথার কাছ থেকে বলে উঠলেন, "আমি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? আমার ঘুম পায় না?" যেমন কথা কানে গেছে দিদি তো বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে দে-ছুট উঠিপড়ি ক'রে। কবি তখন খুব হাসছেন আর বলছেন, "অমলা, ও অমলা, অত ছুটো না, পড়ে যাবে যে!" আর পড়ে যাবে! একেবারে ছুটে এসে বিছানায় মুখ লুকিয়ে পড়ে আছেন। সকালবেলা দেখা হতে কবি একটু একটু হাসছেন আর বলছেন, "অত লজ্জা পাবার কি হল তোমার? আমি তো বেশ উপভোগ করছিলাম ব্যাপারটা।" এসব কথা কিছু-কিছু আমার প্রত্যক্ষ, কিছুটা আমার দিদির কাছে শোনা।

আমার দিদির হিন্দী গান শেখার ব্যবস্থা কবি নিজে করে দিয়েছিলেন। তখনকার দিনের নামকরা গাইয়ে রাধিকা গোঁসাই তাঁকে গান শেখাতেন। প্রত্যেক বছর ১১ই মাঘের উৎসবের জন্য কবি নতুন গান রচনা করতেন। একটি গান হিন্দী সুরে বাংলা ভাষায় রচনা করতেন, আমার দিদি একা গাইতেন। সে-সময়ে জোড়াসাঁকোর ১১ই মাঘের উৎসব একটি বিচিত্র ব্যাপার ছিল। যেমন ছিল নীতুবাবুর[২] সাজানো তেমন ছিল গানের পাট, সব মিলে যেন একটা অভিনব ব্যাপার। নীতুবাবুর খুব ফুলের শখ ছিল। দমদমায় তাঁর সুন্দর ফুলের বাগান ছিল। এই বাগান নিয়েই তাঁর জীবন কাটত। তিনিই ১১ই মাঘের উৎসবপ্রাঙ্গণ সাজাবার ভার নিতেন। প্রত্যেক বৎসর নতুন নতুন পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসত। দুবার কখনও একরকম দেখি নি। কত বৈচিত্র্য যে এই সাজাবার মধ্যে ছিল। মনে হত, এই তো নন্দনকানন। আর, কবির বাড়িতে বসে গানের মহড়া চলত এক মাস আগে থেকে। একবার মনে আছে, দিদির গানটি তিনি গাইছেন। পরতে-পরতে সুর উঠছে। কি সুর কি রাগরাগিণী আমি কিছু জানি না, কেননা আমি সংগীতজ্ঞ নই। তবে রিহার্সেলের সময় দেখতুম, গানটি একেবারে চরমে উঠে থেমে যেত। যিনি অর্গ্যান বাজাচ্ছিলেন— কে এখন তা মনে নেই— একটা কাণ্ড করে বসলেন। শেষ যে নোটে গান শেষ হবে সেটি একটু ভুল বাজিয়ে দিলেন। জানি না, হয়তো বা গান শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, গলা একদিকে গান একদিকে, বড়ই বেখাপ্‌পা শোনালো। আমার দিদি তো হতভম্ব। আর, কবির অবস্থা অবর্ণনীয়। এক পাশে বসেছিলেন, তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, ভুরু কুঁচকে চোখ লাল করে যিনি বাজনা বাজাচ্ছিলেন তাঁকে এক ধমক, "কি করলে, তুমি সব মাটি করে দিলে।"

কবিপ্রিয়ার মধ্যে একটা জিনিস খুব উজ্জ্বল হয়ে ছিল, আর সেটা তাঁর জীবনপথের আলো হয়ে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত। সেটি শ্বশুরের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। কতবার যে তাঁর মুখে শুনেছি, "বাবামশায়ের মত এটা নয়, আমি এ কাজ কখনো করব না।" কবির সঙ্গে তর্ক করেছেন এভাবে, "বাবামশায় এটা পছন্দ করেন না, এটা আমি করব না।" কিংবা, "বাবামশায় থাকলে তুমি একাজ করতে পারতে?" এটা যেন তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

২ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র নীতীন্দ্রনাথ
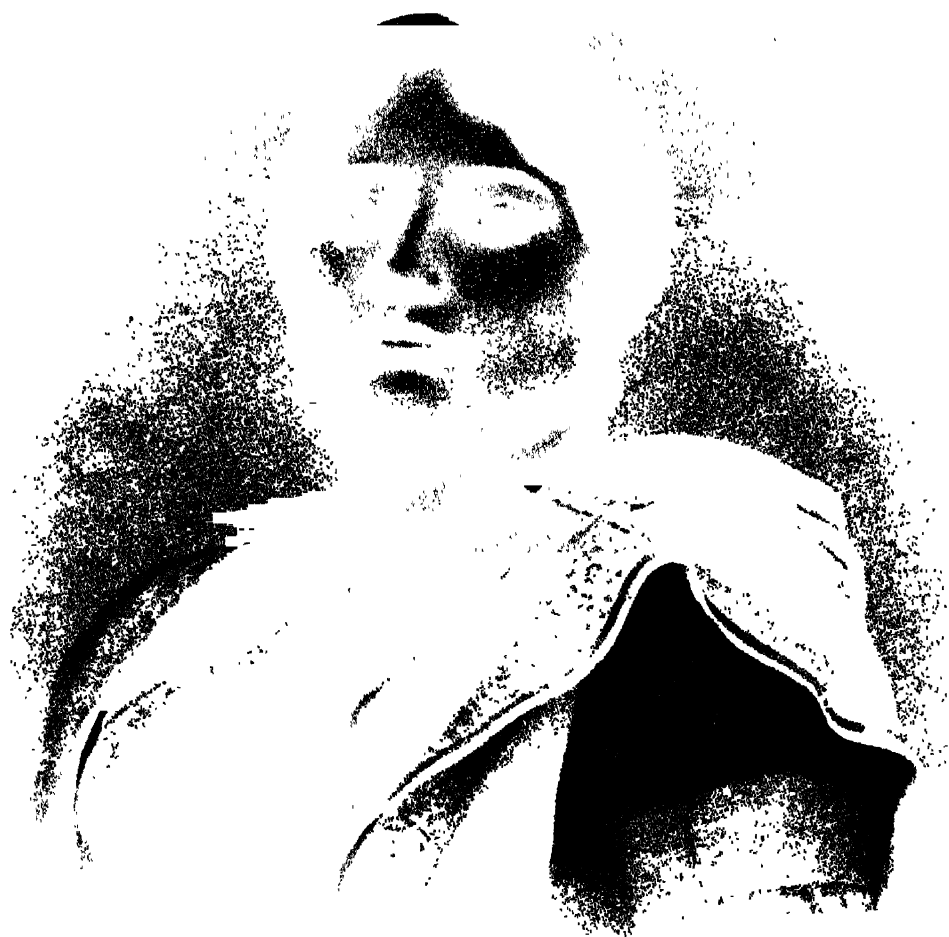
কবির সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী

রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাগণ

মধ্যস্থলে উপবিষ্ট জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা ; পশ্চাতে দণ্ডায়মান মধ্যমা কন্যা রেণুকা
দক্ষিণে দণ্ডায়মান কনিষ্ঠা কন্যা মীরা ; বামে দণ্ডায়মান কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ

মহর্ষিদেবের সন্তানদের মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন কনিষ্ঠটি। এই পুত্রবধূটির প্রতিও তাঁর স্নেহের অন্ত ছিল না। আর, প্রগাঢ় স্নেহ ছিল রথীর প্রতি। রথীর রঙ ময়লা এটা কিছুতে মহর্ষি স্বীকার করতেন না, বলতেন, "তোমরা কি যে বল, রথী তো রবির চেয়ে ফরশা।" এ নিয়ে তাঁর সামনে কেউ কিছু বলতে সাহস না পেলেও আড়ালে বেশ হাসাহাসি হত।

কবিপ্রিয়ার কিন্তু কবির উপর অখণ্ড প্রতাপ ছিল। কবি তাঁকে বেশ ভয় করতেন। তাঁর অভিমানও প্রবল ছিল, আর সে-অভিমান ভাঙতে কবিকে বেশ বেগ পেতে হত। কিন্তু, এঁটে উঠতে পারতেন না তিনি তাঁর মেজ মেয়েটিকে। রানী এক অদ্ভুত মেয়ে ছিল। কি যে এক সন্ন্যাসিনীর মন নিয়ে এসে জন্মেছিল ঐশ্বর্যের মধ্যে! বিধাতার অনেক অদ্ভুত খেয়ালই বোঝা যায় না তো! সব যে সুন্দর দেখতে ছিল তা নয়, কিন্তু চোখদুটির মধ্যে এমন একটি ভাব ছিল যে তা থেকে চোখ ফেরানো যেত না। শিশুকাল থেকে তার সাজগোজ ভালো লাগত না, চুলবাঁধা তো একটা বিরক্তিজনক ব্যাপার ছিল। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও তার ঔদাসীন্যের অন্ত ছিল না। মাছমাংস খাওয়ার স্পৃহামাত্র ছিল না। কিন্তু, জেদ ছিল প্রচণ্ড। সে যখন এক দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়াত তখন কারো সাধ্য ছিল না তাকে দিয়ে কিছু করার। এজন্য শাসন সে যথেষ্ট পেত। তার মা তো একেবারে অস্থির হয়ে পড়তেন এক-একসময়ে— "কি যে ছিষ্টিছাড়া মেয়ে জন্মেছে, আর পারি নে, বাপু!" এক-এক সময়ে বলতেন। রানী কিন্তু বকুনি শাসন শাস্তি সবেতেই অচল অটল। কবি কিন্তু তাঁর এই মেয়েটিকে খুব ভালোবাসতেন, তাকে বুঝতেনও হয়তো। লেগে যেত কবিপ্রিয়ার সঙ্গে আমার দিদির সঙ্গে রানীকে নিয়ে। তিনি বলতেন, "কাকিমা, আপনারা কেউ ওকে বোঝেন না। ওর মধ্যে যে একটা মহাপ্রাণ আছে তা আপনারা দেখেন না।" রানী যখন খোলা ছাতে মনের আনন্দে ছুটে বেড়াত, চুলগুলো তার বাতাসে নাচত—মনে হত একটি তেজী ঘোড়া যেন মুক্তির আনন্দে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। রানী সম্বন্ধে দুটো ঘটনা খুব উজ্জ্বল হয়ে আছে আমার মনে। নীতুবাবু রানীকে বড্ড ভালোবাসতেন, তার প্রত্যেক জন্মদিনে বেশ দামি দামি উপহার এনে দিতেন। একবার রানীর জন্মদিনে আমরাও গিয়েছি। 'লেড্‌ল'র বাড়ি থেকে একটা বাক্‌স এল নীতুবাবুর উপহার নিয়ে। বাক্‌স থেকে বেরোল এক বহুমূল্য ফ্রক, লেস ফ্রিল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি সিল্কের ফ্রক। ফ্রকের বাহার দেখে সকলেই খুব খুশি, সকলেই খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন। রানীকে ডেকে সেই ফ্রক তার গায়ে চড়ানো হল। সে হতভম্ব হয়ে আয়নার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একবার লেসগুলোতে হাত দেয় আর মুখ বাঁকায়, একবার ফ্রিলগুলো তুলে তুলে দেখে আর মুখ বাঁকায়। একটু পরে পট্‌পট্‌ করে লেসগুলো ফ্রিলগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ফ্রকটা টেনে গা থেকে খুলে ফেলে দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে তো হুলস্থুল! তার মা আমার দিদিকে ডেকে বললেন, "ও অমলা, দেখে যাও তোমার অসাধারণ বোনটির কাণ্ড। আমি এখন নীতুকে মুখ দেখাব কি করে?"— ইত্যাদি-ইত্যাদি। আমার দিদি তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে কৌচে বসলেন। সে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকিয়ে চুপ করে রইল। একটু পরে দিদি বললেন, "রানী, কাজটা ভালো কর নি, ভাই। তোমার মা দুঃখ পেয়েছেন, তোমার নীত্‌দা শুনলে কত দুঃখ পাবেন।" সে মুখ তুলল, বিষণ্ণ দুটি চোখ মেলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "অমলাদি, ওরা জানে আমি এসব ভালোবাসি নে, এসব পরতে আমার কষ্ট হয়, তবু কেন আমায় ওরা জোর করে পরায়?"

আর একবার মহাল থেকে মাছ এসেছে, সবাই ছুটে দেখতে গেছে। দুটো প্রকাণ্ড কাতলা মাছ তখনও একটু-একটু খাবি খাচ্ছে। সবাই নানারকম জল্পনা-কল্পনা করছে, মাছ দিয়ে কি-কি রান্না হবে। রানীও একপাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ সে আর্তস্বরে কেঁদে উঠল, "ও মা, মা গো, ওই মাছ তোমরা খাবে? ওরা যে এখনও বেঁচে আছে।" বলে দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে ছুটে পাশের ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কি তার কান্না!

একদিন কবি এসে বললেন, "ছোটবউ, রানীর বিয়ে ঠিক করে এলুম, মাঝে মাত্র তিনটি দিন আছে, তার পরদিন বিয়ে।" কবিপ্রিয়া অবাক হয়ে বললেন, "তুমি বল কি গো? এরই মধ্যে মেয়ের তুমি বিয়ে দেবে?" কবি বললেন, "ছেলেটিকে আমার বড্ড ভালো লেগেছে ছোটবউ, যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি মিষ্টি অমায়িক স্বভাব। রানীটা যে জেদী মেয়ে, ওর বর একটু ভালোমানুষ-গোছের না হলে চলবে কেন? আর সত্যেন বিয়ের দুদিন পরেই বিলেত চলে যাবে। সে ফিরতে ফিরতে রানী বেশ বড় হয়ে উঠবে।" কবিপ্রিয়া বললেন, "এই তিন দিনের মধ্যে সব জোগাড় কি করে হবে?" "হবে হবে, সব হবে, কলকাতা শহরে নাকি কিছু আটকায়? শুধু তুমি একটু প্রসন্ন মনে কাজে লেগে যাও তো, ছোটবউ, সব ঠিক হয়ে যাবে।" হলও তাই। তবে রানীর বিয়েতে সমারোহ বেশি কিছু হল না। রানী কিন্তু এ বন্ধনটা খুব খুশিমনে নিতে পারল না, তার ভুরু একটু কুঁচকেই রইল। বিয়ের পরই বর বিদায় হবে শুনে একটু নিশ্চিন্ত হল। বিয়ের সব কাজেই সে লক্ষ্মী মেয়ের মত মাথা নিচু করে রইল।

কিন্তু, ফুলের কুঁড়ি ফুটবার আগেই ঝরে পড়ার কথা ছিল। বিয়ের কিছুদিন পরেই রানী মাতৃহারা হয়, আর সত্যেন বিলেত থেকে ফেরার আগেই তাকে শেষ ব্যাধিতে ধরে। কবি এই মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্যে অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যয় করেন। দীর্ঘদিন রানীকে নিয়ে আলমোড়ায় ছিলেন, তারপর আশাহীন হয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। কবির জোড়াসাঁকোর নতুন বাড়িতে রানীর জন্য ছাতে ঘর তৈরি হল— চারদিক খোলা। রানী সেই ঘরে তার শেষ শয্যা পাতল। তারপর সে যতদিন বেঁচে ছিল, আমার দিদি সকালে উঠে তার কাছে যেতেন আর রাত্রে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ফিরতেন। শেষ কদিন দিনরাত্রিই থাকতেন। সে সমস্ত দিন বক্‌বক্ করে তার মনের কথা সব উজাড় করে দিত। দিদি মাঝে মাঝে বলতেন, "অত কথা বোলো না, রানী, শেষে কষ্ট হবে শরীরের।" সে হেসে বলত, "আর কতদিন কথা বলব, অমলাদি? যা বলার এইবার বলে শেষ করে নিই।" জীবনে যেমন মরণের সামনে দাঁড়িয়েও তাই— একেবারে অনাসক্ত। মাঝে মাঝে বলত, "বেচারা বাবা! আমি গেলে তাঁর বড্ড কষ্ট হবে।" আমার দিদি বলতেন, "ছিঃ রানী, এসব কথা কি বলতে আছে? শুনলে আমাদের কষ্ট হয় না?" সে একটু চুপ করে থেকে বলত, "আচ্ছা অমলাদি, তুমি ছোটবেলা থেকেই আমায় খুব ভালোবাস, না? যখন আমি বড্ড দুষ্টু মেয়ে ছিলুম, তখনও তুমি আমার উপর কখনও রাগ কর নি, তাই না?" কষ্টে চোখের জল চেপে তিনি বলতেন, "তুমি কখনও দুষ্টু মেয়ে ছিলে না, রানী।" তার মৃত্যুর পর আমার দিদি অনেক দিন বেঁচে ছিলেন, কিন্তু রানীর শোক যেন তাঁর নতুন হয়েই ছিল। তার কথা বলতে বড্ড ভালোবাসতেন, আবার বলতে বলতে চোখের জলেও ভাসতেন।

এক কথায় কত কথা এসে গেল তার ঠিক নেই। যাক, আমার মনে হয়, কবিপ্রিয়া যদি অকালে না চলে যেতেন তবে কবির শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা মূর্ত হয়ে উঠত সকল দিক দিয়ে।

ছেলেরা ঘর ছেড়ে এসে ঘর পেত, মাতৃস্নেহ পেত, রোগে সেবাযত্ন পেত, আর সুখে-দুঃখে সহানুভূতি পেত। কবি যে এ অভাবে কত অসহায় হয়েছিলেন তা তাঁর কথায় একদিন আমি বুঝেছিলুম। যখন আমার ছেলেকে রাখতে আমি শান্তিনিকেতনে যাই তখন আমায় বলেছিলেন, "তোমাদের ছেলেরা যে যত্নে মানুষ, এখানে কি থাকতে পারবে? এখানে অনেক কষ্ট। আমি তাদের সব দিতে পারি, মাতৃস্নেহ তো দিতে পারি না। রথীর মা সে-বিষয়ে আমায় অসহায় করে রেখে গেছেন।" তার দীর্ঘদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু তখনও সে-অভাব তিনি বোধ করছেন।

কবিপ্রিয়া স্বর্গতা হবার অনেকদিন পর কি একটা কারণে কবির সংসারে একটা ক্ষণিক বিপ্লব ঘটে। তখন একদিন তিনি আমার মেজদিদিকে বলেছিলেন, "দেখো, অমলা, মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে-কথা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোনো-একটা সমস্যায় পড়ি যেটা একা মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন। এবারেও আমি কঠিন সমস্যায় পড়েছিলাম, কিন্তু এখন আর আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই।"

কবিপ্রিয়ার বেশি ছবি নেই। তাঁর যে কয়টি ছবি আমি দেখেছি, তার একটিতেও তাঁর charm ভাল করে ফোটে নি।

সূর্যের কোষ্ঠী

শ্রীসুশোভন দত্ত

অনন্ত আকাশে বিরাজমান চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিষ্করাজির মধ্যে জ্যোতিষ্মান সূর্যই আদি মানবের নিকট বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। অন্ধকার রাত্রিশেষে উষাকালে দ্যুলোক ভূলোক আলোকিত করিয়া নবীন সূর্য যখন দিগন্তে দেখা দিত, প্রতি সন্ধ্যায় মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা ছড়াইয়া দিগন্তের সূর্য যখন অস্তাচলে যাইত, আদি মানবের বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। সভ্যতার আদি লীলাভূমি মিশর, পারস্য, গ্রীস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে নানারূপে সূর্যের পূজা ও বন্দনা হইত। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সূর্যের সেই শ্রেষ্ঠত্ব বহুল পরিমাণে খর্ব হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সন্ধান পাইয়াছেন বিশ্বকর্মার কারখানায় আরও বহু কোটি অনুরূপ সূর্য সৃষ্ট হইয়া নক্ষত্ররূপে অনন্ত আকাশে বিরাজ করিতেছে। আয়তন ও দীপ্তিতে সূর্য তাহাদের অনেকের অপেক্ষা হীন। বিশ্বকর্মার সৃষ্টিতে সূর্য একটি নগণ্য ও অতি সাধারণ বস্তু।

বিশ্বের দরবারে সূর্যের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও পৃথিবীবাসী জীবের নিকট সূর্যের প্রাধান্য চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সুদূর অতীতে বহুকোটি বৎসর পূর্বে কোন এক মাহেন্দ্রক্ষণে নিজের বাষ্পীয় দেহের অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথিবীর জন্ম দেওয়ার পর হইতে আজ পর্যন্ত সূর্যই পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎস ও জীবনের আধাররূপে বিরাজ করিতেছে। সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীতে আসা বন্ধ হইলে নিরালোক পৃথিবীর বুকে সব জীবনীশক্তি অচল হইয়া যাইবে। সূর্যের জীবন-মরণের সহিত আমাদের পৃথিবীর জীবন-প্রবাহের অতি নিকট-সম্বন্ধ বর্তমান। অতএব স্বার্থের খাতিরেও পৃথিবীবাসী বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সূর্যের জীবনীশক্তির উৎসের সন্ধান লওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

পৃথিবীর মানুষ সৃষ্টি হইবার পর সূর্যের জীবনযাত্রায় কোনোরূপ বিশেষ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যে জ্যোতিষ্মান সূর্যের মহিমা নির্বাক বিস্ময়ে দেখিয়াছিলেন, মধ্য-এসিয়ায় বা উত্তর-ভারতে বৈদিক ঋষি যে সূর্যের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া সবিতৃস্তব রচনা করিয়াছিলেন, পলাশীর রণক্ষেত্রে সায়াহ্নের যে অস্তগামী সূর্যকে সম্বোধন করিয়া বাংলার শেষ হিন্দুবীর মোহনলাল আক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সূর্য ও আজিকার সূর্যে কোনই পার্থক্য নাই। অবশ্য ইহা হইতে সূর্যের আয়ু অথবা জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত করা অর্থহীন—কারণ সূর্যের জীবন-পঞ্জীতে পৃথিবীতে মানব-সভ্যতার যুগ (কয়েক সহস্র বৎসর মাত্র) এক নিমেষতুল্য। ভূগর্ভে বিভিন্ন স্তরে প্রস্তরীভূত যে-সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেও প্রমাণ হয়, কয়েক কোটি বৎসরের মধ্যে সূর্যের দীপ্তি বা তেজ-বিকীরণের ক্ষমতার বিশেষ তারতম্য হয় নাই। সূর্যের তেজ-বিকীরণের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রার বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি হইবে। সূর্যের তেজ-বিকীরণের ক্ষমতা কমিয়া অর্ধেক হইলে পৃথিবীর সমস্ত জল জমিয়া বরফে পরিণত হইবে এবং তেজ-বিকীরণের ক্ষমতা চারিগুণ বৃদ্ধি পাইলে সমস্ত জল বাষ্পে পরিণত হইবে। বিগত কয়েক কোটি বৎসরের মধ্যে সূর্যের জীবনযাত্রায় এইরূপ পরিবর্তন ঘটিলে সেই অবস্থায় পৃথিবীতে আমাদের পরিচিত সাধারণ জীব বা উদ্ভিদের উদ্ভব বা স্থিতি সম্ভব হইত না।

প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ অথবা গণনা হইতে সূর্যের সঠিক বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। নক্ষত্রমণ্ডলীর চলাচল পর্যবেক্ষণের ফলে জ্যোতির্বিদেরা গণনা করিয়া বলিয়াছেন নক্ষত্রজগতের সৃষ্টি হইয়াছে ২০০ কোটি বৎসর পূর্বে। তাহারও পূর্বে ছিল বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করিয়া এক সূক্ষ্ম বাষ্পমাত্র। সূর্য নক্ষত্রজগতের বয়োজ্যেষ্ঠ, এইরূপ অনুমান করিবার কোনও সংগত কারণ নাই। এইরূপ অনুমান করিলেও সূর্যের বয়সের ঊর্ধ্ব সীমা ২০০ কোটি বৎসর।

পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করিতে পারিলে, সূর্যের বয়সের নিম্নসীমা জানা যায়, কারণ সূর্য হইতেই পৃথিবীর জন্ম। সূর্যের বাষ্পীয় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কতকাল পূর্বে পৃথিবীর জন্ম হয় তাহা সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলেও, পৃথিবীর জন্মের অল্পকাল পরেই ভূপৃষ্ঠ যে কঠিন স্তরে আবৃত হইয়া পড়ে তাহার বয়স নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর স্থানে স্থানে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম জাতীয় তেজস্ক্রিয় (radio-active) পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের পরমাণু হইতে অবিরত আল্‌ফা-কণা, ইলেকট্রন ও তেজরশ্মি নির্গত হয় এবং পরমাণুগুলি রূপান্তরিত হইয়া অবশেষে সীসকের পরমাণুতে পরিণত হয়। এই রূপান্তর-ক্রিয়া ঘটে অতি ধীর গতিতে—কিছু পরিমাণ ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম সম্পূর্ণ সীসকে পরিণত হইতে কয়েক শত কোটি বৎসর লাগিবে। ভূপৃষ্ঠে যে সকল স্থানে এই জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সেইখানে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সহিত কি পরিমাণে সীসক মিশ্রিত আছে, তাহার পরিমাপ করিতে পারিলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের কত অংশ সীসকে রূপান্তরিত হইয়াছে জানা যায় এবং ভূপৃষ্ঠের সেই স্তরের বয়স নির্ধারণ করা যায়। এইরূপ গণনার ফলে ভূপৃষ্ঠের কঠিন স্তরের বয়স ১৬০ কোটি বৎসর বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। পৃথিবীর জন্মকাল ১৬০ কোটি বৎসরের অল্প কিছু পূর্বে। অতএব সূর্যের বয়সের ঊর্ধ্ব সীমা ২০০ কোটি বৎসর এবং নিম্ন সীমা ১৬০ কোটি বৎসরের কিছু বেশি।

বৈজ্ঞানিকেরা সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সব পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রের মূল উপাদান হইতেছে কতকগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন।

কোন্ পরমাণুর কেন্দ্রে কতগুলি নিউট্রন ও প্রোটন আছে জানা থাকিলে নিউট্রন ও প্রোটন সমষ্টির ভর হইতে সেই পরমাণুর কেন্দ্রের ভর গণনা করা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা একটি খুব আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছেন। কয়েকটি নিউট্রন ও প্রোটন সংযোগে কোনও পরমাণুর কেন্দ্র গঠিত হইলে তাহার ভর সেই প্রোটন ও নিউট্রন সমষ্টির সম্মিলিত ভর অপেক্ষা সামান্য কম হয়। দুইটি নিউট্রন ও দুইটি প্রোটন সংযোগে একটি হিলিয়াম কেন্দ্র গঠিত হইলে ভর প্রায় শতকরা এক ভাগ কমিয়া যায়। বিজ্ঞান জড়ের বিনাশ স্বীকার করে না। নিউট্রন ও প্রোটন সংযোগে কেন্দ্রগঠনের সময় এই যে সামান্য জড়ের বিলোপ হইল তাহা রূপান্তরিত হয় প্রচণ্ড শক্তিতে। অধ্যাপক আইনস্টাইন জড় ও শক্তির পরস্পরের রূপান্তর সম্ভব, এই মত প্রথম প্রচার করেন। কি পরিমাণ জড়ের বিলোপে কতটা শক্তি সৃষ্টি হইবে তাহাও তাঁহার গণনা হইতে জানা যায়।

সূর্যের অভ্যন্তরেও যদি কোনও উপায়ে পরমাণুর কেন্দ্রের ভাঙাচোরা বা রূপান্তর-প্রক্রিয়া ঘটানো যায় তাহা হইলে প্রচণ্ড আণবিক শক্তি মুক্ত হইবে এবং সূর্যের অফুরন্ত শক্তির উৎস জোগাইবে। বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে খুব দ্রুতবেগশীল প্রোটন সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা আঘাতের ফলে পরমাণুর কেন্দ্র ভাঙিয়া রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয়। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও স্বতঃই তেজস্ক্রিয় পদার্থের

পরমাণু ব্যতীত কোনো সাধারণ পরমাণুর রূপান্তর কখনও ঘটে না। সূর্যে স্বতঃই সাধারণ পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রের ভাঙাচোরা ও রূপান্তর ঘটা কি সম্ভব ?

অ্যাট্‌কিন্‌সন্ হাউটার্ম্যান্ কয়েক বৎসর পূর্বে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছেন। সূর্যে সব পদার্থই বাষ্পীয় রূপে বর্তমান। বাষ্পীয় অবস্থায় সব পদার্থের পরমাণু দ্রুতগতিতে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায় এবং প্রতি সেকেণ্ডে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বার সংঘাত ঘটে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে পরমাণুর গতিবেগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়—পরস্পর সংঘর্ষও দ্রুততর হইতে থাকে। সাধারণ তাপমাত্রায় দুইটি পরমাণুর সংঘর্ষের ফলে তাহাদের কোনো প্রকার বিকৃতি বা রূপান্তর হইতে দেখা যায় না। অত্যধিক তাপমাত্রায় পরমাণুর স্বাভাবিক রূপ থাকে না এবং পরস্পর-সংঘর্ষের ফলে তাহাদের কেন্দ্রগুলির রূপান্তর ঘটিতে পারে। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা দেখাইয়াছেন অত্যধিক তাপমাত্রায় পরমাণুর বাহিরের কক্ষের ঘূর্ণীয়মান ইলেকট্রনগুলি একে একে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া যায়। কত তাপমাত্রায় কোন্ পরমাণু হইতে কি পরিমাণ ইলেক্ট্রন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, অধ্যাপক সাহার নিয়মানুসারে তাহা গণনা করা সম্ভব। সূর্যের কেন্দ্রে তাপমাত্রা দুই কোটি ডিগ্রি। এই তাপমাত্রায় পৌছিবার বহু পূর্বেই সব পদার্থের পরমাণুর বাহির কক্ষের ইলেক্ট্রনগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং পরমাণুর কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণরূপে ইলেক্ট্রন-খোলসমুক্ত হইবে। অতএব সূর্যের অভ্যন্তরে আছে কতকগুলি ইলেক্ট্রন-খোলস মুক্ত পরমাণুর কেন্দ্র এবং পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ইলেক্ট্রন। অত্যধিক তাপমাত্রার জন্য ইহাদের গতিবেগ দ্রুত হয় এবং পরস্পর-সংঘর্ষও খুব দ্রুত হয়। গতিশীল পদার্থ মাত্রেরই কিছু পরিমাণ গতিবেগজনিত শক্তি থাকে। গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গতিবেগ দ্বিগুণ হইলে শক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়, গতিবেগ তিন গুণ হইলে, শক্তি বৃদ্ধি পাইবে নয় গুণ। সূর্যের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রায় পরমাণুর কেন্দ্রগুলির গতিবেগজনিত শক্তি এত প্রচণ্ড হয় যে তাহাদের পরস্পরের সংঘর্ষে তাহাদের ভাঙাচোরা ও রূপান্তর ঘটা সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপায়ে পদার্থের পরমাণুর রূপান্তর ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন প্রোটন প্রভৃতি যে সকল কণিকা ব্যবহার করেন তাহাদের যে পরিমাণ শক্তি থাকে, দুই কোটি ডিগ্রি তাপ তাপমাত্রায় পরমাণুর কেন্দ্রের গতিবেগজনিত শক্তিও তাহার কাছাকাছি হইবে। অতএব অত্যধিক তাপমাত্রায় (বহু লক্ষ ডিগ্রী) নিয়ত সংঘর্ষের ফলে পরমাণুর কেন্দ্রগুলির ভাঙাচোরা ও রূপান্তর ঘটিতে থাকিবে—ফলে প্রচণ্ড আণবিক শক্তির অংশ মুক্ত হইয়া নির্গত হইবে। এইরূপ উত্তপ্ত অবস্থায় কিছু হাইড্রোজেন ও লিথিয়াম একত্রে থাকিলে কেন্দ্রগুলির নিয়ত সংঘর্ষের ফলে তাহারা হিলিয়াম কেন্দ্রে রূপান্তরিত হইতে থাকিবে এবং বহুল পরিমাণ আণবিক শক্তির সৃষ্টি হইবে। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইবে এবং অবশিষ্ট হাইড্রোজেন ও লিথিয়ম কেন্দ্রগুলির পরস্পর-সংঘর্ষ আরও দ্রুততর হইবে এবং তাহাদের হিলিয়াম কেন্দ্রে রূপান্তর আরও দ্রুত হইবে। একবার কোনও উপায়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিয়া প্রক্রিয়াটি আরম্ভ করিয়া দিলে সে প্রক্রিয়া আপনা হইতে চলিতে থাকিবে—বাহির হইতে আর উত্তাপের যোগান দিতে হইবে না।

কত তাপমাত্রায় পরমাণুর কেন্দ্রগুলির পরস্পর-সংঘর্ষে রূপান্তর ঘটিতে আরম্ভ করিবে ? যে সকল পরমাণুর কেন্দ্রের ভর এবং বিদ্যুৎভার অল্প, তাহাদের রূপান্তর অপেক্ষাকৃত অল্প তাপমাত্রায় ঘটিবে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলে ভারি কেন্দ্রগুলিরও রূপান্তর ঘটা সম্ভব হয়। অ্যাট্‌কিন্‌সন্ ও হাউটার্ম্যান্

কত তাপমাত্রায় কত আণবিক সংখ্যার পরমাণুর তাপমাত্রাজনিত সংঘর্ষের ফলে কি হারে রূপান্তর ঘটিবে তাহা গণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক গ্রাম হাইড্রোজেন ও লিথিয়াম পরমাণুর সংমিশ্রণ (এক ভাগ হাইড্রোজেন ও সাত ভাগ লিথিয়াম) সম্পূর্ণরূপে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হইলে ২২,০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ কেলরি আণবিক শক্তি নির্গত হইবে। কিন্তু তাপমাত্রা দশ লক্ষ ডিগ্রি হইলেও এই রূপান্তর এত ধীরে ধীরে ঘটিবে যে কয়েক পাউণ্ড হাইড্রোজেন ও লিথিয়াম সংমিশ্রণ হইতে প্রাপ্ত শক্তি হইতে একটি মোটরগাড়ি চালানো সম্ভব হইবে না। কিন্তু তাপমাত্রা ২ কোটি ডিগ্রি হইলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত হাইড্রোজেন ও লিথিয়ামের রূপান্তর ঘটিবে এবং সহসা প্রবল আণবিক শক্তি মুক্ত হওয়ার ফলে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হইবে। কিন্তু দুই কোটি ডিগ্রি তাপমাত্রাতে হাইড্রোজেনের সহিত অন্য ভারি পরমাণুর সংঘর্ষের ফলে রূপান্তর খুবই ধীরে ধীরে হয়। আবার আল্‌ফা-কণার সহিত খুব হাল্কা পরমাণু-কেন্দ্রের সংঘর্ষের ফলে রূপান্তর ৫ কোটি ডিগ্রি তাপমাত্রার কমে হয় না। সূর্যের কেন্দ্রে তাপমাত্রা ২ কোটি ডিগ্রি —এই তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্র (প্রোটন) এবং কোনও কোনও হাল্কা অণুর কেন্দ্রের সংঘর্ষে দ্রুত রূপান্তর ঘটা সম্ভব এবং তাহার ফলে সৌরতেজ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এডিংটন সূর্যের গঠনোপাদান-সম্বন্ধে যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় সূর্যে প্রচুর হাইড্রোজেন (শতকরা ৩৫ ভাগ) বর্তমান। কোন্ পদার্থের পরমাণুর সহিত হাইড্রোজেন কেন্দ্রের সংঘর্ষের ফলে সৌরতেজ সৃষ্টি হইতেছে অনুসন্ধান করিতে গেলে কোন্ কোন্ পরমাণুর সংঘর্ষজনিত রূপান্তরের ফলে আণবিক শক্তি সূর্য হইতে নির্গত শক্তির সহিত তুলনীয় তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। হাইড্রোজেন ও লিথিয়াম কেন্দ্রের সংঘর্ষের প্রশ্ন উঠে না, কারণ দুই কোটি ডিগ্রি তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন ও লিথিয়াম কেন্দ্র একত্র করিলে নিমেষের মধ্যে তাহাদের রূপান্তরের ফলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হইয়া সমস্ত সূর্য চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত। আবার দুই কোটি ডিগ্রি তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন ও ভারি কোনও পরমাণুর কেন্দ্র একত্র করিলে রূপান্তর এত ধীরে ধীরে হইবে যে তাহাতে সমস্ত সৌরতেজ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব।

অধ্যাপক বেটের (Bethe) গণনার ফলে কোন্ কোন্ পরমাণুর কেন্দ্রের সংঘর্ষ ও রূপান্তরের ফলে সৌরতেজ সৃষ্টি হইতেছে তাহা জানা গিয়াছে। সূর্যের অভ্যন্তরে কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রের সংঘর্ষে রূপান্তর-প্রক্রিয়া শুরু হয়। সংঘর্ষ ও রূপান্তরের ফলে শেষ পর্যন্ত কার্বন-কেন্দ্র অক্ষত দেহে বাহির হইয়া আসে এবং চারিটি প্রোটন ও ছয়টি ইলেক্ট্রনের সংযোগে আল্‌ফা-কণার সৃষ্টি হয়। প্রক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ হইতে প্রায় ৫০ লক্ষ বৎসর লাগে। সংঘর্ষের ফলে আজ যেসব কার্বন-কেন্দ্রের রূপান্তর শুরু হইল, বারবার রূপ পরিবর্তন করিয়া তাহারা আবার স্বকীয় কার্বন রূপ ফিরিয়া পাইবে প্রায় ৫০ লক্ষ বৎসর পরে। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, পৃথিবীতে তাপসৃষ্টির মূল উপাদান কার্বন—সূর্যেও তাপসৃষ্টির জন্য পরোক্ষভাবে সেই কার্বনেরই সহায়তা দরকার।

সূর্যের গঠনোপাদান বিশ্লেষণ করিলে শতকরা এক ভাগ কার্বন পাওয়া যায়। এডিংটনের গণনা অনুসারে সূর্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ শতকরা ৩৫ ভাগ। ২ কোটি ডিগ্রি তাপমাত্রায় এই পরিমাণ কার্বন ও হাইড্রোজেন-কেন্দ্রের সংঘর্ষে ও রূপান্তরের ফলে কি হারে তেজ নির্গত হওয়া সম্ভব বেটে তাহা গণনা করিয়াছেন। বেটের গণনায় দেখা যায় সূর্য হইতে নির্গত সমস্ত তেজ উপরোক্ত রূপান্তর-প্রক্রিয়ার ফলে পাওয়া যাইতে পারে। বেটের পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার ফলে সূর্যে কার্বনের পরিমাণের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না বটে,

কিন্তু হাইড্রোজেনের পরিমাণ ক্রমে হ্রাস পাইবে এবং হিলিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। স্বভাবতঃই আশঙ্কা হয় হাইড্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের তেজ বিকীরণের ক্ষমতা কমিতে থাকিবে —উজ্জ্বলতা ও তাপমাত্রা কমিয়া যাইবে—ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি নিঃশেষ হইয়া সূর্য মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অধ্যাপক গ্যামো আশ্বাস দিয়াছেন অদূর ভবিষ্যতে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তিনি দেখাইয়াছেন বর্তমানে সূর্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের উজ্জ্বলতা কমিবে না, পরন্তু বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আলোক বা তাপ বহন করার ক্ষমতা সব পদার্থের সমান নয়। হিলিয়াম এই বিষয়ে হাইড্রোজেন অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সূর্যে হাইড্রোজেন হ্রাস এবং হিলিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা কিছু বৃদ্ধি পাইবে কারণ সৌরতেজকে অধিক পরিমাণ হিলিয়াম-স্তর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে হইবে। এই আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হাইড্রোজেন-কেন্দ্রের হিলিয়াম-কেন্দ্রে রূপান্তর দ্রুততর হইতে থাকিবে এবং আরও বেশি তাপসৃষ্টি হইবে। অধ্যাপক গ্যামোর গণনা অনুসারে সূর্যে হাইড্রোজেন নিঃশেষ হওয়ার পূর্বে সূর্যের তেজ বিকীরণের শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে এবং সূর্যের আয়তনও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইবে।

সূর্যের তেজবিকীরণ শতগুণ বৃদ্ধি পাইলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পাইবে। সেই অবস্থা কল্পনা করা ভয়াবহ। সাগর মহাসাগর শুষ্ক হইয়া যাইবে—চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর ধূ ধূ করিবে। এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে বহু কোটি বৎসর লাগিবে ইহাই একমাত্র আশ্বাসের বিষয়। বিগত বহু লক্ষ বৎসরে সূর্যের হাইড্রোজেন শতকরা এক ভাগ হ্রাস পাইয়াছে এবং তজ্জনিত ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণিজগতে বিবর্তনের ফলে অধিকতর তাপসহ প্রাণীর উদ্ভব হইবে আশা করা অসংগত নয়। অবশ্য বর্তমান যুগের মনুষ্য অথবা প্রাণিজগতের উচ্চস্তরের কোনও জীবই সেই অবস্থা পর্যন্ত জীবন ধারণ করিতে পারিবে না।

সূর্যের সমস্ত হাইড্রোজেন নিঃশেষ হইলে তাহার জীবনীশক্তি শেষ হইবে। তখন ধীরে ধীরে সূর্যদেহের সংকোচন আরম্ভ হইবে —উজ্জ্বলতা কমিতে থাকিবে। ক্রমে ক্রমে সূর্য মৃত্যুপথে অগ্রসর হইবে।

সূর্যের সমস্ত হাইড্রোজেন নিঃশেষ হইবার পরেও কিছুকাল স্বীয় দেহ সংকোচনজনিত তাপসৃষ্টির ফলে সূর্যের পূর্ব গৌরব না থাকিলেও কিছু দীপ্তি থাকিবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সূর্যের তাপমাত্রা কমিয়া যখন পৃথিবী অথবা চন্দ্রের কাছাকাছি হইবে তখন সূর্যের অবস্থাটা দাঁড়াইবে কিরূপ? আমরা কল্পনা করিতে পারি সূর্য সেই অবস্থায় একটি বৃহদাকার পৃথিবীর রূপ ধারণ করিবে। ভূপৃষ্ঠ যেরূপ কঠিন স্তরে আবৃত কিন্তু কঠিন স্তরের নিম্নে গলিত ধাতব পদার্থ রহিয়াছে, সূর্যেও হয়ত সেইরূপ হইবে। কিন্তু বাস্তবিক সূর্যের বৃহদায়তন ও ভরের জন্য অনুত্তপ্ত অবস্থায় সূর্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পৃথিবী অথবা অন্যান্য গ্রহের মত হইবে না। কঠিন জড় বস্তুপিণ্ডের অভ্যন্তরে বাহিরের স্তরের পদার্থের চাপ পড়ে। এই চাপের পরিমাণ নির্ভর করে সেই বস্তুপিণ্ডের ভরের উপর। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে চাপের সৃষ্টি হয়, তাহা ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের বহু লক্ষ গুণ বেশি। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে চাপের পরিমাণ ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের দুই কোটি গুণ বেশি। আরও বড় জড়বস্তুপিণ্ডের অভ্যন্তরে চাপের পরিমাণ আরও অধিক হয়। বৃহস্পতির কেন্দ্রস্থলে চাপের পরিমাণ ভূপৃষ্ঠের বায়ুর চাপের প্রায় ১৫ কোটি গুণ বেশি। সূর্যের তাপমাত্রা কমিয়া সৌরপৃষ্ঠ কঠিন স্তরে আবৃত হইলে সূর্যের কেন্দ্রে চাপের পরিমাণ হইবে ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের কয়েক শত কোটি গুণ বেশি। সাধারণ কোনও পরমাণুর উপর এই পরিমাণ চাপ পড়িলে তাহারা অক্ষত দেহে থাকিতে

পারে না। বায়বীয় পদার্থের উপর সামান্য চাপ দিলেই সংকোচন হয় এবং পরমাণুগুলির পরস্পর দূরত্ব কমিয়া যায়। কিন্তু কঠিন পদার্থের পরমাণুগুলি এত ঘননিবিষ্ট ভাবে অবস্থিত যে খুব বেশি চাপ দিলেও তাহাদের দূরত্ব বিশেষ কমিতে পারে না এবং সেইজন্যই চাপের ফলে কঠিন পদার্থের বিশেষ সংকোচনও হয় না। কিন্তু চাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে থাকিলে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হইবে যখন পরমাণুগুলির পূর্বরূপ আর থাকিবে না। তাহাদের বাহিরের ইলেক্ট্রনের খোলস চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। সাধারণ অবস্থায় পদার্থমাত্রই কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। পরমাণুগুলির প্রত্যেকের স্বকীয় ইলেক্ট্রনের আবেষ্টনী আছে। একটি কেন্দ্রের চতুর্দিকে যতখানি জায়গা অধিকার করিয়া ইলেক্ট্রনগুলি ঘুরিতে থাকে, তাহার ভিতরে অন্য কোনও পরমাণুর প্রবেশ নিষেধ। সাধারণ অবস্থায় একটি পরমাণুর ইলেক্ট্রন আর-একটি পরমাণুর ইলেক্ট্রনের আবেষ্টনীর ভিতরে প্রবেশ করে না। কিন্তু চাপের মাত্রা অত্যন্ত বেশি (ভূপৃষ্ঠের বায়ুর চাপের বহু কোটি গুণ অধিক) হইলে পরমাণুর ইলেক্ট্রন-আবেষ্টনীর অস্তিত্ব আর থাকে না। সেই অবস্থায় পদার্থকে আর কতকগুলি স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ পরমাণুসমষ্টিরূপে গণ্য করা চলিবে না—থাকিবে কতকগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট পরমাণু-কেন্দ্র এবং বিচ্ছিন্ন ইলেক্ট্রনসমষ্টি। সেই অবস্থায় বস্তুপিণ্ডের আয়তনও খুব সংকুচিত হইবে, কারণ সম্পূর্ণ পরমাণুর আয়তনের তুলনায় কেন্দ্র অথবা ইলেক্ট্রনের আয়তন লক্ষ গুণে ক্ষুদ্র।[১] অতএব কঠিন পদার্থের উপর চাপ পড়িলে সাধারণ অবস্থায় তাহাদের আয়তনের বিশেষ পরিবর্তন না হইলেও চাপের মাত্রা একটি সীমা অতিক্রম করিলে কঠিন পদার্থের দেহেরও দ্রুত সংকোচন হইতে থাকে। কঠিন পদার্থের এই অবস্থা বায়বীয় পদার্থের সহিত তুলনীয়। কি পরিমাণ চাপ পড়িলে অণুর ইলেক্ট্রন-আবেষ্টনী ভাঙিয়া কঠিন পদার্থের এইরূপ বিকৃতি ঘটিবে তাহা প্রথম গণনা করিয়া বলেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডি, এস, কোঠারী। অধ্যাপক কোঠারী গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, চাপের মাত্রা ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের ১৫ কোটি গুণ বেশি হইলে সাধারণ পদার্থের পরমাণুর ইলেক্ট্রন-আবেষ্টনী ভাঙিয়া যাইবে। সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির অভ্যন্তরে পদার্থের উপর প্রায় এই পরিমাণ চাপ পড়ে। অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় না থাকিলে বৃহস্পতি অপেক্ষা বৃহৎ যে-কোনও বস্তুপিণ্ডের অভ্যন্তরে চাপের ফলে পদার্থের পরমাণুর এই প্রকার বিকৃতি ঘটিবে এবং সংকোচনের ফলে তাহাদের আকার অনেক ছোট হইয়া যাইবে। অধ্যাপক কোঠারীর গণনার ফলে দাঁড়াইল—অনুত্তপ্ত অবস্থায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনও বস্তুপিণ্ড বৃহস্পতি অপেক্ষা বৃহদায়তন হইতে পারে না। মৃত সূর্যের আয়তনও বৃহস্পতি অপেক্ষা ছোট হইবে।

নক্ষত্রের মৃত্যুর পর তাহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে সেই সম্বন্ধে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এস্ চন্দ্রশেখর বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। মৃত নক্ষত্রের আয়তন তাহার ভরের উপর নির্ভর করিবে। কত ভর হইলে আয়তন কত বড় হইবে তাহা চন্দ্রশেখরের গণনা হইতে জানা যায়। স্বল্পভর বস্তুপিণ্ড-সমূহের আয়তন ভরের বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কিন্তু বস্তুপিণ্ডের ভর যখন বৃহস্পতি অপেক্ষা অধিক হইবে তখন আর এই নিয়ম চলিবে না। তখন কিন্তু ভর বৃদ্ধির সহিত আয়তন ক্ষুদ্র হইতে থাকিবে।

ইঁহাদের গণনা অনুসারে কোনও মৃত নক্ষত্রের ভর পৃথিবীর ভরের ৫ লক্ষ গুণ হইলে তাহার আকার তিরোহিত হওয়া উচিত। মৃত সূর্যের ব্যাস বৃহস্পতির দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র হইবে। এইরূপ সংকুচিত অবস্থায় সৌর পদার্থের বস্তুগুরুত্ব হইবে গড়ে জলের গুরুত্বের ৩০ লক্ষ গুণ। বাহিরের স্তর অপেক্ষা ভিতরের স্তরের পদার্থের গুরুত্ব অবশ্য বেশি হইবে। চন্দ্রশেখরের গণনায় মৃত সূর্যের কেন্দ্রে এক বর্গ ইঞ্চি পদার্থের ওজন হইবে ৪৬৮ টন। অসম্ভব মনে হইলেও এইসব বৈজ্ঞানিকের কল্পনা অলীক নয়।

---

১ পরমাণুর ব্যাসের পরিমাণ ০০০,০০০,০০৪ ইঞ্চি। ইলেকট্রনের ব্যাসের পরিমাণ, ০০০,০০০,০০০,০০০,০৮ ইঞ্চি মাত্র। কেন্দ্রের আকারও ইলেকট্রনের সহিত তুলনীয় কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও ক্ষুদ্র।

'সাহিত্য'

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

'সাহিত্য' শব্দটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন শব্দ হইলেও ব্যবহারে অতিপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভাষার সাহায্যে সর্ববিধ রূপসৃষ্টি বা রসসৃষ্টির প্রয়াস আজকাল 'সাহিত্য' শব্দের দ্বারাই অভিহিত হয়, অন্ততঃ ছান্দস-ভাষাজাত আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে। আজকাল আমরা যে ব্যাপক অর্থে 'সাহিত্য' কথাটির ব্যবহার করি প্রাচীনেরা সেই ব্যাপক অর্থেই 'কাব্য' কথাটি ব্যবহার করিতেন। কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতির নাটক এবং সুবন্ধুর বাসবদত্তা, বাণভট্টের কাদম্বরী, হর্ষচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ কাব্য-সংজ্ঞাতেই সংজ্ঞিত হইত। ছন্দোবন্ধের সংস্কারের দ্বারা কাব্যশব্দটির পরিধিকে এখন আমরা অনেকখানি সঙ্কুচিত করিয়া লইয়া তাহাকে 'সাহিত্যে'র অন্তর্বর্তী করিয়া লইয়াছি। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের 'পোয়েট্রি' এবং 'লিটারেচর' শব্দ-দুইটির ব্যবহারও লক্ষণীয়। কাব্য শব্দের ন্যায় 'পোয়েট্রি' শব্দের পূর্বে একটা ব্যাপক অর্থ ছিল; সাহিত্য-তত্ত্বকে আজকালও 'পোয়েটিক্স্' বলা হইলেও 'লিটারেচর' বৃহত্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া পোয়েট্রিকে কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছে।

সাহিত্য শব্দটিকে আজকাল আমরা যে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি, শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়ের ভিতরে সেই অর্থটি বীজাকারে নিহিত থাকিলেও কালের বিবর্তনে তাহার অর্থের সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। আমরা বাংলায় এই শব্দটিকে সংস্কৃত হইতে গ্রহণ করিয়াছি; সংস্কৃতে কাব্য-শব্দের পরিবর্তে সাহিত্য-শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের; আর আধুনিক কালেও সংস্কৃতে সাহিত্য শব্দটি কাব্য শব্দটিকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই, শুধু কাব্য শব্দের সমার্থক হিসাবেই ব্যবহৃত। কাব্য শব্দের সমার্থকরূপে সাহিত্য শব্দের ব্যবহার আলঙ্কারিকগণকর্তৃকই প্রচলিত; সুতরাং ইহার তাৎপর্য আলঙ্কারিকগণের আলোচনা হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আলঙ্কারিকগণের ব্যবহারসম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে অন্যান্য বিবিধ গ্রন্থে শব্দটির সাধারণ ব্যবহার এবং তাহার সঙ্গে বাংলায় বর্তমানে প্রচলিত ব্যবহারের সঙ্গে কোথায় কতটুকু যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় তাহাই প্রথমে লক্ষণীয়; আলঙ্কারিকগণের আলোচনা পরে বিশদভাবে করা যাইবে।

সাহিত্য শব্দটির সাধারণ অর্থ 'মেলন'; সহিতের ভাব এই অর্থে 'সহিত' শব্দের উত্তর ষ্য-প্রত্যয়-যোগে শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। হিতের সহিত যাহা বর্তমান তাহাই 'সহিত', এবং এই সহিতের ভাবই সাহিত্য এমন একটা কথা সাধারণে প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু এই অর্থে শব্দটির ব্যবহারের কোন প্রাচীন নজির নাই; অতএব উহাকে আমরা আধুনিক সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা বলিয়া গণ্য করিব। 'মেলন' অর্থে সাহিত্য শব্দের ব্যবহারের অনেক প্রাচীন নজির রহিয়াছে।[১] এই 'মেলন'-অর্থটির সহিতই অন্বিত হইয়া আছে আর একটি অর্থ—বহু জিনিসের 'একক্রিয়ান্বয়িত্ব'। 'শ্রাদ্ধবিবেকে' সাহিত্য-শব্দের ব্যাখ্যায়

---

(১) একার্থচর্যাং সাহিত্যং সংসর্গং চ বিবর্জয়েৎ। কামন্দক-নীতিসূত্র। Sanskrit Worterbuch দ্রষ্টব্য

বলা হইয়াছে, 'পরস্পরসাপেক্ষাণাং তুল্যরূপাণাং যুগপদেকক্রিয়ান্বয়িত্বং সাহিত্যম্।'[২] পরস্পর আপেক্ষিক একই রকমের বহু বস্তুর একই সময়ে এক ক্রিয়ার সহিত যে অন্বয়ের ভাব তাহাকেই বলা হয় সাহিত্য। 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা'তেও বলা হইয়াছে, 'তুল্যবদেকক্রিয়ান্বিত্বম্। বুদ্ধিবিশেষবিশেষ্যত্বং বা।'[৩] 'সারমঞ্জরী'তে এই একক্রিয়ান্বয়িত্বের দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে, যেখানে কোন ধর্মানুষ্ঠানের ক্রিয়াকাণ্ডে বলা হয়,—ধব-খদির-পলাশ-প্রভৃতিকে ছেদন কর, সেখানে তাহারা একই ধর্মানুষ্ঠানের করণরূপে প্রতিযোগিক; এই পরস্পরপ্রতিযোগিকরূপে তাহারা একই ছেদনক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয়, ইহাই তাহাদের সাহিত্য। (সাহিত্যং একক্রিয়ান্বিত্বম্। তদ্‌যথা—ধব-খদির-পলাশাংশ্ছিন্ধি ইত্যত্র ধব-খদির-পলাশ-প্রতিযোগিকং যৎ সাহিত্যং তন্নিরূপিতং যদবয়ব-বিভাগরূপফলং তজ্জনিকা যা ছিদিক্রিয়া তদনুকূলকৃতিমাংস্তম্।[৪]

সাহিত্য-শব্দের ভিতরে এই যে একটি একক্রিয়ান্বয়িত্বের অর্থ নিহিত রহিয়াছে সাহিত্য-শব্দের আধুনিক প্রয়োগের ভিতরে তাহার একটা গভীর সার্থকতা লক্ষ্য করিতে পারি। সমস্ত প্রকারের সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতরেই আমরা এই জাতীয় একটা একক্রিয়ান্বয়িত্ব লক্ষ্য করিতে পারি। একটি বিপুলায়তন সাহিত্যক নির্মিতির ভিতরে আমরা বহুবিধ উপকরণের সমাবেশ করি; এই উপকরণগুলি আপাততঃ যতই বিভিন্ন প্রকৃতির মনে হোক না কেন, মূলে তাহারা পরস্পরসাপেক্ষ এবং একক্রিয়ান্বয়ী। গল্পাংশের প্রতিটি ঘটনার সহিত প্রতিটি ঘটনার যোগ রহিয়াছে, প্রতিটি চরিত্র, তাহাদের কার্যকলাপ এবং সংলাপ, প্রতিটি বাক্য, বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি পদ—ইহার কেহই কোথাও অন্য-নিরপেক্ষ নহে; সমস্ত জুড়িয়া একটি বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই বিশেষ প্রয়োজনের সিদ্ধির নিমিত্ত একটি বিশেষ পরিকল্পনা রহিয়াছে। সাহিত্যের স্বরূপসম্বন্ধে যতই মতান্তর থাকুক না কেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য হইল একটা আনন্দের আয়োজন; এই মূল প্রয়োজনকে অবলম্বন করিয়া জাগিয়া ওঠে একটি বিশেষ পরিকল্পনা, সেই বিশেষ পরিকল্পনাদ্বারাই সাহিত্যের বিভিন্ন অংশগুলি এবং উপকরণগুলি একার্থের সহিত অন্বিত হইয়া ওঠে। এই পরিকল্পনা কতখানি যে সাহিত্যিকের নিজের—আর কতখানি যে তাঁহার 'অন্তর্যামী'র তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে; তবে একথা সত্য যে জ্ঞাতে হোক, অজ্ঞাতে হোক—অর্থাৎ সাহিত্য-স্রষ্টার সচেতন প্রচেষ্টায় হোক অথবা অবচেতন-নিয়ন্ত্রিত সহজ স্বধর্মে হোক—রসবেদনের সঙ্গেই প্রায় অভিন্নরূপে জাগিয়া ওঠে একটি প্রকাশ-পরিকল্পনা। অন্তরের ভিতরে প্রথমানুভূত রসবেদনটি যতই তাহার চারিপার্শ্বস্থিত পরিমণ্ডলটিতে নিজেকে বিকীর্ণ করিয়া প্রসারিত করিতে থাকে ততই আমাদের চিত্তে কলাকৌশলের একটা পরিকল্পনা প্রসার লাভ করিতে থাকে। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সেই পরিকল্পনা সৃষ্টির সকল অংশ ও উপকরণকে একটা গভীর বন্ধনে পরস্পরসাপেক্ষ এবং একক্রিয়ান্বয়ী করিয়া তোলে।

আলঙ্কারিকগণের মধ্যে ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে সাহিত্য কথাটির প্রথম আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—

শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যং গদ্যং পদ্যঞ্চ তদ্দ্বিধা (১।১৬)

শব্দ এবং অর্থের যে সাহিত্য বা মেলন তাহাই কাব্য। ভামহ তাঁহার আলোচনায় এই শব্দ এবং অর্থের সাহিত্য-সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা করেন নাই, কিন্তু সে আলোচনা অতি নিপুণভাবে

---

(২) শব্দকল্পদ্রুম। (৩) ঐ। (৪) ঐ।

করিয়াছেন তাঁহার শিষ্যস্থানীয় লেখক রাজানক কুন্তল (বা কুন্তক)।[৫] কুন্তলই সর্ব প্রথমে সাহিত্য শব্দটিকে কাব্য-শব্দের সমার্থকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। কাব্যালোচনার প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন—

সাহিত্যার্থসুধাসিন্ধোঃ সারমুন্মীলয়াম্যহম্।

কুন্তলের সকল আলোচনার ভিতর হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি যে কাব্য এবং সাহিত্য কথা দুইটিকে সমার্থকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কারণ, তাঁহার মতে সর্বপ্রকারের একটা 'সাহিত্য' বা সঙ্গতিই সকল কাব্যরচনার ভিতরে প্রধান কথা। তিনি এই সাহিত্যার্থসুধাসিন্ধুর সারবস্তুকে আবিষ্কার এবং প্রকাশ করিতে কেন ব্রতী হইয়াছেন তাহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ ত্রিভুবনের ভাবসকলকে যথাতত্ত্ব বিবেচনা করিবার চেষ্টা করেন; অর্থাৎ ভাব যে-রূপের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং যে-রূপের সহিত সে প্রায় অদ্বয়যোগে যুক্ত হইয়া আছে তাহাকে বাদ দিয়া তত্ত্বমাত্ররূপে তাঁহারা ভাবকে বিবেচনা করিতে এবং বুঝিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু এ চেষ্টা একটা ব্যর্থ চেষ্টা; কারণ এ চেষ্টাদ্বারা আমরা ভাবকে যে তত্ত্বমাত্রে লাভ করি তাহার ভিতরে ভাবের বিস্ময়কর রহস্য অনেকখানিই হয়তো আমরা হারাইয়া ফেলি। কিংশুকপুষ্পকে তাহার বাহিরের সকল রূপকে বাদ দিয়া যদি কেবল রক্তমাত্র বলিয়া গ্রহণ করা যায়, ভাবকেও শুধু যথাতত্ত্বে অবস্থিত বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলেও সেইরূপ হইবে। এই চেষ্টা দ্বারা মানুষ স্ব স্ব মনীষাবলেই ভাবসমূহের কতগুলি তত্ত্ব যথারুচি আবিষ্কার করিয়া লয়,—এই জাতীয় যথাভিমত তত্ত্বদর্শনের ফলে জ্ঞানদার্ঢ্যই প্রকাশিত হয়, ভাবের পরমার্থ বা যথার্থ স্বরূপ হয়তো ইহাতে লাভ হয় না,—পরমার্থ হয়তো আমরা এইরূপে যেমন করিয়া কল্পনা করি মোটেই তাদৃশ নয়। সুতরাং ভাবের এই জাতীয় স্বতন্ত্র তত্ত্ব—অর্থাৎ সৃষ্টির ভিতর দিয়া রূপের ভিতর দিয়া তাহার যে প্রকাশময় সত্তা তাহাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া ভাবের একটি 'অসঙ্গ' 'কেবল'-তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা ভুল। এইজন্য ভাব এবং রূপ ইহার ভিতরকার যে সাহিত্য তাহার সার-রহস্য উদ্ঘাটন করিবার মানসেই কুন্তল এই সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন।[৬] কাব্য বা সাহিত্যের সারবস্তু যে 'অদ্ভুতামোদচমৎকার' তাহা দ্বিতয়—অর্থাৎ দ্বিবিধলক্ষণযুক্ত; তাহার একদিকে রহিয়াছে তত্ত্ব, অন্যদিকে রহিয়াছে নির্মিতি—

যেন দ্বিতয়মপ্যেতত্তত্ত্বনির্মিতিলক্ষণম্।
তদ্বিদামদ্ভুতামোদচমৎকারং বিধাস্যতি ॥

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কুন্তল এখানে সাহিত্য কথাটিকে একটি গভীর অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভাব সর্বদা প্রকাশাশ্রয়ী—রূপাশ্রয়ী; বিশ্বসৃষ্টিকে বুঝিতে হইলে তাহার

---

(৫) দ্রষ্টব্য, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সাহিত্য-পরিচয়

(৬) যথাতত্ত্বং বিবেচ্যন্তে ভাবাস্ত্রৈলোক্যবর্তিনঃ।
যদি তন্নাদ্ভুতং ন স্যাদেব রক্তা হি কিংশুকাঃ ॥
স্বমনীষিকয়ৈবাথ তত্ত্বং তেষাং যথারুচি।
স্থাপ্যতে প্রৌঢ়িমাত্রং তৎপরমার্থো ন তাদৃশঃ ॥
ইত্যসত্তর্কসংদর্ভে স্বতন্ত্রেঽপ্যকৃতাদরঃ।
সাহিত্যার্থসুধাসিন্ধোঃ সারমুন্মীলয়াম্যহম্ ॥

অন্তর্নিহিত ভাবসমূহকে নিছক অশরীরী তত্ত্বমাত্রে পর্যবসিত করিয়া সৃষ্টির অন্তর্নিহিত রহস্যকে আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। জগতের দার্শনিকগণ সর্বদা এই চেষ্টা করিতেছেন; তাহার ফলে তাঁহারা জগৎসম্বন্ধে তাঁহাদের স্ব স্ব মনীষার সাহায্যে এবং ব্যক্তিগত রুচিমত যে তত্ত্বসৌধ গড়িয়া তুলিতেছেন তাহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত মনীষারই পরিচায়ক, সৃষ্টির অন্তর্নিহিত বাণী হয়তো তাহার ভিতরে কিছুই ধরা পড়ে নাই। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত বাণীকে লাভ করিতে হয় তাই সাহিত্যের ভিতর দিয়া—ভাবের সহিত রূপকে এক করিয়া গ্রহণ করিয়া। রূপে ভাবে মিলাইয়া মিশাইয়া বিশ্বভুবনের এই বাণী আবিষ্কার করিতেছেন যুগে-যুগে কালে-কালে সব কবিগণ—সকল শিল্পিগণ। ভাব ও রূপের ভিতরে এই যে সাহিত্য তাহা ধরা পড়িয়াছে যাহার ভিতর দিয়া তাহাই তো যথার্থ সাহিত্য।

কাব্যের ভিতরে এই ভাব এবং রূপ দেখা দেয় অর্থ এবং শব্দরূপে। শব্দ এবং অর্থের ভিতরে যে সম্বন্ধ তাহা নিত্য এবং অদ্বয়, এরূপ একটি বিশ্বাস প্রাচীন ভারতীয়দের মনে দৃঢ়বদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। স্ফোটবাদিগণের মতে শব্দ এবং অর্থ উভয়ই একটি চিৎশক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র;—একটি বীজের ভিতরে একটি বৃক্ষের প্রকাশ যেমন করিয়া লীন হইয়া থাকে, সমস্ত অর্থ এবং শব্দও তেমন করিয়াই একটি চিৎশক্তির ভিতরে লীন হইয়া থাকে। এই চিৎশক্তিই আপনাকে ক্রমান্বয়ে অর্থ ও শব্দের ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশ করে। যে শক্তি নিজেকে বুদ্ধিবৃত্তির ভিতরে অর্থরূপে প্রকাশিত করে তাহারই বহিঃপ্রকাশ শব্দে। কবি কালিদাসও শব্দ ও অর্থের ভিতরকার সম্বন্ধকে একাধিক স্থলে পার্বতী-পরমেশ্বরের নিত্য অদ্বয় সম্বন্ধের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[৭] কুন্তলও তত্ত্ব ও নির্মিতির সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে মহাদেবকে নমস্কার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

জগৎত্রিতয়বৈচিত্র্যচিত্রকর্ম বিধায়িনম্।
শিবং শক্তিপরিস্পন্দমাত্রোপকরণং নুমঃ॥

এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে শুধু তত্ত্বরূপী শিব বসিয়া নাই—সেই তত্ত্বরূপী শিবের সহিত রহিয়াছে শক্তিপরিস্পন্দ; সেই শক্তিপরিস্পন্দই তো শিবরূপ তত্ত্বের প্রকাশ। সেই তত্ত্ব এবং প্রকাশে মিলিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। বিশ্বসৃষ্টি এবং সাহিত্যসৃষ্টির ভিতরে আমরা দেখিতে পাই একই সত্য; তত্ত্ব ও প্রকাশের অদ্বয়রূপের ভিতরে যেমন নিহিত রহিয়াছে বিশ্বসৃষ্টির মর্মবাণী, ভাব ও ভাষার নিবিড়তম যোগের ভিতরেই তেমনি নিহিত রহিয়াছে যথার্থ কাব্যপ্রাণ। এই ভাব ও ভাষা—অর্থ ও শব্দের ভিতরে যেখানে গভীর সাহিত্য বা মেলন নাই সেখানে তাহার ভিতর দিয়া জগৎ বা জীবনের বাণীও ধরা পড়ে নাই—তাই সে কাব্যসৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে নাই।

কুন্তল বলিয়াছেন, যদিও শব্দ ও অর্থের ভিতরে আসলে কোন ভেদ নাই এবং একটি হইতে অপরটির কোন স্পষ্ট পৃথক্ সত্তা নাই, তথাপি কাব্যের ভিতরে শব্দ ও অর্থের মিলন কিরূপ সুষ্ঠু হইলে সে একটা অপূর্ব বৈচিত্র্যপ্রকাশের ভিতর দিয়া রসিকজনের আহ্লাদকারী হইয়া উঠিতে পারে তাহা দেখাইবার

---

(৭) বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ॥ রঘুবংশ ১।১
তমর্থমিব ভারত্যা সুতয়া যোক্তুমর্হসি। কুমারসম্ভব ৬।৭৯

জন্যই শব্দ ও অর্থকে দুই বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। শব্দ ও অর্থের ভিতরে এইজাতীয় একটা ভেদ স্বীকার করিয়া কুন্তল কাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শব্দ ও অর্থের যে সম্মিলন তাহাই সাহিত্য বা কাব্য।

শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি॥

ইহার ব্যাখ্যায় কুন্তল বলিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থরূপ বাচক ও বাচ্যের সাহিত্য বা সম্মিলনেই যে কাব্য সৃষ্ট হয় এ-কথা বলিবার দুইটি তাৎপর্য। প্রথমতঃ একদল লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন 'কবিকৌশলকল্পিতকমনীয়তাতিশয়' শব্দ দ্বারাই উত্তম কাব্য রচিত হইতে পারে; আবার একদলে বলেন, ভাষা বা প্রকাশভঙ্গির উপরে কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে না,—'রচনাবৈচিত্র্যচমৎকারকারি' বাচ্য বা অর্থ-দ্বারাই উত্তম কাব্য নির্মিত হইতে পারে। কুন্তল এই উভয়পক্ষকেই নিরস্ত করিবার জন্য শব্দার্থের সাহিত্যের উপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রতি তিলে যেমন করিয়া তৈল অবস্থান করে বাক্যার্থের সাহিত্যের ভিতরেই তেমন করিয়া রসিক-হৃদয়ের আহ্লাদকারিত্ব অবস্থান করে,—ইহার কোনও একটির ভিতরেই এই হ্লাদকারিত্ব-শক্তি পৃথক পৃথক রূপে বর্তমান থাকে না। যেখানে এই সাহিত্য-বিরহ যতটুকু ঘটিয়াছে সেইখানেই ততটুকু কাব্যত্বহানি ঘটিয়াছে। যেখানে গভীর ভাব বা অর্থ রহিয়াছে, অথচ সমর্থবাচকের অভাব সেখানে ভাব বা অর্থ আপনার ভিতরে আপনি স্ফূর্তি পাইয়াও মৃতকল্প হইয়া অবস্থান করে; আবার শব্দের সঙ্গেও যেখানে উপযোগী বাক্যের যোগ ঘটে নাই সেখানে বাচ্য ব্যতীত বাচক বাক্যের ব্যাধিভূত রূপেই প্রতিভাত হয়।[৮]

শব্দার্থের সাহিত্যের দ্বারা কুন্তল এই যে কাব্যত্বসংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া দিলেন, আমরা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, মোটামুটিভাবে কাব্য-বিচারে এই সংজ্ঞাই আমাদের প্রধান সহায়। আমরা পূর্বেও দেখিয়াছি, কুন্তল কাব্যের সারবস্তুকে 'তত্ত্বনির্মিতি-লক্ষণ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নির্মিতিকে বাদ দিয়া তত্ত্ব অথবা তত্ত্বকে বাদ দিয়া নির্মিতি ইহার কোনটাই সাহিত্যপদবাচ্য নহে। এই সংজ্ঞা-দ্বারা বিচার করিলেই আমরা দেখিতে পাইব, কোনটা যথার্থ কাব্য আর কোনটা অকাব্য তাহা অতি সহজেই ধরা পড়িবে। পদে পদে উপমার প্রাচুর্য সত্ত্বেও যে কালিদাস জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি তাহার কারণ তাঁহার কাব্যে ভাব বা অর্থ এবং শব্দ বা ভাবের বহিঃপ্রকাশের সাহিত্য বা সুসঙ্গতি। 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' বা 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' প্রভৃতির ভিতরে যেটুকু শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারের আয়োজন রহিয়াছে তাহা ভাবের সহিত অটুট সাহিত্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু মাঘের 'শিশুপাল-বধে'র ভিতরে যে শব্দালঙ্কারের চাতুর্য সেখানে ভারসাম্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না, উহা অর্থপ্রকাশের কোন আয়োজন বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে না; উহা একান্তই সাহিত্য-বিরহিত স্বতন্ত্র শব্দাড়ম্বর; অতএব তাঁহার সকল 'দ্ব্যক্ষরানুপ্রাস'[৯],

---

(৮) তথা চার্থঃ সমর্থবাচকাসম্ভাবে স্বাত্মনা স্ফুরন্নপি মৃতকল্প
এবাবতিষ্ঠতে। শব্দোঽপি বাচ্যোপযোগিত্বাসংভবে বাচ্যান্তরবাচকঃ
সন্ বাক্যস্য ব্যাধিভূতঃ প্রতিভাতি।

(৯) ক্রূরারিকারী কোরেককারকঃ কারিকাকরঃ।
কোরকাকারকরকঃ করীরঃ কর্করোঽর্করুক্॥ শিশুপালবধ, ১৯।১০৪

'একাক্ষরানুপ্রাস'[১০] বা 'সর্বতোভদ্র-বন্ধ'[১১] প্রভৃতির কারুকার্য সত্ত্বেও তাঁহার কাব্য যথার্থ কাব্যত্বপদবী লাভ করিতে পারে নাই,—অন্ততঃ এইসব অংশে নহে। জয়দেবের 'মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে'র ভিতরে কোন সাহিত্য নাই, অতএব ইহা বহুস্থানে বাক্যের 'ব্যাধিভূত'মাত্র। কিন্তু জয়দেবের হাতেও অনুপ্রাস বহুস্থানে কাব্যত্ব লাভ করিয়াছে যেখানে শব্দের এবং ছন্দের ঝঙ্কার মিলিত হইয়া অর্থের অনির্বচনীয় মাধুর্যকেই প্রকাশ করিয়াছে। জয়দেবের—

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহুমনুতে তনুতে তনুসঙ্গত-পবনচলিতমপি রেণুম্॥
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্॥ গীতগোবিন্দ

তরল হইলেও কাব্য হইয়াছে; কারণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাস-বৈচিত্র্য শব্দের কমণীয় ঝঙ্কার এবং ছন্দের সুখকর দোলার ভিতরে একটা বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে।

একদিকে যেমন ভাষা বা প্রকাশ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িতে চাহিলে সাহিত্য-বিরহের সম্ভাবনা, অন্যদিকে তত্ত্ব, অর্থ বা ভাব ভাষা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িতে চাহিলেও তুল্যরূপেই সাহিত্য-বিরহের সম্ভাবনা। সাহিত্যের বিষয়বস্তু কতখানি তত্ত্বপ্রধান হইতে পারে-না-পারে তাহা লইয়া সাহিত্যিকমহলে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই; কিন্তু সে সমস্যার অতি সহজ সমাধান এইখানে, তত্ত্ব যদি নির্মিতির সহিত ভারসাম্যে তাহার সাহিত্যবন্ধন রক্ষা করিতে পারিয়া থাকে তবেই সে সাহিত্য; ভারসাম্য বিনষ্ট হইয়া যেখানেই সাহিত্য নষ্ট হইয়া থাকে সেখানেই সে অ-সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বপ্রধান কবিতাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমরা দেখিতে পাইব—নির্মিতির সেখানে কত রকমের আয়োজন! এ আয়োজন কবির সচেতনে হোক বা অচেতনে হোক, যথার্থ কাব্য হইয়া উঠিতে হইলে এই আয়োজন অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বপ্রধান কবিতাগুলি ছন্দের আবেগে শব্দালঙ্কার-অর্থালঙ্কারের প্রাচুর্যে জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে; তাই সেখানকার তত্ত্ব তাহার নির্মিতি বা প্রকাশ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িতে পারে নাই,—তাই সাহিত্য-বিরহও ঘটে নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু কবিতায় যে সকল ভাবকে অবলম্বন করিয়াছেন, বিহারীলাল চক্রবর্তীও সেইসকল ভাবকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু নির্মিতির সহিত সাহিত্য-বিরহে তাঁহার ভাব বহুস্থানে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে, তত্ত্ব ও নির্মিতি—ভাব ও রূপ মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের সাহিত্যের ভিতর দিয়া সর্বত্র একটা হ্লাদিকারিত্বের সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

---

(১০) দাদদো দুদ্দদুদ্দাদী দাদাদো দুদদীদদোঃ।
দুদ্দাধং দদদে দুদ্দে দদাদদদদো দদঃ॥ ঐ, ১৯।১১৪

(১১)
স কা র না না র কা স
কা য় সা দ দ সা য় কা
র সা হ বা বা হ সা র
না দ বা দ দ বা দ না॥ ঐ, ১৯।২৭

যে শব্দ এবং অর্থ—বাচক এবং বাচ্যের সাহিত্যের দ্বারা কাব্যের কাব্যত্ব স্বীকৃত হয় তাহাদের ভিতরে একটা অনন্যসাধারণতা রহিয়াছে ; নতুবা যে-কোন বাচ্য-বাচকের সাহিত্যের দ্বারাই কাব্য রচিত হইতে পারিত। কাব্যের ভিতরে অর্থের বৈশিষ্ট্য এই, সে সর্বদাই 'সহৃদয়াহ্লাদকারিস্পন্দসুন্দরঃ'। যে অর্থ একটি সুকুমার স্পন্দনের দ্বারা সহৃদয়ব্যক্তির চিত্তে একটা অলৌকিক আনন্দের অনুভূতি আনিয়া দিতে পারে না, সে কখনও সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠিতে পারে না। জগতে যত বস্তু রহিয়াছে তাহাদের নানাবিধ ধর্ম রহিয়াছে, কিন্তু কবিচিত্তে তাহাদের সকল ধর্মের ভিতরে সেই ধর্মটিই প্রধান হইয়া উঠে যে-ধর্মে তাহারা সহৃদয়ব্যক্তির হৃদয়ে আনন্দদানে সক্ষম হয়। পদার্থের এই সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদসামর্থ্য কিরূপে লাভ হয় ? কাব্যের ভিতরে পদার্থসমূহ অথবা জীবনের কোন ঘটনা নিজের স্বভাবকে পরিত্যাগ না করিয়াই একটা আলৌকিক রসের পরিপোষকরূপে একটা বিশিষ্ট প্রকাশ বা দ্যোতনা লাভ করে।[১২] কাব্যের ক্ষেত্রে জগৎ বা জীবনের কোন বিশেষ পদার্থ বা ঘটনার যে একটি রসময় বিশিষ্ট প্রকাশ তাহাই তাহার অর্থ। যখন অর্থ এবং শব্দের সাহিত্যের কথা বলা হয় তখন জগতের পদার্থসমূহের এই বিশিষ্ট অর্থের কথাই মনে করিতে হইবে। মোটের উপরে বলিতে গেলে, জগতের প্রত্যেক বস্তুর ভিতরেই তাহার স্বধর্মের সহিত অবিরোধে যুক্ত হইয়া রহিয়াছে তাহার একটি রসমূর্তি ; সাধারণ লোকের চোখে পদার্থের সাধারণ ধর্মই তাহার অর্থ হইয়া ওঠে ; কিন্তু তিনিই কবি বা শিল্পী যাঁহার চোখে ধরা পড়ে পদার্থের এই রসমূর্তির অর্থটি।

কাব্যের ভিতরে অর্থেরও যেমন এইরূপ একটি বিশিষ্টতা রহিয়াছে শব্দেরও তেমনই একটি বিশিষ্টতা রহিয়াছে। কাব্যের ভিতরকার এই শব্দ বা বাচকের লক্ষণ কি ? কুন্তল বলিয়াছেন, 'কবিবিবক্ষিতবিশেষাভিধানক্ষমত্বমেব বাচকত্বলক্ষণম্'। পদার্থসমূহের যে রসময় বিশেষ অর্থটি কবির অন্তরে একটি বিশেষ ক্ষণে ধরা পড়ে তাহা একটি আনন্দানুভূতির ভিতর দিয়া কবির মনে একটি বিশেষ বাণীরূপ গ্রহণ করে ; রসানুভূতি হইতে লব্ধ কবিহৃদয়ের এই বিশেষ বাণী যাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে তাহাই কাব্যের ভিতরে শব্দ বা বাচক। প্রত্যেক কাব্যসৃষ্টির পিছনেই তাই থাকে কবিহৃদয়ের একটি বিশেষ বাণী ; তথাকথিত বাস্তববাদী রচনার ক্ষেত্রেও এ-সত্যের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। কোন পদার্থই তাহার যথাস্থিত স্বধর্মে কখনও কাব্যের সামগ্রী হইয়া উঠিতে পারে না ; সে তাহার 'স্পন্দনসুন্দর'রূপে তাহার স্বধর্ম ত্যাগ না করিয়াই কবিহৃদয়ের একটি বাণীমূর্তি লাভ করে। প্রতিভাবান ব্যক্তি যখন কোনও পদার্থ অবলোকন করেন তখন তাহা তৎকালোচিত একটি বিশেষ পরিস্পন্দনের দ্বারা পরিস্ফুরন্ত রূপেই আত্মপ্রকাশ করে ; এই বিশেষ পরিস্পন্দনের দ্বারা তাহার স্বভাব যখন সমাচ্ছাদিত হইয়া ওঠে তখনই একটি রসময়ী বাণীরূপে তাহা কবির চিত্তে অবতরণ করে ; কবিচিত্তের এই রসময়ী বিশেষবাণী যখন আবার সেই জাতীয় বাণীকে সুষ্ঠুরূপে এবং অতি সুকুমাররূপে প্রকাশ করিতে পারে এমন শব্দদ্বারা প্রকাশিত হয়

---

(১২) তদেতদুক্তং ভবতি—যদ্যপি পদার্থস্য নানাবিধর্মখচিতত্বং সম্ভবতি
তথাপি তথাবিধেন সম্বন্ধঃ সমাখ্যায়তে যঃ
সহৃদয় হৃদয়াহ্লাদমাধাতুং ক্ষমতে। তস্য চ তদাহ্লাদসামর্থ্যং
সংভাব্যতে যেন কাচিদেব স্বভাবমপহত্য রসপরিপোষাঙ্গতয়া
ব্যক্তিমাসাদয়তি।—বক্রোক্তি-জীবিতম।

তখনই তাহা যথার্থ সাহিত্য হয়, এবং তখনই তাহা আমাদের একটা অলৌকিক চেতনচমৎকারিতার কারণ হয়।[১৩]

মোটের উপরে কবিচিত্তের রসস্পন্দিত বিশেষ বাণীর একটি বিশেষ ভাষা চাই; সাহিত্য বলিব তাহাকেই যেখানে এই বিশেষ বাণী একটি বিশেষ প্রকাশ লাভ করিয়াছে। পূর্বেই দেখিয়াছি, এই বিশেষ বাণী বা অর্থ দ্বারাও কাব্য হয় না, শুধু বিশেষ প্রকাশের দ্বারাও কাব্য হয় না,—তাহাদের নিখুঁত মিলন বা সাহিত্যের দ্বারাই কাব্যত্ব সিদ্ধ হয়। সাহিত্যের ভিতরে তাই সর্বত্র চাই নিখুঁত সাহিত্য; শব্দের সহিত শব্দের সাহিত্য, অর্থের সহিত অর্থের সাহিত্য,—আবার শব্দার্থের সর্বাঙ্গীণ এবং সুকুমার সাহিত্য। ভাব, শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার ইহারা সকলে যখন একটি অপূর্ব মিশ্রণের ভিতরে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া একটি নূতন স্বাদের সৃষ্টি করে তখনই তাহা সাহিত্য বা কাব্য পদবী লাভ করে। কুন্তল কাব্যের ভিতরে এইরূপ সর্ববিধ উপকরণের মিশ্রণকে তুলনা দিয়াছেন পানকরস বা 'সরবৎ'-এর সহিত; সেখানে যেমন বহু জাতীয় বহু রস একত্রিত হইয়া তাহাদের পৃথক পৃথক স্বাদবৈশিষ্ট্যকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সাহিত্যে একটি নবতম স্বাদের সৃষ্টি করে, কাব্যের ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই ঘটে;—সাহিত্য শব্দের ইহাই তাৎপর্য।

কুন্তলের পর হইতে আমরা সাহিত্য-শব্দটিকে নানা কাব্যগ্রন্থে বা আলঙ্কারিক গ্রন্থে নানারূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই। ইহার ভিতরে বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য-দর্পণ' অলঙ্কার গ্রন্থখানিই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। আমরা আজকাল যে ব্যাপক অর্থে সাহিত্য কথাটির ব্যবহার করি বিশ্বনাথ সেই জাতীয় ব্যাপক অর্থেই সাহিত্য কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। তবে লক্ষণীয় এই, বিশ্বনাথ তাঁহার গ্রন্থ-মধ্যে সাহিত্য অর্থে কাব্য কথাটিই সর্বত্র ব্যবহার করিয়াছেন; একমাত্র গ্রন্থশেষে একটি শ্লোকে তিনি 'সাহিত্যতত্ত্ব' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে।[১৪] তাহাতেই বোঝা যায় তখন পর্যন্তও (অর্থাৎ ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতকেও) সাহিত্য শব্দটি সাধারণ কাব্যসৃষ্টি অর্থে সুপ্রচলিত ছিল না। তবে এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অর্বাচীনকালে বহু কাব্য, অলঙ্কার, টীকা গ্রন্থের নামরূপে বা ব্যক্তিবিশেষের পদবীরূপে সাহিত্য কথাটির বহু ব্যবহার দেখিতে পাই।[১৫]

---

(১৩) যস্মাৎ প্রতিভায়াং তৎকালোল্লিখিতেন কেনচিৎপরিস্পন্দেন পরিস্ফুরন্তঃ
পদার্থাঃ প্রকৃতপ্রস্তাবসমুচিতেন কেনচিদুৎকর্ষেণ বা সমাচ্ছাদিতস্বভাবাঃ
সন্তো বিবক্ষিতাভিধেয়তাপদবীমবতরন্ত স্তথাবিধবিশেষপ্রতিপত্তি—
সমর্থেনাভিধানেনাভিধীয়মানাশ্চেতনচমৎকারিতামপদ্যন্তে।

(১৪) সাহিত্যদর্পণমমুং সুধিয়ো বিলোক্য
সাহিত্যতত্ত্বমখিলং সুখমেব বিত্ত।

(১৫) যথা,—সাহিত্যকণ্টকোদ্ধার; সাহিত্যকল্পদ্রুম; সাহিত্যকল্পবল্লী (অনন্তকৃত); সাহিত্যকৌতূহল (যশস্বিকবিকৃত 'উজ্জ্বলপদা'র টীকা); সাহিত্যকৌমুদী (বিদ্যাভূষণকৃত ভরতসূত্রবৃত্তি); সাহিত্যচন্দ্রিকা; সাহিত্য-চিন্তামণি (বীরনারায়ণকৃত); সাহিত্যচূড়ামণি (লৌহিত্য-ভট্টগোপালকৃত কাব্যপ্রকাশটীকা); সাহিত্যতরঙ্গিণী (কৃষ্ণকৃত); সাহিত্যদীপিকা (ভাস্করমিশ্রকৃত কাব্যপ্রকাশটীকা); সাহিত্যবোধ (সীতারামকৃত); সাহিত্য-মীমাংসা; সাহিত্যমুক্তামণি; সাহিত্যরত্নমালা; সাহিত্যরত্নমালা (কমলাকরকৃত গীতগোবিন্দটীকা); সাহিত্যবিচার

এই অর্বাচীন সংস্কৃতের ব্যবহার হইতেই আমরা বাংলায় সাহিত্য কথাটি গ্রহণ করিয়াছি। অবশ্য দুইয়ের মিলন এই অর্থে শব্দটির প্রয়োগও দু'এক স্থানে দেখা যায়।[১৬] বাংলায় আবার 'সাহিত্য-মঙ্গল'ও রচিত হইয়াছিল।[১৭] পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে সাহিত্য শব্দটি আরও একটি গভীরতর দ্যোতনা লাভ করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—"সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে ভাষায়-ভাষায় গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে,—মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভব নহে। যে-দেশে সাহিত্যের অভাব সে-দেশের লোক পরস্পর সজীববন্ধনে সংযুক্ত নহে—তাহারা বিচ্ছিন্ন।" (সাহিত্য) সাহিত্যের ভিতরে আমরা দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া একটি হৃদয়ের রসময় বাণীস্পন্দনকে বহুর ভিতরে সঞ্চারিত করিয়া দেই ; হৃদয়ের এই আদান-প্রদানের ভিতর দিয়াই বহুর ভিতরে জাগিয়া ওঠে একটি অখণ্ড যোগ ; সমরসানুভূতির যোগে বহু হৃদয়কে যাহা এক করিয়া বাঁধিয়া তোলে তাহাই যথার্থ সাহিত্য।

(কৃষ্ণতর্কালঙ্কার) ; সাহিত্যবিদ্যাধর (চারিত্রবর্ধনমুনির উপাধি) ; সাহিত্যশার্ঙ্গধর (শার্ঙ্গধরের অলঙ্কার) ; সাহিত্য-সংগ্রহ (শম্ভুদাস) ; সাহিত্যসরণীব্যাখ্যা ; সাহিত্য-সর্বস্ব (বামনের কাব্যালঙ্কার-সূত্রের মহেশ্বরকৃত টীকা) ; সাহিত্য-সাম্রাজ্য (সুমতীন্দ্রস্বামীকৃত রঘুনাথ-ভূপালীয়ের টীকা) ; সাহিত্যসার (বিশ্বেশ্বরকৃত কাব্য) ; সাহিত্যসার (মানসিংহকৃত অলঙ্কার); সাহিত্যসুধা (রসতরঙ্গিণীর নেমিশাহকৃত টীকা), সাহিত্য-সুধাসমুদ্র (হীরভট্টের পিতা কৃষ্ণবৈদ্যকৃত) ; সাহিত্য-সূক্ষ্ম-সরণি (শ্রীনিবাস) ; সাহিত্যসূচী (হরদত্তসিংহ) ; সাহিত্য-হৃদয়-দর্পণ (কাব্য-প্রকাশের টীকাকার চণ্ডীদাস কর্তৃক উদ্ধৃত)। দ্রঃ—Catalogus Catalogorum—Aufrecht.

(১৬) "এই দুইয়ের সাহিত্যে অথবা পার্থক্যে শ্রবণ এবং চিন্তন করিবেক।"—রামমোহন রায়। দ্রষ্টব্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান।

(১৭) দ্রষ্টব্য জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান।

স্বপ্নপ্রয়াণ

শ্রীকানাই সামন্ত

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যখানি একটি দ্বীপের মতো।

মানবচিত্তসিন্ধু যুগ যুগান্তর প্লাবিত করিয়া উচ্ছল তরল কলরবে ওঠে পড়ে; নীলাকাশে নীল তরঙ্গমালার ফেনপুঞ্জিত বিচিত্র ভঙ্গী উদ্যত করিয়া কত কী ব্যক্ত করিতে চায়, পারে না; কারণ, কিছুই স্থির থাকে না, কিছুই রূপ ধরিয়া ওঠে না— প্রাক্‌সৃষ্টির সীমাহীন এই ব্যাকুলতার অন্তর হইতে সাহিত্য বা রসসৃষ্টি ধীরে ধীরে অজ্ঞাত অপরিচিত ভূভাগের মতো জাগিয়া উঠিয়াছে, ধীরে ধীরে নিজেই নিজেকে পরিচিত করিয়াছে। যুগযুগান্তরব্যাপিনী চেতনা, আর তাহারই অন্তহীন কূলে উপকূলে যুগযুগান্তরব্যাপী সাহিত্য। এক-এক জাতির সৃষ্ট সাহিত্যকে এক-একটি নূতন মহাদেশ ধরা যাইতে পারে, এবং এ হিসাবে দেখা যায়, সমগ্র মানসভূভাগ মানব-অধ্যুষিত সমগ্র বাস্তব ভূভাগের তুলনায় বহুগুণে বৃহত্তর ও বিচিত্রতর— ইহারই অগ্রসরণীল দিগন্তের পর দিগন্তের আহ্বানে বিস্মিত ব্যক্তিমনের তীর্থপর্যটনের কোনো দিকেই কোনো শেষ নাই।

বাঙালির মানসভূভাগের হিমাবৃত উত্তরমেরু কোথায় কোন্ শূন্যপুরাণে বা বৌদ্ধ দোঁহায়, পণ্ডিতগণের নিকটে তাহার দিশা মিলিবে; বৈষ্ণবপদাবলীতে মঙ্গলকাব্যে পাঁচালিতে গীতিকায় বাউলগানে বিচিত্র যে পুরাতন অববাহিকাভূমি, বাঙালির জীবনে তাহার পুঞ্জীভূত দান এখনও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই; আগন্তুক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল অভিঘাতে বিপুল এক ভূমিকম্পের পীড়নে শস্যশ্যামল ধীরসমীরণসঞ্চরিত সেই সমতলপ্রদেশ বিদীর্ণ ও বিত্রস্ত হইয়া যে অভিনব নদীনদ-পর্বতগহ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকেই আমরা বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিম-ভূদেব-দীনবন্ধু-অধিষ্ঠিত আধুনিক বাংলাসাহিত্য বলি; তারপর সন্ধ্যাসংগীতের শুরু হইতে শেষলেখার সময় পর্যন্ত, এক যুগসন্ধির প্রাগূষা হইতে আর-এক যুগসন্ধির আরক্ত দিবাবসানের মধ্যেই, যে আশ্চর্য বিশাল ঐশ্বর্যময় ধরিত্রী বেদে ও পুরাণে বর্ণিত উর্বশীর মতোই সমুদ্রসম্ভবা এবং উর্বশীর মতোই চিরতরুণী— আজ হইতে এক শত বৎসর পরে রবীন্দ্রবর্ষ বলিয়া যাহার খ্যাতি দেশে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পথিক প্রাণকে উৎসুক করিয়া তুলিবে, তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় না জানিলেও, বিস্ময়ের শেষ না হইলেও, সেই ভূমিতেই আজিকার বাঙালি আমরা বাস করিতেছি। কিন্তু, আধুনিক বাঙালির বাসভূমিরই সামিল, অথচ তাহা হইতে সমুদ্রের এক উৎক্ষিপ্ত সংকীর্ণ বাহুর বেষ্টনে বিচ্ছিন্ন, একটি ক্ষুদ্রদ্বীপ আছে— তাহারই নাম স্বপ্নপ্রয়াণ।

উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদে রচিত এই কাব্যখানি বাঙালি পাঠকের বিশেষ পরিচিত নহে। ইহার স্ফুরদ্‌বিদ্যুৎ নীলাভ জলদমালায় আলিঙ্গিত গিরিশিখর ও দূরত্বহেতু-নীলবর্ণ তালতমালসর্জের বনশ্রেণী সমুদ্রের নীলদর্পণে ও আকাশের নীলপটে এমনই মিলাইয়া গেছে যে সে কাহারও চোখে পড়ে না। সাধারণ মানুষের দিগন্ত হাতড়াইয়া বেড়ানো স্বভাবই নয়; কদাচিৎ ইহার অন্যথা হইলেও অন্য ভাষার ও অন্য যুগের অন্য-কোনো কবির রচনা আমাদের মনোহরণ করে, কিন্তু অতি নিকটের দেশে ও কালে বর্তমান স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যখানির কোনো সন্ধান পাই না। শরৎঋতুর কোনো এক সকাল-

বেলায় এমন ইচ্ছা হয় না যে, উপস্থিতের-ঘাটে-বাঁধা নৌকাখানার রশি খুলিয়া দিয়া, বাতাসে শুভ্র পাল তুলিয়া দিয়া, অন্তত একবারও ভাসিয়া পড়ি। সুপ্তিমগ্ন সমুদ্রের এই উপকুলসীমাটুকু আদৌ তরঙ্গসংকুল নয়, ঝটিকা নাই, এবং মগ্নগিরির দংষ্ট্রাঘাতে ভরাডুবি হইবার কোনোই আশঙ্কা থাকিতে পারে না। অথচ, তরলকল্লোলকুল অনতিপ্রসর এই বাধাটুকু অতিক্রম করিলেই স্বপ্নপরিচিত অপরিচিত দ্বীপের স্তরে স্তরে সজ্জীকৃত নিপুণচিত্রিত সৌন্দর্যসম্পদে মুগ্ধদৃষ্টির আশাতীত পুরস্কার মিলিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। দ্বীপভূমি বলিয়া ইহার একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ রমণীয়তা আছে; এখানকার সমুদ্রশীকরবাহী সমীরণে চিরশরতের সুখস্পর্শ সঞ্চার করিয়া ফিরিতেছে; কুঞ্জে কুঞ্জে কত প্রসূনের হাসি, কত বিহঙ্গের গান— তাহাদের চিনি-চিনি মনে হয়, সম্পূর্ণ চিনিতে পারি না। আকাশের দুই দিগন্ত চুম্বন করিয়া বর্ণের একখানি ইন্দ্রধনু প্রসারিত; তাহার আভা কোথায় যে লাগে নাই তাহা বলিতে পারি না।

২

বাংলাভাষায় স্বপ্নপ্রয়াণই বোধহয় স্মরণযোগ্য একমাত্র রূপক কাব্য; তাই বর্তমান আলোচনার সূচনাতে রূপকতার ঈষৎ ছোঁয়া লাগিলেও দোষ নাই। কিন্তু, কাব্যের পক্ষে আগাগোড়া রূপক হওয়া সম্ভবপর, কাব্যের আলোচনায় সে প্রথা বেশি দূর চলিবে না; কাব্য হিসাবে স্বপ্নপ্রয়াণের বিশিষ্টতা কী, উহাতে কোন্ বিশেষ রস কোন্ বিশেষ কৌশলে পরিবেশন করা হইয়াছে, অলংকারবিরল প্রাঞ্জল গদ্যে তাহা ভাবিয়া দেখা ও ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

ইংরেজি সাহিত্যে দুখানি রূপককাব্য বহুখ্যাত; তাহারই দূরাগত শ্রুতিস্মৃতি হইতে বর্তমান লেখকও বঞ্চিত নন। একখানি হইল বনিয়ান্এর পিল্গ্রিম্স্ প্রগ্রেস্, আর-একখানি স্পেন্সর্-এর ফেয়ারী কুঈন। একখানি গদ্যে আর-একখানি ছন্দোবন্ধে লেখা। প্রথমোক্ত কাব্যের বিষয় হইল মুক্তিস্বর্গকামী মানবাত্মার নানা অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া, নানা প্রলোভন ও বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া, বিশ্বাস বিবেক ও নিষ্ঠার আনুকূল্যে ও ইষ্টের প্রসাদে, অন্তিম আকাঙ্ক্ষাতীর্থে উত্তীর্ণ হওয়া। দ্বিতীয় কাব্যখানি অর্থাৎ স্পেন্সর্এর ফেয়ারী কুঈন্ সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায় তাহার এক একটি সর্গে সাত্ত্বিকতা, সংযম, মৈত্রী প্রভৃতি এক-একটি সদ্গুণের অভিযানকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, প্রথম সর্গে 'পবিত্রতার এবং বিশুদ্ধতার উপাসক…… সত্যকে বিপন্মুক্ত করিয়া স্ত্রীরূপে লাভ করিবার জন্য অভিলাষী এবং তাহাতে মিথ্যা, কাপট্য প্রভৃতির চক্রান্তে নানা বিপদ্ আপদে পড়িয়া, ভ্রান্তির অরণ্যে পথ হারাইয়া, নিরাশার গহ্বরে পতিত হইয়া, পরে অভিলষিত লাভ করেন।'[১]

'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক' সিন্ধবাদকল্প প্রিয়নাথ সেন বলেন, স্বপ্নপ্রয়াণ ও 'মুক্তিপথযাত্রী' এই দুইখানি কাব্যই রূপক হিসাবে ফেয়ারী কুঈন্এর তুলনায় সার্থকতর রচনা। আখ্যানবস্তু সুব্যক্ত ও সুনির্দিষ্ট, পদে পদে পাঠকের কৌতূহল জাগিয়া উঠে ও ঘটনাপরম্পরায় তাহার যথোচিত

১ প্রিয়নাথ সেন।

নিবৃত্তি ঘটে ; স্পেন্‌সর্‌এর কাব্যে প্রবেশ করিয়া যেমন হয় তেমন করিয়া জটিল কল্পনার জালে ও অবান্তর বিষয়ের অনুসরণে পথ হারাইতে হয় না।

নিছক গল্পের হিসাবে বনিয়ান্‌এর গদ্যকাব্য তুলনারহিত, তাহার কল্পনার ক্ষেত্রও অতিশয় বিস্তৃত, 'মানবজীবনের সমস্ত পরিসর ব্যাপিয়া আছে।' স্বপ্নপ্রয়াণ সম্পর্কে রসিক পাঠকের অনুরূপ কোনো দাবি নাই। রচয়িতার উদ্দেশ্যও সেরূপ ছিল না। এ কাব্যের নায়ক যে কবি, মুমুক্ষু সাধক নয় ; বর্ণনার বিষয় হইল— স্বপ্নের কুহকে মনোরথযাত্রা ও নন্দনের আনন্দনিকেতনে কল্পনাবালার সহিত মিলন। অন্য কথায় বলিতে গেলে, স্বপ্নপ্রয়াণ নিছক কাব্যগ্রন্থ ; তন্ন তন্ন করিয়া মানবমানসের সৌন্দর্যচয় আবিষ্কার করা ও তাহারই নানা অবস্থায় মৈত্রী প্রীতি শান্তি সাহস প্রভৃতি মনোবৃত্তির আবির্ভাব-তিরোভাবে বিচিত্র রসসৃষ্টি ও রূপসৃষ্টি করা, ইহা ছাড়া তাহাতে কোনো নৈতিক বা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ছিল না।

ছিল না বটে, তবুও রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-উপনিষদের স্তন্যে লালিত হইয়া— বৈষ্ণব ও বাউলের গান কানে রাখিয়া— নিখিল সৃষ্টির মূলে একই বস্তু, দুই নয়, এই অজপা রক্তের কণায় কণায় জপিয়া— ইহ ও অমুত্র, সুখ ও কল্যাণ, সুন্দর ও সৎ, একটি হইতে আর-একটির একান্ত ভেদ কল্পনা করা বা সীমান্ত নির্দেশ করা হিন্দু কবির কল্পনাতেও অসম্ভব ছিল। তাই কবির সচেতন প্রয়াস ও আপাতপ্রতীয়মান উদ্দেশ্য রূপসৃষ্টি হইলেও, উহার প্রত্যেক কল্পনাভঙ্গীতেই তদতিরিক্ত ভূমার প্রতি ইঙ্গিত দেখা যায় এবং ঐ অদ্বৈতেরই উচ্চারিত উচ্ছ্বসিত বন্দনাগানে গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

ইংরেজি দুইখানি কাব্যের উল্লেখ করিয়াছি, এ দেশীয় একখানি দৃশ্যকাব্যের উল্লেখ করিয়া তুলনা দেওয়ার প্রসঙ্গ শেষ করিব। এই নাটকটি হইল শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের সহিত রুচিতে প্রকৃতিতে প্রকাশশক্তিতে মিল নাই, কিন্তু জাতিগত যে মিল আছে তাহাই প্রণিধানের বিষয়।

উক্ত দৃশ্যকাব্যের আখ্যায়িকাসূত্র হইল এই যে, আদিপুরুষের সংকল্প হইতে মায়া মন নামক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই মন হইতে প্রবৃত্তির গর্ভে মহামোহ কাম ক্রোধ আদি এবং নিবৃত্তির গর্ভে বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি সন্তান জন্মিল। প্রবৃত্তিপক্ষীয়গণের চক্রান্তে আত্মা আত্মবিস্মৃত ও বন্দীকৃত। নিবৃত্তিপক্ষীয়গণের চিন্তা ও চেষ্টার বিষয় হইল তাঁহাকে মুক্ত করা। ফলে, বিবেকের ঔরসে ও উপনিষদের গর্ভে বিদ্যানাম্নী কুলগ্রাসিনী কন্যার জন্ম ও তাহারই অনুজ প্রবোধ-চন্দ্রের উদয়ে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ ও স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

এই নাটকখানি যে পুরাদস্তর একখানি রূপক, সে কথা বলাই বাহুল্য এবং ইহার তত্ত্বাংশও, খুব সম্ভব, যুক্তিতর্কসিদ্ধ দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ও 'অখণ্ডনীয়'। কিন্তু, ঐ পর্যন্তই। ইহাকে সার্থক দৃশ্যকাব্য বলা যায় না। ইহাতে ঘটনা নাই বলিলেই হয় ; ঘটনার বর্ণনাও বিরল, কারণ, শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলাইয়া বর্ণ ও রেখাপাতের বিভূতি সুলভ নয় ; ঘটনার ব্যাখ্যাতেই আগা-গোড়া ছয়টি অঙ্ক ভরাট হইয়া আছে। অধিকন্তু, রাঢ়দেশের ভূতচক্রগ্রাম, বারানসীধাম, আদি-কেশবের মন্দির, এ-সব আছে ; তুরস্কের মানুষ, কুমারিল ভট্ট, 'নাস্তিক, তস্কর ও বৌদ্ধভিক্ষু'গণ, তাহাও আছে ; গীতা এবং সাংখ্যপাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনের শরীরী অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ অস্তিত্বের ও ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ আছে— মোট কথা, তত্ত্ব আর কল্পনা, বাস্তব আর অবাস্তব মিলাইয়া বেশ

একটি গোলযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। ফলে, তত্ত্ব হিসাবে ইহা যত উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থই হউক, কল্পনা হিসাবে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের নিকটে শুষ্ক ও শ্রীহীন বলিয়া বোধ হয়। বুঝিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র পণ্ডিত ছিলেন, কবি ছিলেন না। অন্যদিকে, স্বপ্নপ্রয়াণী দ্বিজেন্দ্রনাথ পণ্ডিত হয়তো ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অতুলনীয় কবিত্বপ্রতিভাও স্বতঃসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ। অন্তর্লীন চিন্তাশক্তি ও ধীশক্তিকে ফুলে-পল্লবে ছায়ায়-আলোয় ও বর্ণগন্ধের বিচিত্র হিল্লোলে আবৃত করিয়া, স্বতঃউচ্ছসিত অথচ সংযমিত রসশ্রী বিরাজ করিতেছে।

৩

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য সাতটি সর্গে সম্পূর্ণ। সর্গ কয়টি যথাক্রমে এই— মনোরাজ্য-প্রয়াণ, নন্দনপুর-প্রয়াণ, বিলাসপুর-প্রয়াণ, বিষাদপুর-প্রয়াণ, রসাতল-প্রয়াণ, সমর-প্রয়াণ ও শান্তি-প্রয়াণ। প্রথম সর্গের সূচনাতেই কবি বলিয়া দিয়াছেন, ইহা হইল মনোরথে চড়িয়া মনোরাজ্যে যাত্রার কাহিনী। কবি নিজেই যাত্রী। ক্রমে ক্রমে ইহাও ব্যক্ত হইয়াছে যে, নন্দনপুর, বিলাসপুর বিষাদপুর, রসাতল, অভিনব কুরুক্ষেত্র ও অন্তিম শান্তিনিকেতন এ-সমস্তই মনের ভিতরে; এ-সমস্তই চিন্ময়। হর্ষ, বিলাস, বিষাদ, মূর্ছা, উদ্‌বোধ, উদ্যম, শান্তি— মনেরই বিচিত্র অবস্থা, একের সীমান্ত পার হইয়া আর-একটিতে কখন কেমন করিয়া গিয়া পড়ি তাহার নিশ্চয়তা কিছু নাই; এক মনেরই ভিতরে চতুর্দশ ভুবন এবং সেই নিখিলভুবনাধীশ হইলেন আনন্দ; নিখিল রসের তিনিই ঘনীভূত মূর্তি, মায়া তাঁর পত্নী। অবশ্য, এ যেমন করিয়া বলা হইল, এমন করিয়া কবি বলেন নাই, কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রনাথ শ্রীকৃষ্ণমিশ্র নহেন। তিনি ঘটনার পর ঘটনা সাজাইয়া, নিপুণ তুলিকাপাতে ছবির পর ছবি আঁকিয়া, হাস্য করুণ বীর বীভৎস মধুর প্রভৃতি প্রত্যেকটি রসকে শরীরী করিয়া, শ্রদ্ধা প্রীতি শোভা কল্পনা প্রত্যেকেরই অধরের বিশেষ হাসিটি ও অপাঙ্গের বিশেষ দৃষ্টিটুকু ফুটাইয়া তুলিয়া, প্রসাদগুণসম্পন্ন সুললিত ভাষায় ও ছন্দে, পদে পদে দ্যুতিময় স্ফটিকখণ্ডের মতো নবসৃজিত শব্দরাজি ছড়াইয়া, অভিনব অলংকার পরাইয়া, কাব্যকেই কথা বলাইয়াছেন।

ইহাতে বিচিত্র ভাব, বিচিত্র রস, বিচিত্র কল্পনা— বিচিত্র পাত্রপাত্রী, বিচিত্র ঘটনা— বিচিত্র বাগ্‌ভঙ্গী ও বিচিত্র কারুকৌশল— ইহাদের একটিকে আর-একটির সঙ্গে মিলাইবার, একটির সহায়ে আর-একটি গাঁথিয়া দিবার, এবং পরিণামে চিত্তচমৎকারী অপূর্ব এক স্বপ্নসৌধ গড়িয়া তুলিবার অতুলনীয় এক প্রতিভা দেখা যায়। সৌধ স্বপ্নের বটে কিন্তু গাঁথনি আলগা নয়; মর্মরে গাঁথিলে যেমন হইবার কথা— তাহার বর্ণবিভাসে জ্যোৎস্নাধৌত মল্লিকাকুসুমদামের কথা মনে আনিলেও, তাহার কাঠিন্য ও ধৃতি তবু প্রস্তরের। বস্তুতঃ, স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের স্থাপত্যোচিত এই যে নির্মাণকৌশল ইহাই এক অভূতপূর্ব বিস্ময়ের বস্তু, বাংলাসাহিত্যে ইহার জুড়ি নাই, এবং অনুজ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্পূর্ণ ভিন্নশ্রেণীর হইলেও ইহা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই লিখিয়াছেন, 'স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের রাজ-প্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড়

জিনিসকে তাহার নানা অবয়বে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি তো সহজ নহে। ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারি, এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।'

যেমন কোণার্ক মন্দিরের নির্মাণকৌশল তাহার একখানা ভাঙা পাথর আনিয়া বোঝানো যায় না, ক্লেশস্বীকার করিয়া কোণার্কে যাওয়া দরকার, স্বপ্নপ্রয়াণের নির্মাণকৌশলও তেমনি অখণ্ড স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যেই পাওয়া যাইবে, বর্তমান আলোচনায় প্রমাণ আহরণ করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিব না। অন্য যে একটি গুণে এই কাব্য চিরস্মরণীয় তাহার উদাহরণ তো পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, পাওয়া যায়, তাহারই দুই-চারিটা চয়ন করিয়া দিতে দোষ নাই। সে গুণ হইল ভাষা ও ভাবের চিত্রময়তা। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের একখানি কাব্যের নাম— ছবি ও গান। রবীন্দ্রনাথ বুঝাইয়াছেন, বস্তুতঃ বাঙ্ময় হইলেও কবিতায় অন্য দুই কলালক্ষ্মীর অন্য দুই জাতের প্রাসাদও বর্তমান। তবে কোনো কবির রচনায় বা চিত্রের সাদৃশ্য অধিক দেখি, কোনো কবির রচনায় বা সংগীতের। দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা প্রথমোক্ত পর্যায়ে পড়িবে।

স্বপ্নপ্রয়াণের প্রথম পদক্ষেপেই এই ছবি ফুটিয়াছে—

> সুপ্তিতে ডুবিয়া-গেল জাগরণ,
> সাগরসীমায় যথা অস্ত যায় জ্বলন্ত-তপন।
> স্বপন-রমণী আইল অমনি
> নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ॥
> সুকোমল চরণকমল দুটি
> ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি;
> করে পদ্ম-ফুল করে ঢুল-ঢুল
> অলসিত আঁখি-সম আধো-আধো ফুটি॥

তারপর স্বপনরমণী কবির চক্ষে মুখে ঐ মায়াময় পদ্মফুল বুলাইতেই সুপ্ত কবির মোহবন্ধ খসিল, তিনি স্বপ্নে জাগিয়া উঠিলেন। এবং মনোমন্দিরে রহস্যের চাবি ঘুরাইয়া দিতেই, আরব্য উপন্যাসের কাহিনীতে যেমন শুনিয়াছি, গহন ছায়াপথ দিয়া মায়ারথ নামিয়া আসিল; কল্পনাকুমারী তার সারথি। কবি বলিতেছেন, সেই কল্পনা যাঁর সাহচর্যে—

> বেড়াতেম কত খুসিতে-হাসিতে!
> বারেক না মনে হ'ত, পরিচয় তব জিজ্ঞাসিতে!
> শুধু জানিতাম কল্পনা নাম,
> নব নব সাজি' সাজ, ছলিতে আসিতে॥

রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরীর কথা মনে পড়ে না তা নয়—

> তুমি এই পৃথিবীর
> প্রতিবেশিনীর মেয়ে ধরার অস্থির
> এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে,
> সখী, আসিতে হাসিয়া তরুণ প্রভাতে
> ইত্যাদি।

তবে কল্পনা রবীন্দ্রের মানসসুন্দরীর মতো নিরুদ্দেশ তরণীর কাণ্ডারী হইয়া বসেন নাই, পার্থপ্রিয়া সুভদ্রার মতো মনোরথগামী অশ্বের বল্গাপাশ ধরিয়া হাসিতেছেন—

কবিবর বচন করিতে সাঙ্গ
কল্পনা মধুর হাসি, হরি-লয়ে হরিণ-অপাঙ্গ,
শিথিল-আয়াসে লোল-দিল রাসে ;
তেজে গরবিয়া-উঠি' ধাইল তুরঙ্গ ॥
মনোরাজ্য ক্রমে হৈল সন্নিকট ;
দূর-হৈতে মনে লয়, শোভে যেন চিত্র অকপট ।
গিরি নদী বন হর্ম্ম্য সুশোভন,
স্তরে স্তরে শোভা করে দিগন্তের পট ॥
সম্মুখে তোরণদ্বার শক্রধনু
ভিতরে সরসী হাসে, চন্দ্রভাসে পুলকিত-তনু ।
ঘন বনচ্ছায় কজ্জলের প্রায়
তীরে যথা নীরে তথা, ভেদ নাহি অনু ॥
থামিল তুরঙ্গরাজি ক্ষণপরে ;
"নাম' এই ঠাঁই" কল্পনা কহিল মৃদুস্বরে ।
নামিলে সে গুণী, কল্পনা-তরুণী
নামিল, মরাল যেন কেলি-সরোবরে ॥

কিন্তু, এভাবে চিত্ররচনার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলেও বোধহয় সমস্ত বইখানি উদ্ধৃত করিতে হয় ।—

ছুটিছে ফোয়ারা, হর্ষে মাতোয়ারা,
শূন্যে চড়ি-উঠিয়া ধরিতে যায় গগনের তারা ।
… …
কুমুদিনী-সদনে পড়িয়া খসি
তল্ তল্ থল্ থল্ করিতেছে প্রতিবিম্ব-শশী ।
… …
যতগুলি হরিণ আছিল জাগি
একে একে আসিয়া যুটিল তথি, কানন তেয়াগি ।
নেত্র-কিসলয় স্থির করি রয়,
নিদ্রা-তন্দ্রা পসারিয়া স্বর-সুধা লাগি ॥

ইহার কোন্ ছবিটি চমৎকার নয় ? —

দক্ষিণের দ্বার খুলি মৃদুমন্দ-গতি
বনভূমে পদার্পিয়া ঋতুকুলপতি
লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইল ফুল ।
অঙ্গ ঘেরি পরাইল পল্লব-দুকূল ॥

কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হ'ল মলয় বাতাস।
ফুলের ঘোমটা খুলি কাড়য়ে সুবাস।
"এ নহে সে" বলি শেষে ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥

ইহাতে কি—

পাগল হাওয়া বুঝতে নারে
ডাক পড়েছে কোথায় তারে,
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো ॥

ইত্যাদি বহু অগীত গানেরও পূর্বঝংকার বাজিতে থাকে না, পূর্বরাগ ফুটিয়া ওঠে না? বস্তুতঃ, পদে পদেই শব্দের কারুকার্যে, প্রকাশভঙ্গীর চারুতায় ও ভাবের বৈচিত্র্যে দ্বিজরাজকে আসন্ন-উদয় রবির পূর্ববর্তী বলিয়া বুঝিতে কিছুই অসুবিধা হয় না। উপমামাত্রই একদেশিক, সুতরাং বলিতে হইবে কি, এ ক্ষেত্রে অবশ্য প্রভাতের রবির নিকট নিশান্তের শশধর জ্যোতির ঋণ লইতে পারেন না।

কিন্তু, কেবল মধুর সুন্দর ছবিই নয়— কেবল জ্যোৎস্নার বিভাস, মলয়ের হিল্লোল, পুষ্পের বিকাশই নয়, অন্যভাবের বর্ণনাও প্রচুর আছে। বিষাদপুর-প্রয়াণ ও রসাতল-প্রয়াণ, এই কাব্যের অপূর্ব দুইটি সর্গ। সেখানে বিষণ্ণ বা ভয়ংকরের তো কথাই নাই, কত কিছু অবিশ্বাস্য অদ্ভুত কিম্ভূত কিমাকার রূপ পাইয়াছে—

ঝুপ্‌সি-ঝাপ্‌সি বন-আব্‌ডালে,
হাপসি-বদন-সব উঁকি দেয়, ভর দিয়া ডালে।
কিম্ভূত-আকার অতি চমৎকার
প্রকাশ পাইয়া উঠে জোনাক-মশালে।

... ...

ডাকি-উঠে বায়স ঘুমের ঘোরে ;
আ উ হা হু শব্দ করি রোগী-সবে শয্যাময় ঘোরে।

... ...

ভাঙা জানালায় বায়ু ফুসলায়,
আছেন কাল পেচক থামের মাথায় ॥

... ...

ছড়ি-ভঙ্গি পড়ি'-আছে খান-কত
উচা-উচা কাষ্ঠাসন, তিনকাল যাহার বিগত।...
শূন্য সব ঘর-দ্বার শ্মশানের মত ॥
আইল অদ্ভুত-রস দল-সনে ;
নেঙচিয়া চলি-চলি' লাফ-দিয়া উঠে সিংহাসনে।
কে যে কোথাকার ঠিক নাই তার
বসিলেন ঠেস দিয়া সহাস্য-বদনে ॥

মন্ত্রী আসি বসিল পেচক মুখ গম্ভীর করিয়া।
কাগের খোঁচায় চক্ষুটা ওঁচায়,
কাগা সে অমনি বসে কিঞ্চিৎ সরিয়া ॥

... ...

বসে কাগাতোয়া, ফুলাইয়া রোঁয়া ;
টুকু-টাকু আহারে রসনা নড়ে, কালো যেন লোহা।
ধীরে ধীরে চলি ঝুলাইয়া থলি
উচ্চে রহে হাড়গিলা, নাহি যায় ছোঁয়া ॥

আবার ওদিকে—

গম্ভীর পাতাল। যথা কালরাত্রি করাল-বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য! শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখা-সঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমো-হস্ত এড়াইতে— প্রাণ যথা কালের কবল!
কোথা জল কোথা স্থল কোথা তল কোথা দিগ্বিদিক্।
রসাতল-গভীর তিমির এক গ্রাসয়ে সকল!
দেখে যদি মর্ত্ত্য কেহ প্রান্তে দাঁড়াইয়া, সে কি আর
আসে ফিরে! আপাদ-মস্তক ঘুরি', টলিয়া চরণ,
কণ্টকিয়া কেশজাল, বিস্ফারিয়া নয়ন-যুগল,
তমোগর্ভে তলাইয়া শেষপৃষ্ঠে লভে শেষ গতি!

দীর্ঘপদী এই পয়ারের ছন্দও যেমন স্বচ্ছন্দচারী, ধ্বনিও যেমন গম্ভীর, বিষয়ও তেমনি অদৃষ্টপূর্ব। কালানল-প্রজ্জলিত নরকের বর্ণনা করিতে গিয়া দান্তে ইহার চেয়ে কী ভয়াল রোমহর্ষণ চিত্র আঁকিয়া থাকিবেন, অনুমান করিতে পারি না।

এইভাবে শব্দ দিয়া কেবল রূপকল্প সৃজন করা নয়, বহুবিধ নৈসর্গিক ধ্বনি-প্রতিধ্বনির বোধও জাগাইয়া তোলা যায়, স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে ইহাও দেখিতেছি—

জানালা ঠেলিয়া বায়ু চলি'-যায়, বলি' 'সর্ সর্'!

... ...

শ্রবণ-প্রবণ গহ্বর-ভবন
সামান্য শব্দটিতেও নহেক বধির ॥
টুঁ-শব্দটি হইলেই, তাড়াতাড়ি
তাহারে লুফিয়া-লয় দশদিক্ করি' কাড়াকাড়ি।

জানিতে ইচ্ছা করে, ধ্বনি কানে শুনিতেছি না চোখে দেখিতেছি!—

সরিৎ ত্বরিৎ বহে তট চুমি চুমি।

এক্ষেত্রে যেন চোখ খুলিয়া শব্দের অর্থের দিকে তাকানো নিষ্প্রয়োজন, ধ্বনিতেই অভীপ্সিত চিত্র নিপুণভাবে আঁকা হইয়াছে।

এইভাবে কবিকল্পনার অনুসরণে মনোরাজ্যের লোকলোকান্তরে ফিরিয়া অবশেষে দেখি, কখন্ একসময় স্বপ্নদৃষ্টি আর স্বপ্নশ্রুতি দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছে—

খুলি-গেল দিগন্ত সকল-দিকে ;
পর্ব্বত-পাথার-ব্যোম দেখা দিল একৈ নিমিখে !

তখন মানসের সেই মেরুশিখরে দাঁড়াইয়া কী দেখিতেছি ! কী শুনিতেছি ! বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া বিশ্বেশ্বরের স্তুতিগান ধ্বনিত হইতেছে—

নানারসযুত ভব গভীর রচনা তব
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়।
মহাকবি ! আদিকবি ! ছন্দে উঠে শশিরবি,
ছন্দে পুন অস্তাচলে যায় ॥
তারকা কনক-ভাতি জলদ্-অক্ষর-পাঁতি,
গীত লেখা নীলাম্বর-পাতে।
ছয় ঋতু সম্বৎসরে মহিমা কীর্ত্তন করে
সুখ-পূর্ণ চরাচর সাথে ॥

... ...

আনন্দে সবে আনন্দে তোমার চরণ বন্দে
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্রতারা।
তোমারই এ রচনারই ভাব ল'য়ে নরনারী
হা হা করে, নেত্রে বহে ধারা ॥

৪

স্বপ্নপ্রয়াণে কবিত্বসম্পদের দিক দিয়া যেমন কবিত্বকৌশলের দিক দিয়াও তেমনি বহুবিচিত্রতা আছে। ছন্দের আছে নূতনত্ব। কাব্যে-ব্যবহৃত সকলপ্রকার ছন্দই অত্যন্ত স্বচ্ছন্দচারী ; চরণে চরণে মিল বা মিত্রতা থাকিলেও, মাইকেলি অমিত্র পয়ারের তুলনাতেও যতিপাতের স্বাধীনতা বা 'প্রবহমানতা' তাহাদের কম নয়। পূর্বের বহু উদ্ধৃতিতে ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে। মিলযুক্ত পয়ারে বা দীর্ঘপয়ারে অমিত্রপয়ারের আসল গুণ মিলাইয়া উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দে বহু কবিতা লিখিয়াছেন, 'সমুদ্রের প্রতি' বা 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় যাহার প্রকৃতি জানা যায়, তাহার ইঙ্গিত কি স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য হইতে আসে নাই ?—

কখনো বনে পশি', দেখে শশী, গাছের ফাঁকে।
কখনো হেরে দিক কোথা পিক না জানি ডাকে ॥

নমনা নামি নামি ঊর্দ্ধগামী হইয়া উঠি
বহে বিপুলভার ; অন্ধকার ধরে ভ্রূকুটি ॥

ইহার ছন্দই কি রবীন্দ্র-প্রতিভায় নিখুঁত ও বিচিত্র হইয়া মানসীকাব্যের 'বধূ' হইতে মহুয়ার 'সাগরিকা' পর্যন্ত বহু কবিতাকেই অপ্রকাশ হইতে প্রকাশের ঘাটে বরণ করিয়া আনে নাই ?

দ্বিজেন্দ্রনাথের শব্দসম্পদও অতুলনীয়। বিষয় অনুযায়ী শব্দের ভোল বদল হইয়া যায়, ধ্বনি ও ধ্বনির অনুষঙ্গ একরূপ রাখেন না। একেবারে অভিজাত ও সাহিত্যিক, একেবারে ঘরোয়া ও লোকের মুখে মুখে প্রচলিত বাংলা, আর তাহারই মাঝে মাঝে উদ্‌ভাবিত বা উদ্‌ভূত আন্‌কোরা কত নূতন শব্দ— এ সমস্তই কবি কী আশ্চর্য কৌশলে মিলাইয়াছেন, গুরুচণ্ডালী দোষ হয় নাই, কোথাও তাল কাটে নাই, সেই এক বিস্ময়ের বিষয়। বুঝিতে পারি, ভাষার উপর দ্বিজেন্দ্রনাথের কী দখল ছিল, কী সাহস ছিল, কী দরদ ছিল এবং কী ভাবে তিনি ভাষার প্রকৃতি ও ভাষার মেজাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া ধ্যান করিয়াছেন ও অনুভব করিয়াছেন।

বস্তুতঃ, স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের ছন্দ ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিয়াই স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধ হইতে পারে। এ বিষয়ে যোগ্যতরজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

৫

খাঁটি ভারতীয় কল্পনায় ও খাঁটি বাংলাভাষায় লেখা হইলেও স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যখানি আজ হারাইয়া গেছে। সে বাংলাদেশ নাই, সে বাঙালিজাতিকেও চেনা যায় না। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির রাগে রঞ্জিত হইয়া সাহিত্যে অমরতা না পাইলে, উনবিংশ শতকের শেষভাগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি যে কী ছিল ও কেমন ছিল মনে আনা দুরূহ হইত। সে তো কেবল এক ধনীপরিবারের বসতবাটি ছিল না। অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ব্রহ্মবিদ্যা ও কলাবিদ্যা, ধর্ম ও কর্ম— এ সকলেরই সে যে মিলনভূমি ছিল। সেই তীর্থের পুণ্যোদকেই বাংলার ভবিষ্যতেরও অভিষেক হইয়াছে। ইহারই অন্যতম পুরোহিত ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

স্বপ্নপ্রয়াণ হাতে লইয়া দক্ষিণের সেই বারান্দা মনে আনিতে ইচ্ছা করে। দক্ষিণের বারান্দায় শুভ্র ফরাশ পাতা, ছোটো ডেস্‌কোখানি পাতিয়া কবি তাঁহার কাব্য লিখিতেছেন। বসন্তের বনে যেমন অজস্র মুকুল ধরে, অজস্র ফুল ঝরিয়া যায়— দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখাও সেইরূপ। মালায় গাঁথা হইয়াছে অল্প, হেলাফেলায় হারাইয়া গেল অনেক। এদিকে কাব্যসৃজনের তুলনায় বন্ধুবান্ধব লইয়া কাব্যরসসম্ভোগের আনন্দও কিছুমাত্র কম নয়— তাহারই আড়াল-আবডালে থাকিয়া বালক রবীন্দ্রনাথও সে আনন্দের অংশ পাইয়াছেন— কবি কখনও তাঁর মধুরগম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন, কখনও তাঁর উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যে ছাদ-বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে, সে সময় কবির হাতের কাছে কাব্যিক বা অন্যবিধ রসলুব্ধ যে অভাগার পিঠখানা আছে তাহার দশা ভাবিয়া দুঃখ হয়।

ক্রমে এই দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের গহনে পথ হারাইলেন। কবিপ্রকৃতি ও শিশুপ্রকৃতি আমরণকাল অম্লান অটুট থাকিলেও, কবিতাসুন্দরীর চরণবন্দনা চুকাইয়া দিয়া, জীবনসাধক

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পী শ্রীমুকুলচন্দ্র দে

মধ্যস্থলে উপবিষ্ট মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ॥ দক্ষিণে, মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ॥ বামে, দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ॥ দক্ষিণে উপবিষ্ট, দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র দিনেন্দ্রনাথ ॥

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

জীবনরসিক মহাপুরুষ শান্তিনিকেতনে আশ্রয় লইলেন, এবং তাঁহার অধিষ্ঠানে আশ্রমকে আশ্রম বলিয়া মনে হইল।

মধুসূদনের লোকোত্তর প্রতিভা[১], তাহার সমাদর ও সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহারই মতো আর কোনো কবি অমরতায় উত্তীর্ণ হন নাই। শৈবালে সে পথ ঢাকা পড়িয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর। তিনি নিজেই নিজের কাব্যসাধনাকে রচনা হইতে রচনান্তরের ভিতর দিয়া পরমা সিদ্ধির অভিমুখে লইয়া যান নাই। কাব্যসাধনার এ যে একটা নূতন দিক, এবং ইহার সম্ভাবনাও যে অপরিসীম, সে কথা অন্য কোনো কবির মনে উদয় হয় নাই।

যুগের পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। হয়তো অন্য কোনো যুগান্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার যথাযোগ্য সমাদর হইবে (স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো হইলেও, কালের প্রবাহে বা মানস উপপ্লবে, একেবারে ডুবিবে না) এবং অন্য কোনো কবি তাঁহারই পথে তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অভিনব অমরতার অধিকারী হইবেন।

---

১ শোনা যায়, একমাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ মাইকেল মধুসূদন মাথার টুপি খুলিতে রাজি ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম গৌরব। তিনি নানা বিষয়ের রচনা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রূপককাব্য বঙ্গভাষা-ভাষীদিগের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধগুলি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও প্রবন্ধের ভাষা অতি সরল ও প্রাঞ্জল। দুঃখের বিষয়, দ্বিজেন্দ্রনাথের কোন জীবনী রচিত হয় নাই। তাঁহার জীবনীর উপকরণস্বরূপ আমি কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি—ভবিষ্যৎ জীবনীকারের সহায়তা হইতে পারে, এই আশায় সেগুলি প্রকাশ করিলাম।

জন্ম-তারিখ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মপত্রিকা রক্ষিত আছে। তাহা হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :

শকনরপতেরতীতাব্দাদয়ঃ ॥১৭৬১॥ ১০।২৮।৫৫।৩২।৪০॥০ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরফাল্গুনস্যোনত্রিংশতদিবসে বুধবারে শুক্লপক্ষীয়নবম্যাস্তিথৌ নক্তং একাদশপলাধিকষড়্‌বিংশতিদণ্ডসময়ে রবৌ মীনরাশিগতে ......শ্রীলশ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়স্য প্রথম শুভ নবকুমারো জাত...... ॥ তস্য নাম শ্রীযুত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মা ঠাকুরঃ

ইহা হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম-তারিখ ২৯ ফাল্গুন ১২৪৬ (১১ মার্চ ১৮৪০) পাওয়া যাইতেছে। এই তারিখই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে— বর্ত্তমানে বহুস্থলে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভুল জন্মতারিখ চলিতেছে।

বিবাহ

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। এই সময় তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। এই বিবাহের সংবাদ সমসাময়িক সংবাদপত্র পাঠে জানা যায়। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :

মহামান্য বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিমুলা হইতে লাহোরে আসিয়াছেন। আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, তিনি তথা হইতে অবিলম্বে এতন্নগরে প্রত্যাগমন করিবেন।

গত শনিবার [৬ ফেব্রুয়ারি] রাত্রিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের এবং রবিবার রাত্রিতে ভ্রাতৃপুত্রের শুভবিবাহকার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সুনির্ব্বাহ হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর্ব্বগুণজ্ঞ ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় তথা বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই মাঙ্গলিক কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ বাবু এতৎকর্ম্মে স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে আরো অধিক সুখের বিষয় হইত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্নী সর্বসুন্দরী দেবী ছিলেন যশোহরের নরেন্দ্রপুর-নিবাসী তারাচাঁদ চক্রবর্তীর কন্যা।

চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা

√চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা ভারতের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অগ্রদূত। "স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করা"র উদ্দেশ্যে ১২৭৩ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (১২ এপ্রিল ১৮৬৭) কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়া ভিলায় চৈত্রমেলার প্রথম অনুষ্ঠান হয়। প্রথম তিন বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা চৈত্রমেলা নামে পরিচিত ছিল। প্রধানতঃ কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন এক উদ্যানে প্রতি বৎসর এই মেলার আয়োজন হইত। জনচিত্তে দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিবার মানসে মেলায় জাতীয় শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হইত, দেশীয় ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়াম প্রদর্শিত হইত ; ইহা ছাড়া জাতীয় সংগীত, কবিতাপাঠ ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হইত। এই মেলার পরিকল্পনাটি রাজনারায়ণ বসুর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে ৭ আগষ্ট ১৮৬৫ তারিখে প্রথম প্রকাশিত 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে ও উৎসাহে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের নিকট এই স্বদেশী মেলা অশেষ প্রকারে ঋণী। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। তিন বৎসর মেলার সম্পাদক এবং নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৬ মে গণেন্দ্রনাথের অকাল-মৃত্যুতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার সম্পাদক হন। মেলার ৪র্থ হইতে ৭ম সাম্বৎসরিক অধিবেশন পর্য্যন্ত (ইং ১৮৭০-৭৩) এই পদে তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি হিন্দুমেলার ৮ম অধিবেশনে (ইং ১৮৭৪) এবং ১০ম অধিবেশনে (ইং ১৮৭৬) সভাপতিও হইয়াছিলেন। তিনি একাধিক বার মেলায় বক্তৃতা-দান, এবং মেলার উদ্দেশ্য প্রচার ও তদনুযায়ী কার্য করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল সোসাইটি বা জাতীয় সভায় প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন।[১] তিনি সোসাইটির অধ্যক্ষ-সভার সদস্য ছিলেন এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সহ সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যাঁহাদের প্রেরণায়— যাঁহাদের সুপরামর্শে ও সাহায্যে এই জাতীয় মেলা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। মেলার অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসু সত্যই লিখিয়াছেন :

> কিন্তু জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠানের বিষয় একা তাঁহার [নবগোপাল মিত্রের] গুণানুবাদ করিলেই পর্য্যাপ্ত হয় না। সদ্বিদ্যাবিশারদ নিয়ত-স্বদেশ-হিতৈষী প্রসিদ্ধনামা বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামও সর্ব্বাগ্রে গণনীয়। রোমনগরের এক সেনাপতিকে তরবার, অন্যকে ঢাল বলিয়া যেমন উপমা দেওয়া হইত, আমাদিগের বর্ত্তমান জাতীয় অনুষ্ঠানপক্ষে ঐ উভয় মহাশয়ই সেইরূপ সমহিতকারী হইতেছেন।
>
> —'মধ্যস্থ', ফাল্গুন ১২৮০, পৃ ৭৩০

হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিকথায় দুই-চারি কথা বলিয়াছেন ; এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

> ...নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল ; আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত ; কুস্তি জিম্ন্যাষ্টিক প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তা'র খুব ছিল ; কিন্তু কি রকম কি হওয়া

---

১ ১৮ কার্ত্তিক ১২৭৯ তারিখের 'মধ্যস্থ' (তৎকালে সাপ্তাহিক) পত্রে প্রকাশ, "আমরা অবগত হইলাম যে আগামী ন্যাসনেল সোসাইটীর অধিবেশনে বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রের বিষয়ে এক বক্তৃতা করিবেন।"

উচিত, সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত। একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল,— তাঁতি, কামার, কুমার ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম,—'ও সব ত দেশের সকলের জানা আছে; দেশী painting দেখাতে পার?' মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানীয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। আমি বলিলাম—'উল্‌টে রাখ, উল্‌টে রাখ; এই তুমি দেশী painting করাইয়াছ? আর আমাদের ন্যাশন্যাল মেলায় এই ছবি রাখিয়াছ?' ছবিখানা সরাইয়া উল্‌টাইয়া রাখা হইল। তা'র ঝোঁক ছিল, বড়-বড় ইংরাজকে নিমন্ত্রণ করা। আমি অনেক বলিয়া কহিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করাইলাম। সে বড়-বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের ও দেশী রাজাদের কাছে খুব যাতায়াত করিতে পারিত। —'পুরাতন প্রসঙ্গ', দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ২০৬-৭

চৈত্রমেলার সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে দেশানুরাগের গান রীতিমত রচিত হইতে আরম্ভ হয়। "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি" নামে যে জাতীয় সংগীতটির সহিত আমরা সুপরিচিত, তাহা দ্বিজেন্দ্রনাথেরই রচনা, উহা চৈত্রমেলার জন্য লিখিত হইয়াছিল। গানটি উদ্ধৃত করিতেছি:

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
দিবা রাত্রি ঝরিছে লোচন-বারি॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি॥

কলিকাতা বা আদি ব্রাহ্মসমাজ

কলিকাতা (পরে 'আদি') ব্রাহ্মসমাজের সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মাধ্যক্ষ-হিসাবে তিনি কখন কোন্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার তালিকা দিতেছি:

সম্পাদক

পৌষ ১৭৮৬-১৭৮৭ শক	...	সম্পাদক, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ
১৭৮৮ শক	...	যুগ্ম-সম্পাদক (অন্যতর সম্পাদক সারদা-প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়), কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।
১৭৮৯-১৭৯০ শক (পৌষের মধ্যভাগ পর্যন্ত)	...	সম্পাদক, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ
পৌষ ১৭৯০	...	সম্পাদক, আদি ব্রাহ্মসমাজ
১৭৯১-১৭৯২ শক পৌষ	...	যুগ্ম-সম্পাদক (অন্যতর সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর), আদি ব্রাহ্মসমাজ।

ট্রাস্টি (বিশ্বস্ত অধিকারী)

১৮০৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে (ইং ১৮৮১) দ্বিজেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন ট্রাস্টি বা বিশ্বস্ত অধিকারী নির্বাচিত হন।

সভাপতি

১ অগ্রহায়ণ ১৮২১ শক (ইং ১৮৯৯) হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহার্থে দ্বিজেন্দ্রনাথ সভাপতি নিযুক্ত হন।

আচার্য ও সভাপতি

১৮২৬ শকের ১লা শ্রাবণ (ইং ১৯০৪) হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও সভাপতি হন। ১৮২৯ শকের ১লা শ্রাবণ (ইং ১৯০৭) হইতে তিনি এবং তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়ে এই পদে বৃত হন।

ব্রহ্মসংগীত

দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজে গীত হইবার জন্য তিনি অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ছিলেন বিষ্ণু চক্রবর্তী।[২] এখানে দ্বিজেন্দ্রনাথের রচিত একটি ব্রহ্মসংগীত উদ্ধৃত হইল :

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য, পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকরভূমি, মঙ্গলের তুমি মূলাধার।
নানা-রস-যুত ভব, গভীর রচনা তব, উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়।
মহাকবি! আদিকবি! ছন্দে উঠে শশী রবি, ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়।
তারকা-কনক-কুচি, জলদ-অক্ষর-রুচি, গীত-লেখা নীলাম্বর-পাতে।
ছয় ঋতু সম্বৎসরে মহিমা কীর্ত্তন করে, সুখপূর্ণ চরাচর সাথে।
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি, বজ্র-রবে রুদ্র তুমি ভীম।
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি, ধ্যায় যুগ-যুগান্ত অসীম।
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে, কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তারা।
তোমারি এ রচনারি ভাব লয়ে নরনারী হা হা করে, নেত্রে বহে ধারা।
মিলি' সুর নর ঋভু প্রণমি' তোমায় বিভু, তুমি সর্বমঙ্গল-আলয়।
দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম, দেও দেও ও-পদ-আশ্রয়।

বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটি

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির এই শাখা গঠিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ সোসাইটির অন্যতর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৩০৪-১৩০৬ সাল— এই তিন বৎসর পরিষদের সভাপতি-পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় তাঁহার একাধিক রচনা স্থান পাইয়াছে।

---

২ ইনি রামমোহন রায়ের সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ছিলেন; বার্ধক্য নিবন্ধন ১৮০৪ শকের মাঘ মাসে (ইং ১৮৮৩) আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ৪মে ১৯০০ (২২ বৈশাখ ১৮২২ শক) ৯৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ফাল্গুন ১৮০৪ ও জ্যৈষ্ঠ ১৮২২ শক দ্রষ্টব্য।

পত্রিকা-সম্পাদন

'ভারতী'

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৭৭) 'ভারতী' প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ইহার প্রথম সম্পাদক। এ-বিষয়ে তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :

জ্যোতির ঝোঁক হইল, একখানা নূতন-পত্র বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় 'ভারতী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল। আমি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতাম। মলাটের উপরে একটি ছবির design আমি দিয়াছিলাম ; কিন্তু সে ছবি ওরা দিতে পারিল না। —'পুরাতন প্রসঙ্গ', দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ২০৫

'ভারতী' প্রকাশ সম্বন্ধে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' পুস্তকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :

একদিন জ্যোতিবাবু তাঁহার তেতলার ঘরে বসিয়া, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, সাহিত্যবিষয়ক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে হইবে। যেমন কথা, অমনি কায। তৎক্ষণাৎ জ্যোতিবাবু দ্বিজেন্দ্রবাবুকে এই সঙ্কল্প জানাইলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবুও এ প্রস্তাবে অনুকূল মত দিলেন। এখন এ পত্রের কি নাম হইবে, এই সমস্যাসমাধানেই সর্ব্বাগ্রে সকলে যত্নবান্ হইয়া পড়িলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু নাম করিলেন "সুপ্রভাত"— কিন্তু এ নামটি জ্যোতিবাবুদের মনোনীত হইল না, কারণ ইহাতে যেন একটু স্পর্দ্ধার ভাব আসে ; অর্থাৎ এতদিনে ইঁহাদের দ্বারাই যেন বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রভাত হইল। সুপ্রভাত নাম যখন গ্রাহ্য হইল না, তখন দ্বিজেন্দ্রবাবুই আবার তাহার নাম রাখিলেন "ভারতী"।...

জ্যোতিবাবু বলিলেন,—"ভারতী প্রকাশ হইতেই আমাদের আর একজন বন্ধুলাভ হইল। ইনি কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। আগে তিনি বড়দাদার কাছে কখন কখনও আসিতেন। কিন্তু আমার সঙ্গে তেমন আলাপ ছিল না। এখন 'ভারতী'র জন্য লেখা আদায় করিবার জন্য আমরা প্রায়ই তাঁহার বাড়ী যাইতাম, এবং এই সূত্রে তিনিও আমাদের বাড়ী আরও ঘনঘন আসিতে লাগিলেন।...

"ভারতীর প্রথম বর্ষে 'সম্পাদকের বৈঠকে' 'গঞ্জিকা' নামে একটা বিভাগ ছিল। তাহাতে কেবল ব্যঙ্গকৌতুকের কথাই থাকিত। এই ভাগে বড়দাদাই প্রায় সব লিখিতেন। আমি "ঊনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ বা রামিয়াড" নামে কেবল একটা নক্সা লিখিয়াছিলাম মাত্র। আমি তখন অনেক বিষয়েই লিখিতাম। প্রথম বর্ষের "ভারতী"তে রবি ও অক্ষয়ের লেখাই বেশী প্রকাশিত হইয়াছিল। "ভারতী"তে রবির "মেঘনাদবধ" কাব্যের সমালোচনা ও কবিতা প্রথম বাহির হয়। অক্ষয় তখন বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা এবং হৃদয়-ভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া এক একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, যেমন "মান ও অভিমানে কি প্রভেদ ?" ইত্যাদি। লোকের এ সব তখন খুবই ভাল লাগিত।"...

সাত বৎসর (১২৯০ সাল পর্যন্ত) সুষ্ঠুভাবে পত্রিকা পরিচালনের পর দ্বিজেন্দ্রনাথ অবসর গ্রহণ করেন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'

'ভারতী'র ভার ভগ্নী স্বর্ণকুমারীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮০৬ শকের আশ্বিন মাস (ইং ১৮৮৪) হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। এই পদে তিনি ১৮৩০ শক (ইং ১৯০৯) পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী

দ্বিজেন্দ্রনাথ যে-সকল পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। এই তালিকায় ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। দ্বিজেন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধ মাসিকে মুদ্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার সকলগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। বর্তমান তালিকায় বন্ধনীমধ্যে সন-তারিখ-যুক্ত যে ইংরেজী তারিখ লক্ষিত হইবে, তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্তৃক সংকলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকায় প্রদত্ত পুস্তকের প্রকাশকাল।

বাংলা

১। **মেঘদূত** (পদ্যানুবাদ)। ১২৬৬ সাল (ইং ১৮৫৯ ?)।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন : সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পরে আমার 'মেঘদূত' প্রকাশিত হইল।...মেঘদূতে আমার নাম ছিল না।...আমি যখন মেঘদূত লিখি, তখন ও-ধরণের বাঙ্গালা কবিতা কেহ লিখিতেন না ; ঈশ্বর গুপ্তের ধরণটাই তখন প্রচলিত ছিল। মাইকেল তখন ইংরাজীতে কবিতা লিখিতেন। একদিন হাইকোর্টে আমার ভগিনীপতি সারদাকে তিনি বলিলেন 'আমার ধারণা ছিল, বাঙ্গালায় ভাল কবিতা রচিত হোতে পারে না, 'মেঘদূত' প'ড়ে দেখ্‌ছি, সে ধারণা ভুল'। —'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পৃ ১৯১-৯২, ২০৪।

'মেঘদূত' ১৩১৪ সালে প্রকাশিত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত 'নব রত্নমালা' এবং দিনেন্দ্রনাথ প্রকাশিত 'কাব্যমালা' (২৫নং দ্রষ্টব্য) পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

২। **ভ্রাতৃ-ভাব**। ইং ১৮৬৩।

১৭৮৫ শকের আষাঢ় সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ : নূতন গ্রন্থ।— ...ভ্রাতৃ-ভাব। শ্রীযুত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক যে প্রবন্ধ ব্রাহ্ম ভ্রাতৃসভায় পঠিত হয় তাহা এই পুস্তকে প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাহাতে পরস্পর ভ্রাতৃ-ভাব উন্নত হয় সেই ভ্রাতৃ-ভাবের ফল অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

৩। **জ্যামিতি**।

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' পুস্তকে (পৃ ৮৩) প্রকাশ :—[প্রেসিডেন্সী কলেজের] Sutcliffe সাহেব...কাহাকেও বড় প্রশংসা করিতেন না— কেবল একবার জ্যোতিবাবুর বড়দার (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলেন।...দ্বিজেন্দ্রবাবু সেই সময়ে নূতন প্রণালীতে একখানি জ্যামিতি ছাপাইয়াছিলেন। ছাত্রেরা মজা দেখিবার জন্য তাঁহার হস্তে সেই বই এক খণ্ড দিল— তিনি খানিকটা দেখিয়া বলিলেন, "This man has brains."

এই প্রসঙ্গে ১৩০৬ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথের 'দ্বাদশ-স্বীকার্যবর্জ্জিত জ্যামিতি' প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।[৩]

---

৩ দ্বিজেন্দ্রনাথের গণিতচর্চা যে এই সময়েই শেষ হয় নাই, আজীবন তাঁহার ব্যসন ছিল, এ কথা শান্তিনিকেতন-বাসকালে যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই জানেন। তাঁহার Boxometry বা 'কাগজের বাক্স রচনা প্রণালী'ও এই গণিতচর্চারই ব্যাবহারিক প্রয়োগ। ১৩৩৩ সালের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র কর্তৃক পরস্পরকে লিখিত যে পত্রাবলী প্রকাশিত হয়, তাহাতে দেখিতে পাই, ১৯০১ সালে জগদীশচন্দ্র যখন লণ্ডনে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে দ্বিজেন্দ্রনাথের গণিত সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া লিখিতেছেন—

৪। **তত্ত্ববিদ্যা**।

প্রথম খণ্ড—জ্ঞানকাণ্ড। ৮ অগ্রহায়ণ ১৭৮৮ শক (ইং ১৮৬৬)। পৃ ১৮২

দ্বিতীয় খণ্ড—ভোগকাণ্ড। (১৮ অক্টোবর ১৮৬৭)। পৃ. ৬৪

তৃতীয় খণ্ড—কর্ম্মকাণ্ড। (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮)। পৃ. ৭০

চতুর্থ খণ্ড ৪ (১০ এপ্রিল ১৮৬৯)। পৃ ৪৪

৫। **স্বপ্ন-প্রয়াণ** (রূপক কাব্য)। ১৭৯৭ শক (ইং ১৮৭৫ ?)। পৃ. ২৪৩

'স্বপ্ন-প্রয়াণ'এর প্রথম সর্গটি প্রথমে ১২৮০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ (ভাদ্র ১৩০৩) স্থানে স্থানে পরিবর্তিত।

৬। **সোনার কাটি রূপার কাটি**। ? (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ৫৮

"বহুবাজার সাবিত্রী লাইব্রেরির ১২৯১ সালের ২১ মাঘের অধিবেশনে··· পঠিত হয়।" নং ২৪ দ্রষ্টব্য। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে।

৭। **সোণায় সোহাগা**। [ইং ১৮৮৫] পৃ. ২০।

নং ২৬ দ্রষ্টব্য। আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড 'সোণায় সোহাগা' পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। ইহা প্রথমে ১৮০৭ শকের আষাঢ় সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়।

৮। **আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা**। ২৫ ভাদ্র ১২৯৭ (ইং ১৮৯০)। পৃ. ৩১।

নং ২৪ দ্রষ্টব্য।

"···বড়দাদা তাঁহার পাণ্ডুলিপি তোমাকে পাঠাইবার জন্য আমার হস্তে দিয়াছেন। কোন গণিতওয়ালাকে দিয়া একবার যাচাই করাইয়া লইতে চান—নিরুৎসাহজনক কথা হইলে বলিতে কুণ্ঠিত হইও না। তাঁহার মতে ইহা কিছু জটিল ও বাহুল্যময় হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে নূতন পদার্থ মেলা অসম্ভব নহে। যদি কেহ ইহাকে [সহজ] করিবার জন্য কোন [ইচ্ছা জ্ঞাপন] করেন, তাহা তিনি শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন। অথবা কেহ যদি ইহার মর্ম্মটা রাখিয়া কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ছাপাইতে ইচ্ছুক হন, তিনি তাহাতে সম্মত।···বড় দাদার এই খাতার কোন নকল নাই।"— প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৩

জগদীশচন্দ্র পত্রোত্তরে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—

"···অনেক অনুসন্ধানের পর Liverpool Mattemafeal Societyর সম্পাদকের সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাঁহার নিকট তোমার দাদার লেখা দিয়াছি। তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া পড়িবেন এবং অন্যান্য specialistদের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া আমাকে পরে পত্র লিখিবেন।···"— প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৩

পত্রান্তরে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

"···তোমার দাদার পুস্তক এখানকার এক Mathematical Societyর Secretaryকে দেখিতে দিয়াছিলাম। তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি ingenuityর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তবে নূতন notation বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহার চিঠি পাঠাই। এখানে Conservation সব দিকেই বেশী; যদি একজন অনেক কাল ধরিয়া নূতন সংজ্ঞা প্রচলিত করিতে না পারেন, তবে তাহা সর্ব্বসাধারণে দেখিতে চাহে না। আমার বিবেচনায় যদি তোমার দাদা পুস্তকের litho copy করিয়া বিভিন্ন libraryতে পাঠান তাহা হইলে ভাল হয়।···"— প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৩

৪ ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। ১৭৯১ শকের শ্রাবণ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে।

৯। **সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা।** ইং ১৮৯১। পৃ. ৮২।

১৮১৩ শকের আশ্বিন সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "নূতন পুস্তক"-এর বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। ইহা কম্বুলিয়াটোলা পাঠ্যসমিতির অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত হয়। নং ২৪ দ্রষ্টব্য। চৈতন্য লাইব্রেরি ও রামমোহন লাইব্রেরিতে ইহার এক এক খণ্ড আছে।

১০। **সাধনা— প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।** ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ (ইং ১৮৯২)। পৃ. ৪৮+৪ পরিশিষ্ট।

নং ২৩ দ্রষ্টব্য। ১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সাধনা'য় প্রথম প্রকাশিত। চৈতন্য লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে।

১১। **অদ্বৈত মতের সমালোচনা।** অগ্রহায়ণ ১৩০৩ (ইং ১৮৯৬)। পৃ. ৪৪+৮ পরিশিষ্ট।
"চৈতন্য লাইব্রেরি সম্পর্কীয় সভায় ১৮১৮ শক, ২৮ অগ্রহায়ণের বিশেষ অধিবেশনে...পঠিত।"

১২। **অদ্বৈত মতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনা।** ৩০ অগ্রহায়ণ ১৩০৪ (১৪ ডিসেম্বর ১৮৯৭)। পৃ. ৭০

১৩। **পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।** বৈশাখ ১৩০৫ (১৪ মে ১৮৯৮)। পৃ. ৬৭ (নং ২৭ দ্রষ্টব্য)

১৪। **আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত।** ১৩০৬ সাল (১৫ জুন ১৮৯৯)। পৃ. ১০৩। নং ২৩ দ্রষ্টব্য।

১৫। **ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধনা।** (১৩ জানুয়ারি ১৯০০)। পৃ. ২৬

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে।

১৬। **আচার্য্যের উপদেশ** :

১ম খণ্ড—১৪ চৈত্র ১৩০৬ (ইং ১৯০০)। পৃ. ৮৩
২য় খণ্ড—পৌষ ১৩০৮ (ইং ১৯০২)। পৃ. ৬১

১৭। **শ্রীমন্মহর্ষি দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আচার্য্য শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা।** ১৩০৮ সাল (ইং ১৯০১)। পৃ. ৩১

১৮। **বিদ্যা এবং জ্ঞান।** (২০ এপ্রিল ১৯০৬)। পৃ. ২৪

নং ২৩ দ্রষ্টব্য। ১৩১২ সালের মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।

১৯। **একটি প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর।?** (২ সেপ্টেম্বর ১৯০৬)। পৃ. ২২

ইহা প্রথমে 'ভাণ্ডারে' (২য় বর্ষ, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১৩ প্রকাশিত হয়। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

২০। **বঙ্গের রঙ্গভূমি।** ১৩১৪ সাল (২০ জুলাই ১৯০৭)। পৃ. ২৫

সূচী : পিতৃভূমি এবং মাতৃভূমি ও বাবুর গঙ্গাযাত্রা। নং ২৪ দ্রষ্টব্য। প্রথমটি ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠসংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' পত্রে এবং দ্বিতীয়টি "বঙ্গের রঙ্গ দর্শক" স্বাক্ষরে ১৩১৩ সালের আশ্বিনসংখ্যা সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তিকার এক খণ্ড শ্রীপুলিনবিহারী সেনের নিকট দেখিয়াছি।

২১। **হারামণির অন্বেষণ**। ইং ১৯০৮ (১৮ এপ্রিল)। পৃ. ৬৪

১৩১৪ সালের 'বঙ্গদর্শন' পত্রে প্রকাশিত। নং ২৬ দ্রষ্টব্য।

২২। **দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব**। (২০ ডিসেম্বর ১৯০৮)। পৃ. ৩২

নং ২৩ দ্রষ্টব্য। ১৩১৫ সালের শ্রাবণসংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এই পুস্তিকার এক খণ্ড আছে।

২৩। **রেখাক্ষর-বর্ণমালা**। ১৩১৯ সাল (২৫ মে ১৯১২)। পৃ. ১২০

লিথোয় মুদ্রিত, কবিতায় বাংলা শর্টহ্যাণ্ড্ পুস্তক। ইহার প্রাথমিক খসড়া ১২৯২ সালের 'বালক'এ এবং সচিত্র আকারে ১৩০৬ সালের 'পুণ্য' এবং ১৩১৪-১৫ সালের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২৪। **গীতাপাঠ**। ১৩২২ সাল (ইং ১৯১৫)। পৃ. ৩৩৮

১৩১৮-২১ সালের 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত।

২৫। **নানা চিন্তা**। ১৩২৭ সাল (৫ মার্চ ১৯২০)। পৃ. ৩৩৬

সূচী: সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ; বিদ্যা এবং জ্ঞান ; সাধনের সত্য ; আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত ; [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের] সভাপতির অভিভাষণ ; সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ ; উপসর্গের অর্থ-বিচার ; দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব ?

২৬। **প্রবন্ধ-মালা**। ১৩২৭ সাল (২০ জুন ১৯২০)। পৃ. ২০২

সূচী: মুখ্য এবং গৌণ ; কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক, সোনার কাটি রূপার কাটি ; সোনায় সোহাগা ; নব্যবঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি ; আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা ; সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা, বাবুর গঙ্গাযাত্রা।

২৭। **কাব্য-মালা**। ১৩২৭ সাল (২০ জুন ১৯২০)। পৃ. ১৬৭

সূচী: যৌতুক না কৌতুক ; গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য ; মেঘদূত ; সেরা মালি ; অন্তিম বাসনা ; বাসন্তী পদাবলী ; তেতালায় দুপুর রাত্রি ; বরাহনগরের উদ্যানে ; পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

২৮। **চিন্তামণি**। ১৩২৯ সাল (ইং ১৯২২)। পৃ. ২৭০

সূচী: হারামণির অন্বেষণ, সারসত্যের আলোচনা।[৫]

---

৫ দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতামহের যে-সকল গদ্য ও পদ্য রচনা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, সেগুলি ২৩-২৬ সংখ্যক চারিখানি পুস্তকে প্রকাশ করেন। এগুলি প্রকাশিত হইবার পরও দ্বিজেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন ও তাঁহার লেখনী সক্রিয় ছিল ; এই সময়কার রচনাগুলি এখনও কোন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে ছড়ায় চিত্তাকর্ষক সরস চিঠি লিখিবার অভ্যাস দ্বিজেন্দ্রনাথের ছিল ; পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধে এইরূপ কতকগুলি ছড়া প্রকাশ করিয়াছেন। 'নানা চিন্তা', 'প্রবন্ধমালা' ও 'কাব্যমালা' প্রকাশিত হইলে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে সেগুলি উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিবার সময় এইরূপ যে কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি পরপৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত হইল।

দশোপদেশ। শ্রাবণ ১৭৯২ শক (ইং ১৮৭০)।

আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানপূর্বক প্রদত্ত দশটি উপদেশ— আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত। ইহার ১-৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত উপদেশটি (১ মাঘ ১৭৯১ শকে প্রদত্ত) দ্বিজেন্দ্রনাথের।

পুরাতন-প্রসঙ্গ। ২য় পর্যায়। আশ্বিন ১৩৩০ (ইং ১৯২৩)। পৃ. ১৭৯-২০৭।

এই পুস্তকের শেষাংশে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা দ্বিজেন্দ্রনাথ কর্তৃক বিবৃত ও বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্তৃক লিখিত।

ইংরেজী

Ontology being a translation of "Tatwavidya" a Bengali work by Babu Dwijendranath Tagore, with subsequent additions and alterations made by him in the original text. 1871, pp 70

কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

বাক্স-রচনা-প্রণালী। ১৩২০ (?) সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ এই বিষয়ে ইংরেজীতে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় ('প্রবাসী' বৈশাখ ১৩২১ দ্রষ্টব্য)। তিনি ১২৯৫ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'ভারতী ও বালক'এ কবিতায় "কাগজের বাক্স রচনা" প্রণালী বিবৃত করিয়াছিলেন।

সাশীরাশি হাসি-ভরা

সারস্বত উপহার

সত্য অবতার তুমি ওহে ভাই সত্য।
নিখিল সত্যের সত্য তোমায় অবতু॥
তুমি, জ্যোতি, সত্যের প্রকাশ নিরমল।
তোমার আশ্রয় সত্য অচল অটল॥
মরুমাঝে কুঞ্জবনে কূজয়ে বিহঙ্গ।
অজ্ঞান-সাগরে ওঠে চিন্তার তরঙ্গ॥
জ্যোতির নিকটে নাই কিছুই গোপন।
সত্যের উদার আঁখে সকলই আপন॥
ভেটিল ব্রাহ্মণ তাই, সাজাইয়া থাল।
চিন্তানিধি কাব্য ফুল, প্রবন্ধরসাল॥ *

স্বস্তি-বাচন

ওহে খেন্দ্র বজ্রধর, সমরেন্দ্র শূলী।
অবনীন্দ্র! রাজদণ্ড, ওয়ে তব, তূলী।
ত্রিপথগা নির্ঝরিণী গদ্যপদ্যময়ী,
বাটি ল'য়ে তিনঃবীরে হও বিশ্বজয়ী॥
চাহ যদি উপদেশ অম্বল মধুর,
প্রবন্ধমালায় তাহা পা'বে ভরপুর॥
মধুর বাণীমধু'র হও যদি ভোমরা।
সুরভি কাব্যমালায় পাবে তাহা তোমরা॥
নানাচিন্তা ঢেউ দেখি কেন গো পলাও।
মণিমুক্তা পা'বে, যদি ভিতরে তলাও॥

শাঁসালো গদ্য রসালো পদ্য
মোহিনীমোহনে ভেটিনু অদ্য॥
হাতে পেয়ে তিন স্নেহ-মাখা পুঁথি,
দহনে, মোহন, দিও না আহুতি।
নানা চিন্তা ঢেউ দেখি কেন গো পলাও।
মণিমুক্তা পা'বে, যদি ভিতরে তলাও॥

* রসাল-শব্দে আম্রফল বুঝায়।

মাসিকপত্রে প্রকাশিত রচনা

দ্বিজেন্দ্রনাথের লিখিত বহু প্রবন্ধ মাসিকপত্রে ছড়াইয়া আছে। এগুলির অধিকাংশই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। প্রধানতঃ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'ভারতী,' 'সাধনা', 'বালক', 'প্রবাসী' ও নব-পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' তাঁহার রচনাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া 'সাহিত্য', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', 'ভাণ্ডার', 'শান্তিনিকেতন', 'বুধবার', 'সবুজ পত্র' প্রভৃতিতেও তাঁহার কিছু কিছু রচনার সন্ধান মিলিবে।

পত্রাবলী

দ্বিজেন্দ্রনাথের লিখিত অনেকগুলি পত্র 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'সবুজ পত্র' ও 'সুপ্রভাত' পত্রে ও 'প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনের নিকট তাঁহার কতকগুলি পত্র দেখিয়াছি; উহার অনেকগুলি 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমল হোমের নিকটও দ্বিজেন্দ্রনাথের তিনখানি পত্র আছে। আরও অনেকের নিকট এরূপ পত্র থাকিতে পারে; এগুলি প্রকাশিত হওয়া উচিত।

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের নিম্নমুদ্রিত দুইখানি চিঠি মজিলপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্তের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। প্রথম চিঠিখানি দ্বিজেন্দ্রনাথের 'আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা' প্রবন্ধ (গ্রন্থপঞ্জী, ৭নং দ্রষ্টব্য) প্রসঙ্গে লিখিত :

১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আর্য্যের উপর আপনারও শ্রদ্ধা যেরূপ আমারও সেইরূপ কিন্তু আর্য্যামিকে আমি দুচক্ষে দেখিতে পারি না। যখন আমি শুনিলাম যে কে একজন কুমার কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ঝাড়িতেছেন ও আর্য্য movement is an anti-brahmic movement তখনই আমি বুঝিলাম যে, আর্য্যামিতে শুভ নাই—may be আদিসমাজের অনুকরণে সভা স্থাপন করিয়াছে but it is not therefore a friend to Adi Brahmo Somaj। Adi সমাজ reasonable আর্য্যের স্বপক্ষে কিন্তু আর্য্যওয়ালারা unreasonable আর্য্যতা-পরায়ণ। By reasonable আর্য্য I mean that আর্য্য which is allied to the whole length and breadth of আর্য্য-dom and is not an enemy to enlightenment; by unreasonable আর্য্য I mean that bigoted আর্য্য which is dead against evcything that savours of enlightenment, and ফাল্‌তো আর্য্যগরিমাতেই বিভোর! আমার উদ্দেশ্য গোঁড়া আর্য্যদিগকে convert করা নহে—this is impossible and absurd. আমার উদ্দেশ্য হ'চ্চে প্রকৃত আর্য্যতা এবং আর্য্যামির মধ্যে যে প্রভেদ আছে সেই বিষয়ে লোকের চক্ষু ফুটাইয়া দেওয়া—ridiculousness of আর্য্যামি দেখাইয়া দেওয়া।—আর্য্যামির উপর প্রবীণ ভাবের attitude ধারণ করিলে প্রবীণতার অপব্যয় করা হয়।

them's my sentiments। আমাদের দেশের লোক এমনি ঘোর অরসিক যে একটা জিনিস্ যাহা prima facie ridiculous তাহার ridiculousness তাঁহাদের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া না দেখাইলে তাঁহারা তাহা কোনো মতেই দেখিতে পান না। আবার দেখাইয়া দিলে বলেন "ও তো জানাই আছে"! না দেখাইয়া দিলে ridiculousকে sublime মনে করিয়া তাহার গোঁড়া admirer হ'ন—এইরূপ উভয় সংকটে আমার মন্তব্য এই যে—"দেখাইয়া দেওয়া at any risk" is preferable to দেখাইয়া না দেওয়া for প্রবীণতা's sake। আপনার গত পত্র পড়িয়া আমার কলম হইতে উপরের প্রলাপোক্তি বাহির হইয়া পড়িল—আপনি তৎপ্রতি আপনার usual আসান নজরে দৃষ্টি করিবেন। "প্রণয়ের আড়াআড়ি—ভাল নয় বাড়াবাড়ি" (রেখাক্ষর গ্রন্থ) between Deoghur and Park Street.

Faust un-fausted.

২

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার পত্র পড়িয়া ছিল—আমি কলিকাতায় জ্ঞান-বৃক্ষে বারি সিঞ্চন করিতে গিয়াছিলাম। সূক্ষ্ম-শরীর মহাত্মা আপনাকে দিব্য মেওয়া পাইয়াছেন আমি তাঁহাকে envy করি,—কিন্তু আপনি আমার হাত এড়াইয়াছেন,—সিংহের হস্ত এড়াইতে ব্যাধের হস্তে পড়িয়াছেন—হইয়াছে ভাল। Arcady অর্থাৎ বিলাতি বৃন্দাবন—দিশী বৃন্দাবন কি দোষ করিল বুঝিতে পারি না; Arcadyর swain-এর মধ্যে একজন মুনি গোঁসাই আর এক জন বিবিধার্থ মহাভারতের ব্যাস-দেব;—বিহার শব্দের অর্থ যদি আহার হয়, তবে উভয়েই গোকুল-বিহারী তাহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই—এখন না হো'ন—এককালে ছিলেন! মুনি গোঁসাই এখন Old Lion—ব্যাসদেবের এখনো বিলক্ষণ চলে,—তাঁহার লেখনী-নখের দাগে গোকুল-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; সূক্ষ্ম-শরীর মহাত্মা আপনার নিকট কি সাহসে এগো'ন্ তাই আমি ভাবি—আমার তো এগো'তে ভয় করে; গো আগে, মৃগ তাহার পরে, তাহার পরেই—॥

মৃত্যু

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনের দীর্ঘকাল, ও শেষ জীবন বোলপুর শান্তিনিকেতনে কাটিয়াছিল। এইখানে তিনি ১৩৩২ সালের ৪ মাঘ সোমবার রাত্রিশেষে চারিটার সময় (ইং ১৯ জানুয়ারি ১৯২৬) পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ২৫ ফাল্গুন ১৩৪১ তারিখে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র পরিষদ্-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

স্বরলিপি

"ঐ আঁখি রে"— রাজা ও রানী

কথা ও সুর— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি— শ্রীইন্দিরা দেবী

গমা II পনা না | ^ন^র্সা -া -ণধা | -ণর্সণাঃ -ধঃ | পধপা -মগা -মা I
ঐ ০ II আঁ০ খি | রে ০ ০০ | ০০০ ০ | ঐ০০ ০০ ০ I

I পনা না | ^ন^র্সা -া -ণা | ^র্স^ণা ণা | ধা -া ধা I
I আঁ খি | রে ০ ০ | ফি রে | ফি ০ রে I

I ধা ধা | ^ধ^ণা -া ণধা | ^প^ধা পা | পধপা -মগা গা I
I চে য়ো | না ০ চে০ | য়ো না | ফি০০ ০০ রে I

I ^গ^মা -া | -া -া -া | সা মা | মা -গা মা I পা পা |
I যা ০ | ০ ০ ও | কী আ | র ০ রে I খে ছো |

| পা -ধপা ধা | ^ধ^ণাঃ -ধঃ | পধপা -মগা -মা II
| বা ০০ কি | রে ০ | "ঐ"০০ ০০ ০ II

[ধপা]

II { মা মা | ^ম^গা -ধা না | র্সা না | র্সা -া -া I র্সা র্সর্মা |
II { ম র | মে ০ কে | টে ছো | সিঁ ০ দ্ I ন য়০ |

| র্রা -র্সা র্সা | না সর্রা | র্সণর্সা -ণা -ধা } I
| নে র্ কে | ড়ে ছো০ | নি০০ ০ দ্ } I

I ^ধ^ণা ণধা | পা -া পা | ^প^ধা ধপা | মপমা -গা মা I
I কী সু০ | খে ০ প | রা ন০ | আ০০ ০ র I

I পা ধা | ^পধ^ণা -া -ধপা | ^প^-ধাঃ -পঃ | মপমা -গা -মা II II
I রা খি | রে০ ০ ০০ | ০ ০ | "ঐ"০০ ০ ০ II II

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

১৩৫০

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় মুদ্রণ
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
৩ ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ খুদা

১৩৫১

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শ্রীশচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর শ্রীসর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩ বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : শ্রীরজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বানিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

১৩৫২

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
৩৮ প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত

প্রত্যেকটি আট আনা ॥ ৫, ৯, ৩৯ ও ৪১ সংখ্যা যন্ত্রস্থ ॥

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

"তুমি অলকে কুসুম না দিও শুধু শিথিল কবরী বাঁধিও"
HIMKALYAN HAIR OIL
হিমকল্যাণ
হিমকল্যাণের
কল্যাণ পরশ ফুটিয়ে তোলে এর বাস্তব রূপ
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস ·· কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
প্রকাশক শ্রীবিনোদচন্দ্র চৌধুরী
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা